খুন রাঙা পথ

নসীম হিজাযী

খুন রাঙ্গা পথ
নসীম হিজাযী

প্রসঙ্গ কথা

পাঠকমহলে ঔপন্যাসিক নসিম হিজাযীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি উপমহাদেশের সার্থক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় রচিত তাঁর উপন্যাসগুলো নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, মূল্যবোধ জাগরণ এবং জাতিসত্তার স্বকীয় অনুভূতির উজ্জীবনে ফলপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী অবদান রেখেছে।

নসীম হিজাযীর উপন্যাসের ভিন্নরূপ স্বাদ, বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র সাহিত্যমূল্যের কথা বিবেচনা করে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি তাঁর সবগুলো উপন্যাস বাংলায় অনুবাদের গ্রন্থস্বত্ব গ্রহণ করে অতীতে অনেকগুলো প্রকাশ করেছিলো। স্বাধীনতার পর "খুন রাঙ্গা পথ" বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশিত নসীম হিজাযী রচিত পঞ্চম উপন্যাস। এটা 'মোয়াজ্জম আলী' বাংলা তরজমা। ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রথম প্রকাশের সুদীর্ঘ দুইযুগ পর এ উপন্যাসটি আবার পাঠক মহলের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বাংলায় অনূদিত নসীম হিজাযীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে "শেষ প্রান্তর", "মরণজয়ী", "ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার", "মুহাম্মদ বিন কাসিম", "শেষ রাতের মুসাফির", "মাটি ও রক্তের সোহাগ", "শেষ সময়", "কাইসার ও কিসরা", "কাফেলায়ে হিজায ইত্যাদি। এক সময় এ অনুবাদগ্রন্থগুলো পাঠকদের মধ্যে নসীম হিজাযী ও তার উপন্যাস সম্পর্কে প্রভূত কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো। "খুন রাঙা পথ" - এর এবারের প্রকাশনাও পাঠক মহলে সমভাবে সমাদৃত হবে আশা করি।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এক সময় উপন্যাসকে হাতিয়ার করে হিন্দু সমাজের সংস্কার এবং উন্নয়নের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক সময় একই উদ্দেশ্যে ইমদাদুল হক লিখেছিলেন "আব্দুল্লাহ" নজিবর রহমান লিখেছিলেন "প্রেমের সমাধি", "আনোয়ারা", "মনোয়ারা" ইত্যাদি। এ সমস্ত উপন্যাস শরৎসাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে মীর মোশাররফ হোসেন বিষাদ সিন্ধুর মাধ্যমে মুসলিম বাংলার ঘরে ঘরে পৌছেছিলেন। নসীম হিজাযী ঔপন্যাসিক। তার উপর তিনি একজন দরদী সমাজসংস্কারক। উপন্যাস তার হাতে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার।

এদেশে কার্লমার্ক্সের ডাস ক্যাপিটাল যত জনপ্রিয়, তার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' এবং অন্যান্য উপন্যাস। উপন্যাস যে কেবল বিনোদন ছাড়া আরও মহত্তর কিছু হতে পারে, তার প্রমাণ শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র,

অনুবাদকের কথা

উর্দু সাহিত্যের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযী প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে আমার অনূদিত তৃতীয় গ্রন্থ 'খুন রাঙা পথ' (মূলগ্রন্থ 'মোয়াযযম আলী)' আল-হর ফযলে আত্মপ্রকাশ করছে। লেখকের 'দাস্তানে মুজাহিদ' ও 'আখেরী চটান' ইতিপূর্বে যথাক্রমে 'মরণজয়ী' ও 'শেষ প্রান্তর' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

নসীম হিজাযীর ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ পাকিস্তানে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তার অনুবাদ বাঙালি পাঠকসমাজেও সমাদৃত হবে, এরূপ আশা করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। হিজাযীর প্রতিটি উপন্যাস ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। দেশ ও দ্বীন ইসলামের প্রতি আকর্ষণ তার প্রধান উপজীব্য।

পলাশী প্রান্তরে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনা থেকে শুরু করে মহীশূরে সুলতান ফতেহ আলী খান টিপুর উত্থান পর্যন্ত সময়ের পটভূমিকায় 'খুন রাঙা পথ' উপন্যাসটি রচিত। নওয়াব আলীবর্দী খানের শাসন-আমলের যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি দেশে অসংখ্য গাদ্দারের মাথা তুলবার সুযোগ দিয়েছিল, নওয়াবের ইন্তেকালের পর তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় দৌহিত্র তরুণ নওয়াব সিরাজদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পথ খোলাসা করেছিল, মূললেখক তার একটি সুন্দর চিত্র পেশ করেছেন পাঠকদের সামনে। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য–ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি বিকৃত করেননি কোথাও। ইসলামী জাহানের ইতিহাসে আমরা দেখি, কোথাও কখনো সত্যিকার মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর পরাজয় প্রকৃতপক্ষে বিঘোষিত ইসলাম-বিরোধী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুশমনের হাতে ঘটেনি, বরং তাই তাদের পরাজয় ঘটেছে পার্থিব স্বার্থশিকারী সুযোগসন্ধানী মুসলিম নামধারী দেশ ও ধর্মের সত্যিকার দুশমন গাদ্দারদের চক্রান্তের ফলে। পলাশী ও মহীশূরে তথা গোটা উপমহাদেশে মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় এবং বিদেশি ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার মূলেও সেই একই ইতিহাস-আমাদের জাতীয় কলঙ্কের কাহিনী। আজো তা থেকে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়ার জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস চিরকালই পরবর্তী যুগের মানুষকে দেয় সঠিক অভ্রান্ত পথ নির্দেশ। মহীশূরে সুলতান টিপুর সংগ্রাম ও পরাজয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত 'ভেঙে গেলো তলোয়ার' (আওর তলোয়ার টুট গেয়ি) বর্তমানগ্রন্থে বিধৃত কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে।

জাতীয় আজাদি সংগ্রামের বীর মুজাহিদরা বুকের রক্তে সত্যের পথে কোরবানীর যে অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আমাদের দেশের তরুণ-মনে সংগ্রামী জীবনের অনুপ্রেরণা এনে দিলেই এ শ্রম সার্থক হবে।

সৈয়দ আব্দুল মান্নান
হক ভিলা
লেক সার্কাস, ঢাকা
নভেম্বর, ১৯৬৪

এক

মোয়াযযম আলী মুর্শিদাবাদের কয়েদখানার এক কুঠরিতে ছিলেন বন্দী। তার অতীতের কাহিনী ছিলো সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা আর উসাহ-উদ্দীপনার কাহিনী, যার সমাপ্তি ঘটেছিলো পলাশীর ময়দানে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে। এখন তার জীবনে ঘনিয়ে এসেছে এক ভয়াবহ নিবিড় অন্ধকার।

এর আগেও তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে বহুদূরে এক কয়েদখানায় ছিলেন বন্দী, কিন্তু তার অন্ধকার কুঠরিতে সেদিন তার মনের পরদায় ভেসে উঠতো মুর্শিদাবাদের কল্পনার ছবি আর তার প্রতি আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তো রংধনুর বিচিত্র রঙের ছটা। বর্তমানের দুঃখ-দুর্ভোগ সেদিন তার মনে জাগাতো ভবিষ্যতের হাসি-আনন্দের পয়গাম। বন্দী-জীবনের অমানিশার অন্ধকার পরদার ফাঁকে দেখা দিতো আজাদির প্রভাত সূর্যের সোনালি রশ্মি। উড়িষ্যার সীমান্ত শহরের কয়েদখানা ছিলো তার চলার পথের এক মনজিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একদিন তিনি সেই মনজিল অতিক্রম করে পৌঁছবেন এক নতুন দুনিয়ায়। সেখানে তার অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করছে জীবনের হাসি-আনন্দ। কিন্তু মুর্শিদাবাদে তার বন্দীজীবনের অমানিশা ছিলো সেই প্রভাতী তারার হাসি থেকে বঞ্চিত, যা আঁধার রাতের মুসাফিরকে দেয় সুবহে উম্মিদের পয়গাম।

কুঠরির দেওয়ালে ছাদের কাছাকাছি একটা ছোট্ট ছিদ্র। গোড়ার দিকে সেই ছিদ্রপথে সূর্যের আলো এসে তাকে দিতো আর এক দুনিয়ার পয়গাম, যেখানে তখনো জ্বলছে একটি আশার নিভু নিভু দীপ। কল্পনায় তিনি অন্ধকার পার হয়ে চলে যেতেন তার জীবনের শেষ আশাস্থল একটি বাড়ির চার দেওয়ালের ভিতরে। যেখানে একদিন শোনা যেতো আনন্দের কলগুঞ্জন, সেই কামরাগুলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াতো তার মন। হঠাৎ বাড়ির কোনো কোণ থেকে এসে হাজির হতো ফরহাতের মুগ্ধকর রূপ, অমনি তিনি বলে উঠতেন, ফরহাত! ফরহাত! আমি এসেছি। আমি বেঁচে আছি, আমি তোমারই জন্য বেঁচে থাকতে চাই। নিঃসঙ্গ কয়েদখানায় তুমি ছিলে আমার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গিনী। আমার স্বপ্ন, আমার আকাঙ্ক্ষা সবই ছিলো তোমারই জন্য! আমার ভয় ছিলো, তুমি হয়তো কোথাও চলে গেছো! হয়তো তোমার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হবে সারাটা জীবন। কয়েদখানায় যদি আমি তোমার কোনো খবর পেতাম-ফরহাত! আর আমরা এখানে থাকবো না-মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে কোথাও চলে যাবো আমরা, সেখানে আমরা গড়ে তুলবো এক নতুন দুনিয়া। তোমার সাথে থেকে একথা আমার মনে আসবে না যে, আমি জীবন-কাফেলার এক পিছিয়ে-পড়া মুসাফির!

আরো কয়েদি এলো কয়েদখানায়। তারা বললো, তার গ্রেফতারের পরদিন ফরহাত তার বাপ-মা'র সাথে মুর্শিদাবাদ থেকে হিজরত করে চলে গেছে নিরুদ্দেশের পথে।

তারপর মোয়াযযম আলীর কাছে তার কল্পনার আশা-আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর চাইতেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো। অচেনা মরুপথে বনে-জঙ্গলে আর পাহাড়ি পথে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন ফরহাতকে। কখনো দূরে দূরে বস্তির কুড়েঘরে, কখনো বা কোলাহলময় শহুরে মহলে তার সন্ধান চললো। কখনো ফরহাতের মুগ্ধকর রূপ ক্ষণিকের তারার ঝলকের মতো ভেসে উঠতো তার দৃষ্টির সামনে। কখনো বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভয়াবহ খেলা থেকে কল্পনায় তার মন ছুটে পালাতো অতীতের সুন্দর দিনে। কখনো আবার কল্পনা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতো সেই সুখনীড়ে যেখানে তিনি দেখেছিলেন জীবনের প্রথম হাসি আনন্দ। কখনো তার মন চলে যেতো মহল্লার গলিপথে শৈশবের খেলার সাথীদের মাঝখানে। কয়েদখানার আগেকার জীবন তার কাছে যেনো এক স্বপ্ন—যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনি ভয়ানক।

২

যে কওম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শক্তি ও সৌভাগ্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে পতনের শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, মোয়াযযম আলী ছিলেন সেই কওমের লোক। বিশাল মোগল সালতানাত তখন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, দেশব্যাপী মুসলমান শক্তিহীন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এমনি এক দুর্দিনে মোয়াযযম আলী চোখ মেলেছিলেন দুনিয়ার কোলে।

তৈমুরের বংশধরগণ আত্মরক্ষার যে শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন তা তখন ধূলায় মিশে গেছে। দিল্লির তখতের উপর আধিপত্য করার জন্য লোভী ভাগ্যান্বেষীদের কাড়াকাড়ি তৈরি হয়ে রয়েছে। দেশের রাজনীতি তখন নীতিবর্জিত। নামেমাত্র বাদশাহ পরিণত হয়েছিলেন উজির, উমরাহ ও পরিষদের হাতের দাবার ঘুঁটিতে। ভাগ্যান্বেষীদের তলোয়ার তখন রক্তের তৃষ্ণায় আকুল। শাহী মসনদের পথে এক ভাগ্যান্বেষীর লাশ হয়ে উঠেছে অপরের কাছে ভাগ্যের সোপান। মিথ্যা শপথ, প্রবঞ্চণা, ষড়যন্ত্র ও হত্যা লালকেল্লার সীমানার মধ্যে নিত্য-নতুন কাহিনী রচনা করে চলেছে। লালকেল্লার বাইরে প্রত্যেক সুবাদার কখন তার নিজস্ব আজাদি ঘোষণার চেষ্টায় বিব্রত।

কেন্দ্র ও সুবার মধ্যকার রাজনীতিও যেমন পীড়াদায়ক তেমনি রহস্যময়।

বাদশাহ সালামত কখনো কখনো কোনো আমীরের তলোয়ারের ভয় আবার কখনো তার খোশামোদে বিভ্রান্ত হয়ে কোনো এক এলাকার সুবাদারী সনদ মঞ্জুর করেন তাকে। সুবার রাজধানীর দিকে যেতে যেতে পথে তিনি খবর পান যে শাহানশাহ অপর কোন আমীরকে সুবাদারী সনদ দিয়েছেন এবং তিনিও লোক-লশকর নিয়ে সুবায়ী রাজধানীর পথে রওয়ানা হচ্ছেন।

প্রদেশের আমীরদের এক দল প্রথম পক্ষে, আর এক দল দ্বিতীয় পক্ষে ভাগ হয়ে গিয়ে লড়াই বাধাতেন। পরাজিত দলের রক্তে বিজয়ী দলের সুবাদারী সনদ মোহরাঙ্কিত হতো। কখনো এক ভাগ্যান্বেষী প্রচুর অর্থ দিয়ে সুবাদারী ফরমান পেতেন আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরো বেশি অর্থের বিনিময়ে নতুন করে হাসিল করতেন আর এক ফরমান।

ঈসায়ী ১৭২৫ সালে দিল্লি সালতানাতের এক হুঁশিয়ার উজির নিযামুল মুলক আসফজাহ চালবাজির বদৌলতে দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রকাশ্যে তিনি ছিলেন দিল্লির নামেমাত্র বাদশাহ সুবাদার কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের সর্বময় কর্তা। ১৭৪৮ সালে নিযামুল মুলকের ওফাতের পর তার পুত্রেরা পরস্পরকে গলা কাটতে ব্যস্ত হলেন।

নিযামুল মুলক প্রথম আসফজাহের পূর্ব-পুরুষরা তাতারী হামলার আমলে খারেজম থেকে ভারতে এসেছিলেন। এমনি করে আরো এক খানদান তুর্কিস্তান থেকে হিজরত করে এসেছিলেন এদেশে আওরঙ্গজেব আলমগীরের আমলে এই খানদানের মোহাম্মদ জানেজাহান আনওয়ারুদ্দীন ছিলেন এক সাধারণ সরকারি কর্মচারী। আলমগীরের মৃত্যুর পর যখন ভাগ্যান্বেষীদের সুদিন দেখা দিলো, তখন এই জানেজাহান খানেজাহান খেতাব নিয়ে কর্নাটকের অধিপতি হয়ে বসলেন। ঈসায়ী ১৭৪৯ সালে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহ হলেন কর্নাটকের নওয়াব।

তখনকার দিনে বাংলা ও দক্ষিণ-ভারতের উপকূল এলাকায় ইংরেজ বণিকদের কুঠি অস্ত্রাগারে পরিণত হচ্ছিলো। দীর্ঘদিনের সংঘাতের পর ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা তাদের পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়িত করলো। এবার তারা তেজারতী সুযোগ সুবিধার চাইতে বেশি করে নজর দিতে শুরু করলো রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেবার দিকে। দেশের ভিতরকার অনৈক্যের সুবিধা নিতে তাঁরা দেরি করলো না। কোনো প্রদেশে দুই ক্ষমতার দাবিদারের মধ্যে লড়াই বাধলে একদল ইংরেজদের সাহায্য হাসিল করতো, অপর দল গিয়ে মিলতো ফরাসিদের সাথে।

দক্ষিণ ভারতে নিযামুল মুলক প্রথমে আসফজাহের মসনদ অধিকার করেছিলেন

যারা তারা কখনো ইংরেজের, কখনো ফরাসিদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করতেন। কর্নাটকের নওয়াব মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহ ছিলেন ইংরেজদের রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি। ফরাসিরা ছিলো কর্নাটকের আর একদল ক্ষমতার দাবিদারের সমর্থক। কতক ক্ষমতাশিকারী কর্নাটকের বেশিরভাগ এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করে মোহাম্মদ আলীকে ত্রিচিনোপলীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। মোহাম্মদ আলী ছিলেন এমন এক নওয়াব, কয়েক বছর ধরে যাঁর হাতে কোনো রাজ্যের আধিপত্য ছিলো না। তাঁর প্রজা বলতে কেবল নিজের খানদানের লোক, কতক কর্মচারী, আর কিছু জী-হুজুর ও খোশামোদকারী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। তথাপি ইংরেজের সঙ্গীগণের পাহারায় তার দরবার বসতো নিয়মিত। তার সম্মানে কাসিদা পড়া হতো এবং নওয়াব ওয়ালাজাহ আমীরুল হিন্দ উমরাতুল মুলক আসফুদ্দৌলা মোহাম্মদ আলী খান বাহাদুর জাফর জঙ, সিপাহসালার সাহেবুসসায়ফ ওয়াল কলম, মোদাব্বেরে উমরায়েআলম ফরযন্দ আযীয আযজান উপাধিসহ তার নাম ঘোষণা করা হতো। ইংরেজ যখন ফরাসিদের হাত থেকে কর্নাটকের কোনো এলাকা জয় করে নিতো তখন এই সিপাহসালারের হেরেমে উৎসব করা হতো। ইংরেজ সিপাহীদের মাইনে দেবার জন্য যখন অর্থের প্রয়োজন হতো, তখন এই মোদাব্বেরে উমরায়ে আলেমকে লাগানো হতো গরিব সাধারণ মানুষের কাছে থেকে কর আদায় কাজে।

আগে কতক ক্ষমতাসীন লোক ফরাসিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের বিনিময়ে কর্নাটকের বিভিন্ন এলাকা ফরাসিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে যখন মোহাম্মদ আলীর পালা এলো তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে ইংরেজকে কর্নাটকের মালিক বানিয়ে দিলেন। কর্ণাটক প্রকাশ্যে মোহাম্মদ আলীর শিকারভূমি হলেও সেখানে শিকার খেলবার অধিকার ছিলো একমাত্র ইংরেজেরই হাতে।

দিল্লির তখতের সঙ্গে অযোধ্যার নওয়াবদের সম্পর্কও ছিলো নামেমাত্র। ঈসায়ী ১৭৪১ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ করলেন আলীবর্দী খান। তখন দক্ষিণ ভারতের মতো বাংলায়ও ইংরেজ বণিকদের আধিপত্য মজবুত হয়ে উঠেছে, কিন্তু আলীবর্দী খান ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি ফিরিঙ্গী বণিকদের যে বাণিজ্যের অনুমতিপত্র দিয়েছিলেন তার জরুরি শর্ত ছিলো এই যে, তারা তাদের তেজারতী এলাকায় কেল্লা বা আত্মরক্ষার জন্য চৌকি নির্মাণ করতে পারবে না।

তখনকার দিনের হিন্দুস্তানে আর এক বড় শক্তি ছিলো মারাঠা। মোগল সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলির উপর তারা নতুন করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলো।

২

মোয়াযযম আলী যখন দুনয়ার কোলে চোখ মেললেন, তখন হিন্দুস্তান মারাঠা বর্গীদের এক বিস্তীর্ণ শিকারভূমিতে পরিণত হয়েছে। তার বাপ মাহমুদ আলী ছিলেন আলীবর্দী খানের রক্ষীবাহিনীর পাঁচশ ঘোড়সওয়ার সিপাহসালার। মুর্শিদাবাদ শহরের বাইরে এক নতুন মহল্লায় মাহমুদ আলীর বাড়ির সামনে এক বড়ো জায়গীরদার মীর্যা হোসেন বেগের বিরাট বাড়ি-যেনো একটি দুর্গ। বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে অনেকগুলো থাকার ঘর ছাড়া আরো ছিলো ঘোড়ার আস্তাবল, ভৃত্য ও পাহারাদারদের আলাদা আলাদা কামরা। মোয়াযযম আলীর বাপ ফউজী অফিসার হলেও হোসেন বেগের সামনে একটি সাধারণ মানুষের বেশি ছিলেন না। গোড়ার দিকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিলো কেবল সামাজিক ধরনের কিন্তু তাদের ছেলেদের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে তাদেরকে পরস্পরের নিকটতর করে তুললো। হোসেন বেগের ছোট ছেলে আফযল বেগ মোয়াযযম আলীর চাইতে দুবছরের বড়ো আর তার বড়ো ভাই মোয়াযযম আলীর বড়ো ভাই ইউসুফ আলীর সমবয়সী। ছেলে বেলায় ইউসুফ ও মোয়াযযম মহল্লার আর সব ছেলেদের মতো হোসেন বেগের হাবেলীতে গিয়ে দিনভর আসফ ও আফযলের সাথে খেলা করতেন।

হাবেলীর ভেতর এক সোনালী চুলওয়ালী ছোট্ট মেয়ে তাঁর সখীদের সাথে খেলে বেড়াতো। ছোট্ট মেয়েদের নির্দোষ কলকাকলী মোয়াযযম আলীর খুবই ভালো লাগতো। মেয়েটি আফযলের ছোট্ট বোন ফরহাত।

মাহমুদ আলী আর তার বিবি হোসেন বেগের খান্দানের সামনে নিজেদেরকে ছোট মনে করতেন, কিন্তু তাদের ছেলেরা কারুর সামনে ছোট হয়ে না থাকে, সেদিকে তাদের নজর ছিলো। বরং হামেশা তাদের নজর থাকতো যে হোসেন বেগের ছেলেদের মতো দামী পোশাক তাদের ছেলেদের না থাকলেও তাঁরা সব সময়ই পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে চলবে। আসফ ও আফযলকে যখন মুর্শিদাবাদের সব চাইতে ভালো মকতবে ভর্তি করা হলো মাহমুদ আলী তখন ইউসুফ ও মোয়াযযমকেও পাঠিয়ে দিলেন সেই একই মকতবে। তফাৎ ছিলো এইটুকু যে, আফযল ও আসফ গাড়িতে চড়ে যেতেন আর ইউসুফ ও মোয়াযযম যেতেন পায়ে হেঁটে। তাদের বন্ধুত্ব আরো ঘনিষ্ঠ হলে আসফরা মোয়াযযম ও তার ভাইকে পীড়াপীড়ি করে গাড়িতে তুলে নিতেন। হোসেন বেগের বাড়িতে ছেলেদের পড়াবার জন্য ছিলেন একজন মোটা মাইনের ওসতাদ। মাহমুদ আলী অবসর মতো তাঁর

ছেলেদের নিজেই পড়াতেন।

উমরাহর ছেলেদের মকতবের শিক্ষার সাথে সাথে ফউজী শিক্ষা দেওয়াও ছিলো জরুরি। আসফ ও আফযল বড়ো হয়ে উঠলে তাদের ফউজী শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন বিচক্ষণ ফউজী অফিসারকে নিযুক্ত করা হলো। তিনি তাদের শাহসওয়ারী তীরন্দাজি ও নেজাহবাজি শিখাতেন কিন্তু মাহমুদ আলী এ কাজের জন্য অপর কোনো লোকের সাহায্য নেওয়ার দরকার বোধ করতেন না। ঘোড়সওয়ারী এবং তলোয়ার, তীর ও বন্দুক চালনায় তার সমকক্ষ লোক মুর্শিদাবাদে কমই ছিলো।

তার ঘরে ইরানী মখমলের গালিচা ছিলো না, কিন্তু আস্তাবলে তিন চারটি আরবী ঘোড়া ছিলো। সোনাচাঁদির বাসনপত্র তার ছিলো না, কিন্তু তার নিজস্ব অস্ত্রাগারের তলোয়ার- বন্দুক নিয়ে তিনি গৌরব করতে পারতেন। ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা সময় করে নিয়ে তিন ছেলেদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যেতেন শহরের খোলা ময়দানে।

মীর্যা হোসেন বেগের কুতুবখানায় ছিলো অসংখ্য পুঁথিপত্র; তিনি যতোটা পড়তেন, তার চাইতে বেশি বন্ধু-বান্ধবকে দেখাতেন। মোয়াযযম আলীর ছিলো বই পড়ার শখ। আফযল বেগের কাছ থেকে বইপত্র ধার নিয়ে তিনি পড়তেন। একদিন তিনি যখন গেছেন সেখানে তখন আফযল ও আসফ বেগ দেওয়ানখানার বাইরে এক গাছতলায় বসে বৃদ্ধ ওসতাদের কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছেন। তাঁদের পড়াশোনায় মগ্ন দেখে মোয়াযযম আলী কর্তব্য স্থির করতে না পেরে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ ওসতাদ তাকে দেখে বললেন ঃ তুমি কি দেখছো ভাই? এতো খেলার সময় নয়, পড়ার সময়। এখন চলে যাও।'

মোয়াযযম আলী একথা আশা করেননি। কি করবেন, স্থির করতে না পেরে তিনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আফযল তাঁকে দেখে ওসতাদকে বললেন ঃ ও বই নিতে এসেছে। আমায় এজাযত দিন আমি এখনই ফিরে আসছি।

ওসতাদের খেলাধুলায় ব্যস্ত ছেলেদের প্রতি যেমন ছিলো বিদ্বেষ তেমনি পড়াশোনার কথা শুনলে তিনি খুশি হতেন। তিনি আর একবার মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে আফযলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আচ্ছা যাও কিন্তু জলদি ফিরে অসো।'

আফযল বেগ উঠে মোয়াযযম আলীর সাথে চলে গেলেন। দেওয়ানখানার দীর্ঘ বারান্দা পার হয়ে তারা প্রশস্ত কামরাটির একটা দরজা ভিতর-বাড়ির প্রাঙ্গনের দিকে খোলা। কামরায় সেগুন কাঠের সুন্দর আলমারিতে অসংখ্য বইপত্র সাজানো। আফযল বললেন ঃ তুমি ধীরস্থির হয়ে বই দেখে নেও। আমি ওসতাদের কাছে যাচ্ছি।'

আফযল বেগ কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মোয়াযযম আলী আগেও বহুবার এ কামরায় এসেছেন। বইপত্র দেখে নিতে তার বেশি সময় লাগলো না পনের মিনিট পর দুখানা আরবি ও তিনখানা ফরাসি কেতাব নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। আফযল ও আসফের কাছ দিয়ে যাবার সময় ওসতাদ তাকে কাছে ডাকলেন। মোয়াযযম চমকে উঠে ওসতাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওসতাদ বললেন ঃ দেখে কি কিতাব তুমি পড়ছো।' মোয়াযযম কিতাবগুলো তার হাতে দিলেন। ওসতাদ একে একে সব কটি কিতাব খুলে দেখে অবাক হয়ে বললেন ঃ এসব কিতাব তুমি পড়তে পার?'

ঃ জী হ্যাঁ!'

ঃ আমি জানতে চাই এগুলো পড়ে তুমি বুঝতে পার?'

ঃ জী হ্যাঁ!'

ঃ আচ্ছা, আমি তোমার পরীক্ষা নেবো।' বলে এক আরবি কিতাব খুলে ওসতাদ মোয়াযযম আলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ পড়ে শোনাও তো।'

মোয়াযযম খানিকটা পড়ে শোনালে ওসতাদ তরজমা করতে বললেন। মোয়াযযম বিনা অসুবিধায় হুকুম তামিল করলেন। ওসতাদ প্রশ্ন করলেন-

ঃ তুমি কোথায় পড়?

ঃ আমি আফযলের সাথে পড়ি।

ঃ কোথায় থাক তুমি?

ঃ এই মহল্লায়। এই বাড়ির ঠিক সামনে।

ঃ তুমি...তুমি মাহমুদ আলী খানের ছেলে?

ঃ জী হ্যাঁ!

ওসতাদ কি যেনো বলতে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে পেছন থেকে আওয়াজ শোনা গেলো ঃ এটি কে?

ওসতাদ ফিরে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি তশরীফ রাখুন। মীর্যা হোসেন বেগ সামনে এসে বললেন ঃ আর এটি বুঝি মাহমুদ আলীর ছেলে?'

ঃ জী হ্যাঁ! এখনই এর সাথে আমার পরিচয় হলো। খুব বুদ্ধিমান ছেলে। দেখুন না আপনার কুতুবখানা থেকে সত্যিকার ফায়দা নিচ্ছে এই ছেলেটি। আপনার এজাযত পেলে সাহেবজাদাদের সাথে একেও আমি পড়াবো।

ঃ এতো খুব খুশির কথা। গরিব ছেলেরাই মেহনতী হয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস এই ধরনের ছেলের সাথে বন্ধুত্ব আসফ ও আফযলের জন্যও ভালোই হবে। এই কথা বলে হোসেন বেগ মোয়াযযম আলীকে বললেন, মক্তবের ছুটির পর তুমি এখানে চলে এসো। মাহমুদ আলীকেও আমি বলবো।

ঃ জী বহুত আচ্ছা!' বলে মোয়াযযম আলী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নত করলেন।

আসফ বললেন ঃ আব্বাজান মোয়াযযমের বড়ো ভাই ইউসুফ আলী আমার সহপাঠী। আপনার এজাযত পেলে সেও এখানে আসবে।'

হোসেন বেগ জওয়াব দিলেন ঃ তোমার ওসতাদের আপত্তি না থাকলে আমার এজাযত রইলো।'

ওসতাদ বললেন ঃ জী আমার কোনো আপত্তি নেই।'

অন্দর বাড়ির ফটক থেকে এক ভৃত্য বেরিয়ে এসে হোসেন বেগকে সালাম করে ওসতাদকে প্রশ্ন করলো ঃ জনাব শের আলী খান সাহেব জানতে চাচ্ছেন সাহেবজাদারা কখন ছুটি পাবেন।'

ওসতাদ জওয়াব দিলেন ঃ আজকের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যেতে পারেন।'

আফযল বললেন ঃ মোয়াযযম তুমি এসো। আমরা আজ পিস্তল চালানো অভ্যাস করবো।' দ্বিধাকুণ্ঠিত মোয়াযযম আলী বন্ধুদের সাথে চললেন।

হোসেন বেগ ওসতাদকে বললেন ঃ আসুন আপনিও আজ আপনার ছাত্রদের নিশানা দেখবেন।'

৫

ওসতাদের নাম আবদুল কুদ্দুস। মুর্শিদাবাদের কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের মধ্যে তিনি একজন। হোসেন বেগের সাথে তিনি বাইরে ফউজী ওসতাদকে দেখতে পেলেন। তাদের দেখে ওস্তাদ এগিয়ে এলেন। হোসেন বেগ বললেন ঃ আমরা আপনার শাগরেদদের নিশানা দেখতে এসেছি।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ সে আমার সৌভাগ্য। আমার বিশ্বাস, আমার শাগরেদরা আপনাদের হতাশ করবেন না। চলুন।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ শের আলী, এ হচ্ছে মাহমুদ আলীর ছেলে। মওলবী সাহেব আজ জবরদস্তি করে একে তার শাগরেদ বানিয়ে নিয়েছেন। আমার ইচ্ছা আপনি এরও পরীক্ষা নেবেন।'

শের আলী জওয়াব দিলেন ঃ জনাব, এর পরীক্ষার দরকার হবে না। আমি একে বাইরের ময়দানে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ও লক্ষ্যভেদ করতে দেখেছি।'

খানিকক্ষণ পর তারা ভৃত্য ও পাহারাদারদের কুঠরিগুলোর কাছে এসে থামলেন। বাইরের পাঁচিলের কাছে এক গাছের নিচে কয়েকজন সিপাহী জমা হয়েছিলো। একটি টেবিলের উপর ছিলো চারটি পিস্তল। সামনে কয়েক পা দূরে এক গাছের ডালে একটি তখ্‌তি ঝুলানো আর তার মাঝখানে পানের মতো আকারের একটি লাল নিশানা। হোসেন বেগকে দেখে সিপাহীরা আদবের সাথে সরে গেলো। শের আলীর ইশারায় আসফ ও আফযল পিস্তল তুলে নিলেন। কিন্তু মোয়াযযম আলী তখন হতভম্বের মতো খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওসতাদের ইশারায় আসফ পিস্তল চালালেন। নিশানা লাল দাগের নিচের দিকে লাগালো। এরপর আফযলের পালা। তার গুলি লাল দাগ থেকে দু'ইঞ্চি বাইরে লাগলো। বয়সের হিসাবে এও কম কৃতিত্ব নয় মনে করে শের আলী প্রশংসা পাবার আশায় হোসেন বেগের দিকে তাকালেন।

ঃ আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা করো।' তিনি বললেন।

খালি পিস্তল রেখে ছেলেরা ভরা পিস্তল তুলে নিলেন। আফযলের দ্বিতীয়বারের লক্ষ্য আরো ভালো হলো, কিন্তু আসফের হাত নড়ে যাওয়ায় গুলি তখতি না ছুঁয়েই চলে গেলো। দুজন সিপাহী খালি পিস্তল ভরে দিচ্ছে। আসফ তার লজ্জা ঢাকবার জন্য খালি পিস্তল রেখে ভরা পিস্তল হাতে তুলে নিলেন। এবার তার গুলি নিশানায় লাগলো। তারপর যখন আফযলের পালা এলো তখন তিনি ভরা পিস্তল

তুলে নিয়ে নিজে গুলি না ছুড়ে মোয়াযযম আলীর হাতে দিয়ে বললেন ঃ এবার তোমার পালা।'

মোয়াযযম খানিকক্ষণ চুপ থেকে হাতের বইপত্র এক সিপাহীর হাতে দিয়ে পিস্তল তুলে নিলেন। হোসেন বেগ বললেন ঃ দেখ সাহেবজাদা কাউকে জখম করে দিয়ো না যেনো।'

মোয়াযযম আলী এগিয়ে গেলেন। নিশানার দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ পিস্তলওয়ালা হাত উপরে তুলতেই চোখের পলকে লাল নিশানার ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র হয়ে গেলো।

মোয়াযযম আলী খালি পিস্তল টেবিলের উপর রেখে সিপাহীর হাত থেকে বইপত্র নিয়ে একদিকে সরে দাঁড়ালেন। হোসেন বেগ এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন ঃ সাবাস তোমার নিশানা তো খুব ভালো।'

ঃ জী আমার ভাইয়ের নিশানা আমার চাইতে আরো ভালো।'

হোসেন বেগ টেবিল থেকে একটি পিস্তল তুলে মোয়াযযম আলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ তুমি পুরস্কার পেলে এই পিস্তল! যখন বড়ো হয়ে তুমি লড়াইয়ের ময়দান থেকে মাথা উঁচু করে ফিরে আসবে, সেদিন আমার অস্ত্রাগারের শ্রেষ্ঠ বন্দুক ও আমার আস্তাবলের সবচাইতে ভালো ঘোড়া আমি তোমায় পুরস্কার দেবো।'

ঠ

এই ঘটনার তিনদিন পর হোসেন বেগের বাড়িতে মুর্শিদাবাদের বড়ো বড়ো উমরাহ দাওয়াত পেয়েছেন। প্রথমবার মাহমুদ আলী তাদের সাথে এক দস্তরখানে বসবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এক সপ্তাহ পরে হোসেন বেগের বিবি শহরের বড়ো বড়ো মেয়েদের দাওয়াত দিলেন। মোয়াযযম আলীর মা আমিনাও দাওয়াত পেলেন। হোসেন বেগের বিবি প্রকাশ্যে তার সাথে বেশ আন্তরিকতার সাথে আলাপ করলেন, কিন্তু উঁচু স্তরের বেশিরভাগ মেয়ের তা পছন্দ হলো না। মেজবানের প্রকাশ্যে আন্তরিকতার পরিচয় পেলেও আমিনা এ সত্য অনুভব না করে পারলেন না যে, ছোট ছোট ছেলেদের বন্ধুত্ব এবং তাদের বাপ-মা'র দাওয়াত ও দেখা সাক্ষাত তাঁদের মধ্যেকার দূরত্ব মুছে ফেলতে পারে না।

ফরহাতের বয়স তখন আট বছরের কাছাকাছি। সে অপরূপ সুন্দরী। আমীরদের যেসব মেয়েরা মায়েদের সাথে দাওয়াতে শরীক হতে এসেছে তাঁরা ফরহাতের সাথে আলাপ জমাবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। বয়স্ক মেয়েরাও তার রূপ, সৌন্দর্য ও লেবাস দেখে মুগ্ধ। ফরহাত কাউকে খালাজান, কাউকে চাচীজান বলে সালাম জানিয়ে দোআ নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমিনার কোনো মেয়ে নেই। তিনি বারবার তার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, কিন্তু ফরহাত তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। একবার তাঁর মা বললেন ঃ ফরহাত, তুমি তোমার খালাকে সালাম করলে না! অমনি ফরহাত তাঁর দিকে তাকিয়ে খালাজান সালাম' বলেই পর মুহূর্তে এক হাস্যোজ্জ্বল আমীরজাদির সাথে আলাপ শুরু করলো। আমিনার অন্তর থেকে তার প্রতি হাজারো শুভেচ্ছা উৎসারিত হলো। এই হাস্যমুখরা সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি পয়লা নজরেই নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করে ফেলেছেন। তিনি যদি তাকে আর সব মহিলাদের মতো কাছে টেনে নিতে পারতেন! যদি তাঁর সাথে মন খুলে আলাপ করতে পারতেন! তার সোনালী চুলের উপর হাত বুলাতে পারতেন! তিনি কেবল তার উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাতে লাগলেন। হাসলে তার মোতির মতো চকচকে দাঁতগুলি তার নজরে আসতে লাগলো। দাওয়াতের শেষে ফিরতে গিয়ে তার মনে হলো হোসেন বেগের বিবি ও তার মধ্যে রয়েছে এক অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান।

কিন্তু এ ব্যবধান বেশিদিন টিকে থাকলো না। ইউসুফ ও মোয়াযযমের সাথে আফযল ও আসফের ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে চললো। আগে তারা যখন স্কুলে যাবার জন্য গাড়িতে চড়ে বাড়ি থেকে বেরুতেন, তখন ইউসুফ ও মোয়াযযম তাদের জন্য দেউড়ির সামনে অপেক্ষা করতেন। এখন তাদের কখনো দেরি হলে আসফ ও আফজল তাদের দরজায় এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাদেরকে ডেকে নেন। দুই বাড়িতেই ছেলেদের মুখে বারংবার শোনা যেতে লাগলো পরস্পরের তারিফ। দেড় মাস পর আমিনা যখন দ্বিতীয়বার হোসেন বেগের বাড়িতে গেলেন, তখন আফযলের মা পুরোপুরি মন খুলে তার সাথে আলাপ করলেন।

দুজনেই নিজের ছেলেদের ছোট বেলাকার ঘটনা শুনাতে লাগলেন। ফরহাত মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন তাদের কথা। আমিনা যখন ইউসুফ ও মোয়াযযমের দুর্দান্তপনার কথা বলছেন, ফরহাত তখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

দিন আসে দিন যায়। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিতেই মোয়াযযম আলীর বড়ো ভাই ইউসুফ ও হোসেন বেগের দুই পুত্র সেনাবাহিনীতে ভর্তি হলেন। ইউসুফ এক বছর চাকরি করে পঞ্চাশ ঘোড়সওয়ারের অফিসার হয়ে গেলেন। আসফ ও আফযলদের খান্দানি প্রভাব ছিলো শাহী দরবারের পর। তাই তাঁদের উন্নতি হতে লাগলো দ্রুত গতিতে। এক বছর চাকরি করে আসফ দুশো ঘোড়সওয়ারের ও আফযল একশ ঘোড়সওয়ারের অধিনায়ক হয়ে গেছেন। মোয়াযযম আলীর বাপ মাহমুদ আলী তখন উন্নতি করে হয়েছেন এক হাজার রক্ষী সৈনিকের অফিসার। তাই ইউসুফের তরক্কীর পথও নিশ্চিত। কিন্তু মোয়াযযম আলীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগে তিনি যতোটা আশান্বিত হয়েছিলেন, এখন ততোখানি পেরেশান হয়ে পড়েছেন। মোয়াযযম আলী ফউজে ভর্তি হতে অস্বীকার করেছেন। তার কারণ অবশ্যি এ নয় যে তার ভিতরে সিপাহীসুলভ প্রবণতার অভাব রয়েছে। মাহমুদ আলী জানতেন যে, সৈনিক জীবনের যাবতীয় গুণ রয়েছে তার পুত্রের মধ্যে। শক্তি-সাহস-উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়াও তাঁর ভিতরে রয়েছে অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ও নেতৃত্বসুলভ গুণের সমাহার। পুঁথিপত্রের দিকে আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি ভালোবাসেন সৈনিক-জীবন। রোজ ভোরবেলা ঘোড়ায় চড়া নেজাবাজি ও নিশানাবাজির অভ্যাস চলেছে নিয়মিত। সাঁতার কেটে দরিয়া পার হওয়া তার কাছে অতি মামুলি ব্যাপার। শিকারেও তার শখ রয়েছে। এযাবত তিনটা বাঘ ও পাঁচটা চিতা তার হাতে খতম হয়েছে।

মাহমুদ আলী যখনই ফউজে ভর্তি হবার কথা তোলেন, তখনই তা এড়িয়ে যাবার জন্য বলেন ঃ আব্বাজান, আমার উপর চাপ দেবেন না। আমায় ভাববার সুযোগ দিন। এখনো আমার লেখাপড়া শেষ হয়নি। এখনো অনেক কিছু তো শিখবার বাকি রয়েছে। আম্মা বরাবরই পুত্রের পক্ষে কথা বলেন। তিনি বলেন ঃ মোয়াযযম আলীকে নিয়ে আপনি কেন এতটা পেরেশান হচ্ছেন? কতইবা বয়স হলো ওর?

মোয়াযযম আলীর বেশিরভাগ সময় কাটে আবদুল কুদ্দুসের কাছে। একদিন মাহমুদ আলী তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন ঃ দেখুন কেবলা, মোয়াযযম আলীর ভবিষ্যতের উপর আমার খুবই আশা ছিলো। আমি মনে করতাম আপনার শিক্ষা পেয়ে তার ভিতরে খোদার দেওয়া গুণগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থায় আমি যারপরনাই হতাশ হয়ে পড়েছি। আমি ভাবতাম,

সে হবে সিপাহসালার, কিন্তু এখন দেখছি, কিতাবপত্র ছাড়া আর কোনো দিকে তার আকর্ষণ নেই। আমার যথেষ্ট জমিজমা থাকলে তাকে ঘরে বসিয়ে রাখতে আমার আপত্তি হতো না, কিন্তু আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।'

আবদুল কুদ্দুস আস্থা সহকারে জওয়াব দিলেন ঃ মোয়াযযম আলীকে নিয়ে আপনার হতাশ হওয়া উচিত হবে না। আমার বিশ্বাস দুনিয়ায় তার সুনাম থাকবে। সালতানাতের সিপাহীর তলোয়ার ছাড়া আলেমের কলমেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। আপনি একথা কেন চিন্তা করেন না যে, শহরের কাজী অথবা কোনো সুবার শাসনকর্তা হবার জন্য মোয়াযযম আলী পয়দা হয়েছে। লেখা-পড়ার যে শখ তার রয়েছে, তা পুরো করবার সুযোগ দিন। তার খোদাদাদ প্রতিভার উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। এতটা বুদ্ধি তার রয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা সে নিজেই করতে পারবে। আপনার কোনো ফয়সালা ওর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে অন্যায় করা হবে। যদি সে স্বেচ্ছায় সৈনিক পছন্দ করে নেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও ইজ্জত ও খ্যাতির মনজিলে পৌঁছতে তার দেরি হবে না।

মাহমুদ আলী আশ্বস্ত হয়ে বললেন ঃ মোয়াযযম আলীকে নিয়ে আমি হতাশ হইনি, কিন্তু তার সাথীরা সবাই ফউজে শামিল হয়ে গেছে বলেই লোকে আমায় নিন্দা করে।'

ঃ লোকের কথায় পরওয়া করবেন না। যে নওজোয়ান নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেয়, জীবনের একটা ভাগ তাকে অপরের নিন্দা শুনতে হয়।'

আবদুল কুদ্দুসের সাথে দীর্ঘ কথা কাটাকাটির পর মাহমুদ আলীর পেরেশানি কিছুটা দূর হলো। এরপর প্রশ্ন করলে তিনি জওয়াব দিতেন ঃ মোয়াযযম আলী আলেম হয়েছে। আমার বিশ্বাস সে তার কলম দিয়েই বাংলার বেশি করে খেদমত করতে পারবে।'

৫

ফরহাত এগারো বছর বয়স থেকে পরদা করতে শুরু করেছে। গত দু'বছরে মোয়াযযম আলী তাকে দেখেননি। তার মা কখনো কখনো তার কথা বলেন।

একদিন তিনি তাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ বেটা, ফরহাত আজ তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলো।'

মোয়াযযম আলীর গাল ও কান লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আমার কথা সে কি জিজ্ঞেস করেছিলো?'

মা বললেন ঃ সে জিজ্ঞেস করছিলো, কেন তুমি ফউজে ভর্তি হচ্ছো না।'

মোয়াযযম হেসে বললেন ঃ আম্মাজান, আমার আফসোস আমার জন্য আপনাকে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের বিদ্রূপও শুনতে হচ্ছে।'

মা জওয়াবে বললেন ঃ বেটা সে তো আমায় বিদ্রূপ করেনি, বরং সে আমায় হামদর্দী দেখাচ্ছিলো। ফরহাত এখন আর ছোট্ট মেয়েটি নেই, তাকে এখন বেশ জোয়ান দেখাচ্ছে। তার পয়দায়েশের দিন থেকে তার মা তার বিয়ের আয়োজন শুরু করেছেন। মুর্শিদাবাদের বড়ো বড়ো ঘর থেকে কতো সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু তিনি কোথাও রাজি হচ্ছেন না। ফরহাত এমন মেয়ে, কোনো নওয়াবের ঘরেই ওকে মানায়। মির্যা সাহেব ভারী ধূমধামের সাথে ওর বিয়ে দেবেন। লক্ষ্ণৌ থেকে মির্যা সাহেবের বন্ধু তার ছেলের জন্য বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন, মির্যা সাহেবও অনেকটা রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু ফরহাতের মা রাজি হননি।'

মোয়াযযম জানতেন যে, তার মা ফরহাতকে খুব ভালোবাসেন। ফরহাতের কথা উঠলে তার কথা আর ফুরায় না। মাকে চটাবার জন্য ঠোঁটের উপর দুষ্ট হাসি টেনে এনে তিনি বললেন ঃ আম্মাজান, ফরহাত সেই মেয়েটি নয়, যার নাক চেপটা, রঙ মিসকালো, আর একটা চোখ খানিকটা ছোট ছিলো?'

ঃ শরম করে কথা বলো, মা রেগে বললেন। মোয়াযযম উঠে হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেলেন। দু'বছর আগেরকার দেখা একটি হাস্যোজ্জ্বল নিরপরাধ মুখ তার স্মৃতির পরদায় ভেসে উঠলো।

কয়েকদিন পরেরে ঘটনা। মোয়াযযম আলী প্রত্যুষে উঠে কিতাব নেবার জন্য আফযলদের বাড়িতে গেলেন। তিনি প্রথম দেউড়ি পার হয়ে ভিতর বাড়ির চার দেওয়ালের ফটকের কাছে পৌছলে আসফ ও আফযল ফউজী লেবাস পরে বাইরে বেরুচ্ছিলেন। ভৃত্য প্রাঙ্গণে তাদের ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে।

মোয়াযযম তাঁদেরকে দেখেই বললেন ঃ ভাই ইউসুফ বলছিলেন, আজ ছুটির দিন। তাই আমি একটা কিতাব নিতে এসেছি। আপনারা কোথায় চললেন?

আফযল বললেন ঃ আজ ছুটি, কিন্তু আমরা চলেছি পোলো খেলতে। এসো, তুমি কিতাব নিয়ে যাও।

ঃ কিন্তু জলদি এসো' আসফ বললেন ঃ ওঁরা হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ঃ এই এখখুনি আসছি।'

আফযল মোয়াযযম আলীকে সাথে নিয়ে কুতুবখানার সামনে গিয়ে দেখলেন, বাইরের দিককার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

আফযল বললেন ঃ আব্বাজান আজ বাইরে চলে গেছেন। তাই ভৃত্য ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এসো, ওদিক দিয়ে যাই।'

মোড় ফিরে দেওয়ানখানায় এক প্রশস্ত কামরা পার হয়ে তারা যখন ভিতরের প্রাঙ্গণের কাছে পৌঁছে গেছেন, তখন মোয়াযযম কি যেন চিন্তা করে থেমে গেলেন।

আফযল ফিরে বললেন ঃ এসো ঘরের সবাই উপরে আছেন। এখানে কেউ নেই।'

মোয়াযযম আফযলের পিছু পিছু প্রাঙ্গণ পার হয়ে কুতুবখানায় ঢুকলেন।

আফযল বললেন ঃ তুমি এবার খাতির হয়ে কিতাব দেখে নেও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি চললাম।'

আফযল বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। মোয়াযযম একটি আলমারী খুলে কিতাবগুলি বের করে দেখতে লাগলেন। দু'তিনটি আলমারি দেখার পর তিনি এক কোণের আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে একখানা কিতাবের পাতা উল্টাচ্ছেন। হঠাৎ কারুর পায়ের আওয়াজ তার কানে এলো এবং পরক্ষণেই একটি মিষ্টি গলার আওয়াজ ভেসে এলো ঃ ভাইজান, আপনি এখনও .....।'

মোয়াযযম আলী ফিরে দেখেই মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি তরুণী বেখেয়াল হয়ে কামরার মাঝখানে এসে পড়েছে এবং তার চাইতে বেশি চমকে গেছে। এমনি সে আশা করেনি। মোয়াযযম আলী এক নজরের বেশি তাঁর দিকে তাকাতে পারেন নি। দৃষ্টি অবনত করে তিনি বলে উঠলেন ঃ মাফ করবেন, আমি .....।'

মোয়াযযম আলীর মুখের কথা শেষ হলো না। তরুণী ফিরে দ্রুতগতিতে দরজার দিকে সরে গেলো। আলোর ঝলকের মতো হঠাৎ দেখা দিয়ে সে তার গতি ফিরিয়ে নিয়েছে। সমুদ্র তরঙ্গের মতো বালুকা বেলায় আছাড় খেয়ে সে ফিরে গেছে।

তরুণীটি ফরহাত। মোয়াযযম আলী দু'বছর পর তাকে দেখলেন আর তাও মুহূর্তের জন্য। তার মনের উপর ফরহাতের কোন সঠিক প্রতিকৃতি ধরা দেয়নি। অবশ্য তার মনে হয়েছে, এরূপ অনন্তকাল ধরে দেখলেও বুঝি তার দৃষ্টির ক্ষুধা মিটবে না। অন্তরে তিনি এক আনন্দের কম্পন অনুভব করলেন, কিন্তু তা'ও ক্ষণিকের জন্য। হাওয়ার উপর কেল্লা তৈরি করবার মতো স্বপ্নবিলাসী মোয়াযযম আলী নন। খানিকক্ষণ পরে তিনি নিবিড় প্রশান্তির সাথে আলমারি থেকে আর একখানা কিতাব বের করে দেখতে লাগলেন। তার দৃষ্টির সামনে থেকে যে চিত্রটি মুহূর্ত আগে চলে গেছে, তা তার কাছে একটি মামুলি ঘটনা মাত্র- অতীতের একটি ঘটনা, যার সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো যোগ নেই। তিনি জানেন জীবনে তাদের দুজনের পথ আলাদা, মুহূর্তের জন্য যদি কোন চৌরাস্তায় তাদের দেখা হয়, তবুও তাদের মনজিল কখনো এক হতে পারে না। ফরহাত হোসেন বেগের কন্যা আর তাঁর চালচলন এমন কাব্যময় যে, জমিনের উপর দাঁড়িয়ে তার বাণী-বিনিময় হয় আকাশের তারাদের সাথে।

২

আধ ঘণ্টাখানেক খোঁজ করে মোয়াযযম বাইরে বেরিয়ে এলে বাইরের গেটের কাছে হোসেন বেগের সাথে দেখা হলো। মোয়াযযম এগিয়ে গিয়ে তাকে সালাম করলেন। হোসেন বেগ সালামের জওয়াব দিয়ে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। মোয়াযযম বললেন ঃ আমি এই কিতাবখানা নিতে এসেছি।'

বাইরের প্রাঙ্গণে কয়েকখানা কুরসি পড়েছিলো। হোসেন বেগ এক কুরসীতে বসে বললেনঃ মোয়াযযম, বসো। তোমার সাথে কয়েকটা কথা বলবো।'

মোয়াযযম আলী তাঁর সামনে আর এক কুরসিতে বসে পড়লেন। হোসেন বেগ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ দেখ তোমার ব্যাপারে আমি বড়ো হতাশ হয়ে পড়েছি। কিতাব-পত্রের প্রতি আকর্ষণের অর্থ এ হতে পারে না যে, তুমি তোমার আর সব কর্তব্যের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে থাকবে। শাহী মহলের বাইরে এখনই তোমার আব্বাজানের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। তাঁর কথা শুনে আমার খুবই আফসোস হয়েছে। আমি ভাবতাম, সিপাহী হয়ে তুমি তোমার খান্দানের মুখ উজ্জ্বল করবে। শের আলী বলতেন যে, তুমি একদিন সিপাহসালার হবে। কিন্তু তুমি কেবল বইপত্রের মধ্যে ডুবে থেকে তোমার খোদাদাদ প্রতিভার

অপচয় করছো। ফউজে শামিল হতে তোমার ভয় কিসের? দেহের শক্তির দিক দিয়ে বাংলার হাজার হাজার নওজোয়ান তোমায় ঈর্ষার চোখে দেখে। নেজাবাজি, শাহ সওয়ারী ও নিশানাবাজিতে খুব কম নওজোয়ান তোমার মোকাবিলা করতে পারবে। আল্লাহ তোমায় বুদ্ধিবৃত্তিও দিয়েছেন। তোমার ভাইয়ের মতো দু'বছর আগে ফউজের শামিল হলে এতদিনে হয়তো দু'শো সওয়ার তোমার পরিচালনায় থাকতো। মামুলি অফিসার হয়ে যদি তুমি ফউজে শামিল হতে না চাও, তা'হলে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করবো। আলীবর্দী খানের সাথে আমার যথেষ্ট ভাব। মীর মদন আমার দোস্ত। তুমি ইচ্ছা করলে আমি তোমায় সাথে নিয়ে তার কাছে যাবো।'

খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচাজান, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার ফউজে ভর্তি না হবার কারণ এ নয় যে গোড়ার দিকে আমি সাধারণ সৈনিক হতে চাই না। যে ফউজের সাধারণ সৈনিক হতে আমি চাই না, সেখানকার সিপাহসালার হবার লোভও আমার নেই। আমার মনে যেদিন প্রত্যয় জন্মাবে যে, সিপাহী হয়ে আমি কওমের ও দেশের খেদমত করতে পারবো, সেদিন আমি সিপাহী না সিপাহসালার হতে চলেছি, সে প্রশ্নই আমার সামনে থাকবে না। আমার সামনে একটিমাত্র প্রশ্ন থাকবে ঃ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তলোয়ার ধরছি, তা কতোটা হাসিল হচ্ছে। আত্মতুষ্টিই হবে আমার সবচাইতে বড়ো পুরস্কার।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ সেদিন কবে আসবে, যখন তুমি কওম ও দেশের জন্য তলোয়ার ধরবার প্রয়োজন অনুভব করবে?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ গণজীবনের নীতিতে বিশ্বাসী মানুষদের হাতে যেদিন আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত হবে। বর্তমান অবস্থায় আমাদের সবচাইতে বড়ো ব্যাধি হচ্ছে কেন্দ্র থেকে বিচ্যুতি এবং এরই জন্য সংখ্যাতীত ভাগ্যান্বেষী তাদের ক্ষমতার লোভে হিন্দুস্তানকে তাদের ছোট ছোট শিকারভূমিতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। বর্তমান অবস্থায় সিপাহীর তলওয়ার মুষ্টিমেয় উমরাহের মসনদের হেফাজত করে তাঁদের শাসনকাল কিছুকালের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা কওমের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।'

হোসেন বেগ এই ধরনের আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিরক্তির স্বরে তিনি বললেন ঃ আমাদের আলোচনা হচ্ছে বাংলার ফউজ নিয়ে আর বাংলার ফউজ হচ্ছে একদিকে মারাঠাদের লুটতরাজ ও অপরদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দুশমনি মনোভাবের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র আশাস্থল।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ জী হ্যাঁ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আলীবর্দী খানের ফউজের সিপাহী ও জেনারেল কেউ জানেন না, বাংলার দোস্ত কে আর দুশমনই বা কে।'

হোসেন বেগ স্বভাবের দিক দিয়েই ছিলেন সরকারের সমর্থক ও আলীবর্দী খানের সম্পর্কে তার ছিলো অত্যন্ত উঁচু ধারণা। বাংলার শাসকের ব্যক্তিত্বকে তিনি মনে করতেন নিন্দা ও সমালোচনার উর্ধ্বে। তিনি প্রাণপণে নিজের রাগ চেপে বললেন ঃ দেখ বাছা, আলীবর্দী খান সম্পর্কে কথা বলতে তুমি সংযমের পরিচয় দেবে, আশা করি এবং একথাও মনে রাখবে যে, তিনি আমাদের শাসক।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচাজান, মাফ করবেন। আলীবর্দী খানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি কোনো কথাই বলিনি। নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের শাসক, কিন্তু কোনো সরকার যদি তার কার্যকলাপ যাচাই করে দেখবার অধিকার আমায় না দেন, সে সরকার তার হেফাযতের জন্য তলোয়ার ধরবার দাবিও আমার কাছে করতে পারেন না। আলীবর্দী খানের বহু গুণের আমি প্রশংসা করি। দেশের অপর যে কোনো শাসকের চাইতে তিনি নিশ্চিতরূপে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু তিক্ত সত্য হচ্ছে এই যে, যে সালতানাতের কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙে পড়বার মতো হয়, তা বেশিদিন কোনো কওমের আজাদি ও সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। আপনি অবশ্যি স্বীকার করবেন যে, দিল্লিতে মুসলমানদের সৌভাগ্যের পতাকা অবনমিত হয়ে গেছে। আলমগীর রহমাতুল্লাহ আলাইহের বিশাল সালতানাতের ভগ্নাংশের উপর নিজ নিজ শক্তির দুর্গ গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম কোনো সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনের জন্য নয়, বরং ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের জন্য চালিত হচ্ছে। মুসলমান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাসনক্ষমতা লোপের পর ক্রমাগত ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং ঐক্যহীন কেন্দ্রচ্যুত জাতিসমূহের শেষ পরিণামই হচ্ছে এই ধ্বংস।

হোসেন বেগ বললেন ঃ আলমগীর রহমাতুল্লাহ আলাইহের উত্তরাধিকারী অযোগ্য এবং দিল্লি দরবারের অবস্থা দেখলে তুমি আলীবর্দী খানের মতো লোকদের জীবনকে গণীমাত মনে করবে। দিল্লির অপদার্থ ও নিষ্ক্রিয় শাসকদের কার্যকলাপে হতাশ হয়ে এই ধরনের লোকেরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন অনুভব না করলে এতদিনে সারা দেশ দুশমনের হাতে চলে যেতো। মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্মৌ ও হায়দারাবাদের অবস্থা নিশ্চিতরূপে দিল্লির অবস্থার চাইতে ভালো।'

ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বর্তমানকে ছেড়ে ভবিষ্যতের চিন্তা করুন। গাছ থেকে কেটে নেওয়া শাখা খুব বেশি বেঁচে থাকতে পারে না। বর্তমান অবস্থার জন্য আমি আওরঙ্গজীব আলমগীর রহমাতুল্লাহ আলাইহের উত্তরাধিকারীদের চাইতে

বোধ দাবী মনে করে সেইসব ভাগ্যান্বেষীকে, যারা কোনো উপযুক্ত শাসকের দিল্লির মসনদে বসাবার সাহস, হিম্মৎ ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। দিল্লির অপদার্থ, নিষ্ক্রিয় ও অসহায় শাসক তাদেরই দলীয় রাজনীতির সৃষ্টি। লালকেল্লা হয়েছে তাদের শক্তিপরীক্ষার আখড়া। শাহীতাজ তাদের হাতের খেলনা। প্রত্যেক দলই চায়, দিল্লির শাসক অমনি অসহায় ক্রীড়নক হয়ে থাকুক এবং তারই ছায়ায় তারা যথাসম্ভব বেশি করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে। একদল কোনো এক অপদার্থ শাসককে নিজেদের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি মনে করে তাকে তখতে বসিয়ে দিলে অপর দল তাকে সরিয়ে তার চাইতেও অপদার্থ আর একজনকে তাজ পরিয়ে দেবার সংগ্রাম শুরু করে দেয়। এমনি অবস্থার সুযোগ নিয়ে দিল্লির বাইরে যেসব সুবাদার ছোট ছোট শাহীতাজ মাথায় চড়িয়েছেন, তারা আমাদের কোনো কল্যাণ করেননি।

দিল্লির ওমরাহ নেক নিয়তে কাজ করলে এবং তাদের রাজনৈতিক কওমের সামগ্রিক কল্যাণের অনুসারী হলে তারা নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে অপদার্থ শাসক খুঁজে বেড়াতেন না। কতিপয় বুদ্ধিহীন শাসককে মসনদে বসাবার জন্য তারা যেমন হুঁশিয়ারীর সাথে সংগ্রাম চালিয়েছেন, তেমনি হুঁশিয়ার হয়ে তারা কোনো সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্য হাসিল করতে অথবা কোনো নৈতিক বিধানকে জয়যুক্ত করতে সংগ্রাম চালিয়ে গেলে তারা দিল্লির তখতে বসাবার জন্য উপযুক্ত শাসক খুঁজে বের করতে পারতেন। কিন্তু তারা কোনো আদর্শ বা নৈতিক বিধানের বিজয়কে নিজেদের ব্যক্তিগত লালসা ও পরিতৃপ্তির পরাজয় মনে করেছেন। তারা কোনো আদর্শ বা উদ্দেশ্যের জন্য কোরবানী দেবার পরিবর্তে প্রতিটি আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে নিজস্ব স্বার্থের জন্য কোরবানি দিতে শিখেছেন। দিল্লির সালতানাতের পতনের কারণ কেবল শাসকদের অপদার্থতাই নয়, বরং তার আরও কারণ রয়েছে এই যে, আত্মমর্যাদাহীন যে সব ওমরাহ সালতানাতের স্তম্ভ বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন, তারা সবরকম দুস্কৃতির ভিতর খুঁজতেন নিজেদের স্বার্থ।'

মোয়াযযম আলী যেখানে বাংলা ও আলীবর্দী খান সম্পর্কে কথা বলছেন, হোসেন বেগ কেবল সেইটুকু মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। দিল্লির উমরাহ সম্পর্কে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। মোয়াযম আলী তাদেরকে আরো কঠোরভাবে নিন্দা করলেও তার কোনো আপত্তি থাকতো না। তিনি বললেন ঃ বাছা, দিল্লির উমরাহ ও শাসকের প্রতি আমার কেনো আকর্ষণ নেই। তারা অন্যায় বীজ বুনে থাকলে তার শাস্তি তারা কয়েকবার পেয়েছেন। মারাঠা আর জাঠরা কয়েকবার দিল্লি লুট করেছে। এমনি অবস্থার মধ্যেও যাঁরা, বাংলা অযোধ্যা ও দাক্ষিণাত্যকে ধ্বংসের

হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তারা আমাদের কল্যাণ করেছেন। বাংলায় আলীবর্দী খান আমাদের আজাদি ও ইজ্জতের সর্বশেষ রক্ষক। আল্লাহ করুন, তার ছায়া যেনো আমাদের মাথার উপর আরো কয়েক বছর অব্যাহত থাকে আর তোমার মতো নওজোয়ানের নিজ নিজ দায়িত্বের অনুভূতি জাগে।'

হোসেন বেগের কাছে এ আলোচনা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাই তিনি আলোচনাটা এখানে শেষ করে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মোয়াযযম আলী আলোচনার রেশ টেনে গেলেন।

তিনি বললেন ঃ চাচাজান, আপনি কিছু মনে করবেন না। যে সব সুবাদার দিল্লি দরবারের ষড়যন্ত্রের সুযোগ নিয়ে সালতানাত নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন, আজকের দিনের পরিস্থিতির দায়িত্ব থেকে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক তাদেরকে মুক্তি দেবে না। তাদের মধ্যে কেউ যদি পুরো সালতানাত দখল করে নিতেন আর তার উদ্দেশ্য হতো কওমকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচানো, তা হলে অন্তত আমি তার অধিকার নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতাম না। যদি তিনি তার কার্যকলাপে নিজেকে কওমের পরিত্রাণকর্তা প্রমাণ করতেন, তা হলে আমি এক রেযাকার হিসাবে তার ঝাণ্ডার তলে দাঁড়িয়ে জান কোরবান করতে গৌরববোধ করতাম। তার ফউজের এক মামুলি সিপাহী হলেও আমার এ বিশ্বাস থাকতো যে, তিনি কখনো কোনো ভুল পথে পা ফেললে আমি তাকে ফিরাতে পারবো। তার আকাঙ্খা হতো আমার আকাঙ্খা, তার বুকের স্পন্দন হতো আমার বুকের স্পন্দন এবং তার আত্মার আওয়াজ হতো আমার আত্মার আওয়াজ। তার বিজয় হতো আমারই বিজয় এবং তার পরাজয়কে আমি মনে করতাম আমারই পরাজয়, এই ধরনের মানুষের উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য ভাগ্যান্বেষীদের কোন বিশেষ দলের সাহায্য প্রয়োজন হতো না। তিনি এক আদর্শের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতা ও কোরবানীর উদ্দীপনা নিয়ে ময়দানে অবতরণ করলে তার পেছনে থাকতো সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তি। তিনি আওয়ামের জন্য তৈরি করতেন কুঁড়েঘর আর মর্মর পাথরের পরিবর্তে তাদেরই দীলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতো তার ক্ষমতার মসনদ। কিন্তু এসব লোককে আপনারা কওমের পরিত্রাণকর্তা মনে করেন, আমার দৃষ্টিতে তারা কোনো সামগ্রিক আদর্শের বাহন হতে পারেন না, যাঁদের বিজয়কে আমি কওমের বিজয় বলে ধরে নেবো। এই ধরনের লোক আমাদের অনুভূতির ও উপলব্ধির পরিবর্তে আমাদের সম্বিতহারা অবস্থার সৃষ্টি। তাদের তুলনা চলতে পারে সেই গাছের সাথে, যার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে জমিনের উপর এবং যাকে

ভূপাতিত করতে একটা দমকা হাওয়ার বেগই যথেষ্ট। আপনারা মনে করেন যে, তারা আমাদেরকে মারাঠাদের লুটতরাজ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য লিপ্সার কবল থেকে বাঁচাতে চাচ্ছেন, কিন্তু এও কি সত্য নয় যে একদিন তাঁরা মারাঠাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং পরদিনই তাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করছেন। মারাঠাদের সাহায্য পেলে তারা মুসলিম প্রতিবেশীর উপর হামলা চালাতেও দ্বিধা করেন না। তারা জানেন যে, ইংরেজ আমাদের আজাদির সবচাইতে বড়ো দুশমন, কিন্তু তাদের এমন কে আছেন, নিজের কোনো না কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এ দেশে ইংরেজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহায্য করেননি? তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রয়েছে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের গণ্ডিতে এবং আমার ভয় হয়, তারাই হয়তো কোনোদিন ব্যক্তিগত ক্ষমতা হেফাজত করবার জন্য কওমের ভাগ্যকেও বলি দিতে পিছপা হবেন না।'

হোসেন বেগ উত্তেজনা স্বরে বললেন ঃ আলীবর্দী খান সম্পর্কে তুমি বলতে পারো না যে, তিনি ইংরেজ বা মারাঠার সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হতে পারেন অথবা কওমের আজাদি বলি দিতে পারেন।'

হোসেন বেগের মনোভাব লক্ষ্য করে আয়াযিযম কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন ঃ চাচাজান, এ কথাগুলি আমায় বলতে হচ্ছে, কারণ আপনাকে আমি অসীম ইজ্জতের চোখে দেখি এবং আমি চাই না যে, আমার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো ভুল ধারণা থাকে। আমি জানি, আলীবর্দী খানের উপর আপনার বিপুল শ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা আপনি আমার চাইতে বেশি জানেন। আমি জানি, আলীবর্দী খান বাংলাকে মারাঠার কবল থেকে বাঁচাতে চান। আমি এও জানি যে, ইংরেজকে তিনি সবচাইতে বড়ো দুশমন মনে করেন, কিন্তু যে জিনিসটিকে আমি সবচাইতে ক্ষতিকর মনে করি, তা হচ্ছে তার নীতি। এই ধরনের শাসকের শক্তি, তার শাসনক্ষমতা আদর্শের সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং তা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মকুশলতার ফল। যে ব্যক্তি কোনো আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে যান, তার কাছে সবচাইতে বড়ো পুঁজি হচ্ছে শিক্ষিত জনমত, যাকে তিনি তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজে লাগান। এই ধরনের শাসকের শাসনক্ষমতার জণকল্যাণের দিকে চালিত হলে তাকে হেফাজত করে আওয়ামের সামগ্রিক অনুভূতি। তিনি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে জনমত তাঁকে ঢালের মতো রক্ষা করে। এই ধরনের শাসকের শাসন ক্ষমতা হেফাজত করবার জন্য ভাগ্যান্বেষীদের সাথে চক্রান্ত বা দর কষাকষি করবার প্রয়োজন হয় না। তার বন্ধু ও সাথীরা হন সারা কওমের বন্ধু। তার দুশমন সকলের দৃষ্টিতেই

দুশমন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সংখ্যাতীত গুণের অধিকারী হয়েও আলীবর্দী খান এই ধরনের শাসকের পর্যায়ে পড়েন না। নিজস্ব ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও হুঁশিয়ারির বলে তিনি রাজ্য লাভ করেছেন এবং রাজ্যের হেফাজতের জন্য তিনি কতক হুঁশিয়ার লোকের সাহায্য ও বন্ধুত্বকেই যথেষ্ট মনে করেন। বাংলার কোনো ঘরোয়া বিপদ দেখা দিলে তিনে ইংরেজ ও মারাঠার দুশমনী কার্যকলাপের দিকে চোখগুলো ফিরিয়ে রাখতে বাধ্য হন এবং বাইরের বিপদ ঘনিয়ে এলে ভিতরের নিকৃষ্টতম দেশদ্রোহীকেও তিনি মাফ করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন হুঁশিয়ার রাজনীতিক ও অভিজ্ঞ জেনারেল, কিন্তু আমি আগেই বলেছি, বাংলার সিপাহীরা এখনও জানতে পারেনি তাদের যুদ্ধের আসল ক্ষেত্র কোথায়।'

হোসেন বেগের মুখ রাগে গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি সংযত হয়ে বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, আলীবর্দী খান মোটেই নির্ভরযোগ্য লোক নন। প্রয়োজনমতো তিনি দোস্ত-দুশমন বদল করে থাকেন।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আলীবর্দী খানকে আমি নির্ভরের অযোগ্য বলিনি। কিন্তু আপনি কিছু মনে না করলে আমি বলবো যে, তার আশেপাশে এমন সব লোক রয়েছেন, যাদেরকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি না। তার দৃষ্টির সামনে শাসকের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা না থাকলে তার দরবারে এই ধরনের লোকদের কোন জায়গা হতো না।

হোসেন বেগ বললেন ঃ তুমি বলতে চাও যে, আলীবর্দী খানের সিপাহীদের ঃ জী হ্যাঁ, আমি ভুল বলছি না।'

ঃ আলীবর্দী খান নিজেও হয়তো তা জানেন না। এ হতে পারে না যে, তুমি আমায় বলে দিলে আমি তোমার কথা তার কানে পৌছে দিবো?'

হোসেন বেগের বিদ্রূপের হাসিতে মোয়াযযম আলী ভয় পেলেন না। তিনি বললেন ঃ তাকে বলবার প্রয়োজন হবে না। তিনি জানেন যে, মীর জাফরের মতো লোক কারুর কাছে নিমকহালাল হতে পারেন না।'

হোসেন বেগ মীর জাফরকে খুব ভালো চোখে দেখতেন না, তথাপি আলীবর্দী খানের ফউজের এক অফিসারের ছেলের মুখে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনবার জন্য তিনি তৈরি নন। তিনি উঠতে উঠতে বললেন ঃ দেখো বাছা, তুমি ফউজে শামিল হতে না চাইলে আমি তোমায় বাধ্য করবার চেষ্টা করবো না, কিন্তু আলীবর্দী খানের সালারদের সম্পর্কে মুখ খুলতে গেলে সতর্ক হয়ে কথা বলা উচিত। তারা হচ্ছেন সুলতানাতের স্তম্ভ, আর তোমার বাপ ফউজের একজন চাকুরে। তুমি যে এতটা বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ কর, তা আমার জানা ছিল না। আমি যথেষ্ট

সংযত হয়ে তোমার কথা শুনেছি, কিন্তু এই বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে কারুর সাথে এ ধরনের কথা বললে তোমার ভালো হবে না। তুমি আসফ ও আফযলের দোস্ত এবং তাদের কাছে এই ধরনের মনোভাব প্রচার করবার অনুমতি আমি তোমায় দেবো না। এখনো তুমি ছেলেমানুষ, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তুমি বুঝবে যে, আলীবর্দী খান বাংলার মুসলমানের শেষ আশাস্থল।'

মোয়াযযম আলী কুরসী থেকে উঠতে উঠতে বললেন ঃ চাচাজান, আমি কোনো অপ্রিয় কথা বলে থাকলে তার জন্য মাফ চাই। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন, সময় এলে আমি প্রমাণ করবো যে, বাংলার মুসলমানের ভবিষ্যৎ আমার কাছে আর কারুর চাইতে কম প্রিয় নয়।'

৪

পরদিন মোয়াযযম ও ইউসুফ পিতার সঙ্গে এশার নামাজের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। হোসেন বেগের ভৃত্য পিছন থেকে আওয়াজ দিলে তারা থেমে পড়লেন। ভৃত্য কাছে এসে মাহমুদ আলীকে বললো ঃ মীর্যা সাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন।'

মাহমুদ আলী ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা যাও। আমি ওর সাথে দেখা করে আসছি।'

মাহমুদ আলী ভৃত্যের সাথে চলে গেলেন। ইউসুফ মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ মোয়াযযম মীর্যা সাহেব আব্বাজানকে এসময়ে ডেকে পাঠালেন যে, খবর ভালো তো?

ঃ কেন, কি হয়েছে?

ঃ কাল আমার কথায় মীর্যা সাহেব রেগে গিয়েছিলেন।

ঃ কেন? তুমি ওঁকে কি বলেছো?

ঃ আমি ফউজে ভর্তি হওয়ায় তিনি পেরেশান হয়েছিলেন। আমি তার পেরেশানী দূর করবার চেষ্টা করেছিলাম।

ঃ এখন উনি হয়তো আরো পেরেশান হয়েছেন। নিশ্চয়ই তুমি আলীবর্দী খান সম্পর্কে এধার-ওধার কিছু বলেছো।'

ঃ আমি বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনা করেছিলাম। উনি হয়তো মনে করেছেন আমি আলীবর্দী খানের হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।'

ঃ মীর্যা সাহেবের সাথে ওসব কথা বলে তুমি ভালো করোনি। উনি পুরানো ধরনের লোক। তা ছাড়া আলীবর্দী খানের সাথে তার সম্পর্ক বড়ো গভীর।'

ইউসুফ ও মোয়াযযম নামাজের পর কিছুক্ষণ মাহমুদ আলীর জন্য অপেক্ষা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরলেন। তাদের বাড়ি পৌঁছার খানিকক্ষণ পরই মাহমুদ আলী ফিরে এসে উঠানে তাঁদের পাশে এক কুরসীতে বসে কোনো ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন ঃ মোয়াযযম, কাল তুমি মীর্যা সাহেবের কাছে কি কথা বলেছিলে?'

ঃ আব্বাজান, আমি ভয় বা দুর্বলতার জন্য ফউজে ভর্তি হইনি, এই ভুল ধারণা আমি তার মন থেকে দূর করার চেষ্টা করেছিলাম। মীর্যা সাহেব খুব বেশি রেগে যাননি তো?'

ঃ না, তিনি বরং তোমার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন বলে পেরেশান হয়ে আছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, আলীবর্দী খান ও তার উমরাহ সম্পর্কে তোমার ধরণা প্রকাশ করতে তোমার সতর্ক হয়ে চলা উচিত।'

মোয়াযযম আলী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন ঃ আব্বাজান, উনি তো নিশ্চিয়ই আমায় খুবই না-লায়েক বলেছেন।'

ঃ 'না তিনি বললেন তোমার পুত্র আমার কাছে এক রহস্যের মতো। কখনো আমি তাকে সরলমনা নওজোয়ান মনে করি, কখনো আমার মনে হয়, সে প্রয়োজনের চাইতেও বেশি হুঁশিয়ার। এই ধরনের নওজোয়ান হয় দুনিয়ায় নাম রেখে যায়। নইলে তার বন্ধু ও সাথীদের কাছে মুসীবতের কারণ হয়ে ওঠে।"

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আব্বাজান, আমি এখখুনি ভাইজানকে বললাম যে, উনি অবশ্যি আমার নিন্দা করবেন আর আপনি বাড়িতে এসে আমায় শাসন করবেন আমার আরো ভয় ছিলো যে, এরপর উনি আমায় তার বাড়ির চার দেয়ালের কাছে ঘেঁষতেও দেবে না। কিন্তু এখন দেখছি উনি তো ভারী ভালো লোক।'

ঃ তুমি তার কাছে মীর জাফরের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলো?'

ঃ জী হ্যাঁ।'

ঃ মীর জাফরের নিন্দা করে যারা, এমনি প্রত্যেকটি লোককেই উনি ভালো মনে করেন।'

ঃ কিন্তু উনি তো আমায় বেশ কড়া কথা শুনিয়েছিলেন'।

ঃ বাইরে উনি তো অমনি করে থাকেন। এমন ধারণা তুমি আর কারুর কাছে প্রকাশ করো না।'

ঃ আব্বাজান, আমি সতর্ক হয়ে চলবো।'

ঃ মীর্যা সাহেব আরো একটা কথা বলেছেন।'

ঃ কি কথা?

ঃ তিনি বলেছেন মোয়াযযম আলীর জন্য আমার কুতুবখানার দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে। কিন্তু আমি সেইদিন খুশি হবো, যেদিন সে আমার অস্ত্রাগার থেকে তলোয়ার ও আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে আসবে।"

দুই

মুর্শিদাবাদে একদিন খবর রটলো যে, পণ্ডিত ভাস্করের নেতৃত্বে রঘুজী ভোসলার চল্লিশ হাজার মারাঠা ফউজ বর্ধমানের দিকে এগিয়ে আসছে। আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের বাইরে শিকারে বেরিয়েছেন। মারাঠার অগ্রগতির খবর পেয়েই তিনি বর্ধমানের দিকে রওয়ানা হলেন। মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য শহরের সেনাবাহিনীর উপর তিনি হুকুম পাঠালেন যে, তারা রাস্তায় তার সাথে এসে মিলিত হবে। দু'দিনে মুর্শিদাবাদের ছাউনী খালি হয়ে গেলো। শহর ও শাহীমহল হেফাজত করবার জন্য সৈন্যদের মাত্র কয়েকটি দল সেখানে রয়ে গেলো। কয়েক দিন পর আবার খবর পাওয়া গেলো যে, আলীবর্দী খানের অন্যতম সেনানায়ক মীর হাবীব ও আরো কয়েকজন ফউজী অফিসার বাংলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মারাঠা ফউজের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং পণ্ডিত ভাস্কর ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, বাংলার ফউজ থেকে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে যাবে, মারাঠা বাহিনীতে তাদেরকে সাবেক পদে বহাল করা হবে। মুর্শিদাবাদে একটা চাঞ্চল্যের ভাব ছড়িয়ে পড়লো।

মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী এবং হোসেন বেগের দুইপত্র আসফ ও আফযল, মুর্শিদাবাদের ফউজের সাথে যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

মোয়াযযম আলী প্রথমবার অনুভব করলেন যে, যাঁদের ছেলেরা যুদ্ধে চলে গেছে, তারা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

শাহী মহলের দারোগা মোয়াযযম আলীর পিতার বন্ধু। রোজ ভোরবেলা তার কাছে গিয়ে তিনি যুদ্ধের নতুন খবর জেনে নেন। একদিন দারোগার সাথে দেখা করে ফিরে এসে তিনি দেখলেন তার মায়ের মুখ দুঃখভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে।

ঃ কি হয়েছে, আম্মাজান? তিনি প্রশ্ন করলেন।'

ঃ কিছু নয়, বেটা! আজকে কোনো ভালো খবর আছে কি?'

ঃ হ্যাঁ, আম্মাজান, আজকের খবর কিছুটা ভালো। মারাঠারা পিছু হটে গিয়েছে, কিন্তু এখনো চূড়ান্ত লড়াই হয়নি। আপনি এতটা বিমর্ষ কেন?

মা দুঃখের সাথে জওয়াব দিলেন ঃ বেটা, ফরহাতের কাছ থেকে আমি এমনটি আশা করিনি।'

ঃ কি হয়েছে আম্মাজান?' মোয়াযযম আলী হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করলো ঃ ফরহাত কি বলেছে?'

ঃ এতে ফরহাতের কোনো কসুর নেই। আসলে তার সাথে যেসব মেয়েরা এসেছিলো, তারা বড়োই বদ-তমিজ।'

ঃ ফরহাত এখানে এসেছিলো?'

ঃ হ্যাঁ, ওতো এইমাত্র গেলো।'

ঃ কি করেছে সে?'

মা উঠে গিয়ে এক আলমারী থেকে কয়েকটা কাচের চুড়ি বের করে মোয়াযযম আলীকে দেখিয়ে বললেন ঃ এই দেখো! ফরহাত আজ কয়েকজন সখীকে নিয়ে এখানে এসেছিলো। তার সাথে সুলতান খানের মেয়েও ছিলো। আমি তাকে কখনো পছন্দ করি না, কিন্তু আজ সে খুব বাড়াবাড়ি করেছে। আগে সে বলেছে যে, বুযদীল বলেই তুমি ফউজে শামিল হওনি। ঃ আমাদের তরফ থেকে মোয়াযযম ভাইকে এগুলি উপহার দেবেন।' বলে সে তার হাত থেকে চুড়িগুলো খুলে আমার সামনে রেখে দিয়েছে।'

খানিকক্ষণের জন্য মোয়াযযম আলীর দেহের রক্ত যেনো উঠে এসে তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ ফরহাত কি বললো?'

ঃ ফরহাত কিছু বলেনি, তবে আমার আশা ছিলো যে, সে তার সখীদের মুখ বন্ধ করে দেবে, কিন্তু সে চুপ করে থেকে হাসতে লাগলো।'

ঃ আম্মাজান, এই বাজে কথায় আপনি যদি আঘাত পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি একাই মারাঠা লশকরের সামনে দাঁড়িয়ে যাবো। আপনি বিশ্বাস রাখুন, সময় এলে আপনার পুত্রকে কেউ ভীরু বুযদীল বলবে না। যে সুলতান খানের সাহেবজাদি আমার জন্য আপনার কাছে চুড়ি রেখে গেছে, তিনি নিজেই মারাঠা হামলার খবর শুনে শহর থেকে হিজরত করতে চেয়েছিলেন এবং আমি বহু কষ্টে তাকে ফিরিয়ে রেখেছি। আম্মাজান, ফউজের সাথে আমি যাইনি। তার কারণ বর্তমান অবস্থায় মুর্শিদাবাদেই আমার সবচাইতে বড়ো প্রয়োজন। শহরে সিপাহী একরকম নেই। যদি দুশমন এই অবস্থায় সুযোগ নিয়ে কয়েকটি দ্রুতগামী সৈন্যদল

এদিকে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে শাহীমহলের আশপাশের মহল্লাও রক্ষিত থাকবে না, আর শহরের বাইরে আমাদের এ এলাকাতো পুরোপুরি অরক্ষিত। আমি মীর্যা সাহেবের কাছে যাচ্ছি।'

ঃ কিন্তু বেটা, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে ফরহাতের কোনো নিন্দা করো না। তার নিয়ত খারাপ ছিলো না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ না আম্মাজান, আসফ ও আফযলের বোনের নিন্দা আমি করতে পারি না। কিন্তু চুড়িগুলো সেরে রাখবেন।'

৫

মোয়াযযম আলী যখন হোসেন বেগের মহলে প্রবেশ করলেন, হোসেন বেগ তখন বাইরের পাঁচিল ঘেরা জায়গায় বন্দুক নিয়ে নিশানাবাজি করছেন। আটদশ জন সিপাহী তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মোয়াযযম আলী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর হোসেন বেগ তার দিকে তাকালে বললেন ঃ চাচাজান আজ আমি আপনার কুতুবখানার বদলে অস্ত্রাগার দেখতে এসেছি।'

হোসেন বেগ হেসে বললেন ঃ তোমার তলোয়ারের প্রয়োজন, না বন্দুকের?

ঃ এখন আমার কিছু চাই না। আপনার কুতুবখানায় তো দেড় হাজার কিতাব রয়েছে। আপনার অস্ত্রাগারে কি কি রয়েছে, তাই আমি জানতে এসেছি।'

ঃ কাজে লাগাবার লোক থাকলে আমার হাতিয়ার যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু তোমার এদিকে হঠাৎ আকর্ষণের কারণ তো আমি বুঝতে পারছি না!'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ শহরের ফউজ সব চলে গেছে। আমার ভয় হয়, দুশমন খুব বেশী হুশিয়ার হলে তাদের পক্ষে হঠাৎ মুর্শিদাবাদ দখল করে বসা খুব শক্ত হবে না। তার উপর আমাদের এ মহল্লা তো খুবই অরক্ষিত। আমার মনে হচ্ছে, যদি সত্যি কোনো বিপদ আসে, তাহলে আপনার বাড়িটি এই মহল্লার জন্য কেল্লার কাজ দেবে। আপনি একবার বলেছিলেন, আমার কোনো ফউজী চাকরি দরকার হলে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন। এখন আমি চাচ্ছি যে, আমায় এই কেল্লার মুহাফিজ নিযুক্ত করা হোক।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ কিন্তু আমার কাছে শিক্ষিত সিপাহী রয়েছে মাত্র পনেরো জন, আর বেকার ভৃত্য রয়েছে পাঁচ ছ'জন। কোনো বিপদ এলে এ ক'টি লোক নিয়ে তুমি কি করতে পারবে?

ঃ লোকের চিন্তা করবেন না। বিপদের সময়ে মহল্লার প্রত্যেকটি লোক এখানে

এসে হাজির হবে। আমি কেবল এইটুকু চাই, যেনো তাদেরকে শিক্ষা দেবার সুযোগটা পাই। তাদের হাতিয়ার ও গোলাবারুদের প্রয়োজন হবে। তার ব্যবস্থা করবার ভার আপনাকে নিতে হবে।

ঃ বাছা তুমি আমার অস্ত্রাগার দেখোনি। আমার কাছে প্রায় আড়াই শ বন্দুক আর তার সমান পিস্তল ও তলোয়ার রয়েছে। বারুদও এতটা রয়েছে যে ব্যবহার করবার লোক পাওয়া গেলে এক সপ্তাহে তা খতম হবে না। পাঁচ বছর আগে আমি দুটি তোপ খরিদ করেছিলাম, তা এখনো ভিতরে পড়ে রয়েছে। কোথায় তা বসানো যাবে, তার ফয়সালা এখনো হয়নি। যদি কোনো বিপদ আসে, তাহলে সে ফয়ালা কেল্লার মুহাফিজই করবেন।'

ঃ তাহলে আমার খেদমত আপনি মঞ্জুর করলেন?'

হোসেন বেগ হাসতে হাসতে জওয়াব দিলেন ঃ মোয়াযযম আলী, আমি তোমায় আমার কেল্লার মুহাফিয ও আমার ফউজের সিপাহসালার নিযুক্ত করলাম যার সংখ্যা হচ্ছে পনেরো জন শিক্ষিত ও ছয়জন অশিক্ষিত সিপাহী।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনার সিপাহসালার আপনাকে হতাশ করবে না।'

হোসেন বেগ মোয়াযযম আলীর ঘাড়ের উপর হাত রেখে তার মাথাটা নিজের বুকে লাগিয়ে বললেন ঃ বেটা তোমার সম্পর্কে আমি কখনো হতাশ হইনি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আজ থেকে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় আপনি মহল্লার বিশিষ্ট লোকদের এখানে মিলিত হবার জন্য দাওয়াত দিন।'

ঃ বহুত আচ্ছা, কিন্তু আমি তোমার কাছে জানতে চাই, মুর্শিদাবাদের যে সত্যি কোনো বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, হঠাৎ এ খেয়াল কি করে তোমার মাথায় এলো?'

ঃ চাচাজান, বিপদ না এলেও আমাদেরকে তৈরি থাকতে হবে। এখনই আপনি নিশানাবাজির অভ্যাস করছিলেন। আপনি যে কোনো গোলযোগের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরি থাকতে চান, এ ছাড়া তার কারন আর কি হতে পারে?'

হোসেন বেগ জওয়াব দিলেন ঃ এ কথা ঠিক যে, লড়াইয়ের ময়দানে সিপাহী পাঠাবার পর এই চিন্তা কখনো আমায় পেরেশান করেছে যে, যদি কোনো বিপদ এদিকে এসে পড়ে, তখন আমরা কি করতে পারবো। আমার ঘরে ফরহাত আমার চাইতেও বেশি করে এ চিন্তা করছে। একদিন সে স্বপ্ন দেখেছে যে, ডাকাত আমাদের ঘরে ঢুকেছে। সতর্ক থাকা সব সময়েই ভালো। আমি অবশ্যি ভাবিনি যে, মারাঠা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে এদিকে আসবে, কিন্তু এদিকটা তুমি

চিন্তা করেছো এবং তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, মারাঠা লশকর সত্যি সত্যি এদিককার পথ ধরছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচাজান, আমার আশঙ্কা অমূলক নয়। মারাঠারা বিজয়ের জন্য আসেনি, এসেছে লুটতরাজ করতে। এরই মধ্যে তারা পথে পথে বহু বস্তি ও শহর বরবাদ করে দিয়েছে, কিন্তু এমন জায়গা কমই আছে যেখানে তারা তাদের দখল কায়েম করবার প্রয়োজনবোধ করেছে। বাংলার বেশিরভাগ দৌলত রয়েছে মুর্শিদাবাদে, একথা তাদের অজানা নেই; তা ছাড়া আমাদের দিক থেকে যেসব বিশ্বাসঘাতক গিয়ে তাদের সাথে মিলেছে, তারা একথা অবশ্যি বলে দিয়েছে যে, আজকাল মুর্শিদাবাদে সিপাহী নেই। মুর্শিদাবাদের উপর হামলা করে কোনো ফয়দার আশা না থাকলেও তাঁরা যুদ্ধের ময়দান থেকে আমাদের ফউজের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেবার জন্য কয়েকটি সৈন্যদল এদিকে পাঠাতে পারে। মীর হাবীবকে আপনি জানেন। তিনি হুঁশিয়ার লোক। মুর্শিদাবাদের অলিগলির খবর তাঁর জানা আছে। আমি তাঁর জায়গায় থাকলে এতক্ষণে মুর্শিদাবাদ দখল করা হয়ে যেতো। আপনি হয়তো শুনেছেন, জগতশেঠ তাঁর মহল পাহারা দেবার জন্য দেড়শ লোক ভর্তি করেছেন এবং আমাদের ওসতাদ শের আলীকেও চাকরিতে বহাল করেছেন। আজ ভোরবেলা যখন আমি লড়াইয়ের ময়দানের খবর নেবার জন্য শাহী মহলের দারোগার কাছে যাচ্ছিলাম, তখন পথে শের আলী খানের সাথে আমার দেখা হলো। তিনি আমায়ও জগতশেঠের চাকরি নেবার উপদেশ দিলেন। আমি জওয়াব দিয়েছি যে, এক কোটিপতি মহাজনের ভাণ্ডার হেফাজত করার চাইতে মহল্লার কোনো গরিব মানুষের দরজায় পাহারা থাকা আমি ভালো মনে করি। চাচাজান, আমার আশঙ্কা নিছক কল্পনা প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু যতোক্ষণ লড়াই খতম না হবে এবং আমাদের ফউজ ফিরে না আসবে, ততোক্ষণ আমরা নিশ্চিত নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। আপনার এজাযত পেলে আমি একবার দেখবো, আপনার মহলের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কেমন রয়েছে এবং তা আরো ভালো করার জন্য আমরা কি করতে পারি।'

ঃ বহুত আচ্ছা, তুমি নিজের কাজ কর। আমি মহল্লার লোকদেরকে দাওয়াত পাঠাই।'

এই কথা বলে হাসেন বেগ ভৃত্যদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা সবাই ভালো করে শুনে রাখ, আজ থেকে মোয়াযযম আলী তোমাদের চালক এবং তাঁর যেনো কোনো অভিযোগের কারণ না ঘটে।'

৪

সন্ধ্যাবেলা হোসেন বেগের দস্তরখানে মহল্লার ত্রিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে জমা হলেন। গোড়ার দিকে হোসেন বেগ তাদেরকে দাওয়াত করবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর মোয়াযযম আলী নিজের ধারণা প্রকাশ করলেন। মুর্শিদাবাদের কোনো বিপদ আসতে পারে, মেহমানদের বেশিরভাগ তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা কেবল সতর্কতার খাতিরে নিজ নিজ বাধ্য লোকদের সংঘবদ্ধ করতে রাজি ছিলেন। মাত্র দশজন লোক এমন ছিলেন, যারা হোসেন বেগ ও মোয়যযম আলীর ধারণার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আন্তরিকতার সাথে তারা তাদেরকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরদিন মাত্র বিশজন তরুণ ও ত্রিশজন বয়স্ক লোক হোসেন বেগের মহলে হাজির হলো। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মহল্লার গরিব দোকানদার, মজদুর ও আমীর ঘরের ভৃত্য। তাদেরকে দেখে হোসেন বেগের মনে হতাশা জাগলো, কিন্তু মোয়াযযম আলীর কাছে এই ধরনের শুরু মোটেই হতাশাজনক ছিলো না। তিনি অস্ত্রাগার থেকে বন্দুক বের করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং তাদেরকে মহল্লার বাইরে এক খোলা ময়দানে নিশানাবাজির জন্য নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আরো পনেরোজন লোক তাদের সাথে শামিল হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে মোয়াযযম আলীর কাছে ফউজী শিক্ষা নেবার জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ালো দেড়শ।

তার নিজস্ব ভৃত্য সাবের ও জামাল খান রেজাকারদের মধ্যে শামিল হলো। জামাল খান কয়েক বছর বাংলার ফউজে চাকরি করেছে, কিন্তু সাবেরের তলোয়ার বন্দুকের দিকে মোটেই আকর্ষণ ছিলো না। কেবল জামাল খানের সাথে প্রতিযোগিতা করবার জন্যই সে রেজাকারদের সাথে প্যারেডে শামিল হয়েছিলো। তিনদিন সাথীদের সাথে কলরব করে বেড়াবার পর একদিন আকস্মিকভাবে তার পয়লা নিশানা ঠিক জায়গায় লাগলো। সেখানেই বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে সে এক দৌড়ে মোয়াযযম আলীর কাছে গিয়ে জোর গলায় চেঁচিয়ে বললো ঃ সরকার, আমার নিশানা ঠিক হয়ে গেছে। এবার আমায় ছুটি দিন। ঘরে বহুত কাজ পড়ে রয়েছে।

মোয়াযযম আলীর কার্যকলাপ ধীরে ধীরে এক আন্দোলনে রূপ নিচ্ছিলো। কতকলোক স্বেচ্ছায় আর কতক বাধ্য হয়ে তার সাথে যোগ দিচ্ছিলো। রোজ

রেজাকারদের তিন চার ঘন্টা শিক্ষা দেবার পর তিনি হোসেন বেগের মহলে চলে যেতেন। সেখানে হোসেন বেগ চাহিদা অনুযায়ী চল্লিশজন মজদুরকে পুরনো পাঁচিল মেরামত করবার ও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘাটি তৈরি করবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মোয়াযযম আলী তাদের কাজ দেখতেন। মহলের কোণে কোণে ঘুরে কোনো নতুন ধারণা মাথায় এলে তা হোসেন বেগকে জানিয়ে চলে যেতেন। আবার মহল্লার অলিগলিতে ঘুরে ফিরে বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঘাঁটি তৈরি করবার পরামর্শ দিতেন। কয়েকদিনের মধ্যে মহল্লার প্রত্যেক গলির মুখে মুখে ফটক তৈরি হলো। কয়েকদিন আগে যারা ঘরে বসে তাদেরকে বিদ্রূপ করতো, তাদের মধ্যেও কর্মের উদ্দীপনা দেখা দিলো। এশার নামাজের পর রোজ প্রতিদিন তার বিশেষ বিশেষ সাথীরা হোসেন বেগের বাড়িতে হাজির হয়ে সারাদিনের কাজকর্মের হিসাব নিকাশ করতো এবং পরের দিনের কার্যসূচি তৈরি করতো।

২

একদিন মীর্যা হোসেন বেগের দাওয়াত পেয়ে শের আলী তার হাবেলীর রক্ষা-ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে এলেন। দেউড়ি পার হয়ে ভিতরে ঢুকেই তিনি দেখলেন যে, বাইরের পাঁচিলের গায়ে কিছুটা দূরে ইটের স্তম্ভ তৈরি করা হচ্ছে। তার প্রশ্নের জওয়াবে মোয়াযযম আলী বললেন যে, পাঁচিল বেশি চওড়া নয়। এসব স্তম্ভের উপর যখন কাঠের তখত বসানো যাবে, তখন সিপাহীদের জন্য যথেষ্ট জায়গা বেরুবে। পাঁচিলের কিনার কিছুটা উঁচু করা সিপাহীদের জন্য ঢালের কাজ করবে। বাকি তিনদিকের কাজ আগেই শেষ হয়ে গেছে। তিনি তা দেখবার জন্য শের আলীকে আহবান করলেন।

শের আলী বাইরের প্রাঙ্গণের চারদিককার পাঁচিল ঘুরে দেখবার পর হোসেন বেগকে বললেন ঃ মীর্যা সাহেব, আপনিতো আপনার বাড়িটাকে কেল্লা বানিয়ে ফেললেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ দেউড়ির ছাদের উপরও আমাদের ঘাঁটি বেশ মজবুত হয়েছে। কিন্তু এসব তো সাময়িক ব্যবস্থা। সময় হলে মীর্যা সাহেবকে এই চার দেয়াল ভেঙে নতুন পাঁচিল তৈরি করবার পরামর্শ দিতে হবে। আসুন ভিতরের দিকটা দেখাচ্ছি।'

শের আলী তার সাথে সাথে ভিতর বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। মোয়াযযম

আলী থাকার বাড়ি নিচতলার জানালা দরজার পিছে বালুর বস্তার ঘাঁটি দেখিয়ে বললেন ঃ উপরতলায়ও এই ধরনের ব্যবস্থা দেখতে পাবেন। আমি ছাদের উপরও ঘাঁটি তৈরি করাচ্ছি। দুশমন ভিতরবাড়ির প্রাঙ্গণে পৌছে গেলে প্রত্যেক কামরার দরজা জানালা ছাদ ও বারান্দার ঘাঁটি থেকে গুলিবর্ষণের মোকাবিলা করতে হবে তাদেরকে। অবশ্য আমি এসব ব্যবস্থা যথেষ্ট মনে করছি না। এখনো আমাদেরকে অনেক কিছু করতে হবে। ভিতরবাড়ির দেয়ালগুলো যেমন কমজোর, তেমনি উঁচুও নয়। দুশমন বাইরের প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারলে সহজেই লাফ দিয়ে ভিতরে আসতে পারবে। এসব দেয়ালের বুনিয়াদ এত দুর্বল যে, এগুলিকে উঁচু করা চলবে না। তাই আমার ইচ্ছা, ওর সামনে এক খন্দক খুঁড়ে তা পানি দিয়ে ভর্তি করে দেবো। এরপর সময় পাওয়া গেলে ও মীর্যা সাহেব আমার সাথে একমত হলে খন্দকের সাথে সাথে বাঁশ গেড়ে দিতে হবে। সেগুলো মাটির নিচে একগজ ও বাইরে আড়াই গজ থাকবে। বাঁশের এ বেড়া খুব বেশি মজবুত হবে না। তবু এতে অবশ্য এই ফায়দা হবে যে, দুশমন দেয়াল টপকে ও খন্দক পার হয়ে সোজাসুজি থাকার বাড়ির ভিতর আমাদের সর্বশেষ ঘাঁটির উপর হামলা করতে পারবে না। বাড়ির ভিতরকার ঘাঁটি থেকে আমাদের গুলি খন্দকে পড়ে-যাওয়া দুশমনকে আর মাথা তুলতে দিবে না। মীর্যা সাহেবের কাছে দুটো তোপ রয়েছে। সে দুটোকে দরজার সামনে বসানো হবে। তা ছাড়াও প্রাঙ্গণে এক গর্ত খোদাই করা হবে। তাতে পঞ্চাশ-ষাটজন সিপাহী লুকিয়ে থাকতে পারবে। দুশমনকে কোনমতে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করলে তাদেরকে সবার আগে আমাদের তোপের অগ্নিবর্ষণের মোকাবিলা করতে হবে। এসব ব্যবস্থা অবশ্য সাময়িক, এক অপ্রত্যাশিত হামলার মোকাবিলার জন্য এসব করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, মারাঠারা বাইরে পাঁচিল ভাঙবার অথবা টপকে আসার পর সংঘবদ্ধ ফউজের বদলে বিচ্ছিন্ন জনতার ভিড়ের মতো ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকবার চেষ্টা করবে। আর তাদের উদ্দেশ্য হবে শুধু লুটতরাজ। আমরা এবার তাদের দাঁত ভেঙে দিতে পারলে দ্বিতীয়বার হামলা করার সাহস আর তাদের হবে না।'

শের আলী বললেন ঃ কিন্তু বাছা, এত বড়ো কাজের জন্য বহু দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তোমার ধারণায় এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে কতো সময় লাগবে?'

ঃ পঞ্চাশ-ষাটজন লোককে কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে একাজ কয়েকদিনেই শেষ হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার বহু পরিকল্পনার সাথে মীর্যা সাহেব একমত হন না। তাঁর ধারণা বাইরের পাঁচিলের কাজ হয়ে গেলেই মহল সুরক্ষিত হয়ে যাবে।'

হোসেন বেগ শের আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ মোয়াযযম আলীর কোনো পরিকল্পনায়ই আমার দ্বিমত নেই। কিন্তু এসব পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে গেলে বহুত সময় প্রয়োজন। মারাঠা ফউজ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে এদিকে আসবে, আমাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলে শহরের লোক আমায় বিদ্রূপ করবে। আর সব লোকের কথা বাদ দিন আমার ছেলেরাই ফিরে এসে এসব দেখে অবাক হয়ে যাবে। এখনইএমন অবস্থা হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদে আমার কোনো কোনো দোস্ত আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ করেছে।'

শের আলী বললেন ঃ মীর্যা সাহেব, লোকের নিন্দার জন্য পরোয়া করবেন না। মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা প্রমাণিত হোক, কিন্তু একথা কে বলতে পারে যে, মারাঠা যুদ্ধের ময়দান থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেও আমাদের ভবিষ্যতে কোনো বিপদ আসবে না? বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের যে কোনো অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকা উচিত। বুদ্ধিমান লোক সব সময়ই বর্ষার দিন আসবার আগে বাড়ির ছাদ মেরামত করে নেয়। বর্তমান অবস্থায় আমাদেরকে বর্ষার চাইতে বেশি করে দুশমনের হামলার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। বর্ষাকালে কতোবার জমেও বর্ষণ না করেই ভেসে যায়, কিন্তু তা বলে বর্ষার সূচনা হলে যে লোক বাড়ির ছাদ ও নালি মেরামত করতে লেগে যায়, সে নির্বোধ নয়।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ মহল্লায় আমার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই রটে গেছে যে, আমার কাছে এক বিরাট ধনভাণ্ডার রয়েছে এবং তারই হেফাজতের জন্য আমি এসব করছি।'

শের আলী বললেন ঃ মীর্যা সাহেব, আপনি আপনার কাজ করে যান। আপনার যদি ধনভাণ্ডার নাও থাকে, তবু হয়তো কোনো দিন ধনভাণ্ডারের মালিকরা এসে এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। জগত শেঠ তার ভাণ্ডার হেফাজত করার জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন। নিজের মহলের আত্মরক্ষা ব্যবস্থার জন্য তিনি এরই মধ্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন। তিনি আমায় তার মহলের মুহাফিজ নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু এযাবত আমি যা করেছি তা মোয়াযযম আলীর কার্যকলাপের সামনে কিছুই নয়। মোয়াযযম আলী মহল্লার লোকদের মধ্যে আত্মরক্ষার যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছে তা প্রশংসার যোগ্য। জগত শেঠ যেসব ভাড়াটে সিপাহী ভর্তি করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকের সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, বিপদের সময়ে হয়তো তারা নিজের বন্দুকই সামলে রাখতে পারবে না।'

এমনি কথাবার্তা চলবার মধ্যেই অন্দরমহল থেকে বন্দুকের আওয়াজ শোনা

গেলো। শের আলী চমকে উঠে বললেন ঃ এ বন্দুকের আওয়াজ অন্দর থেকে আসছে যেন মনে হয়।'

হোসেন বেগ হেসে বললেন ঃ আফযলেন বোন হবে। সে উপর তলার জানালা দিয়ে বন্দুক চালানো অভ্যাস করে থাকে।'

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর শের আলী হোসেন বেগের কাছে থেকে বিদায় চাইলেন। মোয়াযযম আলী তার সাথে সাথে দেউড়ি পর্যন্ত গেলেন। দরজার কাছে এসে শের আলী মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ মোয়াযযম, আজ যা দেখে গেলাম, তাতে আমার স্বীকার করতেই হবে যে, কয়েক বছর ধরে ফউজের চাকরি করেও তোমার সামনে আমার জ্ঞান বহুত কম। তুমি একদিন কিছুক্ষণের জন্য সময় করে জগত শেঠের মহলে এসে আমার কার্যকলাপ যাচাই করে দেখবে। সত্যি সত্যি তুমি আমায় কাজে লাগাবার মতো কিছু পরামর্শ দিতে পারবে।'

ঃ আপনি যখনই হুকুম দেবেন, আমায় হাজির পাবেন।

ঃ ফুরসত পেলে আজই একবার এসো।'

ঃ বহুত আচ্ছা, আজকে জোহরের নামাজের পর আমি আপনার খেদমতে হাজির হবো।'

কয়েকদিন পর হোসেন বেগের মহলের যাবতীয় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা শেষ হল। তারপর মোয়াযযম আলী অন্দরমহলের চারদেয়ালের ভিতরে খন্দক খোদাই করবার পরামর্শ দিলেন।

হোসেন বেগ জওয়াব দিলেন ঃ আমরা যা করছি তা-ই যথেষ্ট। আমি বাড়িটার অবস্থা এতটা বিকৃত করতে চাই না, যাতে পুরা বাড়িটা আবার ভেঙে নতুন করে গড়তে হয়।'

ঃ বহুত আচ্ছা, চাচাজান। আপনার মর্জি। আমাদের বর্তমান প্রস্তুতিতে এতটা ফায়দা অবশ্য হবে যে, বিপদ এলে আমার দুশমনকে অন্তত কয়েক ঘন্টা বাধা দিয়ে রাখতে পারবো।'

এই কথা বলে মোয়াযযম আলী সেখান থেকে চলে গেলেন, কিন্তু হোসেন বেগের কানে তার কথা দীর্ঘ সময় ধরে বাজতে লাগলো। সারাদিন তিনি কেমন

অস্বস্তিবোধ করলেন এবং রাত্রেও তার ভালো ঘুম হলো না।

পরদিন খুব ভোরে মোয়াযযম আলী নিজের ঘরে গভীর নিদ্রায় অচেতন। সাবের এসে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বললো, সরকার, মীর্যা সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

ঃ মীর্যা হোসেন বেগ?' মোয়াযযম আলী হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলো।

ঃ হ্যাঁ, 'সরকার, সম্ভবত তিনি কোথাও যাচ্ছেন।'

মোয়াযযম আলী জলদি উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ঃ আপনি ? এ সময়ে?' হোসেন বেগের সাথে দেখা হতেই তিনি বললেন।

হোসেন বেগ কোনো ভূমিকা না করেই বললেন ঃ দেখ বেটা, কাল তোমার সাথে আলাপ করার পর আমি চিন্তা করেছি যে এতটাই যখন করলাম, তখন ও খন্দকও খোদাই করা হোক। কিন্তু তা এতটা গভীর হবে যাতে দুশমন ভিতরের দেওয়াল টপকে সহজে বাড়ির উপর হামলা করতে না পারে। কথা দাও, এরপর খন্দকের সামনে বাঁশ গাড়বার উপর জোর দেবে না। আমি চাই না যে, মুর্শিদাবাদের লোকেরা সত্যি সত্যি আমার পাগল ঠাউরে বসে।'

মোয়াযযম আলী জানতেন, এক কাজ শেষ হয়ে গেলে মীর্যা সাহেব নিজেই আর এক কাজ করবেন। তাই তিনি বললেন ঃ চাচাজান, আমি আপনাকে খন্দক খোদাই করতে তো জোর করে বলছি না।'

ঃ না, না, খন্দক খোদাই অবশ্যি করতে হবে। আমি তার ফয়সালা করে ফেলেছি। লোকে যা বলে বলুক, আমি তার জন্য পরওয়া করবো না।'

ঃ বহুত আচ্ছা, চাচাজান, কিন্তু এ সময় আপনি কোথায় চললেন?'

ঃ আমি পাড়াগাঁ থেকে লোক ডাকতে যাচ্ছি। শহুরে লোক কোনো কাজের নয়। কাজের বদলে তারা আমায় বিদ্রূপ করবে। দুপুরের মধ্যে আমার এলাকার দেড়-দুশো লোক এখানে পৌঁছে যাবে। আরো বেশি লোক লাগালে দরিয়ার ওপারের জায়গির থেকে কিষাণদের ডেকে আনা যাবে। কিন্তু চারদিনের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই।' এই কথা বলে হোসেন বেগ ঘোড়া হাঁকালেন।

তৃতীয় প্রহরে হোসেন বেগের বাড়িতে খন্দক খোদাই করার কাজ শুরু হয়ে গেলো। তাঁর লংগরখানায় দুশো লোকের খানা তৈরি হতে লাগলো।

পরদিন হোসেন বেগের এক দোস্ত তার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন ঃ মীর্যা সাহেব, এ কি হচ্ছে?'

আগেও কোনো লোক মীর্যা সাহেবকে এই ধরনের প্রশ্ন করেছে। তিনি তীব্র স্বরে বললেন ঃ দেখুন সাহেব, এটা আমার নিজের বাড়ি। এটাকে খোদাই করে

আমি দিঘি বানিয়ে ফেললেও আপনার কোনো প্রশ্ন করবার অধিকার নেই।'

দোস্ত এ ব্যপার নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখ খোলার প্রয়োজনবোধ করেননি। তিনি চলে যাবার পর হোসেন বেগ এক ভৃত্যকে বললেন ঃ এরপর কেউ আমার সাথে দেখা করতে এলে তাকে ভিতরে না এনে বাইরের বৈঠকখানায় বসিয়ে দিয়ো।'

কয়েকদিনের মধ্যে খন্দক খোদাই শেষ হয়ে গেলে হোসেন বেগ হাবেলী থেকে বর্ষার পানি বেরিয়ে যাবার নালির মুখ সেদিকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপরের দিন মহল্লার লোকেরা দেখলো, হোসেন বেগের হাবেলীতে বাঁশ বোঝাই গাড়ি আসছে। তাদের মনে ভাবান্তর হলে হোসেন বেগের কাছে [illegible] মনোভাব প্রকাশ করবার মতো সাহস হলো না।

মোয়াযযম আলী মহল্লার [illegible]দের ক্রমাগত ফৌজী শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা অবশ্য ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো। [illegible] সংখ্যা বাড়বার বদলে দিনের পর দিন কমে আসছে। তথাপি তার মনে স্বস্তি এসেছে, কারণ এর মধ্যে মহল্লার লোকেরা বন্দুক চালানো শিখে ফেলেছে। আগে যে সব লোক তাদেরকে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করতো, তারই এখন গোপনে গোপনে নিজ নিজ ঘর হেফাজত করবার ব্যবস্থা করছে। মোয়াযযম আলীর আন্দোলনের প্রভাব মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন মহল্লায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রচুরসংখ্যক তরুণ শহরগুলোতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থার অনুপ্রেরণা সঞ্চার করবার জন্য ময়দানে নেমেছে।

৫

একদিন মোয়াযযম আলী মহল্লার তামাম [illegible]কে হোসেন বেগের বাড়িতে জমা করলেন এবং তাদের সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন ঃ ভাই ও বোযর্গান, কয়েক সপ্তাহ আগে মুর্শিদাবাদ থেকে ফউজ রওয়ানা হয়ে যাবার পর আমার মনে হয়েছিলো যে, আল্লাহ না করুন, মুর্শিদাবাদের উপর কোনো বিপদ ঘনিয়ে এলে শহরের বাইরে আমাদের মহল্লা অত্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে, কিন্তু আজ আমার মনে হয়, শাহীমহল বাদ দিয়ে আমাদের মহল্লাই সবচাইতে বেশি সুরক্ষিত। এখন কেউ আমাদের উপর হামলা চালালেও ঠিক ভেড়ার মতো আমাদের তাড়িয়ে নিতে পারবে না। প্রথমে আমরা দুশমনকে রুখবো গলিগুলোর দরজার বাইরে। আমাদের গোড়ার দিকের ঘাঁটি পার হয়ে যদি তারা ভিতরে ঢোকে ,তাহলে উঁচু বাড়িগুলোর ছাদ ও পাঁচিলের উপর থেকে আমরা তাদের উপর গুলিবৃষ্টি করবো।

তারপর আমাদেরকে আরো পিছু হটতে হলে এই বাড়িই হবে আমাদের সর্বশেষ কেল্লা। বিপদের সময়ে মহল্লার নারী, শিশু ও বৃদ্ধ এর ভিতরে আশ্রয় নেবে এবং আমরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে বসে তাদেরকে হেফাজত করতে পারবো। আপনারা এই হাবেলীর ভিতর ও বাইরে নিজ নিজ ঘাঁটি দেখে নিয়েছেন। বিপদের সময় কীভাবে কাজ করতে হবে, এখন সেই কার্যসূচি শুনে নিন। বিপদ এলে সবার আগে মহল্লার ভিতর ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় পাহারারত [illegible] নাকারা বাজাবে। তখন আপনারা মুহূর্তের জন্য দের না করে নিজ নিজ ঘাঁটিতে পৌঁছে যাবেন। নিজ নিজ পরিবারের নারী ও শিশুদের আপনারা বুঝিয়ে দেবেন যে, তারা কোনোরকম উদ্বেগ প্রকাশ না করে যেনো নাকারার আওয়াজ শোনামাত্রই বাড়ির অন্দরমহলে এসে জমা হন। এর ভিতরে এতটা জায়গা রয়েছে যে, মহল্লার সব নারী ও শিশু সেখানে স্থান পাবে। খানিকক্ষণ পরেই হাবেলীর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আজ দুপুরের পর একবার তার মহড়া দেওয়া হবে।

'সন্ধ্যার আগে কোনো এক সময়ে নাকারা বাজলে কোনো অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য আমারা কতোটা তৈরি হয়েছি, তখন তাঁর পরীক্ষা হবে। দিনের বেলায় নারী ও শিশুরা নিজ নিজ আশ্রয়স্থান দেখে নেবে এবং রাতের বেলা দ্বিতীয়বার এর মহড়া দেওয়া হবে।'

এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন ঃ আপনার মতলব, রাতের বেলায়ও আমাদের বালবাচ্চাদেরকে উঠে নিয়ে এদিকে ছুটতে হবে?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ হাঁ কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাঁরা ছুটতে পারবে না। তাদেরকে অন্ধকার গলি পার হয়ে এখানে পৌঁছতে হবে। হাবেলীর ভিতরে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মশাল জ্বলবে, যেনো তারা নিজ নিজ জায়গা দেখে নিতে পারে।'

আর এক ব্যক্তি উঠে বললেন ঃ এতো বড়ো অদ্ভুত কথা। নারী ও শিশুরা কি করে রাতের বেলায় এখানে পৌঁছবে?'

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ আমরা আপনার সব কথাই মানতে রাজী কিন্তু নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে রাতের বেলা এমন তামাশা করা ঠিক হবে না।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার যদি জানা থাকতো যে, দুশমন কেবল দিনের বেলায়ই হামলা করবে, তাহলে মা-বোনদেরকে এমনে তকলিফ দেওয়াটা আমি পছন্দ করতাম না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমার মনে হয় যে, রাতের বেলা মুষলধারে বৃষ্টি হলেও আমাদেরকে এ অভ্যাস অবশ্যি করতে হবে। আমি জানি, কতকলোক গোড়া থেকে আমাদেরকে বিদ্রূপ করছে, কিন্তু আপনারা জানেন, গত কয়েক বছরে হিন্দুস্তানের বড়ো বড়ো শহরে একাধিকবার লুটতরাজ হয়ে গেছে। শান্তিপ্রিয় লোকেরা এসব মুসিবত নিজের চোখে দেখেছেন। এসব ছিলো তাদের স্বপ্নেরও অতীত। যারা নিজেদের সামগ্রিক দায়িত্ব পালনে

পশ্চাৎপদ হয়, কোনো ফউজ তাদের ঘরবাড়ি হেফাজত করতে পারে না। আপনাদের পেরেশানির কারণ হচ্ছে, রাতের বেলা এঅভ্যাস করলে নারী ও শিশুদের তকলীফ হবে, অপর মহল্লার লোকেরা তাদের চিৎকার শুনে বিদ্রূপ করবে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে এমনি অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য তৈরী করতে চাই। আমার বন্ধু ও বোযর্গান। আপনারা জানেন না, গাফলতের সুখনিদ্রায় বেহুঁশ লোকেরা যখন হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ ও দুশমনদের কোলাহল শুনে চমকে উঠে দেখে যে এক অপ্রত্যাশিত মুসিবত তাদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে, তখন তাদের উদ্বেগ, ভয় ও বিশৃঙ্খলা চরম পর্যায়ে এসে যায়। তখন ভাই-বোনের, মা-বাপ, সন্তানের ও স্বামী-স্ত্রীর খবর রাখতে পারে না। পড়শি পড়শিকে চিনতে পারে না। অন্ধকারে তারা নিজের ছায়া দেখে এমনি করে ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে যে, তাদের পায়ের তলায় তাদেরই ভাই, বোন, বিবি, বাচ্চা, মা, বাপ পিষে যায় কিনা তারও ঠিকানা থাকে না। এমনি বিশৃঙ্খলার মধ্যে বন্দুক চালাতে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারে না তাদের লক্ষ্য দুশমন না তাদেরই সাথী। আমাদের যে সত্যি সত্যি কোনে বিপদ আসছে, একথা আমি বলছি না। কিন্তু আমি এই দায়িত্ব নিতে চাই যে, সত্যিই কোনো বিপদ এসে পড়লে মুসিবতের মুখে অসতর্ক লোকদের মতো অবস্থায় না পড়ি। [illegible] এখান থেকে চলে যাবার আগে একবার নিজ নিজ ঘাঁটি ভালো করে দেখে নেবেন। নাকারা বাজলেই তারা মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে সেখানে পৌঁছবেন।'

এক কম-বয়সী নওজোয়ান প্রশ্ন করলো ঃ জনাব, নাকারা কখন বাজনো হবে?'

মোয়াযযম আলী হেসে জওয়াব দিলেন ঃ সেকথা আমি তোমায় বলবো না।'

৪

দিনের বেলা তিনটার সময় মীর্যা হোসেন বেগের বাড়ি ও মহল্লার বিভিন্ন কোণ থেকে একই সঙ্গে নাকারা বেজে উঠলো এবং [illegible] বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ ঘাঁটির দিকে ছুটতে লাগলো। কয়েক মিনিট পর যখন নারী, শিশু ও বৃদ্ধ সবাই হোসেন বেগের মহলের দিকে যাচ্ছে, তখন শাহীমহলের রক্ষী ফউজের একজন মামুলি অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে গলির মধ্যে প্রবেশ করলো। গলীর দরজা বন্ধ দেখে সে ঘোড়া থামিয়ে চিৎকার করে বললো ঃ দরজা খোল জলদি করে!'

দরজার কাছে এক বাড়ির ছাদের উপর ছিলো [illegible] এক ঘাঁটি। এক [illegible] তাকে দেখে জওয়াব দিলো ঃ দরজা এখন খোলা যাবে না। খানিকক্ষণ

দেরি কর।'

অফিসার চিৎকার করে বললেন ঃ বে-অকুফ, আমি শাহীমহল থেকে জয়ের খোশখবর নিয়ে এসেছি। মারাঠা পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে। জলদি করে দরজা খুলে দেও।'

দেখতে দেখতে তামাম নওজোয়ানরা গলির মধ্যে এসে ভিড় করলো। তাদের মধ্যে একজন দরজা খুলতে এগিয়ে গেলে আর সবাই কেলাহল তুলে হোসেন বেগের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলো। যারা আগে থেকে হাবেলীর দিকে চলেছিলো, তারাও তাদের কোলাহলে যোগ দিয়ে এগিয়ে চললো এবং দেখতে দেখতে গলির একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিজয় ও মারাঠাদের পালায়নের খুশির আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। যারা তখনো হাবেলীর দেউড়ির বাইরে ছিলো, তারা ভিতরে না গিয়ে থেমে গেলো, আর যারা ভিতরে গিয়েছিলো, তারাও ভাবনা চিন্তা না করে বাইরে বেরিয়ে এলো। এর মধ্যে বিজয়ের শ্লোগান দিয়ে তার চারপাশে লোকের ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। গলির দরজার কাছের ঘাঁটি ছেড়ে আসা নওজোয়ানরা দরজার বাইরে কয়েকবার শ্লোগান দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। দেখতে দেখতে তারা ভিতর বাড়ির একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত বিজয়ের খবর ছড়িয়ে দিলো। তাদের সাথীরা পাঁচিলের উপরকার ঘাঁটি ছেড়ে এসে তাদের সাথে মিলিত হলো। মোয়াযযম আলী ভিতর বাড়ি থেকে তাদের কোলাহল শুনে বাইরে চলে এলেন এবং জোর গলায় চিৎকার করে বললেন, কোথায় পালাচ্ছো তোমরা? তার গলার আওয়াজ বাইরের কলরবের মধ্যে ডুবে গেলো।

এক নওজোয়ানের ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি বললেন ঃ তোমায় পাঁচিল থেকে নেমে আসবার অনুমতি কে দিয়েছে? যাও তোমার ঘাঁটিতে।'

নওজোয়ান ভয় পেয়ে আবার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে গেলো। আর সব নওজোয়ান কি করবে, স্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়েছিলো। মোয়াযযম গজবের স্বরে বললেন ঃ কি দেখছো এখানে? যাও নিজ নিজ ঘাঁটিতে।

আবার তারা ঘাঁটিতে চলে গেলো, কিন্তু তাদের সামনে পাঁচিলের উপরকার সবগুলো ঘাঁটি তখন খালি। দরজার কাছে জমা হওয়া লোকদের মিলিত আওয়াজ ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। মোয়াযযম আলী সামনে দেউড়ির দিকে ছুটে গেলেন। দেউড়ির সামনে তখন লোকের ভিড়। মোয়াযযম আলীকে দেখে এক নওজোয়ান জোর গলায় বললো ঃ আমাদের ফউজ বিজয়ী হয়েছে। মারাঠা আর এদিকে আসবে না। এ মহল্লা নিয়ে আর আপনাকে ভাবতে হবে না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ বিজয়ের খবর পেয়েই যদি তোমাদের মধ্যে এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহলে আমার আরো বেশি ভাবনার কথা। জয়ের খবর কার কাছে পেলে?'

নওজোয়ান জওয়াব দিলো ঃ আশরাফ খান শাহীমহল থেকে খবর নিয়ে এসেছে। আমরা গলির দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর সে এসে পৌঁছেছে।'

ঃ আর তোমরা অমনি দরজা খুলে দিয়েছো?'

ঃ হ্যা।'

ঃ কিন্তু আমার তো হুকুম ছিলো, দ্বিতীয়বার নাকারা না বাজালে দরজা খোলা যাবে না।'

ঃ কিন্তু সে যে বিজয়ের খবর নিয়ে এসেছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তোমাদের মতো নির্বোধ যারা, তারা কখনো কখনো অতি বড়ো বিজয়কেও পরাজয়ে রূপান্তরিত করে। ফউজী অফিসারের অধীন সিপাহীদের উপর যে এখতিয়ার থাকে, আমর যদি তা থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দিতাম।

অপর এক [illegible] বললো ঃ কিন্তু জনাব, এখন তো কোনো লোকই নিজের ঘাঁটিতে নেই। গলির তামাম পাহারাদার দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মোয়াযযম আলী লোকগুলোকে এপাশে-ওপাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। কতক নারী ও শিশুর ভিতর বা বাইরে কোনো দিকে যাবার পথ পাচ্ছে না। তারা দেউড়ির পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরে আশরাফ খানকে ঘিরে এক জনতা ভিড় করছে। সে তাদের কাছে যুদ্ধের এমন সব ঘটনা বলে যাচ্ছে সত্যের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। শাহীমহলের সিপাহী সে পর্যন্ত পৌঁছেছে কেবল এই খবরটি পৌঁছেছে যে, মারাঠারা হটে যাচ্ছে। কিন্তু সে বলছে যে, বাংলার ফউজ ময়দানে দুশমনের লাশ স্তূপীকৃত করে অবশিষ্ট লোকগুলোকে সীমান্ত পার করে দিয়েছে।

কতক মহিলা সেখানেও ভিড়ের মধ্যে আটক হয়ে পড়েছে আর শিশুরা চিৎকার করছে। মোয়াযযম আলী লোকগুলোকে ধমক দিলে তারা এক পাশে সরলো।

আশরাফ খান মোয়াযযম আলীকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে বললো ঃ জনাব আপনি বিজয়ের খবর শুনেছেন?'

ঃ তা আমি শুনেছি। আমার অনুরোধ আপনারা এখান থেকে সরে যান। কয়েকজন মহিলা দেউড়ির মধ্যে আটক হয়ে রয়েছেন।'

মোয়াযযম পেছন ফিরে ছাদের উপর হোসেন বেগের এক ভৃত্যকে এক ঘাঁটিতে বসা দেখে তাকে নাকারা বাজাতে বললেন। একজন বৃদ্ধ হেসে বললো ঃ এখন আর নাকারা বাজাবার দরকার কি? এখন তো এমনি সব লোক ছুটে বেড়াচ্ছে।'

মোয়াযযম আলী তার কথাকে আমল না দিয়ে ভিতর-বাড়ির প্রাঙ্গণের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার সামনে ছিলো নারী ও শিশুদের ভিড়। মোয়াযযম আলী তাদেরকে দেখে ফিরে এসে দরজার কাছে একটা খাটের উপরে বসলেন। খানিকক্ষণ পরে এক ভৃত্য বেরিয়ে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ মীর্যা সাহেব কোথায়?'

ঃ তিনি এখন কুতুবখানায় রয়েছেন।'

ঃ আচ্ছা, তুমি গিয়ে মহিলাদের বলে দাও, তাদের জন্য এখন রাস্তা খালি রয়েছে।'

ঃ বহুত আচ্ছা আমি জানতে এসেছি, অস্ত্রাগার থেকে যেসব বন্দুক ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তার কি হবে?'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এখন ওগুলো [illegible] কাছেই থাকবে।'

খানিকক্ষণ পরে মহল্লার ঘরে ঘরে মীর্যা হোসেন বেগ সম্পর্কে এই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিলো।

'মীর্যা হোসেন বেগকে কোনো নজুমী বলেছিলো যে, তার মহল্লে মারাঠাদের হামলা হবে।' -উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ডাকাত তার ঘরে ঢুকেছে।' -হোসেন বেগকে সাদাসিধা লোক পেয়ে মাহমুদ আলীর ছেলে তাকে বে-অকুফ বানিয়েছে।'

রাতের বেলা জয়ের খুশিতে ঘরে ঘরে চেরাগ জ্বালানো হলো। জগত শেঠের মহলে রীতিমতো আতশবাজি চললো। হোসেন বেগের মহলেও চেরাগ জ্বললো। বাজারের অলি-গলিতে আনন্দ উৎসব শুরু হলো। মোয়াযযম আলী এশার নামাজের পর বাড়ির ছাদের উপর বসে গত কয়েক দিনের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করছেন। জামাল খান বসেছে নিচে খাটের উপর। হঠাৎ গলির মধ্য থেকে এক গোলাযোগের আওয়াজ এলো মোয়াযযম আলীর কানে। তিনি উপর থেকে 'সাবের, সাবের' বলে ডাক দিলেন।

জামাল খান জওয়াব দিলো ঃ জী' সাবের এখখুনি বাইরে গেলো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখো, বাইরে কি হচ্ছে।'

জামাল খান ছুটে বাইরে গেলো। কয়েক মিনিট তারা কেউ ফিরছে না দেখে মোয়াযযম আলী নেমে গেলেন। বাইরে বেরিয়ে তিনি দেখলেন, জামাল খান ও সাবের খান ফিরে আসছে।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এত দেরি করলে কেন তোমরা?'

জামাল খান জওয়াব দিলো ঃ জী, কিছু না। মহল্লার কয়েকটা ছেলে সাবেরের সাথে লড়ছিলো। আমি গেলে ওরা পালিয়ে গেলো।

ঃ কি হয়েছিলো, সাবের?'

সাবের জওয়াব দিলো ঃ ওরা আপনাকে ঠাট্টা করছিলো। মীর্যা সাহেব সম্পর্কেও ওরা বাজে কথা বলছিলো। ওরা বলছিলো, আপনারা নাকি লোককে বে-অকুফ বানাচ্ছেন, আর মীর্যা সাহেবের সাথে কোনো নজুমী তামাশা করেছে। এসব শুনে আমি রেগে গেলাম।'

ঃ এসব কথা ওরা বলবে, আমি জানি। তোমার তো কোনো আঘাত লাগেনি?'

ঃ জী না, আমার সামান্য লেগেছে, তবে আমি ওদের দুটোকে খুব করে পিটিয়েছি।'

ঃ তুমি খুব খারাপ কাজ করেছো। বড়োদের ছোটদের সাথে লড়া উচিত নয়।'

ওরা ছোট কোথায়! একটা তো আমার চইতেও খানিকটা উঁচু।'
ঃ জবাব, ...
ঃ এখন গিয়ে আরাম করো। এরপর কেউ কিছু বললে ঝগড়া করো না।'

তিন

পরদিন। আসমানে মেঘ জমে আসছে। মোয়াযযম আলী ভোরবেলার নাশতা শেষ করে একটা বই পড়তে লেগে গেলেন। দশটার কাছাকাছি হোসেন বেগের এক ভৃত্য এসে খবর দিলো, মীর্যা সাহেব তাকে স্মরণ করেছেন।

মোয়াযযম আলী মহলে ঢুকে দেখলেন, হোসেন বেগ দেওয়ানখানার বারান্দায় বসে রয়েছেন। তিনি মোয়াযযম আলীকে দেখে বললেন ঃ এসো বেটা, এখনই আমি নাজিম ও মুর্শিদাবাদের ফউজদারের সাথে দেখা করে ফিরেছি। বিজয়ের খবর সত্যি। আমাদের সেনাবাহিনী আবার কাটোয়া দখল করে নিয়েছে। মারাঠারা শহর ছেড়ে যাবার আগে কাটোয়া ও আশেপাশের বস্তিগুলোয় জমা করা তামাম খোরাক ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষ এখন ক্ষুধায় মরছে এবং ফউজের রসদও শেষ হয়ে গেছে। আজ মুর্শিদাবাদ থেকে তরিতরকারি পাঠানো হচ্ছে। মারাঠারা প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হবার পর কাটোয়া থেকে কয়েক মাইল দূরে সরে গিয়েছে, কিন্তু এখনো সঠিক বলা যাচ্ছে না, ফিরে চলে যাবে, না লড়াইয়ের আর কোনো ক্ষেত্র খুঁজে নেবে। যা হোকে আল্লাহর শোকর, মুর্শিদাবাদের আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। মহল্লার লোকদের কার্যকলাপে তোমার পেরেশান হওয়া ঠিক হবে না। আমি জানি, তারা ঘরে বসে আমাদেরকে বিদ্রূপ করছে, কিন্তু আমাদের কর্তব্য আমরা করছি। যে যা বলে, বলুক, তার জন্য আমার কোনো পরওয়া নেই। ফউজ ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। বর্ষাকালের পর বাইরের পাঁচিল মেরামত করা হবে, আর ভিতরের পাঁচিল ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। এর সবকিছুই তোমার মর্জি মোতাবেক করা হবে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচাজান, আমি মানুষের কার্যকলাপে পেরেশান হয়েছি। আমার মনে মুর্শিদাবাদের বিপদের আশঙ্কা মোটেই কমেনি। কাটোয়া থেকে পালাবার পর মারাঠারা হয়তো ভাবছে, বাংলার কোন শহর সহজে দখল করা যায়, যেখান থেকে সব চাইতে বেশি করে লুটের মাল পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, ওদের পরবর্তী লক্ষ্য হবে মেদিনীপুর অথবা কটক, অথবা তারা হয়তো মুর্শিদাবাদের দিকেই এগিয়ে আসবে। তাদের পক্ষে মুর্শিদাবাদে আসা অনেকটা অসুবিধাজনক। কিন্তু অপর কোনো শহরের তুলনায় মুর্শিদাবাদের সম্পদ বিবেচনা করলে তারা হয়তো সে অসুবিধার জন্য পরওয়া করবে না।

হোসেন বেগ বললেন ঃ মুর্শিদাবাদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ততোটা দুর্বল নয়। যদিও এখানে ফউজ যথেষ্ট নেই, তথাপি এতটা কমও নেই যে, আমরা বাইরের হামলাদারদের দু'একদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। তাছাড়া আলীবর্দী খান এতটা নির্বোধ নন যে, মুর্শিদাবাদের বিপদ দেখেও তিনি কাটোয়ায় বসে থাকবেন। মারাঠা ফউজ এদিকে রওয়ানা হলে আলীবর্দী খান মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে এখানে পৌঁছে যাবেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এই ব্যাপারের জন্যই তো আমি ভয় করছি। মুর্শিদাবাদের দিকে রওয়ানা হওয়ায় দুশমনদের আর কোনো ফায়দা যদি নাও থাকে, তথাপি আলীবর্দী খানের মনোযোগ অপরদিকে সরিয়ে নেবার জন্যও তাঁরা সৈন্যদের কয়েকটি দল মুর্শিদাবাদের দিকে পাঠাতে পারে। দারুল হুকুমাতের বিপদ দেখলে আলীবর্দী খান এক মুহূর্তের জন্যও কাটোয়ায় থাকতে চাইবেন না। তিনি এখানে পৌঁছলে মারাঠাদের নিঃসন্দেহে এখান থেকে সরে যেতে হবে, কিন্তু বাকি মারাঠা ফউজ তখন অনায়াসে মেদিনীপুর দখল করে নেবে এবং তারপর বর্ধমানের পুরো এলাকাটি বিপদের সম্মুখীন হবে।'

হোসেন বেগ চিন্তান্বিত হয়ে বললেন ঃ তা হলে আলীবর্দী খানের কি করা উচিত? তোমার ধারণা, মারাঠাদের কোনো লশকর মুর্শিদাবাদে পৌঁছে গেলেও তাদের পিছু পিছু আসা তার ঠিক হবে না, এই তো?

ঃ না, চাচাজান, আমার মনে হয়, আলীবর্দী খানের সেনাপতিরা তাকে সঠিক পরামর্শ দিলে এই বিজয়ের পর মারাঠাদের আর কোনো নতুন ক্ষেত্রের খোঁজ করবার সুবিধা দেওয়া ঠিক হবে না। আমার ধারণা, এখন কয়েকদিন মারাঠাদের উপর কঠিন আঘাত হানা যেতে পারে।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ আচ্ছা বলো তো, তুমি আলীবর্দী খানের জায়গায় থাকলে কি করতে?'

মোয়াযযম আলী মৃদু হেসে খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন ঃ আমি তার জায়গায় থাকলেএই বিজয়ের পর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে মারাঠা ফউজের অনুসরণ করে তাদেরকে বিতাড়ন করবার কার্য অব্যাহত রাখতাম। কাটোয়ায় তাঁবু ফেলে মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য শহর থেকে রসদের জন্য অপেক্ষা না করে ভুখা সিপাহীদেরকে বলতাম যে, আমাদের রসদের ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু মারাঠাদের আমাদের এলাকায় লুটপাট করে যেসব তরিতরকারি জমা করেছে, তা আমরা ছিনিয়ে নিতে পারি। সে ক্ষেত্রে মারাঠাদের কাছে জান বাঁচানোর প্রশ্নই বড়ো হয়ে উঠতো। মারাঠা কোনো সুশৃঙ্খল ফউজ নয়, তারা বর্গী ডাকাত মাত্র। তাদের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তারা বরাবরই এক ক্ষেত্রে পরাজয়বরণ করে জওয়াবী হামলার জন্য নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বেড়ায়, আর যদি সত্যি সত্যি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমান হয়, তা হলে প্রস্তুতির সুযোগ পাবার জন্য তারা শান্তি আলোচনায়

প্রবৃত্ত হয়। এই হচ্ছে তাদের উপর আঘাত হানবার সময়। আমার ভয় হয়, হয়তো কাটোয়ায় এখন বিজয় উৎসব পালন করা হচ্ছে, ইনাম ও খেলাত বিতরণ করা হচ্ছে। আর কয়েক মাইল দূরে মারাঠা বাহিনী তাঁবু ফেলে কোনো নতুন ক্ষেত্রে হামলার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আবার আমাদের রসদ পৌছবে। সিপাহী ও অফিসাররা আবার কিছুদিন খুশিতে কাটাবেন। তারপর চলবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। হয়তো পণ্ডিত ভাস্কর ইতিমধ্যেই শান্তি আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। এ আলোচনা যখনই খতম হোক, আলীবর্দী খান খবর পাবেন যে, মারাঠা ফউজের একটি অংশ কাটোয়া থেকে পঞ্চাশ বা একশ ক্রোশ দূরে লুটপাট শুরু করেছে। আলীবর্দী খানের রণকুশলতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু শাসক হিসাবে তার নীতিকে আমি ভয় করি। আমি তার জায়গায় থাকলে আজ বাংলার ফউজ কাটোয়া থেকে বহু দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো মারাঠা বাহিনীকে। তাদের রসদ, তাদের বারুদের সঞ্চিত ভাণ্ডার, তাদের তোপ সব কিছু আমাদের হাতে আসতো। পণ্ডিত ভাস্কর যদি শান্তি আলোচনার জন্য দূত পাঠাতেন, তা হলে আমি তাকে জওয়াব দিতাম যে, এ আলোচনা কেবল বাংলার সীমান্তের বাইরেই হতে পারবে।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ কিন্তু মীর মদন আলীবর্দী খানের সঙ্গে রয়েছেন। তুমি তো হামেশাই বলে থাক যে, তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ সিপাহী।'

মোয়াযযম আলী জওয়াবে বললেন ঃ তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের ফউজের অধিনায়কদের মধ্যে সবচাইতে দূরদর্শী, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানের বাইরে আলীবর্দী খানের কাছে এই ধরনের লোকদের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। দরবারে তিনি মীর জাফর ও দুর্লভরামের মতো খোশামুদে ও 'জী-হুজুর'-দের কথায়ই বেশি আমল দিয়ে থাকেন।'

হোসেন বেগ আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ মোয়াযযম, আজ ভোরে কতকলোক বন্দুক ফেরত দিতে এসেছিলো, কিন্তু আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি যে, ফউজ ফিরে না আসা পর্যন্ত ওগুলো তাদের কাছে থাকবে। তোমারও মত তা-ই, না?

ঃ জী, হ্যাঁ।'

ঃ কিন্তু এখন তোমার স্বেচ্ছাসেবক হয়তো প্যারেডের জন্য আসতে চাইবে না।'

ঃ প্যারেডের এখন প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁরা পেয়ে গেছে। এখন রাতের বেলা মহল্লায় পাহারা দেওয়া দরকার। জয়ের খবর শোনার পর এই ধরনের কথা শুনতে লোকের ততোটা ভালো লাগবে না, কিন্তু দু'চারদিন পর আবার তারা মনোযোগের সাথে আমার কথা শুনবে।'

৫

সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি হচ্ছিলো। মুর্শিদাবাদের কায়েম মোকাম ফউজদারের বাড়িতে শহরে রইস ব্যক্তিদের ও সহকারী কর্মচারীদের দাওয়াত। এক প্রশস্ত কামরায় মেহমানরা যখন দস্তরখানে বসেছেন, তখন এক ব্যক্তি ফউজদারকে মীর্যা হোসেন বেগের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

ফউজদার জওয়াব দিলেন ঃ তার খবর পেয়েছি। তার তবিয়ত ভালো নেই।'

এক ব্যক্তি বললেন ঃ জনাব, মীর্যা সাহেব আজকাল এমনিতেই হাবেলীর বাইরে আসেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ ভাই, ঘরে যখন কাজ থাকে, তখন বাইরে আসার দরকার কি? মীর্যা সাহেব আজকাল খুবই ব্যস্ত। তার হাবেলীর ভিতর ঢুকে দেখলেণ আপনারা হয়রান হবেন।'

অপর এক ব্যক্তি ফউজদারকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ জনাব, আপনি যদি মীর্যা সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন যে, এখন আর মুর্শিদাবাদের কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই তশরিফ আনতেন।'

ফউজদার কোনো জওয়াব দিলেন না। কিন্তু তার মেহমানরা মীর্যা সাহেব সম্পর্কে যার যেমন খুশি, মন্তব্য করতে লাগলেন।

শহরের এক ব্যবসায়ী বললেন ঃ আমি শুনেছি, তিনি রাতেরবেলা নাকি মহল্লার লোককে ঘুমুতে দেন না।'

মুর্শিদাবাদের কোতওয়াল বললেন ঃ মীর্যা সাহেব এক সাদাসিধা বোযর্গ মানুষ, কিন্তু মহল্লার এক নওজোয়ান তাকে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকদিন আগে তার মহল্লার পথ দিয়ে আসতে দেখলাম, বাঁশভর্তি গাড়ি তার হাবেলীর ভিতর ঢুকছে। একটি লোকের কাছ থেকে জানলাম, ভিতরে মীর্যা সাহেব ঘাঁটি তৈরী করাচ্ছেন।'

ঃ বাঁশের ঘাঁটি? এক আমীরজাদা বললেন ঃ আপনার সাথে কেউ ঠাট্টা করেনি তো?'

ঃ জী না, মীর্যা সাহেবের হাবেলী দেখলে আপনি হয়রান হবেন।'

খানিকক্ষণ পর হোসেন বেগই বৈঠকের আলোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেন। ফউজদার প্রশান্ত প্রকৃতির লোক, এ আলোচনা তার ভালো লাগলো না। তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ সব শুনে বললেন ঃ মীর্যা সাহেব আমাদের মুরুব্বী,

তাকে নিয়ে এ ধরনের তর্কবিতর্ক করা আমাদের উচিত হবে না।'

এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বললেন ঃ জনাব, মীর্যা সাহেবকে আমরা সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখি, কিন্তু বাঁশ দিয়ে ঘাঁটি তৈরির ব্যাপারটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বাঁশ দিয়ে কি গুলি ফিরানো যাবে?'

ফউজদার জওয়াব দিলেন ঃ বাঁশগুলি ফিরাতে পারে না সত্যি, কিন্তু গুলি যারা চালাবে, তাদের অগ্রগতি ফিরাতে পারে। আমি নিজে মীর্যা সাহেবের মহল্লীর আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দেখেছি, কিন্তু বিদ্রুপ করার মতো কিছু আমার নজরে আসেনি। তাদের মহল্লা শহরের বাইরে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিপদের সময়ে ওখানকার লোক শহরের তুলনায় কম নিরাপদ থাকবে না।'

একজন ভৃত্য দ্রুতগতিতে ফউজদারের কাছে এসে তাঁর কানের কাছে কি যেনো বলে গেলো।

ফউজদার দস্তরখান থেকে উঠতে উঠতে মেহমানদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আপনার ধীরস্থির হয়ে খেতে থাকুন। আমি এখখনি আসছি।'

ফউজদার কামরা থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণে এক ফউজী অফিসারকে দাঁড়ানো দেখলেন। ফউজী অফিসার সালাম করে বললেন ঃ মাফ করবেন, জনাব! এই অসময়ে আপনাকে তকলিফ দিচ্ছি। কিন্তু খবর খুবই উদ্বেগজনক। মারাঠাদের এক ফউজ মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসছে।'

ফউজদার উদ্বেগ সংযত করে বললেন ঃ এ খবর কে এনেছে?'

ঃ এইমাত্র রাস্তার এক চৌকির অধিনায়ক এখানে এসেছে। সে বলেছে যে, পেছনের চৌকির সিপাহীরা ডাক-ঘোড়ায় তাঁর কাছে খবর এনেছে। আমি খাঁটি খবর জানবার জন্য ইতিমধ্যে একদল সিপাহী পাঠিয়েছি।'

ঃ সংবাদবাহক কোথায়?'

ঃ জী, আমি তাকে মহল্লার নাজিমের কাছে রেখে এসেছি। বেচারা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অবিরাম সফর করেছে এবং পথে কয়েকবার ঘোড়া বদল করেছে। সে যখন নিজের চৌকি থেকে রওয়ানা হয়েছে তখন নাকি মারাঠা ফউজ মাত্র এক মনজিল দূরে ছিলো। এখন হয়তো তারা এখান থেকে দুতিন মনজিল দূরে হবে।'

ঃ আচ্ছা, আমি এখখনি আসছি। তুমি গিয়ে শহরে খবর প্রচার করে দাও।

অফিসার তাকে সালাম করে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেলেন। ফউজদার মেহমানদের কামরায় ফিরে গেলেন।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ কি ব্যাপার, জনাব?'

ফউজদার দস্তরখানে বসতে বসতে বললেন ঃ কিছু না এমন। একটা সরকারি কাজ। আপনারা ধীরস্থির হয়ে খেয়ে নিন।'

মেহমানরা খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেবার পরিবর্তে ফউজদারের মুখের উপর উদ্বেগের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করতে লাগলেন। খানা শেষ হবার সাথে সাথে ফউজদার উঠে বললেন ঃ আমার একটু কাজ আছে, তাই আমি আপনাদের কাছে এজাযত চাচ্ছি। কিন্তু আপনারা ঠাণ্ডা হয়ে আলাপ করুন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।'

এক আমীরজাদা প্রশ্ন করলেন ঃ এ বৃষ্টির মধ্যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ফউজদার বললেনঃ সিপাহীর বৃষ্টির ভিতরে চলবার অভ্যাস থাকে। আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি যে, মারাঠা লশকর মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসছে।'

মজলিসের মধ্যে একটা শূন্যতার ভাব ছেয়ে গেলো। উপস্থিত ব্যক্তিরা চঞ্চল হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

ফউজদার বললেন ঃ কিন্তু পেরেশানির কোনো কারণ নেই। এখনো তাঁরা এখান থেকে কয়েক মনজিল দূরে। তারা যথেষ্ট চেষ্টা করলেও কাল ভোর অথবা দুপুরের আগে এখানে পৌঁছতে পারবে না।'

ফউজদার বাইরে চলে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে মাননীয় মেহমানদের মধ্যে এমন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো যে; তাদের পক্ষে নিজ নিজ জুতা নেওয়াই মুশকিল হয়ে পড়লো। কেউ তখন অপরের জুতা পরবার চেষ্টা করছিলো, কেউ বা মানসিক উদ্বেগের ফলে ডান পায়ের জুতা বাম পায়ে আর বাম পায়ের জুতা ডান পায়ে লাগাচ্ছিলেন। তারপর বাড়ি থেকে বেরুবার পর বহু বছরের মধ্যে প্রথমবার তারা সবাই ছুটে পালাবার অভ্যাস করছিলেন।

৪

কিছু সময় পরে মুর্শিদাবাদের প্রত্যেক গলি-কুচিতে মারাঠাদের এগিয়ে আসার খবর রটে গেলো। মীর্যা হোসেন বেগের মহল্লার নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক সবাই মিলে মুষলধার বৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার হাবেলীর দিকে রওয়ানা হলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার বসত-বাড়ির নিচতলায় এবং দেওয়ানখানার কামরা ও বারান্দায় তিল ধারণের জায়গা থাকলো না। বহুলোক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য ভিতরের চারদেওয়ালের বাইরে খড়ের গুদামে, খাদ্যদের কুঠরিতে ও ঘোড়ার আস্তাবলে আশ্রয় নিচ্ছেলো।

মোয়াযযম আলী মহল্লার গলির মুখ দেখে ও পাহারাদারদের জরুরি উপদেশ দিয়ে পানি-কাদায় লটপট হয়ে হাবেলীর মধ্যে ঢুকলেন। দেউড়ির ভিতরে দুটি মশাল জ্বলছিলো এবং হোসেন বেগ কয়েকজন লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

মোয়াযযম আলী হোসেন বেগকে প্রশ্ন করলেন ঃ ফউজদারদের কাছ থেকে কোনো জওয়াব পাওয়া গেছে?'

ঃ হ্যাঁ, তিনি জানিয়েছেন, ভোর হবার আগে মুর্শিদাবাদের উপর কোনো হামলার ভয় নেই। আর যদি কোনো বিপদ এসেই পড়ে, তা হলে তোপ চালিয়ে শহরের লোককে খবরদার করা হবে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, মারাঠা সৈন্যদলের নেতৃত্ব করছেন মীর হাবিব।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনি ভিতরে গিয়ে আরাম করুন। তামাম গলির মুখ আমি দেখে এসেছি। আমাদের ব্যবস্থা বেশ নির্ভরযোগ্য হয়েছে।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ আজ রাতে যে লোক এই বাড়ির চারদেওয়ালের মধ্যে আরাম করতে পারবে, সে রোজ হাশরেও আরামের ঘুম ঘুমুতে পারবে। একবার ভিতরে গিয়ে দেখো, মানুষ এত চিৎকার করতে পারে, তা তোমার বিশ্বাস হবে না। আমার মনে হয়, তামাম দুনিয়ার হাংগামা এসে আমার বাড়িতে জমা হয়েছে। প্রত্যেকটি লোক নিজের গোটা পরিবার একই কামরায় ঢুকাবার চেষ্টা করছে। আমি পুরুষদের থেকে মেয়েদেরকে আলাদা করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে অপর দরজা দিয়ে ঢুকছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচাজান, আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আধঘণ্টা পর কারুর আওয়াজ আপনি শুনতে পাবেন না। আসুন আমার সাথে।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ না, আমি আধঘন্টার জন্য ভিতরে যাওয়ার চাইতে সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ মনে করি। আমার ভয় হয়, ভিতরে গিয়ে আমি কারুর গলা টিপে না ধরি।

মোয়াযযম আলী দেউড়ির কাছে হাজির [illegible]র দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ দরজা বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমার সাথে এসো।'

[illegible] তার হুকুম তামিল করলো। মোয়াযযম আলী মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে ভিতরের প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গেলেন। হোসেন বেগ কি করবেন ভেবে না পাবার মতো অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ছুটে তাদের সাথে সাথে চললেন। বসতবাড়ির বারান্দা ও কামরাগুলোর মধ্যে যেনো রোজ হাশরের তুফান বয়ে যাচ্ছে। হোসেন বেগের ভৃত্যেরা এখানে সেখানে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মোয়াযযম আলী বারান্দায় উঠে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ঃ চুপ কর, সবাই চুপ কর।'

বারান্দায় তাঁর আশেপাশের কতকগুলো চুপ করলো বটে, কিন্তু বাড়ির বাকি অংশে চিৎকাররত মানুষের ভিড় ভেদ করে তার আওয়াজ ভিতরে প্রবেশ করলো না।

মোয়াযযম আলী হোসেন বেগকে বললেন ঃ আপনি উপরে গিয়ে দেখুন, উপরতলায় জায়গা থাকলে মহিলা ও বাচ্চাদের ওখানে পাঠানো যাবে।'

হোসেন বেগ জওয়াব দিলেন ঃ উপরতলায় মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য প্রচুর জায়গা আছে, কিন্তু পুরুষদের বদতমিযীর জন্যই আমি সিঁড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে রেখেছি। তারা মহিলা ও বাচ্চাদের আগেই ওখানে যেতে চাচ্ছে।'

ঃ আপনি তালা খুলে দিন। আমি ওদেরকে বুঝিয়ে দেবো।'

ঃ আগে তুমি ওদের সাথে বোঝাপড়া করে নেও, নইলে দরজা খোলা পেলেই ওরা ভেড়ার দলের মতো উপরে ছুটবে। আল্লাহর দিকে তাকিয়ে ওদেরকে চুপ থাকতে বল, নইলে সত্যি সত্যি কারুর মাথা ঠুকে দেবো।'

ঃ এখনই ওরা চুপ করবে।'

মোয়াযযম আলী এক [illegible] হাত থেকে বন্দুক নিয়ে প্রাঙ্গণের দিকে মুখ করে হাওয়ায় এক গুলি ছুঁড়লেন।

মুহূর্তে মধ্যে বাড়ির আনাচে কানাচে যেনো একটা বিরাট শূন্যতা ছেয়ে গেলো। মোয়াযযম আলী লোকগুলোর এই ভয়ের সুযোগ নিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ ভাই বোনেরা! এখনো দুশমন কয়েক মাইল দূরে। ভোর হবার আগে মুর্শিদাবাদের

উপর কোনো হামলার ভয় নেই। আমার ভয় হয় যে, তোমাদের মধ্যে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে এই চিৎকার ও গোলযোগ তোমাদের মুহাফিজদের কাছে দুশমনের গুলির চাইতেও বেশি বিপজ্জনক হবে। আমি তোমাদের কয়েকটি জরুরি নির্দেশ দিচ্ছি, আর সাথে সাথে একথাও বলে দিচ্ছি যে, কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করলে তার হেফাজতের দায়িত্ব আমরা নেবো না। তাকে আমরা হাবেলী থেকে বাইরে বের করে দেবো। যে পুরুষের বয়স পঞ্চাশ বছরের কম, তাদেরকে এখখুনি বেরিয়ে আসতে হবে। বাইরের প্রাঙ্গণের সংলগ্ন কুঠরিগুলোয় তাদের জায়গা দেওয়া হবে। যেসব মহিলার সাথে ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে তাঁরা উপরতলার কামরাগুলোতে চলে যান। একটু বড়ো ছেলেরা, বুড়ো ও রোগীরা দেওয়ানখানার কামরাগুলোতে ও বারান্দায় জায়গা নিতে পারেন। যেসব মহিলাদের উপরতলায় জায়গা না মেলে, তার নিচতলার কামরাগুলোতে থাকবেন।

'হামলার সময়ে যারা লড়াই করবার যোগ্য এবং যাদের কাছে হাতিয়ার রয়েছে, তারা [illegible] সাথে যোগ দিন এবং বাকি লোক এখানে আসুন। বৃষ্টি থেমে গেলে তারা ভিতরের প্রাঙ্গণের ঘাঁটিগুলোতে আশ্রয় নিতে পারবেন। নইলে বারান্দা ও নিচুতলার কামরাগুলোয় তাদের যথেষ্ট জায়গা হবে। দশ মিনিট পর আমি এই বাড়ির সবগুলো কামরা ঘুরে দেখবো। কেউ ইচ্ছা করে আমার নির্দেশ অমান্য করেছে দেখা গেলে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা যাবে না। আধঘন্টা পর মশাল নিভিয়ে দেওয়া হবে। আপনাদের আমি আর একবার আশ্বাস দিচ্ছি যে, ভোরের পর মশাল নিভিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা নেই। আপনারা নিজ নিজ জায়গায় আরামে শুয়ে থাকুন। এখন আমাদের পুরো মনোযোগ দিতে হবে এই হাবেলীর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার দিকে। আশা করি, আপনারা অকারণ আমাদের পেরেশান করবেন না।'

প্রায় পৌনে এক ঘন্টার মধ্যে হাবেলীর সর্বত্র পূর্ণ শান্তি ফিরে এলো। মোয়াযযম আলী তখন হোসেন বিনবেক বললেন ঃ চাচাজান, আপনি এখন উপরে নিজের কামরায় গিয়ে আরাম করুন।'

হোসেন বেগ জওয়াব দিলেন ঃ বেটা, আমি কেবল এই কোলাহলের জন্য ঘাবড়ে উঠেছিলাম। এখন আমার আরামের প্রয়োজন নেই। [illegible] সাথে আমি বাইরের পাচিলের উপর পাহারা দেবো।'

পরদিন দশটা বাজবার আগেই মীর হাবীবের নেতৃত্বে মারাঠা লশকর মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে লুটতরাজ শুরু করলো। হামলাদার ফউজের একটি দল হোসেন বেগের মহল্লায় ঢুকবার চেষ্টা করলো, কিন্তু গলির ঘাঁটি থেকে গুলি বর্ষণের ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। অল্প সময়ের মধ্যে আরো কয়েকটি দল পৌঁছে এক গলির আশেপাশে কয়েকটি বাড়ির ছাদ দখল করে [illegible] পিছু হটিয়ে দিয়ে মহল্লার ভিতরে প্রবেশ করলো। মহল্লার গলি ও বাড়িগুলি খালি দেখে তারা হোসেন বেগের হাবেলীর দিকে এগিয়ে এসে দেউড়ীর উপর হামলা করলো। অকস্মাৎ দেউড়ির ছাদ ও পাঁচিলের ঘাঁটি থেকে গুলীবর্ষণ হতে লাগলো এবং তারা গলির মধ্যে কয়েকটি লাশ ফেলে আশেপাশের বাড়িগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। ইতিমধ্যে আর একটি মারাঠা দল অপরদিক থেকে পাঁচিলের একটি অংশ দখল করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু হাবেলীর মুহাফিজ [illegible]রা তাদের পিছু হটিয়ে দিলো।

প্রায় দেড় ঘণ্টা তারা আশেপাশের বাড়িগুলোর ছাদের উপর শুয়ে গুলি চালাতে থাকলো। ইতিমধ্যে তাদের আরো কতক সাথী এসে গলির মধ্যে জমা হয়ে গেছে। মারাঠারা অকস্মাৎ পূর্বদিককার একটি দ্বিতল বাড়ির ছাদ থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। সেদিককার পাঁচিলের মুহাফিজরা তাদের গুলির সীমানার মধ্যে পড়েছিলো। তাই কয়েকজন [illegible] আহত হলো ও বাকি লোকগুলো দ্রুতগতিতে গুলি থেকে বাঁচবার জন্য নিজ নিজ ঘাঁটির মধ্যে আত্মগোপন করলো। মারাঠাদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে হঠাৎ গলি ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচিলের সেই দিকে এগিয়ে এলো। তাদের কতক লোক পাঁচিলের সাথে বাঁশের সিঁড়ি লাগালো। দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চাশজন সৈনিক পাঁচিলের উপর উঠে এলো। পাঁচিলের মুহাফিজরা আশপাশের ঘাঁটি থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো কিন্তু মারাঠাদের বর্ধিত সংখ্যার সামনে তারা এগুতে পারলো না। কয়েক মিনিট সামনাসামনি লড়াই করে মারাঠা পাঁচিলের পশ্চিমদিক দখল করে বসলো। প্রাঙ্গণে জমা হয়ে তাদেরকে নিচে নামতে বাধা দিতে চেষ্টা করলো মুহাফিজরা।

মোয়াযযম আলী দেউড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন হঠাৎ তিনি এক রেজাকারকে বললেন ঃ পিছু হটবার জন্য নাকারা বাজাও।'

রেজাকার তাঁর হুকুম তামিল করলো। বাইরের পাঁচিলের মুহাফিজ নাকারার আওয়াজ শুনেই নিজ নিজ ঘাঁটি ছেড়ে ভিতরবাড়ির প্রাঙ্গণের দরজার দিকে ছুটতে লাগলো। পূর্বদিকের দেওয়ালের নিচে লড়াইরত রেজাকারদের পিছু হটতে দেখে মারাঠা সিপাহীরা তাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলো। মোয়াযযম আলী দ্রুতগতিতে নিচে নেমে এসে আট-দশজন নওজোয়ানকে সাথে নিয়ে মারাঠাদের উপর আক্রমণ চালালেন। হামলার তীব্রতায় মারাঠাদের কয়েক পা পিছু হটতে বাধ্য হলো। ইতিমধ্যে রেজাকাররা সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে গেলো।

মারাঠারা তাদের বিজয় নিশ্চিত মনে করে কয়েকটি লোকের জান বাঁচানোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে সামনে এগিয়ে খুলে দিলো দেউড়ির দরজা। প্রায় আটশ মারাঠা বন্যাস্রোতের মতো বাইরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই হাবেলীর ভিতর ও বাইরের চার দেয়ালের মাঝখানকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ থেকে মুহাফিজরা সরে গিয়েছে। মারাঠা লশকরদের এক সরদার চিৎকার করে বললো ঃ বাহাদুর সিপাহীরা! আমাদের সময় কম পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে যাও।'

সিপাহীরা ভাবনা চিন্তা না করে তার হুকুম তামিল করলো। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে সাথীদের খন্দকে পড়তে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ এতো বাড়ি নয় কেল্লা, আমরা অনর্থক এতগুলো জীবন নষ্ট করলাম। এবার দরজার দিক এগিয়ে চলো?

ভিতর বাড়ির প্রাঙ্গণের দরজা মারাঠা সৈনিকদের এক ধাক্কায় ভেঙে পড়লো। অমনি তারা বিজয়ের আওয়াজ তুললো এবং মেলার ভিড়ের মতো ভিতরে ঢুকতে শুরু করলো। ভিতর-বাড়ির দরজা ও বসতবাড়ির মধ্যবর্তী প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটি অর্ধবৃত্তাকার পরিখার দুই প্রান্ত খন্দকের সাথে মিশে গেছে। পরিখার মধ্যে ষাটজন রেজাকার তরুণ সালারের হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। পরিখার পিছে দুটি ছোট ছোট তাঁবুর মধ্যে দুটি তোপ পাতা রয়েছে। তাদের মুখ দরজার দিকে।

হামলাদারদের সরদার পরিখা থেকে কয়েক পা দূরে দু'হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো ঃ থামো! অমনি মারাঠাদের ভিড় সেখানে থেমে গেলো।

মারাঠা সরদার খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলো ঃ এখন আর লড়ে লাভ নেই। যদি জান চাও, হাতিয়ার ত্যাগ করে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসো, নইলে একটি লোককেও আমরা জীবিত ছেড়ে দেবো না। আমরা জানি, মহল্লার সব লোক এই মহলে জমা হয়েছে। যদি তোমরা নারীর ইজ্জত, বাচ্চাদের জান বাঁচাতে চাও, তাহলে হাতিয়ার সমর্পণ করো, নইলে .....

সালার তার মুখের কথা শেষ করতে পারলো না। বাড়ির ছাদ থেকে বন্দুকের

গুলি এসে লাগতেই সে নিচের দিকে মুখ করে পড়ে গেলো। সাথে সাথে প্রাঙ্গণ, বারান্দা, বাড়ির ছাদ ও কুঠরির সবগুলো ঘাঁটি থেকে ক্রমাগত গুলীবৃষ্টি শুরু হলো। মারাঠারা আক্রোশের বশে খানিকটা এগিয়ে এলো, কিন্তু পরক্ষণেই পিছু হটে দরজার দিকে ছুটতে লাগলো। সহসা তোপের ভয়াবহ আওয়াজ শোনা গেলো এবং লোহার বেশুমার টুকরা ছুটে গিয়ে দরজা থেকে কয়েক গজ দূর পর্যন্ত লাশের স্তূপ বানিয়ে ফেললো।

এরপর হামলাদার বাহিনী একটা ভাঙা দরজাকে হাজার বন্দুক ও পরিখার চাইতে বেশি ভয়ঙ্কর মনে করে মাঝখানকার পাঁচিলের আড়ালে গা ঢাকা দিতে লাগলো। তখন তাদের শতাধিক লোক হতাহত হয়েছে। আরো প্রায় দু'ঘন্টা অতীত হয়ে গেলো, তখনো মুহাফিজরা জানে না, তারা কি করছে। এরপর ভাঙা দরজার কাছে পাঁচিলের পেছন থেকে সাদা ঝাণ্ডা দেখা গেলো এবং এক ব্যক্তি বুলন্দ আওয়াজে বললো ঃ আমরা শান্তি আলোচনার জন্য একটি লোক ভিতরে পাঠাতে চাই।'

খানিকক্ষণ ভিতর থেকে কোনো জওয়াব না পেয়ে আবার এক ব্যক্তি বললো ঃ আমরা জানতে চাই শান্তি আলোচনার জন্য আমাদের একটি লোক ভিতরে যেতে পারে কি না?

মোয়াযযম আলী প্রাঙ্গণের ঘাঁটি থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন এবং জওয়াবে বললেন ঃ তোমরা একটি লোককে ভিতরে পাঠাতে পারো।'

মারাঠা ফউজের এক অফিসার সাদা ঝাণ্ডা হাতে দরজার সামনে এসে হাযির হলো। রাস্তায় পড়ে থাকা লাশগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে সে এগিয়ে এলো। মোয়াযযম আলীর কাছ থেকে কয়েক পা দূরে থেমে সে বললো ঃ আমরা তোমাদের এ প্রস্তুতির খবর জানতাম না। নিজেদের ত্রুটির জন্যই আমাদের এতটা ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তোমাদের একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, এতটা ক্ষতি স্বীকার করেও খালি হাতে আমরা ফিরে যাবো।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমাদের এর বেশি কিছু বলবার ইচ্ছা নেই যে, তোমরা কেউ আর ফিরে যাবে না।'

মারাঠা অফিসার বললো ঃ আমি এই হাবেলীর মালিকের সাথে কথা বলতে চাই।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ হাবেলীর মালিক ডাকাতের সাথে আলাপ করতে অভ্যস্ত নন। কি বলতে চাও তুমি?'

ঃ আমি বলতে চাই, এক লাখ টাকার বদলে তোমরা নিজেদের জান বাঁচাতে পারো।

ঃ তুমি আমাদের জানের মূল্য খুবই কম ধরেছো। আমাদের কাছে টাকা নেই, আছে শুধু গুলি।'

ঃ বেশ ভালো করে চিন্তা করে কথা বলো।'

ঃ তুমি যেতে পার এখন।'

মারাঠা অফিসার খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললো ঃ তোমরা আমাদের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা করছো। আমাদের লশকর শহরের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ব্যস্ত রয়েছে। দরকার হলে তাদেরকে এখানে আনা যাবে।'

ঃ এ জায়গা তোমাদের তামাম লাশ সামলে নেবার মতো যথেষ্ট প্রশস্ত। তুমি হয়তো জানো না, আমাদের ফউজও তোমাদের পিছু পিছু আসছে।'

ঃ তা' আমরা জানি, কিন্তু তারা যখন ফিরে আসবে, তখন তাদের একমাত্র কাজ থাকবে তোমাদের কবর খোদাই করা। আমরা তোমাদেরকে শেষবারের মতো চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছি। এরপর তোমরা মুর্শিদাবাদের তামাম ধনভান্ডার আমাদের পায়ে ঢেলে দেবে, তথাপি তোমাদের একটি কথাও শোনা হবে না।'

ঃ তোমরা এক লাখ টাকা দাবি করছো, কিন্তু তোমাদের জন্য আমাদের গুলি ছাড়া আর কিছু নেই। তুমি চলে যেতে পারো, আমরা তোমাদের হামলার জন্য প্রতীক্ষা করছি।'

ঃ আচ্ছা, তোমাদেরকে বেশি সময় প্রতীক্ষা করতে হবে না।'

এই বলে মারাঠা অফিসার ফিরে সাদা ঝাণ্ডা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দ্রুতগতিতে চলে গেলো।

খানিকক্ষণ পর মারাঠারা আশেপাশের কয়েকটি উঁচু বাড়ির ছাদের উপর থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। জওয়াবে মোয়াযযম আলীর সাথীরা বসতবাড়ির ছাদের উপর থেকে গুলিবর্ষণ করতে লাগলো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই বন্দুকের লড়াই চললো। তারপর মারাঠাদের দিক থেকে গুলিবর্ষণ বন্ধ হলো। তাদের বেশিরভাগ লোক তখনো হাবেলীর বাইরের প্রাঙ্গণে জমা হয়ে আছে। সন্ধ্যা হতেই তাদের সাথে আরো কয়েকটি দল এসে মিললো। মোয়াযযম আলী জানতেন যে, তারা নতুন করে হামলা করার জন্য রাতের অন্ধকারের প্রতীক্ষা করছে। ভিতরের দেওয়ালের পিছে মারাঠাদের তৎপরতার খবর নেয়ার জন্য তিনি খন্দকের আশপাশ একবার ঘুরে এলেন। উত্তরদিকে পাঁচিলের কাছে গিয়ে তিনি কতকলোকের পদধ্বনি শুনলেন এবং বুঝলেন যে, মারাঠারা পাঁচিলের পেছনে জমিন খুঁড়তে শুরু করেছে। পূর্বদিকের পাঁচিলের কাছে গিয়েও তিনি একই অবস্থা টের পেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে তিনি গিয়ে পূর্বের পাঁচিলের কাছের এক উঁচু আমগাছে

উঠে গেলেন। গাছের মাথায় উঠলে তাঁর নজরে পড়লো, অসংখ্যলোক পাঁচিলের গায়ে লেগে জমিন খুঁড়তে ব্যস্ত। তিনি দ্রুত নিচে নেমে গিয়ে সবগুলো ঘাঁটি ঘুরে ঘুরে রেজাকারদের খবরদার করে দিলেন যে, দুশমন উত্তর ও পূর্বদিকের পাঁচিল ধসিয়ে ফেলে এক চূড়ান্ত হামলা করবার চেষ্টা করছে। তারপর নিচুতলার জমা লোকদের লক্ষ্য করে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, কোনো নারী, শিশু অথবা বেকার লোকের সেখানে থাকা উচিত হবে না। উপরতলার কামরাগুলোতে যাদের জায়গা না হয়, তারা ছাদের উপর চলে যাবেন। মারাঠারা সেখানে পৌঁছে গেলে প্রত্যেকটি মানুষকে মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য লড়তে হবে। খানিকক্ষণ পরে রেযাকারদের উত্তর ও পূর্বদিকের পাঁচিলের সামনে বালুর বস্তা দিয়ে নতুন ঘাঁটি তৈরি করতে দেখা গেলো।

প্রায় দশটা বাজবার কাছাকাছি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বাইরের বাড়িঘরের ছাদের উপর থেকে আবার গুলিবর্ষণ শুরু হলো। মোয়াযযম আলী ছুটে গিয়ে বাড়ির ভিতর ও বাইরের সব কটি ঘাঁটি ঘুরে ঘুরে রেজাকারদের হুকুম দিলেন যে, দুশমন উত্তর ও পূর্বদিক দিয়ে হামলা করবে, তার আগে তারা যেনো গুলির জন্য পরওয়া না করে। বাড়ির ছাদ থেকে কতক লোক গুলির জওয়াব দিতে থাকবে, কিন্তু বাকি সবারই মনোযোগ থাকবে অপরদিকে।

রাত এগারোটার পর একে একে কয়েকবার গুরুগম্ভীর গর্জন শোনা গেলো এবং উত্তর ও পূর্বদিকের দেওয়াল কয়েক জায়গায় ভেঙ্গে পড়লো। দুশমন তাঁর গোড়ার জমিন আগেই খুঁড়ে ফেলেছে। মারাঠারা এবার পুরো উদ্যমে হামলা শুরু করলো। ভিতর থকে গুলিবর্ষণ চলছিলো। যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করে তারা ভিতরে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো এবং এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। তাঁরা জমিনের উপর হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগুতে লাগলো। ইতিমধ্যে মারাঠা ফউজের একাংশ সোজাসুজি দরজা দিয়ে প্রাঙ্গণে আসবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু প্রাঙ্গণের মাঝখানকার ঘাঁটি থেকে রেজাকারদল তাদেরকে কাছে আসতে বাধা দিলো। আর একবার তোপ দাগানো হলো এবং মারাঠারা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটলো। এরপর লড়াই উত্তর ও পূর্ব দিকেই সীমাবদ্ধ হলো। হামলাদারদের জন্য রাতের অন্ধকার যততাটা সুবিধাজনক, ততোটা ক্ষতিকরও ছিলো। তারা পাঁচিল ভেঙে হামলা করে হাবেলীর মুহাফিজদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তার সুবিধা নিতে চেয়েছিলো, কিন্তু রেজাকারদের আত্মরক্ষার অপ্রত্যাশিত প্রস্তুতি তাদের উদ্দীপনা ভেঙে দিলো। অন্ধকারে হতাহত সাথীদের সঠিক সংখ্যা অনুমান করা ছিলো তাদের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি গুলিবৃষ্টিতে আহতদের চিৎকার প্রতি মুহূর্তে

তাদের উদ্বেগ বৃদ্ধি করে চলেছিলো। কতকলোক রাস্তার ঘাঁটি বিধ্বস্ত করে বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো, কিন্তু তলোয়ার, ছুরি ও লাঠি নিয়ে কামরা ও বারান্দা থেকে বেরিয়ে অসংখ্য মানুষ তাদের উপর ভেঙ্গে পড়লো। কতক মারাঠা মারা পড়লো, আর বাকি সবাই পিছু হটে পালালো।

খানিকক্ষণ পর কতক হামলাদার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসার বদলে প্রাঙ্গণের গাছের আড়াল থেকে এবং বাকি লোকেরা পড়ে যাওয়া পাঁচিলের পেছনে আত্মগোপন করে গুলি চালিয়েই কর্তব্য শেষ করছিলো।

ঌ

মধ্যরাত্রির দিকে আসমানে চাঁদ দেখা দিলো। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নাকারার জোর আওয়াজ শোনা গেলো। মারাঠারা একে অপরকে আওয়াজ দিয়ে দিয়ে বাইরের দরজার দিকে ছুটতে লাগলো। হাবেলীর মুহাফিজরা তখন বন্দুকের আওয়াজের বদলে পালিয়ে যাওয়া দুশমনদের পায়ের আওয়াজ শুনতে লাগলো।

মোয়াযযম আলী বারান্দার সামনের এক ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ মনে হচ্ছে, দুশমন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। এ তাদের একটা চালও হতে পারে। তোমরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে সতর্ক হয়ে থেকো এবং আমার নির্দেশের প্রতীক্ষা করো। আমি উপরে গিয়ে দেখছি।'

মোয়াযযম আলী অন্ধকারে সতর্ক পদক্ষেপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির উপর পা রাখতেই তার কানে আওয়াজ এলো ঃ কে?'

ঃ আমি চাচাজান!' হোসেন বেগের কণ্ঠস্বর চিনে মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ঃ আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি, মারাঠারা হঠাৎ গুলিবর্ষণ বন্ধ করলো কেন?

ঃ আমার মনে হয়, ওরা ফিরে চলে যাচ্ছে। এখন আর হামলার আশঙ্কা নেই। কিন্তু আমি একবার উপরে গিয়ে দেখে আসছি। এখনই আমি ফিরে আসবো।'

মোয়াযযম আলী দেরি না করে সিঁড়ির উপরে উঠলেন। ছাদের উপর পা রাখতেই তিনি এককোণ থেকে বন্দুকের আওয়াজ শুনলেন। ছাদের উপর হোসেন বেগের চাকরেরা পাহারায় ছিলো। মোয়াযযম আলীর নির্দেশে তারা বসেছিলো পাঁচিলের আড়াল করে। কিন্তু তাদেরই একজন ছাদের এককোণে দাঁড়িয়ে ধীরস্থির

হয়ে বন্দুক বোঝাই করছিলো। মোয়াযযম আলী দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে গজবের স্বরে বললেন ঃ বে-অকুফ, মাথা নিচু কর।'

সে মোয়াযযম আলীর দিকে আমলও দিলো না। তার হাত তখন বন্দুক বোঝাই করতে ব্যস্ত আর দৃষ্টি প্রাঙ্গণের এক আমগাছের দিকে। কোনো রক্ষকার অথবা হোসেন বেগের কোনো নওকর মোয়াযযম আলীর হুকুম অমান্য করবে, এরূপ ধারণা ছিলো না। তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে বন্দুকের এক আওয়াজ শোনা গেলো এবং গুলি তার মাথার চুল ছুঁয়ে চলে গেলো। মোয়াযযম আলী দ্রুত নিচু হয়ে পাঁচিলের আড়ালে বসে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুল না। তারপর তার কানে এলো এক কোমল নারী-কণ্ঠের আওয়াজ ঃ আপনার লাগেনি তো?'

ঃ আমি বিলকুল ঠিকই আছি। কিন্তু নেহাত আত্মহত্যা করতে চাইলে গুলির প্রতীক্ষা না করে হলে বন্ধ করে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ো।' এই কথা বলে মোয়াযযম আলী হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে তার বাহু ধরে টেনে নিচে বসিয়ে দিলেন।

ঃ এ গুলি সামনের কোনো গাছের উপর থেকে এলো?' মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন।

ঃ হ্যাঁ।'

ঃ তুমি কে'

প্রশ্নের কোনো জওয়াব না পেয়ে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তুমি এখখুনি এখান থেকে নিচে চলে যাও। এখানে মেয়েদের জন্য জায়গা নেই।

এবারও কোনো জওয়াব এলো না, বরং সে হাঁটুতে ভর করে প্রাঙ্গণের দিকে ঝুঁকে হঠাৎ বন্দুকের গুলি ছাড়লো।

মোয়াযযম আলী গলা উঁচু করে প্রাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তুমি হাওয়ায় গুলি করেছো? দেখি, মাথা একটু নীচু করে নেও।'

বালিকা বললো ঃ আপনি এখানে না এলে আমার নিশানা ব্যর্থ হতো না। এবার সে আর এক ডালে সরে গেছে। আমার বন্দুকটা বোঝাই করে দিন, আর আপনার বন্দুকটা আমার হাতে দিন। জলদি করুন। লোকটা নিচে নামবার চেষ্টা করছে।'

ঃ এই লও।' মোয়াযযম আলী নিজের বন্দুকটা আগে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ লোকটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

ঃ হ্যাঁ।' মেয়েটি উঠে নিশানা ঠিক করতে করতে বললো।

ঃ আল্লাহর নামে মাথাটা নিচু করো।' মোয়াযযম আলী তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন।

ঃ আমি শেষবারের মতো আপনার হুকুম অমান্য করছি।' বলেই মেয়েটি বন্দুক চালিয়ে দিলো। অমনি প্রাঙ্গণের আমগাছ থেকে একটি ভারী জিনিস সশব্দে

মাটিতে পড়লো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এবার তোমার জিদ পুরো হয়েছে, কিন্তু একটি মাত্র মারাঠার জন্য তুমি নিজের জান বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছিলে।'

ঃ ওখানে একজন ছিলো না। আমার কামরার খিড়কি দিয়ে আমি চারজনকে গাছে উঠতে দেখেছি। এখান থেকে গুলি করে আমি একজনকে নীচে ফেলেছি। দু'টো লোক ছুটে পালিয়েছে। আর চতুর্থ লোকটি খিড়কি পথে আমার গুলির নাগালের মধ্যে আসছিলো না। তাই আমায় উপরে আসতে হয়েছে।'

মোয়াযযম আলী চাঁদের আলোয় প্রথমবার বালিকার মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন। তার মাথায় সাদা পাগড়ি, আর গলায় বারুদের থলে লটকানো। মোয়াযযম আলীকে তার দিকে তাকানো দেখে সে তার মুখ অপরদিকে ফিরিয়ে নিলো।

মোয়াযযম আলী তার দীলের মধে খুশির কম্পন অনুভব করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি ফরহাত?'

বালিকা অভিযোগের স্বরে বললো ঃ আপনি আমায় গাল দিয়েছেন।'

ঃ কেনো সিপাহী আমার হুকুম অমান্য করবে, একথা আমি ভাবতে পারিনি। অকারণে তোমার জান বিপদের মুখে ঠেলে দেবে, তাতে বাধা দেওয়া আমি ফরজ মনে করছি। তুমি রাগ করে থাকলে আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

ঃ আমি আপনার উপর রাগ করিনি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এখন তুমি ধীরস্থির হয়ে নিচে গিয়ে শুয়ে পড়। আর কোনো হামলার আশঙ্কা নেই। পালি থেকে দুশমনদের পালানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ছাদের পাহারাদাররা প্রাচীরের দিকে ঝুঁকে দেখে একে অপরকে খোশখবর শুনাচ্ছিলো ঃ মারাঠারা ছুটে পালাচ্ছে।'

মোয়াযযম আলী লোকাই করা বন্দুক ফরহাতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজের বন্দুকটা ফেরত নিয়ে বললেন ঃ এরপর হয়তো এর আর প্রয়োজন হবে না।'

ফরহাত নীরবে সিঁড়ির দিকে চলো গেলো। মোয়াযযম আলী রোজাকারদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা বড়ই দায়িত্বহীন। মীর্যা সাহেবের সাহেবজাদি নিজের অসতর্কতার দরুন আহত হলে আমরা কি করে তাঁকে মুখ দেখাতাম?'

হোসেন বেগের ভৃত্য বললো ঃ জনাব, ওর লেবাস দেখে আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা মনে করেছি, উনি একজন রেজাকার।'

ঃ কিন্তু কোনো রেজাকারেরও তো ছাদের উপর দাঁড়াবার হুকুম ছিলো না। ওকে অসতর্কতা থেকে ফিরিয়ে রাখা তোমাদের কর্তব্য ছিলো।'

হোসেন বেগের ভৃত্য বললো ঃ আমরা ওকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু উনি

আমাদের দিকে আমলই দেননি। হঠাৎ উনি বন্দুক চালিয়ে দিলেন,আর তখখুনি আপনি এসে পড়লেন।'

মোয়াযযম আলী উঠে ছাদের চারদিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমার ধারণা ময়দান এখন খালি হয়ে গেছে। কিন্তু হাবেলীর বাইরের আবস্থা ভালো করে জানা পর্যন্ত তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। হয়তো এখনো কতক লোক গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে।'

কিছুক্ষণ পর মোয়াযযম আলী পনেরোজন রেজাকার নিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণের সবদিক ঘুরে বাইরের খোলা জায়গায় এসে পৌছলেন। হামলাকারদের তখন আর কোনো চিহ্নমাত্র নেই। হাবেলীর আনাচে-কানাচে দুশমনের লাশ পড়ে রয়েছে, কোথাও কোথাও আহতদের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছে। মারাঠারা হোসেন বেগের আস্তাবল থেকে কুড়িটা ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে।

মোয়াযযম আলী রেজাকারদের সাথে হাবেলী থেকে বাইরে গেলেন।প্রায় এক ঘন্টা-কাল মহল্লার গলিতে গলিতে ঘুরে আসার পর ঘোষণা করলেন ঃ মারাঠারা চলে গেছে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এখন তার দরগায় আমাদের সিজদা করার সময় এসেছে?'

নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক খুশিতে কোলাহল করে উঠলো। তাদের চোখে দেকা দিলো আনন্দের অশ্রু। ঘোষণা শুনে সবারা আনন্দ প্রকাশ করলো। বাড়ির ভিতরে মহিলারা মোয়াযযম আলীর মায়ের কাছে জমা হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো। বাইরে পুরুষেরা মোয়াযযম আলীকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো। মোয়াযযম আলী হলেন তাদের কাছে এক গর্ব করবার মতো পুত্র, এক মাননীয় ভ্রাতা ও এক নির্ভরযোগ্য বন্ধু।

মোয়াযযম আলী রেজাকারদের মশাল জ্বালাতে হুকুম দিলেন। তারপর বারান্দার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ ভাইরা! কামরার মধ্যে মহিলারা আর বাচ্চারা বড়োই ভীষণ তকলিফ পাচ্ছে। আমি আশা করি, সবাই বাইরের প্রাঙ্গণে চলে যাবেন, যাতে আমাদের মা-বোনেরা বাকি রাত খোলা হাওয়ার মধ্যে শ্বাস নিতে পারেন। সশস্ত্র রেজাকারদের প্রতি আমার হুকুম, তারা ভোর পর্যন্ত বাইরের পাচিলের ঘাঁটিগুলোতে পাহারায় থাকবেন। দ্বিতীয়বার মারাঠা হামলার কোনো আশঙ্কা নেই, তথাপি সতর্কতার খাতিরে কতক লোককে আমি বাইরের রাস্তায় পাহারা দিতে পাঠিয়েছি। আপনাদের রাতের খানা জোটেনি। মীর্যা সাহেব তার ব্যবস্থা করবার ভার নিয়েছেন। দু'ঘন্টার মধ্যে দস্তরখানা বিছানো হবে, আশা করছি।

চার

ফজরের নামাজের পর মহল্লার লোকেরা যারযার আপন ঘরে চলে যাচ্ছে। মোয়াযযম আলীর দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। দেওয়ানখানার বারান্দায় তিনি এক চারপায়ীর উপর শুয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার চোখে নেমে এলো গভীর ঘুমের মায়া। দশটার কাছাকাছি সময়ে তার ঘুম ভাঙলো। মাহমুদ আলী, ইউসুফ, হোসেন বেগ, আসফ ও আফযল তখন তার কাছে দাঁড়িয়ে হাসলেন। জলদি উঠে গিয়ে তিনি বাপ, ভাই ও বন্ধুদের সামনে দাঁড়ালেন।

আফযল বললেন ঃ মোয়াযযম, তুমি তো দেখছি আমাদের বাড়িটার চেহারাটাই বদলে দিয়েছো।'

হোসেন বেগ বললেন ঃ বেটা, মারাঠারা আর দু'একদিন সময় দিলে মোয়াযযম মহল্লার প্রত্যেকটা বাড়ির নকশাই বদলে দিতো।'

মাহমুদ আলী বললেন ঃ আমরা রাস্তায় চলতে চলতে খুব পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহর শোকর, এই বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য আপনারা তৈরি হয়েছিলেন। নইলে আমাদের মহল্লাই ছিলো সবচাইতে অরক্ষিত।

হোসেন বেগ বললেন ঃ আল্লাহর শোকর, এখন আর মহল্লার লোক বিদ্রূপ করবে না। আমার ভয় ছিলো, মোয়াযযম আলীর অনুমান ভুল প্রমাণিত হলে আমায় এ শহর ছেড়ে হিজরত করতে হতো। আমায় বিদ্রূপ করতে গিয়ে সবচাইতে বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলো সুলতান খান। কিন্তু মারাঠাদের আসার খবর পেয়েই সে সারা শহর থেকে সব আপনার জনকে নিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। রাতের বেলায় সে আমার কুঠরীখানায় ফরাশের উপর শুয়ে পড়ে রয়েছে। অন্ধকারে লোক ঘরে ঢুকে তার গায়ে ঠোক্কর লাগালেও সে টু শব্দটি করেনি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনি শহরের অবস্থা জেনে নিয়েছেন, চাচাজান?'

হোসেন বেগ জওয়াব দিলেন ঃ শহরে মারাঠারা প্রচুর লুটতরাজ করে গেছে। জগত শেঠের মহল থেকে তারা বিশ লাখ টাকা বের করে নিয়েছে। এখন তুমি জলদি তৈরি হয়ে নাও। আমরা শহীদানের জানাজার সাথে যাচ্ছি। এরপর বিকাল চারটায় তোমার মীর মদনের কাছে যেতে হবে।

ঃ মীর মদনের কাছে?'

ঃ হ্যাঁ, তুমি ঘুমিয়েছিলে। তিনি তোমায় জাগাবার এজাযত দেননি।'

ঃ তিনি এখানে এসেছিলেন?'

ঃ হ্যাঁ, তিনি এখানে এসে হাবেলী দেখাশোনার পর ফিরে গেছেন। তার

সাথে ফউজের কয়েকজন অফিসারও এসেছিলেন। তোমার কাজকর্ম দেখে তারা খুব খুশি হয়ে গেছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনি তাদেরকে এখানে ডেকে এনেছিলান?

হোসেন বেগ বললেন ঃ বেটা তাদেরকে এখানে কারুর ডেকে আনবার প্রয়োজন ছিলো না। এই হাবেলীতে দুশো মারাঠার লাশ পড়ে রয়েছে, এই খবরই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিলো।

মাহমুদ আলী বললেন ঃ পথে আমাদের মতো মীর মদনও এই মহল্লার কথা ভেবে খুব পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বারবার বলেছেন ঃ মীর্যা সাহেবের হাবেলী খুবই অরক্ষিত। কিন্তু শহরে ঢুকে মারাঠাদের ক্ষতির খবর শুনেই তিনি বললেন যে, তিনি সবার আগে মীর্যা সাহেবের হাবেলী দেখতে আসবেন।'

৪

বিকাল চারটায় মোয়াযযম আলী মহলের চারদেয়ালের মধ্যে মীর মদনের ভবনে প্রবেশ করলেন। একজন সিপাহী তাকে দেউড়ির কামরায় এক নওজোয়ান অফিসারের কাছে নিয়ে গেলো।

ঃ তশরিফ রাখুন।' অফিসার সামনে একটা কুরসির দিকে ইশারা করে বললেন ঃ আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি?'

মোয়াযযম আলী কুরসির উপর বসে বললেন ঃ আমার নাম মোয়াযযম আলী। মীর সাহেব আমায় ডেকেছিলেন।'

অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কুরসি থেকে উঠে এসে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ আপনি মাহমুদ আলীর সাহেবজাদা? মাফ করবেন। আমি আপনাকে আরো বেশী বয়সের লোক মনে করেছিলাম। -মীর সাহেব কয়েকজন অফিসারের সাথে কথা বলছেন। আপনাকে খানিকক্ষণ দেরি করতে হবে।'

মোয়াযযম তার সাথে হাত মিলিয়ে আবার বসে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে অফিসার বললেন ঃ আমার নাম গওহর খান। আপনার সাথে দেখা হওয়ায় খুবই খুশি হয়েছি।'

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন ফউজী অফিসারকে দেওয়ানখানার এক কামরা থেকে বেরুতে দেখে গওহর খান বললেন ঃ চলুন, এখন উনি অবসর পেয়েছেন।'

মোয়াযযম আলী গহওর খানের পিছু পিছু চললেন। প্রাঙ্গণ পার হয়ে তারা

দেওয়ানখানার বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। মোয়াযযম আলীকে থামতে ইশারা করে গহওর খান ভিতরে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এসে তিনি তাকে হাতের ইশারা দিলেন। তিনি এবার গিয়ে এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন।

শক্তি ও গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি এক বিরাট পুরুষ কুরসি থেকে উঠে মোয়াযযম আলীর সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ আফসোস, তোমায় এতক্ষণ দেরি করতে হয়েছে। আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম।'

ঃ আপনার ব্যস্ততা আমি উপলব্ধি করতে পারি।'

ঃ তুমি বস।'

মোয়াযযম আলী মীর মদনের সামনে এক কুরসির উপর বসলেন।

মীর মদন বললেন ঃ তোমার কার্যকলাপ আমি দেখেছি। তোমায় নিয়ে আমি গৌরববোধ করি।'

ঃ আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।' মোয়াযযম আলী কৃতজ্ঞতায় দৃষ্টি অবনত করে জওয়াব দিলেন।

ঃ আমি তোমায় এই জন্য ডেকেছি যে, বাংলার ফউজে তোমার মতো নওজোয়ানের প্রয়োজন আছে। মীর্যা হোসেন বেগের কথায় আমি জেনেছি যে, ফউজের চাকরি তুমি পছন্দ করো না। আমি শুধু একজন সিপাহী এবং সিপাহী হিসাবেই আমার কর্তব্য তামাম কর্মঠ নওজোয়ানকে আমার চারপাশে জমা করা। মহল্লার হেফাজত করার ব্যাপারে তোমার কার্যকলাপ দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তোমার রাজনৈতিক মত যা-ই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলার ফউজের জন্য তোমার খেদমতের প্রয়োজন তুমি অস্বীকার করতে পার না। মারাঠাদের সাথে যে লড়াই হয়ে গেলো, তাতে আমার কয়েকজন যোগ্য সালার শহীদ হয়ে গেছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাদের একজনের স্থান এখখুনি পূর্ণ করে দেবো। আমি এখনো চাকরি বন্টনের ব্যাপারে কারুর সুপারিশ কবুল করিনি। কিন্তু তোমার ব্যাপার আলাদা।'

মোয়াযযম আলী পেরেশান হয়ে বললেন ঃ মীর্যা সাহেব যদি আমার জন্য সুপারিশ করে থাকেন, তাহলে আমার খুবই আফসোসের কারণ আছে। আমার ধারণা ছিলো, তিনি আমায় ভুল বুঝবেন না।'

মীর মদন হাসতে হাসতে বললেন ঃ বাছা! মীর্যা হোসেন বেগ তোমার জন্য সুপারিশ করেননি, করেছে তার হাবেলীতে পড়ে থাকা দুশো মারাঠার লাশ। আমি যখন তোমাদের মহল্লার গলিপথে হেঁটে আসছিলাম তখন বাচ্চা-বুড়ো সবারই চোখের কৃতজ্ঞতার অশ্রু আমায় এই পয়গাম জানিয়েছে যে, মহল্লায়

এমন একটি নওজোয়ান রয়েছে, যার শক্তি-সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর পূর্ণআস্থা পোষণ করা যেতে পারে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ কিন্তু আমি তো কেবল একটি মাত্র প্রয়োজনই মিটিয়েছি। এতে গর্বের কিছু নেই।'

ঃ তুমি একটি ছোট প্রয়োজন মিটিয়েছো। এখন আমি তোমায় একটি বড়ো প্রয়োজন মিটাবার দাওয়াত দিচ্ছি।

মোয়াযযম আলী কিছুক্ষণ চিন্তা করে জওয়াব দিলেন ঃ এ দাওয়াত আর কারুর কাছ থেকে এলে আমি কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই অস্বীকার করতাম, কিন্তু আপনার সামনে কথা বলাও আমার পক্ষে গোস্তাখি।'

ঃ কথা বলার প্রয়োজন নেই তোমার।' এই কথা বলে মীর মদন কলম তুলে নিয়ে একটা কাগজে কিছু লিখতে লাগলেন। লেখা শেষ হলে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনার হুকুম তামিল করতে আমি অস্বীকার করবো না। আমরা দ্বিধা ও পেরেশানির কারণ, আমি সেই নেতৃত্বে আশ্বস্ত হতে পারি না, যে নেতৃত্ব কওমের সামগ্রিক প্রয়োজনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী দোস্ত-দুশমন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে থাকে।'

মীর মদন তার লিখিত কাগজখানা মোয়াযযম আলীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ সিপাহী হামেশাই রাজনীতিকদের ভুলের কাফফারা আদায় করে থাকে। তুমিও এক সিপাহী। আমি বাংলার ফউজ থেকে সেই ধরনের লোকদের দূর করে দিতে চাই, যারা কওমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হামেশা সুবিধাবাদি রাজনীতিকদের মন নিয়ে চিন্তা করে থাকে। তোমার মতো বাস্তববাদী ও কর্তব্যনিষ্ঠ নওজোয়ানের সাহায্য ব্যতীত এ কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি একদিন ফউজের সিপাহীদের মধ্যে এমন এক সামগ্রিক অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারবে, যা রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের দোষত্রুটি বরদাশত করবে না। এই তোমার নিয়োগের হুকুমনামা। আমি তোমায় দুদিন চিন্তা করবার অবকাশ দিচ্ছি। দুদিন পর যদি তুমি ফউজে যোগদান না কর, তাহলে এ হুকুমনামা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে এবং আমার মনে এই আফসোস থাকবে যে, কওমের আত্মরক্ষার দুর্গ গড়ে তোলার জন্য আমি এক মজবুত পাথরকে কাজে লাগাতে পারিনি। মুর্শিদাবাদে এখন কিছুকালের জন্য হামলার আশঙ্কা নেই, কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় হামলার আশঙ্কা আরো বেড়ে গিয়েছে। আমাদের কমজোরী মীর হাবীবের চাইতে বেশি আর কেউ জানে না। মুর্শিদাবাদে তারা যে আঘাত খেয়ে গেছে, তার বদলা নিতে তারা দেরি করবে না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি জানি, বর্তমানে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলী বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। আমি যদি একজন সিপাহী হই, তাহলে আমার চিন্তা করার জন্য দুদিনের প্রয়োজন নেই। আমি কালই আমার বাহিনীর পরিচালনা ভার হাতে নেবো।'

আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদে তার সেনাবাহিনী নতুন করে সংহত করছেন। মারাঠা ফউজ মীর হাবীবের নেতৃত্বে হঠাৎ হুগলীর কেল্লা দখল করে বসছে। বর্ষার তীব্রতায় মুর্শিদাবাদ থেকে রসদ ও গোলাবারুদ পাঠাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। মারাঠারা বিনা অসুবিধায় বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাইরের আরো কোনো কোনো এলাকায় লুটতরাজ করছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্বের কোনো এলাকাই মারাঠা হামলার বিপদ থেকে মুক্ত নয়।

বর্ষার তীব্রতা কমে এলে আলীবর্দী খান পূর্ণোদ্যমে মুর্শিদাবাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে কাটোয়ার কাছাকাছি জায়গায় ভাগিরথী তীরে তাঁবু ফেললেন। মারাঠা সৈনিকরা চারদিক থেকে সরে গিয়ে তাঁবু ফেললো ভাগিরথীর অপর তীরে। প্রায় একত্রিশ দিন ধরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ফউজ নিজ নিজ তাঁবু থেকে পরস্পরের উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে মারাঠারা খবর পেলো যে, অযোধ্যার সুবাদার তাঁর লশকর নিয়ে আলীবর্দী খানের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন। তারা এক তীব্র সংঘর্ষের পর পিছু হটে গেলো। কয়েকদিনের মধ্যে আলীবর্দী খানের ফউজ মারাঠাদের বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিলো। মারাঠারা তখন পালাচ্ছে প্রত্যেক ময়দান থেকে আর বাংলার ফউজ বলিষ্ঠ অগ্রগামী দল তাদের বিশৃঙ্খল অবস্থায় পুরোপুরি ফায়দা নিচ্ছে।

মোয়াযযম আলী অগ্রগামী দলেগুলোর স্বল্পসংখ্যক অফিসারের অন্যতম, যারা উপর পুরো সেনাবাহিনীর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। দুশমনের পিছু ছুটবার বেলায় তারা হামেশা থাকতেন বাকি ফউজ থেকে এক মনজিল আগে।

মারাঠা ফউজ কয়েক ক্রোশ পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গা দেখে তাঁবু ফেলেছে, কিন্তু এরা হঠাৎ হামলা করে তাদেরকে নতুন করে পালাবার পথ ধরতে বাধ্য করেছেন। মোয়াযযম আলীর পরিচালনায় ছিলো পাঁচশ ঘোড়া-সওয়ারা

কয়েকদিনে মধ্যে তারা মারাঠাদের পঁচিশটি তোপ ও রসদ বোঝাই সত্তরটি গাড়ি দখল করে নিলেন।

আলীবর্দী খান উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করলেন। এক সন্ধ্যায় বাংলার ফউজ চিল্কা হ্রদের কিনারে তাঁবু ফেললো। আলীবর্দী খান অফিসারদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন ঃ এই আমাদের শেষ মনজিল। এরপর এগিয়ে গিয়ে কোনো লাভ হবে না।'

রাতের বেলা ফউজ যখন বিজয়-উৎসবে মত্ত, তখন মীর মদন আলীবর্দী খানের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ আলীজাহ! এইমাত্র আমার কাছে খবর এসেছে, আমাদের অগ্রগামী ফউজের এক সালার ফিরে না এসে এখান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে দুশমনের এক কেল্লার উপর হামলা করেছে।'

আলীবর্দী খান রেগে বললেন ঃ সে আমার হুকুম অমান্য করেছে। আমি তামাম ফউজকে এখানে জমা হবার হুকুম দিয়েছিলাম। সে সালার কে?'

ঃ আলীজাহ, সে মোয়াযযম আলী।'

ঃ কিন্তু অগ্রগামী ফউজের তো সরহদ পার হবার হুকুম ছিলো না।'

ঃ আলীজাহ, সে সরহদ পার হয়ে যায়নি, এ কেল্লা আমাদেরই ছিলো। কয়েক বছর আগে মারাঠারা তা দখল করে নিয়েছিলো।'

ঃ আর সে আহমক মনে করেছে পাঁচশ সিপাহী মারাঠাদের তামাম লশকরকে হারিয়ে দিয়ে কেল্লা দখল করে নেবে।'

ঃ আলীজাহ, আমার মনে হয়, এতক্ষণ সে কেল্লা দখল করে বসেছে। আমি যে খবর পেয়েছি, তাতে জানা গেছে যে, তারা অগ্রগামী ফউজের অন্যান্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারাঠা লশকরদের আগে চলে গিয়েছিলো। তাদের ইচ্ছা ছিলো, মারাঠাদের পৌঁছবার আগেই তারা কেল্লা দখল করে নেবে। এখন আমার ভয় হচ্ছে, এখন তাদের কাছে আরো সিপাহী না পাঠালে মারাঠারা পৌঁছে কেল্লা আবার দখল করে নেবে আর আমাদের পাঁচশ বাহাদুর সিপাহী তাদের হাতে মারা পড়বে।'

আলীবর্দী খান বললেন ঃ তাহলে তো তোমার আরো সিপাহী পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমার কাছে আসা উচিত ছিলো।'

মীর মদন হেসে বললেন ঃ আলীজাহ আমি ফউজ তৈরি করার হুকুম দিয়ে এসেছি। এখন শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছি।'

ঃ কত সিপাহী নিয়ে যাবে?'

ঃ পাঁচ হাজার।'

ঃ আচ্ছা, যাও।

মীর মদন যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন আলীবর্দী খান বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ কাল আমরা সে কেল্লা দেখতে আসবো।'

মীর মদনের অনুমান ঠিকই হয়েছে। মোয়াযযম আলী সূর্যাস্তের দুঘণ্টা পর সীমান্তবর্তী কেল্লা দখল করে নিয়েছেন। কেল্লার পঞ্চাশজন রক্ষী সৈনিকের মধ্যে চব্বিশ জন হতাহত হয়েছে। আরো পনেরোজন গ্রেফতার হয়েছে। বাকি সৈনিকরা এক গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে।

মোয়াযযম আলী কেল্লার বুরুজের উপর বাংলার পতাকা উড়িয়ে সিপাহীদের বললেন ঃ ভাইরা! আমি জানি, তোমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, কিন্তু আজ রাত্রে সম্ভবত তোমাদের ভাগ্যে আরাম জুটবে না। আমার বিশ্বাস, অল্প সময়ের মধ্যে মারাঠা লশকর এখানে এসে পড়বে, কিন্তু ভোর পর্যন্ত যদি আমরা কেল্লা দখলে রাখতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের ফউজ এখানে এসে যাবে। আমরা তাহলে লাভ করবো আর এক নতুনতর বিজয়-গৌরব। কিন্তু আমরা যদি হিম্মৎ হারাই মারাঠা যদি আবার এ কেল্লা অবরোধ করে বসে, তাহলে আমাদের জন্য পালিয়ে বাঁচবার কোনো রাস্তা থাকবে না। কেল্লার মধ্যে এতটা বারুদ রয়েছে যে, আমরা কয়েক ঘণ্টা দুশমনের মোকাবিলা করতে পারবো। রাতের বেলায় পাঁচিলের সব দিকে আমাদেরকে সতর্ক পাহারায় থাকতে হবে।'

মারাঠা ফউজের সরদারের বিশ্বাস ছিলো, আলীবর্দী খানের লশকর বেশি দূরে তাদের পিছু ধাওয়া করবে না। সীমান্তের কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে তারা ধীরস্থির হয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা করবার অবকাশ পাবে। কিন্তু প্রায় দুক্রোশ দূরে তারা কেল্লার পালিয়ে যাওয়া সিপাহীদের কাছে থেকে খবর পেলো, বাংলার মুষ্টিমেয় সিপাহী কেল্লা দখল করে নিয়েছে। মারাঠা সরদার কেল্লার মুহাফিজ সিপাহীদের বুযদীল নির্লজ্জ বলে ভর্তসনা করে সামনে এগিয়ে এলো। মধ্যরাত্রের কাছাকাছি সময়ে তারা তাঁবু ফেললো কেল্লা থেকে প্রায় আধমাইল দূরে। পাঁচ হাজার দক্ষ সিপাহী নিয়ে মীর হাবিব এগিয়ে এসে কেল্লা অবরোধ করলো। রাত্রির শেষ প্রহরে তীর গোলাবর্ষণের পর মারাঠা লশকর চারদিক থেকে কেল্লার উপর হামলা শুরু করলো। মোয়াযযম আলীর সিপাহীরা সাহায্য আসবার আশায় বুকবেঁধে তাদের ঘাঁটি আঁকড়ে থাকলো। অকস্মাৎ দক্ষিণ পূর্ব-দিক থেকে মুষলধারে বৃষ্টির

মতো গুলিবৃষ্টি শুরু হলো মারাঠা ফউজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। তারা পশ্চিম দিকে ছুটতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে পশ্চিম দিক থেকেও মারাঠাদের উপর গুলিবৃষ্টি শুরু হলো। আধঘন্টার মধ্যে মারাঠা লশকর ছিন্নভিন্ন হয়ে উত্তর দিকে ছুটে পালাতে লাগলো।

মীর মদন তার সওয়ারদের হামলার হুকুম দিলেন। দেখতে দেখতে ময়দান খালি হয়ে গেলো। বাংলার ফউজ তাঁবু পর্যন্ত মারাঠাদের পিছু তাড়া করে ফিরে এলো।

ভোরের আলো দেখা দিতেই মোয়াযযম আলী, ইউসুফ, আশরফ ও আফযল বেগ নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিলেন। মীর মদন দরজার কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে মোয়াযযম আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমায় এ কেল্লার উপর হামলা করবার হুকুম কে দিয়েছিলেন?

এ প্রশ্ন ও এ কণ্ঠস্বর মোয়াযযম আলীর কাছে অপ্রত্যাশিত। তিনি মুহূর্তকাল চুপ থেকে পেরেশান হয়ে মীর মদনের দিকে তাকালেন, তারপর নিজের বাপ ভাই ও বন্ধুদের মুখের দিকে তাকালেন। তাদের সবারই মুখে হাসি। মোয়াযযম আলী দীলের মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দের কম্পন অনুভব করলেন।

ঃ কথা বলছো না কেন?' মীর মদন আরো কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন।

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ এ কেল্লার উপর হামলা করার জন্য আমার কোনো নতুন হুকুমের প্রয়োজন ছিলো না। আপনার উদ্দেশ্য মোতাবেক আমি এ পদক্ষেপ করেছি।'

মীর মদন ফিরে মাহমুদ আলীর দিকে তাকিয়ে হাসি চাপাবার চেষ্টা করে বললেন ঃ কিন্তু তোমার সিপাহীরা ছিলো ক্লান্ত। তাদের আরামের প্রয়োজন ছিলো।'

ঃ এই ধরনের অবস্থায় সিপাহীর কাছে ঘোড়ার জিন বিছানার চাইতে আরামদায়ক। আরো তারা জানতো যে, এই কেল্লাই হচ্ছে তাদের সফরের শেষ মনজিল এবং এর উপর দখল বসাতে পারলে মনের সাধ মিটিয়ে আরাম করবার সুযোগ আসবে।'

মীর মদনের ঠোঁটের উপর হাসির ঝিলিক খেলে গেলো। তিনি বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, তোমার কার্যকলাপ আমার আশানুরূপ হয়েছে, কিন্তু তুমি আমাদেরকে তো আরাম করবার জন্য দাওয়াত করলে না?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ ভিতরে চলুন। আমি আপনাদের সবারই আরামের ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

৪

দুপুরবেলা কেল্লার বাইরে এক প্রশস্ত তাঁবুর মধ্যে আলীবর্দী খানের দরবার বসেছে। ফউজের বড়ো বড়ো অফিসার তার সামনে দাঁড়িয়ে। মোয়াযযম আলী তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করলেন এবং বাংলার শাসককে সালাম করে অন্যদের সাথে দাঁড়ালেন।

আলীবর্দী খান তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ নওজোয়ান, আমি জানতে চাই, কেন তুমি এত বড়ো বিপদের মধ্যে পা বাড়ালে?

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আলীজাহ, আমার বিশ্বাস ছিলো, কয়েকঘন্টা আমি কেল্লা দখলে রাখতে পারবো। আর এর মধ্যে সিপাহসালার আরো সিপাহী পাঠাবেন।

ঃ কিন্তু সাহায্য আসতে যদি দেরি হতো?

ঃ আমি একে একে আট সওয়ার পাঠিয়েছি। তা ছাড়া মীর মদন হাজির থাকতে সাহায্য দেরিতে পৌঁছবার কোনো সওয়ালই পয়দা হতে পারে না।'

ঃ রাতের বেলায় এই কেল্লার দিকে তোমায় পথ দেখিয়েছিলো কে?'

ঃ আমায় পথ দেখাবার প্রয়োজন ছিলো না। এ এলাকার সব কিছুই আমি ভালো করে জানি।'

আলীবর্দী খান খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন ঃ নওজোয়ান, আমি তোমায় এই কেল্লার মুহাফিজ নিযুক্ত করছি। তোমার সম্পর্কে মীর মদনের ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি এ দায়িত্ব পালন করে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে?'

মোয়াযযম আলী জওয়াবে বললেন ঃ আলীজাহ, আমি মীর মদনের প্রত্যাশা পূরণ করবার চেষ্টা করবো।'

চতুর্থ দিন মোয়াযযম আলী কেল্লার অধিনায়ক হিসাবে বাংলার সেনাদলকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। কেল্লার কাছে এক উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে তিনি বাংলার ফউজের চলে যাবার শেষ দৃশ্যটি দেখে নিলেন। তারপর তার অধীন পাঁচশ সিপাহীকে তিনি কেল্লার ভিতরে জমা হবার হুকুম দিলেন। তাদের সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ আমার সাথীরা! আমার চোখের সামনে তোমাদের বিমর্ষ মুখ দেখতে পাচ্ছি। নিজের ঘরবাড়ি থেকে আমরা বহু বহু মাইল দূরে এসে পড়েছি; কিন্তু আমাদেরকে যে বিরাট দায়িত্ব পালনের যোগ্য

ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতে আমাদের গৌরবের কারণ আছে। আমার দৃষ্টিতে এ কেল্লা বাংলার এক অদূরবর্তী চৌকি নয়, বরং এ হচ্ছে মুর্শিদাবাদেরই এক দরজা। এখান থেকে আমরা আমাদের সুদূরবর্তী ঘরবাড়ির হেফাজত করবো এবং আমাদের কারণে কওমের লাখো লাখো মানুষ যে আরামে ঘুমোতে পারবে, তাই হবে আমাদের আত্মপ্রসাদ।

মীর মদন ওয়াদা করে গেছেন যে, এই কেল্লাকে শক্তিশালী করবার জন্য তিনি আমায় সবরকম সম্ভাব্য সাহায্য করবেন। আমি তার কাছে ওয়াদা করেছি যে, আমাদের মধ্যে একটি মাত্র মানুষ জিন্দা থাকলেও এই কেল্লার উপর উড্ডীন থাকবে বাংলার গৌরব-পতাকা। এ কেল্লা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে দুর্জয় করে তুলবো আমরা।'

পরদিন মোয়াযযম আলীর সিপাহীরা কেল্লার ভাঙা দেয়াল মেরামত করতে শুরু করে দিলো।

এক বছর পর কটকের ফউজদার এলেন কেল্লা পরিদর্শন করতে। আলীবর্দী খানের কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন ঃ

এক বছর পর এই কেল্লা দেখে আমার মনে হয়েছে, আমি বুঝি ভুল করে আর কোথাও চলে এসেছি। মোয়াযযম আলী এর নকশা বদলে দিয়েছেন। ভাঙা পাঁচিলের জায়গায় তৈরি হয়েছে নতুন পাঁচিল। কেল্লার মধ্যে সিপাহীদের থাকার জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কুঠরি। পাঁচিলের বাইরে খন্দক খুঁড়বার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কেল্লা নতুন করে মেরামত করে গড়ে তোলার জন্য যে অর্থ মঞ্জুর হয়েছিলো তা অতি সামান্য। এছাড়া আর মেরামত ব্যয় কমাবার জন্য মোয়াযযম আলী সিপাহীদের সাহায্যে কাজ করে নিয়েছেন। আমার বিশ্বাস মোয়াযযম আলী আরো কিছুকাল এখানে থাকলে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়ে আমাদের এই সরহদী কেল্লা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে।'

এই কেল্লার আত্মরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিবিধান ছাড়া চারপাশের জঙ্গলগুলোকেও মোয়াযযম আলী মারাঠা ডাকাতদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। সীমান্তের শূন্য বস্তিগুলো আবার ভরে উঠছে জনমানুষে। এইসব বস্তির হেফাজতের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে স্থানীয় রেজাকার ফউজ। এর মধ্যে মোয়াযযম আলীর সিপাহীরা প্রায় হাজারখানেক লোককে ফউজী শিক্ষা দিয়েছে।

আমি আপনার হুকুম মোতাবেক মোয়াযযম আলীকে বলেছিলাম যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মুর্শিদাবাদে বদলি করা হবে। মনে করেছিলাম, একথা শুনে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন, কিন্তু তিনি জওয়াব দিয়েছেন যে, এখনো

এ এলাকায় তার কাজ শেষ হয়নি, এখানে যারা নতুন করে ঘর বাঁধছে তাদের প্রয়োজন আছে তার সাহায্যের।

এই উৎসব-উদ্দীপনা কেবল মোয়াযযম আলীর ভিতরে নয়, বরং তার প্রত্যেক সিপাহী মনে করে যে, তার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

পাঁচ

দিন মাসে আর মাস বছরে রূপান্তরিত হয়ে চলল। সীমান্তের কেল্লার অধিনায়ক হয়ে মোয়াযযম আলীর জিন্দেগির এক লহমাও এমন কাটেনি, যখন তিনি মুর্শিদাবাদের কথা ভবেননি। কখনো তারা কল্পনায় ভেসে আসে ছেলেবেলার সেই দিনগুলো। যখন ইউসুফ ,আফযল ও আসফ বেগকে নিয়ে খেলে বেড়িয়েছেন মহল্লার অলি-গলিতে। সে দিনগুলোর কথা ভেবে তার মুখে খেলে যায় একটা মধুর হাসি। কখনো তার মনে জাগে বাপ-মায়ের স্মৃতি আর কেল্লার আবহাওয়া কেমন যেনো ভারী হয়ে আসে তার কাছে। শৈশব ও যৌবনের সাথীদের ছবি একে একে ভেসে আসে তার মনের পর্দায়, তারপর শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে তার সবটুকু কল্পনা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় একই কেন্দ্রবিন্দুতে। তার দৃষ্টির সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে এমন একটি রূপ যার সঠিক কোনো ছবি কখনো আঁকা হয়নি তার মনেরপটে — তার গোটা দুনিয়া রেঙে ওঠে রংধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়। রাতের বেলায় খোলা আসমানের তলায় শুয়ে শুয়ে তিনি কখনো উঁচু গলায় আর কখনো চাপা আওয়াজে উচচারণ করেন ফরহাতের নাম এবং সৃষ্টির অন্তহীন প্রসার যেনো ভরে যায় অপূর্ব রাগিনীতে। আচানক তার কল্পনার সোনালি তার যায় ছিঁড়ে; তিনি অচেতন হয়ে পড়েন ঘুমের নেশায়।

মোয়াযযম আলী সত্যনিষ্ঠ তরুণ; জিন্দেগির কোনো মনজিলে এসে ফরহাত ও তার পথ যে এক হয়ে মিশে যেতে পারে, এমন কোনো ভুল ধরণায় বিভ্রান্ত হবার চেষ্টা তিনি করেননি কখনো, তবু তার ধারণা ও স্বপ্নের দুনিয়ায় ভেসে আসতে থাকে ফরহাত সম্পর্কে কতো অলীক, মুগ্ধকর ও মন ভুলানো কল্পনা। মীর্যা মোহসেন বেগ, আসফ ও আফযল বেগের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি বাড়ির আর সবাইকে সালাম জানিয়ে শেষ করেন এবং এই শেষ কথাটি তার কাছে সবচাইতে জরুরি হয়ে ওঠে গোটা চিঠিটার মধ্যে। চিঠির জওয়াব দেবার অভ্যাস

আসফের নেই, কিন্তু আফযল ও হোসেন বেগ চিঠির জওয়াব দেন নিয়মিত। হোসেন বেগের চিঠিতে থাকে পিতৃসুলভ স্নেহের প্রকাশ। আফযলের চিঠিপত্রে থাকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশদ আলোচনা। কখনো কখনো তিনি দু'এক কথায় তার বোনের খবরও লেখেন আর সেইটুকু পড়েই মোয়াযযম আলীর দীলের মধ্যে জাগে খুশির কম্পন ঃ ফরহাত ভালো আছে তোমায় সালাম জানাচ্ছে। আজ ফরহাত বলেছিলো, তোমার আম্মা বড়ই বিষণ্ন। তাই কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে তোমার ঘরে আসা উচিত।' কথাগুলো পড়ে মোয়াযযম আলীর মন উড়ে চলে যেতে চায় মুর্শিদাবাদে।

মায়ের কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে মোয়াযযম আলীর মনে অনুভূতি জাগে, যেনো তিনি তারই মাধ্যমে কথা বলছেন ফরহাতের সাথে। মা তার চিঠিতে বিস্তারিতভাবে লেখেন ফরহাতের কথা। কোনো চিঠিতে তার খবর না পেলে তার মনে তকলিফ অনুভূত হয়; তিনি জওয়াব লেখেন ঃ আম্মাজান, মীর্যা হোসেন বেগ ও তার ছেলেমেয়ের খবর আপনি লিখেননি।' তারপর মা'র চিঠি আসে ঃ বেটা তোমার চিঠি পেয়েই মীর্যা সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম তারা ভালো আছেন। ফরহাত বেশ হাসি-খুশি। সে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলো। আমার এখানে এলেই সে জিজ্ঞেস করে তোমার কথা। গত কয়েকদিন আমি অসুস্থ ছিলাম। হররোজ সে এখানে আসতো আমার সেবা করতো। বড়ই ভালো মেয়ে। কেন তুমি কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আসছো না, তাই সে জিজ্ঞেস করছিলো।

ঐ

আলীবর্দী খান ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসক, কিন্তু তার শাসন আমলে বাংলার সালাতানাত হয়ে উঠেছিলো রাজনৈতিক দাবারুদের আড্ডা। তার সময়ই তৈরি থাকতো কওমের ইজ্জত ও আজাদি বলি দেবার জন্য। ক্ষমতার মসনদের বেহারা দাবিদাররা কখনো কখনো সুবাদার অথবা ফউজদারের সাথে চক্রান্ত করে তাকে এনে খাড় করাতো আলীবর্দী খানের সামনে, কখনো বা প্ররোচিত করতো মারাঠাদের বাংলার উপর হামলা চালাতে। আলীবর্দী খানের প্রিয়পাত্র ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও এমন লোকের অভাব ছিলো না, যারা বাংলার শাসনক্ষমতা হাতে নেবার জন্য মওকা খুঁজে বেড়াতো। বাংলার ভিতরে হুকুমাতের বড়ো বড়ো কর্মচারী ও ফউজী অফিসার এবং বাংলার বাইরে মারাঠা বর্গীদের লশকর ছিলো এই ধরনের লোকদের সবচাইতে বড়ো সাহায্যকারী।

সে ছিলো এমন এক যুগ, যখন বাংলার রাজনীতি মোটেই জনমতের উপর নির্ভর করতো না। আলীবর্দী খান কখনো লড়তেন দেশের ভিতরকার গাদ্দারদের সাথে, আবার কখনো মোকাবেলা করতেন বিদেশি হামলাকারীদের। ভিতরে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি দোস্তির হাত বাড়াতেন মারাঠাদের দিকে, আর মারাঠা শক্তি যখন দোস্তির যাবতীয় চুক্তিভঙ্গ করে বাংলার সীমান্তে এসে হানা দিতো, তখন তিনি পরাজিত গাদ্দারদের চিরদিনের জন্য খতম না করে তাদেরই গলা ধরবার প্রয়োজনবোধ করতেন।

আলীবর্দী খান তার জিন্দেগিতে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এমন বিভেদ কায়েম করে রেখেছিলেন, যার ফলে তারা মিলিতভাবে তার অস্তিত্বের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারেনি। এদিক দিয়ে তাকে এক সফল রাজনৈতিক বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিভা বুদ্ধিবৃত্তি ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতাসত্ত্বেও তিনি অনিষ্ট-সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাই হলো তার উত্তরাধিকারী নওয়াব সিরাজদ্দৌলা পরাজয় ও বাংলার ধ্বংসের কারণ। তিনি বাইরের বিপদের মোকাবিলায় দেশের জনগণের দেশরক্ষামূলক চেতনা ও ভিতরের গাদ্দারদের বিরুদ্ধে কওমের প্রতিরোধ- শক্তি জাগ্রত করে তুলতে পারেননি, এই ছিলো তার সবচাইতে বড়ো ব্যর্থতা।'

আলীবর্দী খানের দরবারে মীর জাফরের পদোন্নতির সাথে সাথে বাংলার ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। যেসব ভাগ্যান্বেষী সালতানাতের কর্মচারীদের সাথে চক্রান্ত করে অথবা মারাঠাদের সাহায্যে বাংলার শাসনক্ষমতা হাতে নেবার চেষ্টা করতো, তাদের চাইতে মীর জাফর ছিলেন অনেক বেশি দূরদর্শী। যে ইংরেজ বণিকদল ফোর্ট উইলিয়ামে বসে শুধু বাংলার নয়, বরং পুরো হিন্দুস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করছিলো নিজের ভবিষ্যৎ তাদের সাথে জড়িত করার চাইতে বড়ো দূরদর্শিতার প্রমাণ তার পক্ষে আর কিই বা হতে পারতো?

মীর জাফরের কর্মপদ্ধতি সেইসব ভাগ্যান্বেষীদের থেকে ছিলো স্বতন্ত্র, যারা খোলাখুলি আলীবর্দী খানের সাথে শক্তিপরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের পরাজয় অথবা ধ্বংস ডেকে আনতো। যেসব বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার দেশরক্ষা শক্তি ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ইংরেজদের সংকল্প সিদ্ধির পথ হচ্ছিলো, পরদার আড়ালে তিনি তার সব কিছুতেই থাকতেন শরীক।

বাংলার ওমরাহের ক্রমাগত বিদ্রোহ তার সাফল্যের পথ সহজ করে দিলো। সাধারণ অবস্থায় আলীবর্দী খান মীর জাফরকে মনে করতেন তার এক নগণ্য

সহচর। অবশেষে তিনি এতটা নিরুপায় হয়ে পড়লেন যে, তাকেই মনে করতে লাগলেন নির্ভরযোগ্য দোস্ত। এটা বাস্তবপন্থি মানুষের অসহায়তা নয়, বরং এক রাজনীতিকের অসহায়তা- যিনি অন্যায় অনাচারকে খতম করে দেবার সম্ভাবনায় না- উম্মীদ হয়ে চেষ্টা করছেন তা থেকে কোনো ভালো ফল বের করবার।

মীর জাফর নিযুক্ত হলেন উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার। মুর্শিদাবাদের যেসব ওমরাহ হামেশা তাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন, তারা তার পদোন্নতি দেখে বিস্ময়ে হতবাক, কিন্তু শিগগিরই হলো তার এক ধাপ পদোন্নতি। তিনি হুগলী ও মেদিনীপুরের ফউজদারীও হাসিল করলেন। হয়তো দরবারে নিজের এক আত্মীয়ের চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে আলীবর্দী খান তাকে মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে পাঠানোই ভালো মনে করেছিলেন। কিন্তু হুগলীর ফউজদার হিসাবে মীর জাফরের প্রভাব-প্রতিপত্তি যে শেষ পর্যন্ত বাংলার পক্ষে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে, বাংলার বৃদ্ধ শাসক কি তা জানতেন? হুগলী ও মেদিনীপুরে আলীবর্দী খানের নযরের বাইরে থেকে আরো স্বাধীনভাবে তার ইংরেজদের চক্রান্তে শরীফ হবার সুযোগ জুটলো।

উড়িষ্যার মারাঠা ও আফগানদের মিলিত হামলার খবর মশহুর হয়ে গেলো। মুর্শিদাবাদের উদ্বিগ্ন জনতা একদিন শুনলো যে, মীর জাফরের নেতৃত্বে সাত হাজার সওয়ার ও বারো হাজার পদাতিক ফউজ এগিয়ে চলেছে কটকের পথে। আবার প্রায় এক হফতা পর খবর এলো যে, মীর জাফর দুশমন দলকে পরাজিত করে তাদের পিছু ধাওয়া করে চলেছেন।

মুর্শিদাবাদে যখন বিজয় উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে, তখন আবার খবর এলো যে, হামলাদারদের সাহায্যের জন্য রঘুজীর পুত্র জানুজী এগিয়ে আসছে পঙ্গপালের মতো অগণিত লশকর সাথে নিয়ে এবং মীর জাফর তাদের মোকাবিলা না করে ফিরে পালিয়ে যাচ্ছেন বর্ধমানের দিকে। এরপর কয়েকদিন ধরে উড়িষ্যার সব দিক থেকে আসতে লাগলো লুটতরাজের খবর।

মোয়াযযম আলীর বন্ধু-স্বজনরা এসব খবর পেয়ে খুবই পেরেশান হলেন। সুদূরবর্তী সীমান্ত-দুর্গের মুহাফিজ কি অবস্থায় রয়েছেন, তা কেউ জানেন না। মীর্যা হোসেন বেগ হররোজ সিপাহসালারের কাছে গিয়ে জানতে চান মোয়াযযম আলীর খবর, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তিনি তাকে কোনো আশ্বাসসূচক জওয়াব

দিতে পারেন না। ফরহাত ও তার মা সকাল সন্ধ্যায় মোয়াযযম আলীর ঘরে গিয়ে চেষ্টা করেন তার মাকে সান্ত্বনা দিতে।

কয়েকদিন পর লোকমুখে খবর রটলো, মারাঠারা সীমান্তের কেল্লা জয় করে নিয়েছে। মোয়াযযম আলীর বেশিরভাগ সাথী শহীদ হয়েছেন এবং বাকি বন্দী হয়েছেন দুশমনদের হাতে। এরই সাথে সাথে মোয়াযযম আলীর বাহাদুরসুলভ মৃত্যুর কাল্পনিক কাহিনী রটতেও দেরি হয় না।

একদিন ফরহাত ও তার মা নিত্যকার অভ্যাসমতো মোয়াযযম আলীদের বাড়িতে গেছেন। খানিকক্ষণ মোয়াযযম আলীর মায়ের সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা বিদায় চাইলেন। মোয়াযযম আলীর মা তাদেরকে এগিয়ে দিতে গেলেন দরজা পর্যন্ত। তারা যখন জানানা মহল ছাড়িয়ে বাইরে বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করছেন, তখন গলির দিক থেকে এক সওয়ারকে দেখা গেলো ভিতরে ঢুকতে।

ঃ মোয়াযযম আলী' ! মায়ের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো। তার হলো অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণের জন্য তিনজনই কেমন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

মোয়াযযম আলী ঘোড়া থেকে নেমে সালাম করে কয়েক কদম এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ফরহাতের মুখের রঙ বদলে গেছে। সে তখন তার মায়ের পেছনে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে।

মোয়াযযম! মোয়াযযম!! কাঁপা আওয়াজে মা ডাকলেন এবং তার হলো থেকে বেরিয়ে এলো আনন্দাশ্রু। তারপর তিনি দুহাত বাড়িয়ে মোয়াযযম আলীর মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললেন ঃ বেটা! এই যে তোমার চাচীজান।'

হোসেন বেগের বিবির চোখেও অশ্রু জমে উঠছে। তিনি ফিরে ফরহাতের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বেটি তুমি ফিরে গিয়ে তোমার আব্বাকে বল যে, মোয়াযযম আলী এসে গেছে। আমি এখখুনি আসছি।'

ফরহাত তার মুখখানা চাদরে ঢেকে কম্পিত দ্বিধাকুণ্ঠিত পদে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচীজান, আপনাদের ঘরে সবাই ভালো তো?'

ফরহাতের মা জওয়াব দিলেন ঃ ঘরে সবাই ভালো আছে বেটা, কিন্তু তুমি বড়োই পেরেশান করেছো আমাদেরকে।'

ঃ সাবের! সাবের!' মোয়াযযম আলীর মা নওকরকে আওয়াজ দিলেন।

সাবের হলো মলতে মলতে আস্তাবলের কাছের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো এবং মেয়েদের উপস্থিতি খেয়াল না করেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো মোয়াযযম

আলীকে।

মোয়াযযম আলীর মা হাসতে হাসতে বললেন ঃ সাবের! মোয়াযযমের ঘোড়া বেঁধে এসো আর তার আব্বাজান ও ইউসুফকে খবর দাও।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ না আম্মাজান, ঘোড়া বাঁধবার প্রয়োজন নেই। এখখুনি আমার বাইরে কিছু কাজ রয়েছে।

ফরহাতের মা বললেন ঃ কোথায় যাচ্ছো বেটা? আরামে ঘরে বসো, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, কয়েকদিনে তুমি আরাম করতে পারোনি।'

মোয়াযযম আলী বললেনঃ চাচীজান, আমি এখন মীর মদনের কাছে যাচ্ছি, তার সাথে মোলাকাত করে হয়তো আমায় নওয়াব সাহেবের সামনে হাজির হতে হবে। আমার সোজা ওখানেই যাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু আগে ঘরের খবর জানবার জন্য এদিকে এসেছি।

৪

প্রায় একঘন্টা পর মোয়াযযম আলী মীর মদনের বাসভবনের এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন। মীর মদন কুরসি ছেড়ে উঠে পরম উৎসাহে মোসাফেহা করে তাকে সামনের আসনে বসিয়ে বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, আমি কোনো ভূমিকা না করেই তোমার সাথীদের খবর জানতে চাচ্ছি।'

মোয়াযযম আলী বিষণ্ণ কণ্ঠে জওয়াব দিলেন ঃ আমার সাথীরা মীর জাফরের বুযদীলী ও নির্লজ্জতার কাফফারা আদায় করেছে। আমি মুর্শিদাবাদে মা-বোনদের জন্য পয়গাম এনেছি যে, হুকুমাতের ঔদাসিন্য ও অযোগ্যতার দরুন তাদের তিনশ বেটা ভাই ও সাথী হালকা হয়ে গেছে।'

ঃ আর বাকিরা? মীর মদন খানিকটা ইতস্ততকরে প্রশ্ন করলেন।

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ চল্লিশজন সিপাহী দুশমনের হাতে বন্দী হয়েছে। বাকি একশ ষাটজনের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন জখমি। তারা সবাই জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছিলো কেল্লা থেকে। আমি তাদেরকে বর্ধমানের পথে এক নিরাপদ জায়গায় রেখে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। দুশমনের হাতে আমরা পরাজয় বরণ করিনি। আমি অনুভব করছি যে, হুকুমত আমাদের হাত-পা বেঁধে দুশমনের মুখে এগিয়ে দিয়েছে। আমাদের চাইতে বিশগুণ বেশিসংখ্যক দুশমন

বাহিনীর মোকাবিলা করেছি আমরা পনেরো দিন ধরে। আমাদের বিশ্বাস ছিলো বেশি হলে পাঁচদিনের মধ্যে আমরা সেনা সাহায্য পেয়ে যাব। হররোজ আমি মীর জাফরের কাছে পয়গাম পাঠিয়েছি যে, আমাদের বারুদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর বেশি সময় আমরা দুশমনের মোকাবিলা করতে পারবো না। কিন্তু পনেরো দিন পর জওয়াব মিললো 'এ কেল্লার হেফাজত নিরর্থক। তোমরা দুশমনের অবরোধ ভেদ করে বেরুতে পারলে বর্ধমান পৌছে যেয়ো। 'এ হুকুম যদি আমরা আটদশ দিন আগে পেতাম তাহলে এতগুলো জীবন বিনষ্ট হতো না। মীর জাফরের অযোগ্যতা ও বুযদীলীর ফলে কেবল একটি কেল্লাই আমাদের হাত-ছাড়া হয়নি বরং উড়িষ্যার তামাম এলাকার জন্যই বিপদ সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে। হুকুমত যদি আরো কিছুকাল এমনি করে তার সিপাহীসুলভ যোগ্যতার ফায়দা নেবার চেষ্টা করেন, তাহলে গোটা বাংলাই মারাঠা বর্গীদের শিকারভূমিতে পরিণত হবে। আপনি শুনে হয়রান হবেন, এমনি অবস্থার ভিতরেও মীর জাফরের সাথে কয়েক মিনিট আলাপ করবার জন্য আমায় দুদিন দেরি করতে হয়েছে বর্ধমানে।'

ঃ মীর জাফরের সাথে দেখা করে এসেছো তুমি?'

ঃ জী হ্যাঁ, দুদিন তার জওয়াবের প্রতীক্ষা করবার পর আমি জবরদস্তি করে তার মহলে ঢুকেছিলাম এবং সিপাহী আমায় ধরে নিয়েছিলো তার সামনে।'

মীর মদন বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, জাফর যাবতীয় দুষ্কৃতি সত্ত্বেও বাংলার শাসকের আত্মীয়। তুমি তার সাথে কোনো গোসতাখী তো করোনি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলো ঃ যদি কোনো বুযদীলকে বুযদীল বলা গোসতাখি হয়, তা হলে সে অপরাধ আমি করেছি। আলীবর্দী খানের সামনেও আমি এ কথা বলতে তৈরি যে, মীর জাফর তার আত্মীয় হলেও ফউজের কোনো মামুলি চাকরি নেবার যোগ্যতাও তার নেই।

মীর মদন কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে চিন্তা করে বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, আমি একজন সিপাহী এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারি। মীর জাফর সম্পর্কে আমার ধারণা তোমার ধারণা থেকে স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু আলীবর্দী খানের সামনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও কোনো ফায়দা হবে না। তাকে যখন মেদিনীপুর ও হুগলীর ফউজদারী দেওয়া হলো, তখন আমি তার বিরোধিতা করেছিলাম। মারাঠার বিরুদ্ধে তাকে ফউজের অধিনায়ক নির্বাচন করা ঠিক হবে না, আলীবর্দী খানকে আমি এই পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথায় তিনি মোটেই আমল দিলেন না। মীর জাফরের যোগ্যতা সম্পর্কে তার কোনো ভুল ধারণা নেই, কিন্তু বড়ো বড়ো উমরাহর বিদ্রোহ তাকে মীর জাফরের

মতো খোশামুদে লোকদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করছে। যে মীর জাফরের অযোগ্যতা বুযদীলীর জন্য উড়িষ্যার জনগণ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আলীবর্দী খানের সামনে তুমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে; কিন্তু মীর জাফর যখন তার সামনে আসবেন, তখন বাংলার শাসক তার কিছুই করতে পারবে না। মনিবের অন্তহীন ক্রোধের সময়ে কি করে তার পায়ে পড়তে হয়, তা মীর জাফর জানেন। তিনি বললেন ঃ আলীজাহ! আমি আপনার তুচ্ছ গোলাম! আমি ভুল করেছি। আমার কসুর আপনি মাফ করুন।' আলীবর্দী তার কথায় না হলেও চোখের পানিতে নরম হয়ে যাবেন। মীর জাফর যদি দেখেন যে, তার চোখের পানিও ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তিনি যাবেন মহলের বেগমদের কাছে। সেখানে গিয়ে বলবেন ঃ নওয়াব সাহেব আমার দুশমনদের কথায় ভুলে গেছেন। আমি মজলুম। আমার জন্য খোদার দিকে চেয়ে সুপারিশ করুন। এ বিশ্বস্ত গোলাম নওয়াব সাহেবের পায়ে পড়ে থাকবে, সালতানাতের দুশমনরা তা চায় না। আবার কিছুদিন পর নওয়াব সাহেব তাকে ডেকে বলবেন ঃ মীর জাফর! আমি তোমার আগের অপরাধ মাফ করে দিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থেকো। আর কোনো অভিযোগের মওকা যেনো না আসে কোনোদিন। তিনি তখন বলবেন ঃ আলীজাহ! আমার ধন-দৌলত বা পদমর্যাদার লোভ নেই।' আমায় অন্তত সেই সময় পর্যন্ত আপনার খেদমতের মওকা দিন, যতোক্ষণ না সিরাজুদ্দৌলা আপনার কাছ থেকে শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নেবার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং যতোক্ষণ না বাংলা থেকে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী উমরাহ দল খতম হয়ে যায়।"

মোয়াযযম আলী, আমার আশংকা হচ্ছে, তুমি মুর্শিদাবাদে এসে আলীবর্দী খানের কাছে মীর জাফরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, একথা বর্ধমানে তুমি তাকে অবশ্যি বলে এসেছো। আমার বিশ্বাস, তোমার আসার আগেই মীর জাফরের গুপ্তচর আলীবর্দী খানকে এ পয়গাম পৌঁছে দিয়েছে ঃ এক উদ্ধত নওজোয়ান হয়তো আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহসূচক ধারণা প্রকাশ করেছে। মুর্শিদাবাদের শাহীমহলের ভিতরে ও বাইরে তার চর প্রতি মুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার পৌঁছবার আগেই তার নির্দেশ হয়তো পৌঁছে গেছে তাদের কাছে। এখন, আমার সাথে মোলাকাত করবার পর তুমি যখনই গিয়ে আলীবর্দী খানের কাছে মীর জাফরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, অমনি এই ধরনের লোকেরা তাঁকে খবরদার করে দেবে যে, তুমি আমার তরফ থেকে এসেছো।'

মোয়াযযম আলী বিমর্ষ মুখে বললেন ঃ মীর জাফরের সামনে আপনিও যে এতটা অসহায় হয়ে পড়েছেন, তা আমি আগে বুঝিনি।'

মীর মদন জওয়াব দিলেন ঃ মোয়াযযম আলী, আমরা বড়ো দুর্যোগের দিনে জন্ম নিয়েছি, কিন্তু হায়, আমরা যদি সব অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম! বর্তমান পরিস্থিতিতে নওয়াব আলীবর্দী খান নিজেও অনুভব করেন যে, তিনি একই সময়ে সব রকম দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে লড়তে পারেন না। তাই তিনি বড়ো বড়ো বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য নিরুপায় হয়ে উপেক্ষা করেন ছোট ছোট বিপদকে। এখন তার পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মারাঠাদের দিকে। আমার পরামর্শে তিনি এখন উড়িষ্যা অভিযানের ভার মীর জাফরের পরিবর্তে আতাউল্লাহ খানের উপর ন্যস্ত করেছেন। দুদিনের মধ্যেই তিনি রওয়ানা হয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে। আজ তৃতীয় প্রহরে আলীবর্দী খান কয়েকজন ফউজী অফিসারের এক বৈঠক ডেকেছেন। যদি তুমি ওয়াদা কর যে, তুমি মীর জাফরের বিরুদ্ধে তোমার মনোভাব সংযত করে রাখবে, তাহলে যাতে তোমাকে বৈঠকে ডেকে নেওয়া হয়, তার চেষ্ট আমি করবো। তুমি সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবে এবং বৈঠকে মীর জাফরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো কথা না বলে যেসব কারণে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, পুরোপুরি স্বাধীনভাবে সেসব দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করতে পারবে। মীর জাফরের নির্বোধের মতো পিছু হটে আসার ঘটনা নিয়ে এক হফতা আগে যথেষ্ট আলোচনা হয়ে গেছে দরবারে। তুমি তার ব্যক্তিত্বের বিরূপ সমালোচনা করেও আলীবর্দী খানকে নতুন কিছু বোঝাতে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি অতীতের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিকার সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পার, তাহলে সম্ভবত উড়িষ্যার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার পর খুব শিগগিরই এমন সময় আসবে, যখন আমরা নিশ্চিত স্বস্তির সাথে মনোযোগ দিতে পারবো মীর জাফরের মতো ধরনের লোকদের প্রতি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার প্রথম পরামর্শ হবে যে, মারাঠাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে মীর জাফরের মতো লোকদের ফউজী ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে হবে।'

মীর মদন হেসে বললেন ঃ তোমার এ পরামর্শ দেবার প্রয়োজন হবে না, মীর জাফরকে ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া গেছে যে, তিনি আতাউল্লাহ খানের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং আতাউল্লাহ খানকে এখতিয়ার দেওয়া গেছে যে, তিনি কোনো অফিসারের কার্যকলাপে খুশি না হলে তাকে দয়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পারবেন।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ মারাঠারা যখন আমাদের কেল্লা অবরোধ করলো এবং কয়েকদিন ধরে মীর জাফরের কাছ থেকে কোনো চিঠির জওয়াব মিললো

না, তখন আমি শপথ করেছি যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমি ফউজী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবো, কিন্তু যেদিন আমি আমার সাথীদের লাশ বিনা কাফন ও কবরে ফেলে ওখান থেকে বেড়িয়ে আসি, সেদিন আমি আবার নতুন করে শপথ করলাম যে, আমি আর একবার অন্তত ওখানে ফিরে যাবো। আতাউল্লাহ খান সম্পর্কে আমি বড়ো বেশি কিছু জানি না, কিন্তু তার যোগ্যতার উপর যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমার আবেদন আমায় তারই সাথে পাঠিয়ে দিন।'

মীর মদন বললেন ঃ কিন্তু আমার ধারণা ছিলো, এত দীর্ঘদিন পর তুমি কিছুদিনের জন্য মুর্শিদাবাদে থাকতে চাইবে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ যে কেল্লায় আমার সাথীদের লাশ পড়ে রয়েছে, তা আমার কাছে মুর্শিদাবাদের চাইতেও বেশি প্রিয়।'

ঔ

মীর মদনের বাসভবন থেকে ফিরে মোয়াযযম আলী দেখলেন, দেওয়ানখানায় তার বাপ, ভাই ও হোসেন বেগ তার ইন্তেজার করছেন। সেখানে আরো বসে রয়েছেন মহল্লার পনেরো বিশজন লোক। তারা সবাই একে একে উঠে এলেন তার কাছে।

মীর্যা হোসেন বেগ মোয়াযযম আলীকে তার কাছে বসিয়ে বললেন ঃ বেটা, আমরা তোমার জন্য বহুক্ষণ ধরে ইন্তেজার করছি। তোমার জবান থেকে আমরা উড়িষ্যার অবস্থা জানবার জন্য অধীর। কয়েকদিন ধরে সীমান্ত এলাকা থেকে ক্রমাগত দুঃসংবাদ এসেছে। তাই আমরা তোমার জন্য খুবই পেরেশান। আমাদের সব ঘটনা শুনাও।'

জওয়াবে মোয়াযযম আলী মীর জাফরের অযোগ্যতা, মারাঠাদের জুলুম ও সীমান্ত কেল্লার ধ্বংসকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।

ইতিমধ্যে মহল্লার ছোট-বুড়ো-জেয়ান সবাই ক্রমাগত এসে ঢুকতে লাগলো বাড়ির ভিতরে। সাদেক বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করতে লাগলো ঃ ভাই থামো, ভিতরে জায়গা নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে গোলযোগ করো না। ভিতরে মীর্যা সাহেব বসে আছেন।

মোয়াযযম আলী তখখুনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। লোকগুলো পাগলের মতো ছুটে তার কাছে এসে তার সাথে মোসাফেহা করবার চেষ্টা করতে লাগলো। মাহমুদ আলী, হোসেন বেগ ও মহল্লার বাকি গণ্যমান্য লোক কামরা থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন এ দৃশ্য।

মোয়াযযম আলী যখন প্রাঙ্গণে সমবেত জনতার সাথে করে দেউড়িতে

পৌঁছলেন, তখন বাইরের গলিতে দেখা গেলো আর একটি জনতার ভিড়। প্রায় একঘণ্টা কাল তিনি লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাতে ব্যস্ত থাকলেন।

ইতিমধ্যে আসফ বেগ ও আফজল বেগ এসে গেছেন। তারা মোয়াযযম আলীকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে কোল দিলেন, খানিকক্ষণ পর মহল্লার লোক বিদায় নিয়ে চলে গেলে মোয়াযযম আলী দেওয়ানখানায় না বসে উপরতলার একটি কামরায় বসে আলাপ করতে লাগলেন বন্ধু-স্বজনদের সাথে।

পরদিন সারা মহল্লায় খবর রটলো যে, মোয়াযযম আলী আতাউল্লাহ খানের সাথে যাচ্ছেন উড়িষ্যা অভিযানে। তার ভাই ও হোসেন বেগের দুই পুত্র অভিযানের জন্য নিজ নিজ নাম পেশ করেছিলেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদের ফউজদার কেবল আসফ বেগকেই মোয়াযযম আলীর সাথে যাবার এজাযত দিয়েছেন।

তৃতীয় দিন মীর্যা হোসেন বেগের বাড়িতে মোয়াযযম আলীকে দাওয়াত দেওয়া হলো। মুর্শিদাবাদের প্রায় ষাটজন উমরাহ ও বড়ো বড়ো অফিসার সেখানে আমন্ত্রিত হলেন। এগারোটার কাছাকাছি সময়ে মীর্যা হোসেন বেগ মহল্লার কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে সাথে নিয়ে দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তার মহলের ভিতর প্রশস্ত সামিয়ানার নিচে সমবেত মেহমানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে ভিতর বাড়ির আঙিনার দরজার দিকে। আচানক এক কিশোর এসে হাজির হলেন মজলিসে। তার ডানে-বায়ে রয়েছেন মীর মদন, রাজা রাম মোহন লাল, আতাউল্লাহ খান ও মুর্শিদাবাদের ফউজদার। তাদের পিছনে ঢুকলেন মীর্যা হোসেন বেগ ও মহল্লার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। মণিমুক্তা-জওয়াহের সজ্জিত সুদর্শন কিশোর রাজকীয় আড়ম্বর সহকারে সামনে এগিয়ে এলেন এবং শামিয়ানার নিচে সমবেত মেহমানরা দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য। এই কিশোর বাংলার সালতানাতের ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজুদ্দৌলা। কতক লোকের সাথে তিনি অবাধে মোসাফেহা করলেন এবং বাকি লোকদের হাতের ইশারায় অথবা মৃদু হাস্যসহকারে সালামের জওয়াব দিয়ে এসে বসে পড়লেন দস্তরখানের উপর। খানার সময়ে মেহমানরা সিরাজুদ্দৌলার পরেই সবচাইতে বেশি নজর দিচ্ছিলেন মোয়াযযম আলীর দিকে। তিনি সিরাজুদ্দৌলার বাম দিকে আতাউল্লাহ খান ও হোসেন বেগের মাঝখানে বসেছিলেন। খানা শেষ হলে হোসেন বেগ উঠে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে সিরাজুদ্দৌলা, মীর মদন ও অন্যান্য বিশিষ্ট মেহমানদের শোকরিয়া জানালেন।

সিরাজুদ্দৌলা জওয়াবে বললেন ঃ মোয়াযযম আলীর জন্যই এ শানদার দাওয়াতের আয়োজন হয়েছে, তাই আমাদের সবার তার প্রতি শোকর-গুজারি করা উচিত। বাংলার ফউজের শক্তি সাহস, বাহাদুরী ও বিশ্বস্ততার গৌরবময় আদর্শ এ নওজোয়ানের প্রতি ইজ্জত প্রদর্শনের সুযোগ পাওয়ার চাইতে বড়ো খুশি আমাদের জন্য আর কি হতে পারে? আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই যে, উড়িষ্যা অভিযান থেকে মুর্শিদাবাদের ফউজ ফিরে এলে মীর্যা সাহেব এমনি আরো কয়েকবার দাওয়াত দেবার প্রয়োজন অনুভব করবেন।'

বাংলার সেনাবাহিনী মারাঠাদের উড়িষ্যার বারংবার পরাজিত করে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে পশ্চিম দিকে। আতাউল্লাহ খানের ফউজ তাঁবু ফেলেছে সীমান্ত থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। এক সন্ধ্যায় মোয়াযযম আলী এক হাজার সওয়ার সাথে নিয়ে এসে ঢুকলেন তাঁবুর ভিতরে। ঘোড়া থেকে নেমেই তিনি সোজা চলে গেলেন সিপাহ্সালারের খিমায়।'

আতাউল্লাহ খান তার কাতিবকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিচ্ছেন। মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ আমি দু'দিন ধরে তোমার ইন্তেজার করছি; তুমি বহুত দেরি করেছো।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করে আমি বহুত দূরে গিয়েছিলাম। এখন উত্তরের সব বন-জঙ্গল থেকে তারা দূর হয়ে গেছে। তা'ছাড়া পাঁচশ' কয়েদি সাথে নিয়ে আসার সমস্যা না থাকলে আমি দুদিন আগেই এখনে পৌঁছে যেতাম। কয়েদিদের মুখে আমি শুনেছি যে, সীমান্তের কেল্লায় এখন মারাঠাদের মাত্র এক হাজার সিপাহী মওজুদ রয়েছে। তাই আমি কালবিলম্ব না করে কেল্লার উপর হামলা করতে চাই।'

আতাউল্লাহ খান জওয়াব দিলেন ঃ কেল্লার উপর হামলা করবার জন্য তোমায় আরো কিছুদিন ইন্তেজার করতে হবে। কাল আমার কাছে খবর এলো যে, এখান থেকে চল্লিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে মারাঠাদের একদল লশকর বনের মধ্যে তাঁবু ফেলেছে। তাই আজ ভোরে আমি মীর জাফরের নেতৃত্বে পাঁচহাজার সিপাহী পাঠিয়েছি সেদিকে।'

মোয়াযযম আলী কিছুটা তিক্ত কণ্ঠে বললেন ঃ মীর জাফরকে এই ধরনের অভিযানে পাঠাার আগে দুশমন দলকে নিরস্ত্র করে গাছের সাথে বেঁধে রাখতে পারলে হয়তো এ অভিযান সফল হতো।

আতাউল্লাহ খান জওয়াব দিলেন ঃ মীর জাফর এ অভিযানে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন এবং আমিও তার অতীতের বদনাম মুছে ফেলবার মওকা দিতে চাচ্ছিলাম। তোমার দোস্ত আসফ বেগ তার সাথে চলে গেছেন। মীর জাফরের চাইতে তার সিপাহীসুলভ যোগ্যতার উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে বেশি। আমি তোমায় এ অভিযানে পাঠাবার ইচ্ছা করছিলাম, কিন্তু তুমি বড়ো দেরি করে এসেছো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ মীর জাফরের সাথী হিসাবে আসফ বেগের মতো সাহসী নওজোয়ানের নির্বাচন ঠিক হয়নি। আমার ইচ্ছা, আমায় এ অভিযানে যোগ দেবার জন্য পাঠানো হোক। আমার আরো ইরাদা রয়েছে যে, অভিযান শেষ করে ফিরে না এসে আমরা সীমান্ত-কেল্লার উপর হামলা করবো।'

জওয়াবে আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ আমি এক সিপাহী। মীর জাফর যদি কোনো বড়ো রকমের নির্বুদ্ধিতা না করে বসেন, তা হলে আমাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্যের প্রশ্ন উঠতেই পারে না।'

আতাউল্লাহ খান একটা নকশা হাতে নিয়ে খুলতে খুলতে বললেন ঃ বসো।'

মোয়াযযম আলী তার সামনে বসে পড়লেন। আতাউল্লাহ খান নকশার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বললেন ঃ এই হচ্ছে মারাঠাদের তাঁবু এবং আমি মীর জাফরকে এই রাস্তা ধরে যাবার নির্দেশ দিয়েছি। কাল সূর্যোদয়ের আগে তিনি হামলা করবেন দুশমনের উপর। আমার মতে তোমার দেরি করা ঠিক হবে না। তাজাদম সিপাহীর প্রয়োজন তোমার, তোমার জন্য আমি পাঁচশ সিপাহীকে হুকুম করছি তৈরি হতে। এর মধ্যে তোমার নিজের পথনির্দেশের জন্য এ নকশাটির নকল তৈরি করে নাও।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন এ এলাকা আমার নখদর্পণে। এই যে দেখুন, মারাঠাদের তাঁবু থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে সেই কেল্লা। এখানেই আমি কাটিয়ে এসেছি কয়েকটি বছর। এই জঙ্গলে আমি কতোবার মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করেছি। মারাঠা তাঁবুর আশপাশের টিলা, উপত্যকা ও নদী এখন আমার চোখের সামনে ভেসে রয়েছে। আমার একমাত্র আশঙ্কা, আমি হয়তো হামলার আগে পৌঁছতেই পারবো না।'

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে।'

মোয়াযযম আলী সিপাহসালারের সাথে খিমা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং প্রায় আধঘণ্টা পর পাঁচশ সওয়ার উত্তর-পশ্চিমের পথ ধরে এগিয়ে চললো।'

পরদিন ভোরে কয়েকটি টিলা অতিক্রম করার পর মোয়াযযম আলী তার সামনে দেখলেন নদীর কিনারে কাতারে কাতারে খিমা। সশস্ত্র সিপাহীদের কয়েকটি দল খিমাগুলোর মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে গেলেন সিপাহীদের একটি দলের কাছে। এক নওজোয়ান অফিসার এগিয়ে এসে সালাম করলেন তাকে। মোয়াযযম আলী কোনো ইতস্তত না করে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা রাতের বেলায় এখানে তাঁবু ফেলেছিলে কি?'

ঃ জী হ্যাঁ।'

ঃ ফউজ এখান থেকে কতো আগে রওয়ানা হয়ে গেছে?'

ঃ প্রায় দেড় ঘন্টা।'

ঃ রাতের বেলায় দুশমনের গতিবিধি সম্বন্ধে কোনো খবর পাওয়া গিয়েছিলো?'

ঃ জী হ্যাঁ! বনের ভিতর দিয়ে ফউজের পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত হবে না ঘোড়ায় চড়ে, এ নিয়ে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আসফ বেগের ধারণা যে, ফউজের এর আগে পায়দল যাওয়া উচিত, কিন্তু মীর জাফর বললেন যে, আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

মোয়াযযম আলী ঠোঁট কামড়ে বললেন ঃ মীর জাফর বুঝে নিয়েছেন যে, পালাবার জন্য পায়ের চাইতে ঘোড়াই বেশি কাজে লাগবে।'

এরপর তিনি সিপাহীদলের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন লোক আমার সাথে পায়দল চলো, আর দুশো লোক ঐ নদীর কিনারে গাছ পাথরের আড়ালে ঘাঁটি বানাও। বাকি তামাম সিপাহী ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এই টিলার পিছনে গা-ঢাকা দাও। আমার বিশ্বাস, মীর জাফর দুশমন বাহিনীকে শিগগিরই নিয়ে আসবেন এখানে।'

তিনি তাঁবুর মুহাফিজকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি তোমায় হুকুম দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে খিমা ভেঙে ফেলো আর রসদসামগ্রী টিলার পিছনে নিয়ে যাও।'

নওজোয়ান অফিসার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন ঃ কিন্তু জনাব, মীর জাফরের হুকুম ছাড়া .....?

মোয়াযযম আলী ধমকের সুরে বললেন ঃ রাতের বেলা তোমরা এখানে তাঁবু গেড়ে থাকলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, মীর জাফরের হুকুম দেবার হুঁশ থাকবে না, আর আমি তার সামনেই তোমায় হুকুম অমান্য করার শাস্তি দিতে পারবো।'

ঃ কিন্তু জনাব, আমি কোনো হুকুম অমান্য করিনি। আমি শুধু বলেছি যে, মীর জাফর ....।'

মোয়াযযম আলী তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন ঃ তোমায় বলতে হবে না কিছু। দশ মিনিট পর আমি এখানে তাঁবুর কোনো চিহ্ন দেখতে চাই না।'

বহুত আচ্ছা, জনাব।'

আচানক দূর থেকে বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেলো। মোয়াযযম আলী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তার বন্দুক সামলে নিয়ে বললেন ঃ বাহাদুর দল! জলদি করো। মীর জাফর আমার প্রত্যাশার চাইতে আগেই ফিরে তশরীফ আনছেন।'

পঞ্চাশজন সিপাহী ঘোড়া থেকে নেমে মোয়াযযম আলীর পিছু পিছু নদীতে নেমে পানি পার হয়ে গায়েব হয়ে গেলো বনের মধ্যে। প্রায় এক মাইল পথ চলবার পর তারা শুনতে পেলো ঘোড়ার আওয়াজ। মোয়াযযম আলী সিপাহীদের ইশারা করলেন এবং তারা ডানে বায়ে ছড়িয়ে গিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেলো বাংলার ফউজের কতক সওয়ার। তাদের মধ্যে একজন মীর জাফর।

ঃ থামুন, থামুন!' মোয়াযযম আলী দু'হাত বাড়িয়ে তাদেরকে ফিরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা গাছ ও ঝোপঝাড় থেকে গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেলো। তারপর দেখা দিলো আরো কয়েকটি দল। এক অফিসার মোয়াযযম আলীকে দেখে ঘোড়া থামালেন। মোয়াযযম আলী এগিয়ে এসে তার ঘোড়ার বাগ ধরতে ধরতে প্রশ্ন করলেন ঃ কেন তোমরা পালাচ্ছো?'

ঃ মারাঠারা পথে আমাদের উপর হামলা করেছিলো। আমাদের বেশিরভাগ ফউজ তাদের ঘেরের মধ্যে পড়ে গেলো।'

মোয়াযযম আলী চিৎকার করে বললেন ঃ কিন্তু তোমরা কেন ভাগছো?

ঃ মীর জাফরের হুকুম।'

ঃ মীর্যা আসফ বেগ কোথায়?'

ঃ হামলার সময়ে তিনি তার এক হাজার ফউজ নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ঢুকলেন বনের মধ্যে, কিন্তু তাদের পরিণাম কি হলো, জানতে পারিনি।'

মোয়াযযম আলী ঃ আসফের এক হাজার যোদ্ধা এখনো বনের মধ্যে থাকলে মারাঠারা খোলা ময়দানে লড়তে আসবে না তোমাদের সাথে। তোমরা তামাম সওয়ারকে এখানে থামাবার চেষ্টা করো, আমি তাদের উপর জওয়াবি হামলা করবো।'

অফিসার জওয়াব দিলেন ঃ কিন্তু মীর জাফর এতে মনে করবেন যে, আমরা তার হুকুম অমান্য করেছি।'

মোয়াযযম আলী গর্জন করে বললেন ঃ মীর জাফর মুর্শিদাবাদে পৌছবার আগে দম নেবে না, আর তোমরা এখন আমার পরিচালনায় রয়েছো। যদি কোনো সওয়ার এক পা আগে যাবার চেষ্টা করে, তা হলে আমি আমার সিপাহীদের হুকুম দেবো বিনাদ্বিধায় গুলি করতে।'

অফিসার বললেন ঃ আপনি এ জিম্মাদারী নিজের কাঁধে নিলে আমি পালাবার পরিবর্তে আপনার সাথে থেকে জান দেওয়াকেই গৌরবের কারণ মনে করবো।'

ইতিমধ্যে প্রায় সাতশ' সওয়ার সেখানে এসে জমা হয়েছে। অফিসারের

হুকুমে তারা বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের পিছনের সাথীদের থামাতে লাগলো। খানিকক্ষণ পর সেখানে সিপাহীর সংখ্যা দাঁড়ালো চার হাজারে। মোয়াযযম আলী আটশ সিপাহীকে হুকুম দিলেন তাদের ঘোড়া নিয়ে নদীর ধারে যেতে। বাকি ফউজকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে তারা এগিয়ে যেতে শুরু করলেন বনের পথ ধরে। পথে সিপাহীদের আরো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দল এসে মিলিত হলো তাদের সাথে। বনের মধ্যে কোথাও কোথাও মারাঠাদের বিচ্ছিন্ন দলের সাথে তাদের সংঘর্ষ হলো, কিন্তু মামুলি লড়াইয়ের পর তারা পালিয়ে গেলো।

প্রায় দুঘন্টা পর একদিক থেকে তাদের কানে এলো বন্দুকের তীব্র আওয়াজ ও যুদ্ধরত লোকদের কোলাহল ধ্বনি। তারা ঘন ঝোপঝাড় ও গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে অর্ধ-বৃত্তাকারে এগিয়ে গেলেন। মোয়াযযম আলী সামনে দেখতে পেলেন একটি ছোট টিলা। কয়েকটি লোককে সাথে নিয়ে তিনি ছুটে গিয়ে চড়লেন টিলার উপর। টিলার দক্ষিণে দেখা গেলো একটি ছোট হ্রদ। তার কিনারে আসফ বেগের সিপাহীদল ও মারাঠাদের মধ্যে চলছে তুমুল লড়াই। দেখতে দেখতে টিলা থেকে নিচে নেমে তিনি ফউজকে নতুন করে নির্দেশ দিলেন।

খানিকক্ষণ পর বাংলার লশকর ডান ও বাম দিক থেকে গাছ ও ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল নিয়ে হ্রদের ধার ঘিরে ফেলে মারাঠাদের উপর হামলা করলো। মারাঠাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি, কিন্তু তাদের জন্য এ হামলা যেমন তীব্র, তেমনি অপ্রত্যাশিত। প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে মোয়াযযম আলীর সিপাহীরা হ্রদের আশেপাশে দুশমনদের লাশের স্তূপ বানিয়ে ফেললো। বিশৃঙ্খল মারাঠা ফউজ ছুটে পালাতে লাগলো এদিক ওদিক।

প্রায় চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ময়দান সাফ হয়ে গেলো। পরাজিত দুশমনদের প্রায় দেড়শ আতঙ্কগ্রস্ত সিপাহী হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি ছোট্ট দ্বীপে জমা হয়েছিলো; তারা এবার হাতিয়ার সমর্পণ করলো। বাংলার দেড়শ সিপাহী জখমি আর আশিজন শহীদ হলো। আসফ বেগ সারা গায়ে জখম নিয়ে হ্রদের কিনারে এক গাছের তলায় পড়ে কাতরাচ্ছেন। কয়েকজন সিপাহী ও অফিসার তার আশেপাশে দাঁড়ানো। মোয়াযযম আলী ছুটে এসে আসফের কাছে বসে পড়লেন।

আসফ তার দিকে তাকালেন। তার ঠোঁটের উপর ভেসে উঠলো এক টুকরো বিষণ্ন হাসি। তিনি বললেন ঃ দোস্ত তুমি খানিকটা দেরিতে এসেছো।'

মোয়াযযম আলী আশেপাশে দাঁড়ানো সিপাহীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ অস্ত্র চিকিৎসক ডাকো, জলদি করো।'

আসফ বেগ অস্পষ্ট আওয়াজে বললেন ঃ অস্ত্রচিকিৎসকের দরকার হবে না।

তুমি আমার সাথে নিশ্চিন্ত মনে কথা বলতে থাক। তোমার কাছে অনেক কিছু বলবার আছে আমার। তুমি এখানে আসবে, সে আশা আমি করিনি। খানিকক্ষণ আগেও আমি ভেবেছি যে, তোমার কাছে অনেকগুলো কথাই আমার বলা হলো না।' তারপর তিনি আশেপাশের লোকদের ইশারা করলে তারা সেখান থেকে সরে গেলো।

ঃ মোয়াযযম আলী।' আসফ কিছুটা ইতস্তত করে বললেন ঃ এখানেই আমায় দাফন করো। আব্বাজানকে বলো যে, সবগুলো জখমই আমি সিনা পেতে নিয়েছি। আফযলকে আমার তরফ থেকে নসীহৎ করবে সে যেনো কখনো কোনো বুযদীল মানুষের নেতৃত্বে লড়বার ভুল না করে। আমি আমার ফউজের সিপাহীদের তোমার হাতে সপে যাচ্ছি। আমার যেসব সাথী শহীদ হয়ে গেছে তাদের আপনজনদের জন্য হুকুমাত থেকে সাহায্য ব্যবস্থা করা হবে তোমার ফরজ। আমার কামনা, তুমি কখনো উড়িষ্যার গভর্ণর হয়ে আসবে আর আমার কবরের কাছে এসে বলবে ঃ আসফ, আমি তোমায় ভুলিনি।' আব্বাজানের ইচ্ছা ছিলো, এ অভিযান থেকে ফিরে গেলে আমার শাদী দেবেন। বিদায় নেবার আগে তিনি আমায় বলেছিলেন যে, সেদিন ঢাকার এক উঁচু ঘর থেকে এসেছিলো আমার শাদীর পয়গাম। তোমার সম্পর্কে আমার অন্তরে ছিলো একটা আকঙ্ক্ষা, কিন্তু হায়, এখানে আসার আগে আমি আব্বাজানকে যদি কিছু বলে আসতে পারতাম! মোয়াযযম আলী এক ভাইয়ের মুখ থেকে এ কথাগুলো তোমার কাছে মনে হবে বিস্ময়কর, কিন্তু এখন আর তোমায় এ কথা বললে কোনো ক্ষতি হবে না যে, আমি আমার দীলের মধ্যে ফরহাতের ভবিষ্যৎ তোমার সাথে জড়িত করে রেখেছি। মোয়াযযম, বোনটি আমার বড়ো প্রিয়! আম্মাজান তাকে অন্যত্র বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তার দীলের খবর জানতাম। তাই আমি বিরোধিতা করেছি। আব্বাজান তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি ফয়সালা করবেন, তা আমি জানি না, কিন্তু তার ইরাদা অপর কিছু হলে আমার ইচ্ছাটুকু তাকে অবশ্যি জানাবে। ফরহাতের দীলের খবর আমি জানি বলেই কথাগুলো বলছি। ফরহাত তোমায় ভালোবাসে। তুমি যখন উড়িষ্যার ময়দানে চলে যাচ্ছিলে, তখন তার চোখের আঁশুই সব মনের কথা জানিয়েছে আমায়। আমার ছোট্ট বোনটিকে আমি কাঁদতে দেখিনি আর কখনো।'

কথাটুকু বলে আসফ বেগ চোখ বন্ধ করলেন।

মোয়াযযম আলী এক সিপাহীর কাছে পানি চাইলে সে তার পাত্রটি খুলে এগিয়ে দিলো। মোয়াযযম আলী আসফের গর্দানের তলায় হাত দিয়ে তুললেন

এবং কয়েক ঢোক পান করিয়ে তার মাথাটা রাখলেন নিজের কোলের উপর।

আসফ বেগ তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে যেনো আমি আমার শেষ কর্তব্য সম্পাদন করেছি।'

এমনি করে আসফের প্রায় এক ঘন্টা কাটলো। কিছুক্ষণের জন্য তার হুঁশ ফিরে আসে, আবার মোয়াযযম আলীর কাছে দু'একটা কথা বলেই তিনি বন্ধ করেন চোখ দু'টি।

মোয়াযযম আলীর কথা বলবার অথবা নড়বার শক্তিও লোপ পেয়ে গেছে। তিনি প্রস্তরমূর্তির মতো নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে। ফউজের সিপাহীরা কাছে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নত করে। আসফ বেগ শেষবারের মতো চোখ মেলে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন নীল আসমানের দিকে। ডুবুডুবু আওয়াজে তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন ঃ আব্বাজান, আম্মিজান, আফযল, ফরহাত'- এই ক'টি কথা। তারপর তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

মোয়াযযম আলী প্রথমে তার নাড়িতে হাত রাখলেন, তারপর কান লাগালেন তার সিনায়। 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' বলে তিনি তার মাথাটা নামিয়ে রাখলেন জমিনের উপর। চোখ থেকে উছলে ওঠা অশ্রুধারা মুছে তিনি তাকালেন সাথীদের দিকে। তাদের সবারই চোখে ছলছল করছে অশ্রু। বনের বাণীহীন আবহাওয়ায় শোনা যেতে লাগলো হালকা কান্নার আওয়াজ।

মোয়াযযম আলী হুকুম দিলেন শহীদানকে দাফন করতে। তারপর লড়াইয়ের বিবরণ মীর জাফরকে জানাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন একজন অফিসার ও কয়েকজন সিপাহীকে।

নদীর কিনারে মীর জাফর অধীর চিত্তে ফউজের ইন্তেজার করছেন। মোয়াযযম আলীকে দেখেই তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে এসে বললেন ঃ নওজোয়ান, তোমার এ পদক্ষেপ আমার ইচ্ছানুরূপ হয়নি। আমার ইচ্ছা ছিলো যে, মারাঠাদের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করবো। কিন্তু আমি তোমায় মোবারকবাদের যোগ্য মনে করছি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আপনার পিছু ধাওয়া করবার জন্য মারাঠাদের খোলা ময়দানে আসবার প্রয়োজন ছিলো না। বিশেষ করে আসফ বেগের এক হাজার সিপাহীর উপর তাদের তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করবার

সুযোগ হয়েছিলো তখন।'

মীর জাফর বললেন ঃ আসফ বেগের মওতের জন্য আমার আফসোস হচ্ছে, কিন্তু তিনি আমার হুকুম অমান্য না করলে এমন পরিস্থিতি হতো না।'

ঃ কিন্তু আপনি যদি তার মতো জান দেওয়াটা পছন্দ করতেন না হলেও এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।'

মীর জাফরের মুখ ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেলো, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশি কথা কাটাকাটি করার প্রয়োজনবোধ করলেন না।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি চাই, অবিলম্বে আমায় এখান থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে এক কেল্লার উপর হামলা করবার এজাযত দেওয়া হোক।'

ঃ আগে এখান থেকে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে এ অভিযানের জন্য আতাউল্লাহ খানের এজাযত হাসিল করলেই কি ভালো হয় না।'

ঃ আমি আতাউল্লাহ খানের এজাযত নিয়ে এসেছি। আমার প্রয়োজন শুধু আপনার সিপাহীদের। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এদিক থেকে পরাজিত হয়ে পালাবার পর মারাঠারা সেই কেল্লার দিকেই যাবে। তাই আমি বিলম্ব না করে এগিয়ে যেতে চাচ্ছি।

মীর জাফর বললেন ঃ এ অভিযানে আমিও যাবো তোমার সাথে।'

ঃ কিন্তু এ ছোটখাটো অভিযানের জন্য আপনার তকলিফ করবার প্রয়োজন হবে না। আপনি শুধু আমায় আপনার ফউজের দেড় হাজার সিপাহী সাথে নিয়ে যাবার এজাযত দিন।'

ঃ না, আমি নিজেও যাবো।'

ঃ বহুত আচ্ছা! কিন্তু আপনি মীর্যা হোসেন বেগকে আসফের মৃত্যুর খবর দেবার জন্য একজন লোক পাঠিয়ে দিন।'

ঃ তার ইন্তেজাম হবে, এখন বলো, কখন আমাদেরকে রওয়ানা হতে হবে।'

ঃ এখখুনি। এই মুহূর্তে।' মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন।

১৫

পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে বাংলার ফউজ কঠিন সংঘর্ষের মোকাবিলা করেই সীমান্ত কেল্লা দখল করে নিলো। এ অভিযানে মীর জাফর এক নির্বাক দর্শকের বেশি কিছু ছিলেন না। ফউজের পরিচালনার ভার ছিলো প্রকৃতপক্ষে মোয়াযযম আলীর উপর। কিন্তু বিজয়ের পর তিনি আতাউল্লাহ খান, উড়িষ্যার সুবাদার মীর মদন ও আলীবর্দী খানের কাছে চিঠি লিখে জানালেন।

ঃ আল্লাহ আমাদেরকে অতি বড়ো বিজয়-গৌরব দান করেছেন। আমরা উড়িষ্যার সীমান্তে মারাঠাদের সবচাইতে বড়ো আড্ডা দখল করে নিয়েছি। আমি আশা করি, এরপর দুশমন দীর্ঘকাল ধরে এই আঘাতের জ্বালা ভোগ করতে থাকবে।'

আলীবর্দী খানের কাছে লিখিত চিঠির শেষে তিনি লিখলেন ঃ এ দীনাতিদীন গোলাম মহিমাময় হুজুরের হুকুম যথাসাধ্য তামিল করেছে। এখন আমার সবচাইতে বড়ো আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে এসে হুজুরের কদমবুচি করবার গৌরব লাভ করা। হুজুরকে আমি খোশখবর শোনাচ্ছি যে, উড়িষ্যার সরজমিন থেকে দুশমন দল দূর হয়ে গেছে।'

তৃতীয় দিন আতাউল্লাহ খান বাকি ফউজ সাথে নিয়ে সেখানে পৌছলেন। তিনি প্রায় দু'হফতা থাকলেন কেল্লায়। ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত এলাকা থেকে মারাঠাদের নতুন হামলার খবর এলো এবং তিনি মোয়াযযম আলীকে হুকুম দিলেন দু'হাজার সিপাহী নিয়ে এগিয়ে যেতে।

দশদিন পর মোয়াযযম আলী ফিরে এসে খবর দিলেন যে, উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত এলাকা থেকে মারাঠারা দূর হয়ে গেছে। আতাউল্লাহ খান কেল্লার হেফাজতের ভার মোয়াযযম আলীর উপর ন্যস্ত করে এগিয়ে চললেন কটকের পথে।

তিন মাস পর মোয়াযযম আলী দুমাসের ছুটি নিয়ে রওয়ানা হলেন মুর্শিদাবাদে।

একদিন দুপুরবেলা মীর্যা হোসেন বেগ জ্বরে কাতর হয়ে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছেন। তার বিবি, আফযল ও ফরহাত তার শয্যার পাশে উপস্থিত। এক পরিচারিকা কামরায় ঢুকে মোয়াযযম আলীর আগমনবার্তা জানালো। আফযল জলদি করে উঠে কামরার বাইরে গেলেন। ফরহাত সামনের কামরায় ঢুকে আধা-খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলেন।

একটু পরেই মোয়াযযম আলী আফযলের সাথে প্রবেশ করলেন কামরার ভিতরে। হোসেন বেগ তাকে দেখেই উঠে বসলেন। আফযলের মা তখন বহু কষ্টে রোধ করছেন তার কান্নার বেগ।

মোয়াযযম আলীর চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত। তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন ঃ চাচাজান! চাচীজান! আমার আফসোস, আমি শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত আসফের সাথে যেতে পারিনি।'

ঃ বসো, বেটা!' হোসেন বেগ পিতৃস্নেহ সহকারে তার দিকে তাকিয়ে বললেন।

তিনি বসলেন। কিছুক্ষণ ধরে কামরাটি নিস্তব্ধ-নিঝুম। অবশেষে হোসেন বেগ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন ঃ মোয়াযযম! আমি তার কবর দেখবার জন্য ওখানে যেতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু অসুস্থ হয়ে সফরের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি তার শাহাদতের সব ঘটনা তোমার মুখ থেকে শুনবো।'

মোয়াযযম আলী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা বিবৃত করলেন। আসফের মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি তার আওয়াজ সংযত করে রাখতে পারেননি। শেষ মুহূর্তে আসফ তার বোনের কথা স্মরণ করেছেন, ফরহাত সম্পর্কে এর বেশি কিছু তিনি বলতে পারলেন না।

এরপর মোয়াযযম আলী সকাল- সন্ধ্যায় হোসেন বেগের শুশ্রূষার জন্য গিয়ে কয়েক ঘন্টা করে তার কাছে বসে কাটাতেন। মুর্শিদাবাদে এমন করে বিশ দিন কেটে যাবার পর মীর মদন তাকে কাছে ডেকে বললেন ঃ মোয়াযযম আলী ! সীমান্তের অবস্থা ভালো নয়। মারাঠা শক্তি আবার মাথা তুলছে। গুপ্তচর আলীবর্দী খানকে খবর দিয়েছে যে, আতাউল্লাহ খান ও মীর জাফর কটকে বসে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র করছেন হুকুমাতের বিরুদ্ধে। তুমি অবিলম্বে সীমান্তের কেল্লায় পৌঁছে যাও। তারা মারাঠাদের সাথে কোনো চক্রান্তে লিপ্ত হতে না পারেন সেদিকে খেয়াল রাখবে।'

ঃ অবস্থা যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে আমি আজই রওয়ানা হয়ে যাবো।'

মীর মদন মেঝের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে মোয়াযযম আলীর দিকে

এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এ হচ্ছে তোমার নতুন পদ সম্পর্কে আলীবর্দী খানের হুকুমনামা। উড়িষ্যার নায়েব ফউজদার হিসাবে তোমায় সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর মুহাফিজ নিযুক্ত করা হয়েছে। সাধারণভাবে তোমার পরিচালনায় থাকবে দু'হাজার সিপাহী। আর কটকের সুবাদারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সীমান্তরক্ষী চৌকী নির্মাণের জন্য সরকারি মালাখানা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হবে। আজ তোমার রওয়ানা হতে মুশকিল হবে। তাই আমার ইচ্ছা, তুমি কাল ভোরের দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। আতাউল্লাহ্ খানকে হুকুম দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি তোমার হাতে এক হাজার সিপাহী ন্যস্ত করে দেবেন।'

মীর মদনের সাথে মোলাকাতের পর মোয়াযযম আলী যখন ঘরে ফিরলেন তখন তার মা বালাখানার এক কামরায় বসে রয়েছেন।

মোয়াযযম আলী তার কাছে বসতে বসতে বললেন ঃ আম্মাজান ! আমার ছুটি বাতিল হয়ে গেছে। আমি কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

মা পেরেশান হয়ে বললেন ঃ বেটা! তোমায় কোনো বিপজ্জনক অভিযানে পাঠানো হচ্ছে না তো?'

ঃ না আম্মাজান ! আমায় উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর নায়েব ফউজদার নিযুক্ত করা হয়েছে।'

ঃ নায়েব ফউজদার ?' মা চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন।

ঃ কেন আম্মাজান, আপনি কি মনে করেন যে, নায়েব ফউজদার খুব বড়ো হয়ে থাকেন?'

ঃ না বেটা! আমি তো দোয়া করি, তুমি একদিন বাংলার ফউজদার সিপাহসালার হবে। তোমার আব্বাজান এ খবর শুনে খুব খুশি হবেন। হ্যাঁ একটা কথা আমি তোমায় বলতে ভুলে গেছি। আসফের মৃত্যুর খবর আসবার কয়েক দিন আগে মীর্যা হোসেন বেগের আত্মীয়-ঢাকার এক বড়ো রইস তার বিবিকে নিয়ে তার বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি তার ছেলের জন্য ফরহাতের সম্বন্ধ দিয়েছিলেন। হোসেন বেগের বিবিরও ইচ্ছা ছিলো ওখানেই মেয়ের শাদী দিতে, কিন্তু মীর্যা সাহেব এই বলে এড়িয়ে গেলেন যে, আসফ ফিরে এলে তিনি তাকে নিয়ে ঢাকায় গিয়ে ছেলেটি দেখে ফয়সালা করবেন। বেটা! কখনো কখনো আমি ভেবেছি যে, ফরহাত হবে আমার ঘরের বৌ, কিন্তু একদিন আমি তোমার আব্বাকে একথা বললে তিনি আমায় দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ মনে হয়, তুমি আমায় এখান থেকে তাড়াতে চাচ্ছো। মীর্যা সাহেব যে আমাদের প্রতি এতটা মেহেরবানী করেন, তাতে তুমি ভুল বুঝো না। তুমি জানো না, যে খান্দান থেকে ফরহাতের শাদীর পয়গাম এসেছে, তারা দেড়-দুশো গাঁয়ের মালিক। আমাদের কোনো মর্যাদা থাকলেও মীর্যা হোসেন বেগের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা

করা যায় না যে, তিনি তার পুরনো আত্মীয়দের বাইরে মেয়ের সম্বন্ধ করবেন।'

-তোমার আব্বাজান মানা না করলে হয়তো আমি ফরহাতের মাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। বড়ো ভালো মেয়ে ফরহাত। তাকে আমার ঘরের বৌ করে আনা আমার জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো আকাঙ্ক্ষা। তাই আমি তোমার তরক্কীর জন্য এত দোআ করছি। আমি কখনো কখনো ভাবি , মীর সাহেব অকারণে তোমায় এত ভালোবাসেন না। হয়তো তিনি ফরহাতের সম্পর্কে দিলের মধ্যে কোনো ফয়সালা করে রেখেছেন। হয়তো তিনি সেইদিনেরই ইন্তেজার করছেন, যেদিন তুমি ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে উঁচু খান্দানের ছেলেদের সমকক্ষ হবার দাবি করতে পারবে। নইলে ফরহাতের জন্য লক্ষ্মৌর এক বহুত বড়ো খান্দান থেকে পয়গাম এসেছিলো আর মীর্যা সাহেব সেদিকে আমলও দিলেন না।'

ঃ আম্মাজান !'

ঃ কি হলো, বেটা ?'

ঃ কিছু না, আম্মাজান। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমার আগে ভাই ইউসুফের কথাটা আপনার চিন্তা করা উচিত ?'

মা জওয়াব দিলেন ঃ ইউসুফের জন্য তিনটা সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু তিনটি মেয়ের কোনটাই আমার পছন্দ নয়। আবদুল্লাহ খানের মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছিলো, কিন্তু ওরা এখান থেকে কলকাতা চলে গেছেন। তোমার আব্বাজান কয়েকবার ওখানে যাবার ইরাদা করেছেন, কিন্তু সময় করতে পারেননি। গত মাসে তার চিঠি এসেছে যে, এবার তিনি হজে যাচ্ছেন। তিনি হজ থেকে ফিরে এলে আমি তোমার আব্বাজানকে পাঠাবো অবশ্যি।'

মোয়াযযম আলী খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

ঃ কোথায় যাচ্ছো ?' মা প্রশ্ন করলেন।

ঃ মীর্যা সাহেবের বাড়িতে।'

দরজার কাছে গিয়ে মোয়াযযম আলী ফিরে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আম্মাজান, সত্যি বলুন, ফরহাতকে আপনি সত্যি খুব পছন্দ করেন?'

ঃ হ্যাঁ বেটা !'

ঃ কিন্তু আম্মাজান, আমি যে ওকে মোটেই পছন্দ করি না।'

মিথ্যাবাদী কোথাকার!' মা হাসতে হাসতে বললেন। মোয়াযযম আলী হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। :-)

ছয়

আতাউল্লাহ্ খান কটকের কেল্লার একটি কামরায় উপবিষ্ট। মোয়াযযম আলী কামরায় প্রবেশ করে তার সাথে মোসাফেহা করে বসলেন তার সামনের আসনে।

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ কালই আমি তোমার সম্পর্কে হুকুমনামা পেয়েছি। আমি তোমায় মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আমার বিশ্বাস, তোমার এই পদলাভ উড়িষ্যার কল্যাণের কারণ হবে। তুমি কবে যেতে চাচ্ছো?

ঃ ফউজ তৈরি থাকলে কাল ভোরেই আমি রওয়ানা হয়ে যাবো এখান থেকে।'

ঃ ফউজের জন্য কয়েকদিন তোমায় ইন্তেজার করতে হবে। যে দলটি আমি তোমার পরিচালনায় দিতে চাচ্ছি, সেটি বর্ধমান ও মেদিনীপুরের মাঝখানে তাঁবু ফেলে রয়েছে। আমি আজই হুকুম পাঠাচ্ছি ওখানে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ সিমান্ত এলাকায় মারাঠাদের নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার দরুন আমার এখানে দেরি করা ঠিক হবে না। আপনি সিপাহীদের সরাসরি সীমান্ত কেল্লায় পৌঁছে যাবার হুকুম পাঠালেই ভালো হবে। কাল ভোরেই আমি রওয়ানা হবো এখান থেকে।'

ঃ বহুত আচ্ছা। আমি এখখুনি ওদেরকে হুকুম পাঠাচ্ছি। আজকের জন্য তুমি আমার মেহমান। মীর জাফরের কাছে আমি তোমার তরক্কীর খবর বলেছি। তিনি শুনে খুব খুশি হয়েছেন।'

ঃ মীর জাফর এখানে? আমার তো ধারণা ছিলো যে, তিনি বর্ধমানে।'

আতাউল্লাহ খান জওয়াব দিলেন ঃ তিনি একটা জরুরি পরামর্শের জন্য এখানে এসেছেন। মনে হয়, হুকুমাত তার উপর খুশি নন। তুমি মুর্শিদাবাদে হুজুর নওয়াব সাহেবের সাথে দেখা করেছিলে?'

ঃ না, আমি ওখানে শুধু মীর মদনের সাথেই দেখা করেছিলাম। মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন।

ঃ আচ্ছা, মীর মদনের সাথে মীর জাফরের সম্পর্কে তোমার কোনো কথা হয়েছে?'

ঃ না, তার সাথে বিশেষ কোনো কথা তো হয়নি।'

আতাউল্লাহ খান খানিকটা ইতস্তত করে বললেন ঃ মীর জাফরের ধারণা, দরবারে কোনো কোনো উমরাহ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।'

ঃ সে সম্পর্কে আমি কি জানতে পারি?'

ঃ মীর জাফর বলছিলেন, মুর্শিদাবাদে নাকি আমারও বিরুদ্ধে নানা রকম কাহিনী রটছে।'

ঃ আমার তো ধারণা, মারাঠাদের বিরুদ্ধে আপনার কার্যকলাপে হুকুমাত আপনার উপর খুবই খুশি তথাপি আপনি কিছু মনে না করলে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দেবো।'

ঃ তোমার মতো বিশ্বস্ত দোস্তের সৎপরামর্শের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে আমার। বলো।'

ঃ আমার মনে হয়, মীর জাফর সম্পর্কে আপনরা সতর্ক থাকা উচিত। মীর জাফর কোনো ভুল করলে তার নিরাপত্তার সবচাইতে বড়ো কারণ, তিনি বাংলার শাসকের আত্মীয়।'

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ তুমি জানো, ব্যক্তিগতভাবে আমি মীর জাফরকে পছন্দ করি না।'

ঃ আমি সেইজন্য আপনাকে সতর্ক থাকবার পরামর্শ দিচ্ছি।'

ঃ আমি তোমার শোকরগুজারি করছি। কিন্তু কেন তোমার মনে হলে যে, মীর জাফর আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন?'

মোয়াযযম আলী পেরেশান হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ আমি তো বলিনি যে, মীর জাফর আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আমি কেবল আপনাকে সতর্ক থাকতেই বলেছি।'

আতাউল্লাহ খান কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ মোয়াযযম আলী! আমি তোমায় আমার দোস্ত মনে করি। তুমি কি যেনো গোপন করছো। মুর্শিদাবাদে আমার দুশমনরা আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করলে তা আমায় জানানো তোমার কর্তব্য।'

ঃ আপনার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রের খবর আমার জানা নেই। আপনি এতটা পেরেশান হবেন জানলে এ ধরনের কথা আমি বলতাম না। মীর জাফর সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হয়ে গেছে যে, বাংলার যে কোনো ষড়যন্ত্র সবার আগে তারই মস্তিষ্কে জন্ম নিয়ে থাকে। তিনি ক্ষমতালোভীকে প্রথমে হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দেন। তারপর নিজের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবার জন্য তিনি বিদ্রোহের খবর জানিয়ে দেন আলীবর্দী খানকে। ফলে বিদ্রোহ দমন করা হয়। কতক অপরাধী আর তাদের সাথে কতক বেগুনাহ মানুষ মারা পড়ে, আর মীর জাফরের প্রমাণ করবার সুযোগ হয় যে, তার অন্তহীন অযোগ্যতা সত্ত্বেও হুকুমাতের জন্য তার প্রয়োজন অপরিহার্য। আমি তো মনে করেছি যে, এমন একটা দিন

আসবে যেদিন উমরাহর বিদ্রোহ আলীবর্দী খানকে এমন হতভম্ব করে দেবে যে, মীর জাফর ছাড়া আর কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী তার নজরে পড়বে না। সেই দিনটিই হবে বাংলার ইতিহাসের চরম দুর্দিন।'

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ আমি এক সিপাহী। মীর জাফর কি করতে চান, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আলীবর্দী খান তার সম্পর্কে কি ভাবছেন, তাতেই বা আমার কি প্রয়োজন?'

এক সিপাহী ভিতরে ঢুকে আতাউল্লাহ খানকে বললো ঃ মীর জাফর তশরীফ এনেছেন।'

মোয়াযযম আলী উঠে বললেন ঃ এবার আমায় এজাযত দিন।'

বহুত আচ্ছা। আতাউল্লাহ খান তার সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে আরাম করো।'

মীর জাফর কামরায় প্রবেশ করলেন। তিনি আতাউল্লাহ খানের সাথে মোসাফেহা করে মোয়াযযম আলীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ আপনি কখন এলেন?'

ঃ আমি এখখুনি এখানে পৌছলাম।'

ঃ তশরীফ রাখুন।' মীর জাফর কুরসির উপর বসতে বসতে বললেন।

ঃ না, আমায় এজাযত দিন।'

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ উনি খুবই ক্লান্ত। ওর আরামের প্রয়োজন, ইনশা আল্লাহ আমরা সন্ধ্যাবেলায় আলাপ করবো।'

তারপর তিনি সিপাহীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি ওকে আমার বাড়িতে রেখে এসো।'

মোয়াযযম আলী সিপাহীর সাথে কামরার বাইরে চলে গেলেন। মীর জাফর ও আতাউল্লাহ খান চুপ করে একে অন্যের দিকে তাকালেন কিছুক্ষণ। অবশেষে মীর জাফর বললেন ঃ এ নওজোয়ান সম্পর্কে আপনাকে খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হবে। এ হচ্ছে মীর মদনের আপনার লোক।'

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ ওকে আমি জানি। আপনি কাল যে আশঙ্কা করেছিলেন তা কতকটা ঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। মোয়াযযম আলীর কথায় আমি বুঝেছি যে হুকুমাতের গুপ্তচর আমাদের সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ-খবর নিয়েছে। মোয়াযযম আলী আমায় মনে করেন আপনার দুশমন। তাই তিনি আমায় আপনার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকবার পরামর্শ দিয়েছেন।'

মীর জাফরের মুখখানা আচানক পান্ডুর হয়ে গেলো। তিনি বললেন ঃ না মীর

সাহেব! আমি অতোটা বে-অকুফ তো নই। হুকুমাত আমাদের সম্পর্কে কতোটা খবর রাখেন, তাই শুধু জানবার চেষ্টা করেছি আমি। যতোটা বোঝা গেলো, মুর্শিদাবাদে আমার সম্পর্কে কোনো বিপজ্জনক খবর পৌছায়নি এখনো। তবু আপনার দুর্ভাগ্য সব জায়গায়ই আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। আমাদের আর বিলম্ব করা চলবে না। ফউজী অফিসাররা আমাদের সাথে রয়েছেন। সুবাদার আমাদের সাথে সহযোগিতা না করলে সময় এলে তার গৃহ অবরোধ করা যাবে। কিন্তু এই নওজোয়ানের হাত থেকে নাজাত হাসিল করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে, যথাসময়ে আমাদের ইরাদা সম্পর্কে উনি জানতে পারলে আমাদের সব পরিকল্পনাই মাটিতে লুটাবে। আমার কাছে সব মানুষেরই আত্মার কীমৎ এক, কিন্তু মোয়াযযম আলী তা থেকে ভিন্ন। তিনি পূর্ণ শক্তিতে আমাদের বিরোধিতার ফলে বহু মুশকিল পয়দা হবে আমাদের সামনে।'

মীর জাফর বললেন ঃ কিন্তু ওকে সীমান্তে পৌছবার মওকা দেওয়া কি জরুরি? ঃ না, জরুরি নয়।'

মীর জাফর বললেন ঃ কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ওর গায়ে হাত লাগানো আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হবে।'

ঃ আমরা ওর গায়ে হাত না দিয়েই ওর সীমান্তে পৌছবার পথ রোধ করতে পারবো। মীর হাবীবের দূত যদি এখনো ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এই পয়গাম নিয়ে ফিরিয়ে দিন যে, মোয়াযযম আলী কাল ভোরে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছেন। আর ইনিই হচ্ছেন সেই নওজোয়ান, যিনি হোসেন বেগের হাবেলী হেফাজত করেছিলেন। আপনি তাকে আরো বলে দেবেন যে, ফউজ না নিয়েই তিনি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে। মুর্শিদাবাদ থেকে তার সাথে এসেছে মাত্র আটজন সিপাহী' আর তারাই এখান থেকে যাচ্ছে তার সাথে। কটক থেকে সীমান্ত এলাকার মাঝখানে এমন অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে মীর হাবীবের লোক তাকে গ্রেফতার করতে পারবে সহজেই। এ কৌশল সফল হলে আমাদের পথ থেকে এক পাথর সরে যাবে আর তাতে কোনো দোষও আসবে না আমাদের উপর।'

মীর জাফর বললেন ঃ কিন্তু ফউজ না নিয়ে তিনি এখান থেকে যেতে রাজী হবেন কী?'

আতাউল্লাহ খান জওয়াব দিলেন ঃ আমি তাকে বলে দিয়েছি যে, তার অংশের ফউজ বর্ধমান ও মেদিনীপুরের মাঝখানকার তাঁবুতে রয়েছে।'

মীর জাফর বললেন ঃ আমার প্রত্যাশার চাইতেও বেশি দূরদর্শী আপনি।'

আতাউল্লাহ খান হেসে বললেন ঃ মীর সাহেব! এর সব কিছুই আপনার সহচর্যের ফল।'

পরদিন ভোরে নামাজ পড়ে মোয়াযযম আলী আর তার সাথীরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দরজার কাছে মীর জাফর তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন।

ঃ মোয়াযযম আলী থামুন।' দুহাত বাড়িয়ে তিনি বললেন।'

মোয়াযযম আলী ঘোড়া থামালেন। মীর জাফর বললেন ঃ আমি আপনার কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংশা করছি। কিন্তু আমার ধারণা, ফউজ সাথে নিয়ে গেলেই আপনি ভালো করতেন। আমার ভয় হয়, পথে আপনার কোনো বিপদ ঘটলে এ আটজন লোক আপনার হেফাজতের জন্য যথেষ্ট হবে না।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার হেফাজতের প্রশ্নটা ততো বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে বসে ফউজের ইন্তেজার করতে থাকা আমি সংগত মনে করি না।'

ঃ যা-ই হোক, পথে আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। গত কয়েক দিনে মারাঠারা এখান থেকে ত্রিশ- চল্লিশ মাইল দূরের কতকগুলো বস্তিতে লুটপাট করেছে।'

তারপর মীর জাফর মোয়াযযম আলীর সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ মোয়াযযম আলী বাংলার ফউজের সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহী। তার জান খুবই মূল্যবান। তোমরা তার হেফাজতের খেয়াল রাখবে।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

দিনভর সফর করবার পর মোয়াযযম আলী তার সাথীরা রাতের বেলার জন্য আশ্রয় নিলেন এক গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে। পরদিন দুপুরবেলা এক নদীর ধারে খানিকক্ষণ আরাম করবার জন্য থেমে পড়লেন তারা। নদীর উভয় কিনারে ঘন গাছপালা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন জোহরের নামাজের জন্য। নামাজ শেষ হবার পর তারা গাছের সাথে বাঁধা ঘোড়াগুলো খুলে দিতে গেছেন, অমনি আচানক চারদিকের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র মারাঠা সিপাহী। মোয়াযযম আলীর সিপাহীরা যে ঘোড়ায় চড়বে অথবা তলোয়ার সামলাবে, এমন সময়ও পেলো না তারা। পঞ্চাশজন সিপাহী বন্দুক উঁচিয়ে এসে ঘিরে ফেললো তাদেরকে।

একটি লোক এগিয়ে এসে বললো ঃ এখন মোকাবিলা করে কোনো ফায়দা নেই। হাতিয়ার সমর্পণ করে দেওয়াই এখন ভালো হবে তোমাদের জন্য।'

মোয়াযযম আলী কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা ও পেরেশানির অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বন্দুক ও তলোয়ার ছুঁড়ে ফেললেন। তার সাথীরাও করলো তাই।

একটি মধ্যবয়সী লোককে দেখে মনে হলো, সে দলের সরদার। সে এগিয়ে এসে মোয়াযযম আলীক সম্বোধন করে বললেন ঃ কোত্থেকে এলে তুমি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াবে বললেন ঃ আমাদের কাছে কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন নেই তোমার। বলো, তোমরা কি চাও?'

ঃ তোমরা আমাদের সাথে চলো, এ-ই চাই আমরা।' মারাঠা সরদার বললো।

ঃ কোথায়?'

মারাঠা সরদার বললো ঃ কয়েদিকে এসব প্রশ্ন করার অধিকার দেওয়া হবে না কখনো। আমি তোমার হেফাজত করবার জিম্মা নিচ্ছি। কিন্তু পথে কেউ ভাগবার চেষ্টা করলে তাকে গুলি করা হবে।'

মারাঠা সরদারের ইশারায় কয়েকটি লোক এগিয়ে এসে তাদের ঘোড়া ও হাতিয়ারগুলো দখলে নিলো। তারা তাদের হাত বেঁধে ফেললো রশি দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে মোয়াযযম আলী আর তার সাথীরা কয়েদি হিসাবে রওয়ানা হয়ে গেলেন এক অজানা মনজিলের পথে। এক হফতা ধরে পাহাড়ে-জঙ্গলে সফর করে সীমান্ত পারের এক গাঁয়ের কাছে তাদের নজরে পড়লো মারাঠা ফউজের তাঁবু। মোয়াযযম আলী আর তার সাথীরা মারাঠা সিপাহীদের বন্দুকের পাহারায়

তাবু পার হয়ে পৌঁছলেন গায়ে। তারপর এক সঙ্কীর্ণ গলি অতিক্রম করে তারা ঢুকলেন এক কেল্লায়। মারাঠা ফউজের কয়েকজন সিপাহী তাদেরকে দেখেই এসে জমা হলো।

মোয়াযযম আলীর গ্রেফতারকারী দলের সরদার তার অফিসারদের লক্ষ্য করে বললো ঃ সিপাহসালারের হুকুম, এসব কয়েদিকে ভালো করে দেখশোনা করতে হবে। তাদেরকে যেনো কোনরকমে তকলিফ দেওয়া না হয়। কিন্তু কেউ ভাগবার চেষ্টা করলে তাকে বিনাদ্বিধায় ফাঁসি দেওয়া হবে। সিপাহসালার কিছুকালের জন্য এখানে আসতে পারবেন না।'

আবার মোয়াযযম আলীর দিকে ইশারা করে সে বললো ঃ 'ইনি হচ্ছেন বাংলার ফউজের এক বড়ো অফিসার। সিপাহসালারের হুকুম, এর দিকে বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে।'

অফিসার তার সিপাহীদের লক্ষ্য করে বললো ঃ এদেরকে নিয়ে বন্ধ করে রাখ কুঠরির ভিতরে। আপাতত এক এক কুঠরিতে দুজন করে থাকবে কয়েদি।'

মোয়াযযম সামনে এগিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ আমরা কার হাতে বন্দী, জানতে পারি কি?'

সে উদ্ধতকণ্ঠে জওয়াব দিলো ঃ কোনো কয়েদির এ ধরনের প্রশ্ন করবার অধিকার নেই।' তারপর সিপাহীকে লক্ষ্য করে বললো ঃ একে আকবর খানের সাথে এক কুঠরিতে রেখে দাও।'

পাহারাদার কয়েদিদের নিয়ে গেলো হাবেলীর এক দিকে। মোয়াযযম আলীর আটজন সাথীকে চার কামরায় দুজনকে রাখা হলো। তারপর তারা গিয়ে খুললো এক প্রশস্ত কামরার দরজা। মোয়াযযম আলীকে তারা বললো ভিতরে ঢুকতে।

মোয়াযযম আলী ভিতরে ঢুকলে পাহারাদারগণ বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করলো। খানিকক্ষণ তিনি কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। কপাটের ফাঁক দিয়ে তৃতীয় প্রহরের সূর্যকিরণ এসে পড়ছে কুঠরির ভিতরে। মেঝের উপর খেজুরপাতার চাটাই বিছানো। মোয়াযযম আলী দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লেন। অমনি কুঠরির এক অন্ধকার কোণে নজর পড়লো আর একজন কয়েদি। সেও বসে আছে নির্বাক নিশ্চল।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ভাই, মনে হচ্ছে, খোদা কিছুকালের জন্য আমাদেরকে পরস্পর সাথী বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা দুজন পরস্পরের পরিচিত হলে কি ভালো হয় না?'

কয়েদি জলদি করে উঠে সামনে এগিয়ে এসে মোয়াযযম আলীর পাশে বসে বললো ঃ আমার নাম আকবর খাঁন। মারাঠাদের হাতে বন্দী হয়ে আমার প্রায় তিনমাস কেটে গেলো। গোড়ার দিকে আমায় এ হাবেলীর ভিতরে ঘোরাফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু প্রায় বিশ দিন আগে আমি ভাগবার চেষ্টা করিলে ওরা আমায় বন্ধ করে রেখেছে এখানে।'

মোয়াযযম আলী হয়রান হয়ে তাকাতে লাগলেন কয়েদির দিকে। তার বয়স মনে হচ্ছে বারো চৌদ্দ বছর। তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল মুখশ্রী ও সুগঠিত দেহাবয়বে রয়েছে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ।

ঃ তোমার কি অপরাধে কয়েদ করা হলো?' মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন।

ঃ আমি কোনো অপরাধ করিনি।' কিশোর দৃঢ়তার সাথে জওয়াব দিলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তোমার চেহারায় বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি কোনো বড়ো খান্দানে জন্ম নিয়েছো। বলো, তুমি কোথাকার বাসিন্দা, আর কি করেই বা এলে এখানে?'

কিশোর প্রশ্নের জওয়াবে সংক্ষেপে তার কাহিনী বললো ঃ আমার বাড়ি রোহিলাখণ্ডে। আমার আব্বাজান ছিলেন আজীম খান এবং তিনি ছিলেন তার এলাকার সরদার। ঘোড়ার তেজারত করবার শখ ছিলো তার। রাজপুতানা থেকে ঘোড়া খরিদ করে তিনি কখনো বিক্রি করতেন লক্ষ্ণৌ এ আর কখনো হায়দারাবাদে। আমার বড়ো ভাই সাধারণত যেতেন তার সাথে। এবার আমি জিদ করলাম তার সাথে যেতে; তাই তিনি আমায় নিয়ে এলেন।'

ঃ তারপর?'

ঃ আমাদের সাথে ছিলেন বিশজন সশস্ত্র নওকর। রাজপুতানা থেকে দেড়শ ঘোড়া খরিদ করে আমরা চললাম লক্ষ্ণৌর পথে। অযোধ্যা থেকে যখন কিছুদূরে আমরা, তখন মারাঠারা আমাদের উপর হামলা করলো। সাতজন মারাঠাদের হাতে গ্রেফতার হলো, আর বাকি লোক পালিয়ে গেলো।'

ঃ তারপর তোমার কি হলো?'

ঃ মারাঠা সরদার বাকি লোকদের তল্লাশি নিয়ে ছেড়ে দিলো, কিন্তু আমায় এনে তার কাছে রাখলো। কয়েকদিন পর তারা আমায় পাঠিয়ে দিলো মীর হাবিবের কাছে। মীর হাবিব আমায় পৌছে দিয়েছে এখানে।'

ঃ মীর হাবিব এখানে?'

ঃ না, সে মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য আসে এখানে। তার সিপাহীরা

আমায় কোনো তকলিফ দেয় কিনা, সে হামেশা জানতে চায় আমার কাছে। কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সে তার সাথে কঠোর ব্যবহার করে; কিন্তু আমায় নিজের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য আমি দাবি জানালে সে জওয়াব দেয় যে, রোহিলাখন্ডের উপর হামলা করবার সময়ে আমায় সাথে নিয়ে যাবে তারা। তাদের ধারণা আমার বাপের বেশুমার দৌলত রয়েছে জমানো। আমার ঘরের ধনভাণ্ডার তাদের হাতে তুলে দিতে পারলে তারা আমায় ছেড়ে দেবে।'

ঃ তুমি কি জওয়াব দিলে?'

ঃ আমি যখন বলি যে, আমাদের ঘরে কোনো ধনভাণ্ডার নেই, তখন সে বলে ঃ ধনভাণ্ডারের খবর তোমার জানা না থাকলে আমরা জিজ্ঞেস করে নেবো তোমার ভাইকে।' মীর হাবীবের ধারণা ছিলো আমি পালাবার চেষ্টা করবো না। তাই এ হাবেলীর ভিতরে, বাইরের গাঁয়ে ও ফউজের তাঁবুতে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি ছিলো আমার। এক সন্ধ্যায় আমি পালিয়ে গেলাম এখান থেকে। সারারাত পাহাড়ে-বনে ঘুরলাম, কিন্তু ভোরে কয়েকজন সওয়ার আমায় গ্রেফতার করে ফিরিয়ে আনলো এখানে। ভাগ্য ভালো, মীর হাবীব এখানে ছিলো না। পরে মীর হাবিব এসে আমায় দুদিন ভুখা রেখেছিলো। এখন পাহারাদার সকাল সন্ধ্যায় দুবার আমায় বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু পাহারা এত কড়া যে, আর কখনো পালাবার আশা নেই আমার। আমার আফসোস, আপনিও এদের হাতে বন্দী হলেন। বলুন, আপনি এখানে কি করে এলেন?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি কটক থেকে উড়িষ্যা সীমান্তের এক কেল্লায় যাচ্ছিলাম। পথে মারাঠারা হঠাৎ হামলা করলো। তোমার সাথে কথা বলবার আগে আমি জানতাম না যে, আমি মীর হাবীবের কয়েদখানায় রয়েছি।'

ছমাস পর একদিন ভোরবেলা চারজন সশস্ত্র সিপাহী মোয়াযযম আলীকে বের করে তাদের সাথে যেতে বললো। মোয়াযযম আলী কোনো প্রশ্ন না করে চললেন তাদের সাথে। সিপাহীরা এক কামরায় এসে থামলো। তাদের ইশরায় মোয়াযযম আলী গিয়ে ঢুকলেন ভিতরে।

এই প্রশস্ত কামরা বহু দামী আসবাবপত্রে সাজানো। দুটি লোক গালিচার উপরে বসে দাবা খেলছে। দুজনেরই লেবাস দেখে মনে হয় মুসলমান। একজন দুবলা-পাতলা নওজোয়ান। আর একজনের বয়স চল্লিশের উপর। দোহার চেহারার সুগঠিত দেহ পুরুষ।

ঃ তোমার নাম মোয়াযযম আলী?' সুগঠিত দেহ লোকটি প্রশ্ন করলো।

ঃ হ্যাঁ। মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন।

ঃ কোনো কয়েদিকে অকারণে তকলিফ দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার সিপাহীদের বলে দিয়েছি আমি। আমার লোকদের সম্পর্কে তোমার কোনো অভিযোগ নেই তো?'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ কয়েদির আবার কি অভিযোগ থাকতে পারে?'

ঃ কয়েদখানা যাতে তোমার কাছে তেমন পীড়াদায়ক হয়ে না ওঠে, তার চেষ্টা আমরা করবো। বাহাদুরের ইজ্জত আমরা করে থাকি। মীর্যা হোসেন বেগের হাবেলীর হেফাজত করে তুমি শক্তি সাহসের পরিচয় দিয়েছো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এতটা খবর রাখার জন্য আপনি প্রশংসার দাবিদার।'

ঃ তোমার সম্পর্কে জানবার জন্য আমায় আর কারুর কাছে যাবার প্রয়োজন হয়নি। এখন খবর রটে গেছে যে, সীমান্তের নায়েব ফউজদার ও তার আটজন সাথী কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এ নায়েব ফউজদারটি কে, তা বুঝে নিতে আমার মুশকিল হয়নি।'

ঃ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমি আপনার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করি না, কিন্তু আপনি যদি মীর হাবীব হয়ে থাকেন, তাহলে বাংলার প্রতি আপনার দুশমনির কারণ আমি জানতে চাচ্ছি।'

মীর হাবীব জওয়াবে বললো ঃ আমি কারুর দোস্ত অথবা দুশমন নই। আমার আকর্ষণ শুধু বাংলার শাসক ও তার উমরাহর দৌলতের প্রতি।'

ঃ কিন্তু আপনি মারাঠাদের জন্য পথ খোলাসা করছেন।'

ঃ মারাঠা আমায় সাহায্য করছে দৌলত হাসিল করতে। আমার আফসোস, তুমি কোনো দৌলতমন্দ লোকের ছেলে নও, কিন্তু তুমি যদি কোনো দৌলতমন্দ লোকের ঘরের খবর দিতে পারো আমায়, তাহলে সহযোগিতা হাসিল করতেও আমার কোনো আপত্তি হবে না।'

মোয়াযযম আলী রাগে ঠোঁট কামড়ে বললেন ঃ তোমায় আমি একই ঘরের খবর দিতে পারি। সেটি হচ্ছে মুর্শিদাবাদের কয়েদখানা।'

মীর হাবীব বেপরোয়াভাবে জওয়াব দিলো ঃ যাকে কারুর প্রয়োজন নেই, সেই লোকই যায় কয়েদখানায়। আমি চরম দুর্যোগ-পরিস্থিতিতেও বাংলার শাসককে এ একীন দিতে পারি যে, আমায় তার প্রয়োজন রয়েছে। তুমি বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু আমি ভেবে হয়রান হই, বড়ো উমরাহর বালাখানা পাহারা দিয়ে তুমি যে বাংলার কোনো খেদমত করছো, এ ধারণা কি করে হলো তোমার?'

ঃ তোমার সিপাহীরা হোসেন বেগের মহল থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসায় যদি তোমার আফসোস হয়ে থাকে, তাহলে আমি তোমার ভুল ধারণা দূর করে দিচ্ছি। মীর্যা হোসেন বেগের ঘরে টাকা ছিলো না, ছিলো ইজ্জত-যার হেফাজত করা প্রত্যেক শরীফ লোকেরই ছিলো ফরজ।'

মীর হাবিব জওয়াব দিলো ঃ ইজ্জতের মানে বোঝে উঁচু তবকার লোকদের মধ্যে আমি এমন কাউকেও দেখিনি। তারা শুধু মানে বোঝেন দৌলত আর হুকুমাতের।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি যে বাংলার ইজ্জত ও আজাদীর হেফাজত করতে চাচ্ছি, তা শুধু আমীর ও শাসকের বাংলা নয়, লাখো মুসলমান যাকে নিজের ও ভাবী বংশধরদের ওয়াতন মনে করে, সেই বাংলা হচ্ছে আমার ধ্যানের বাংলা। সেই বাংলাই হচ্ছে আমার বাসভূমি আর তাকেই আমি নিরাপদ দেখতে চাই চোর, রাহজান ও মানবতার দুশমনদের কবল থেকে।'

ঃ নওজোয়ান! আমি তোমার ধারণার প্রশংসা করি। কিন্তু আমি যে বাংলাকে জানি, তার মুহাফিজরা আমার দৃষ্টিতে বাইরের রাহজানদের চাইতেও বিপজ্জনক। এমন দিন শিগগিরই আসছে, যখন তুমি বাংলার কথা চিন্তা না করে নিজের কথা চিন্তা করাই ভালো মনে করবে। কেবল আলীবর্দী খানের চোখ বন্ধ হবারই দেরি। তারপর তুমি বাংলার কথা চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতা মনে করবে। ততোদিন হয়তো তুমি আমার কয়েদখানায়ই থাকবে, কিন্তু যদি তার আগে তোমার ধারণায় কোনো পরিবর্তন আসে, তাহলে আমি তোমার সহযোগিতা খুশির সাথে কবুল করবো। সেদিন আমরা বাংলার কথা চিন্তা করবো না, চিন্তা করবো নিজেদের কথা, ঠিক যেমন করে চিন্তা করেন মুর্শিদাবাদের উমরাহ। তাদের প্রত্যেকেই নিজকে মনে করেন আলীবর্দী খানের একক উত্তরাধিকারী। তারা যে আওয়াজ তুলছেন, তার জওয়াবে আমাদেরও আওয়াজ তুলবার অধিকার আছে যে, বাংলা আমাদের।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তোমার সাথে সহযোগিতা করে দিল্লির তখত পাবার উম্মীদ থাকলেও আমি কয়েদির নিভৃত মৃত্যুকেই সাদরে বরণ করবো।'

মীর হাবিব বললো ঃ মানুষের খেয়াল বদলাতে দেরি লাগে না। আমি কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর ইন্তেজার করতে পারবো। এখানে তোমার কোনো তকলিফ না হয়, ততোদিন তাই হবে আমার চেষ্টা। হাবেলীর ভিতরে ঘোরাফেরা করবার পুরো আযাদি থাকবে তোমার, কিন্তু ভাগবার চেষ্টা করলে আমি তোমার হাত-পা কেটে ফেলতেও দ্বিধা করবো না। এখন তুমি যেতে পারো।

মোয়াযযম আলী কামরার বাইরে বেরুলে অপেক্ষমাণ সশস্ত্র সিপাহীরা তাকে নিয়ে চলে গেলো।'

আলীবর্দী খানের সেনাবাহিনী মেদিনীপুরের কাছে তাঁবু ফেলেছে। মীর জাফর এসে প্রবেশ করলেন আলীবর্দী খাঁনের খিমায়। তিনবার কুর্নিশ করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আদব সহকারে। আলীবর্দী খানের মসনদের পিছনে দুজন রক্ষী নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দণ্ডায়মান। অবশেষে আলীবর্দী খান বললেন ঃ আমি জানতে চাই, আতাউল্লাহ খান এখানে হাজির হতে কেন গড়িমসি করছে?'

ঃ আলীজাহ! আমার তা জানা নেই।'

আলীবর্দী খান বললেন ঃ আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র তোমার অজ্ঞাতে হয় না।'

ঃ আলীজাহ তার কোনো ষড়যন্ত্রের খবর জানলে আমি তার মাথা এনে হুজুরের খেদমতে পেশ করতাম।'

ঃ তার মাথা সম্পর্কে আমি পরে চিন্তা করবো। আপাতত আমি তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে চাই। আমার হুকুম অমান্য করবার সাহস তার কি করে হলো, আর কেনই বা মোয়াযযম আলীর কোনো খবর মিললো না, এখনো?'

ঃ আলীজাহ! কটকের সুবাদার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকে পূর্ণ অবহিত করেছেন। আমি যতোটা জানি, তার ফউজের তামাম বড়ো বড়ো অফিসার আতাউল্লাহ খানের সঙ্গে ছেড়েছে। তার কোনো খারাপ নিয়ত থাকলেও তিনি বর্তমান অবস্থায় হুজুরের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারবেন না। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আদব সহকারে। আলীবর্দী খানের মসনদের পিছনে দুজন তিনি কেবল জানের ভয়ে হুজুরের খেদমতে হাজির হতে ইতস্তত করছেন। হুজুরের হুকুম পেয়েই আমি মোয়াযযম আলীর খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছি। যেদিন তিনি কটক থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন আমিও ওখানে ছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম আটজন লোক নিয়ে সফর না করে ফউজের অপেক্ষা করতে। সীমান্তের আশেপাশে মারাঠাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার খবর পেয়েই আমি এ পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু মোয়াযযম আলী আমার কথা শুনতে রাজি হলেন না। তিনি মারা পড়েছেন না কয়েদ হয়েছেন, তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। অবশ্যি কটক থেকে আমার সামনেই তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। হয়তো আতাউল্লাহ খান তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে থাকবেন, কিন্তু তা প্রমাণ করা সহজ নয়।'

আলীবর্দী খান কিছুটা নরম হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ আতাউল্লাহ খান সম্পর্কে তোমার ঃ

পরামর্শ কি?'

ঃ আলীজাহ ! আমার ধারণা, তিনি ভয়ে হুজুরের খেদমতে হাজির হননি। আমার আবেদন, কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবার আগে আমায় তার কাছে যাবার এজাযত দিন। তার নিয়ত খারাপ হলে আমি তাকে বুঝাতে পারবো যে, তার ষড়যন্ত্রের খবর জানাজানি হয়ে গেছে, আর তার বাঁচবার একমাত্র পথ হচ্ছে দ্বিধা না করে হুজুরের কদমবুচির জন্য হাজির হওয়া।'

আলীবর্দী খান বললেন ঃ তার আমার কাছে আসার প্রয়োজন নেই। তুমি তাকে পথে আনতে পারলে বলে দেবে, সে যেনো ইস্তফা দিয়ে সোজা মুর্শিদাবাদে চলে যায়।'

ঃ আলীজাহ! আমি যদি তার বিশ্বাস জন্মাতে পারি যে, হুজুর তার জান বাঁচাবার ওয়াদা করেছেন তাহলে তিনি মুর্শিদাবাদ যাওয়া সৌভাগ্য মনে করবেন

ঃ গদ্দারের জন্য তোমার সুপারিশ করতে হবে না। অবশ্যি সে সোজা পথে এসে গেলে আমি তাকে মামুলি শাস্তি দেওয়াই যথেষ্ট মনে করবো।'

রাতের বেলায় আতাউল্লাহ্ খান তার বাসভবনে গভীর নিদ্রায় অচেতন। নওকর এসে তাকে জাগিয়ে বললো ঃ মীর জাফর তশরিফ এনেছেন। এখখুনি তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চান। আমি তাকে মোলাকাতের কামরায় বসিয়ে এসেছি। তার সাথে রয়েছেন দুজন ফউজী অফিসার।'

আতাউল্লাহ্ খান পেরেশান হয়ে লেবাস বদল করেই নিচে নেমে ঢুকলেন মোলাকাতের কামরায়। মীর জাফর উঠে তার সাথে মোসাফেহ করে তার সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা গিয়ে সিপাহীদের আরামের বন্দোবস্ত করো। আমি এখখুনি আসছি।'

ফউজী অফিসাররা উঠে বাইরে গেলেন। মীর জাফর আতাউল্লাহ খানকে বললেন ঃ আমার আফসোস হচ্ছে, আমি আপনাকে অসময়ে তকলিফ দিলাম। কিন্তু অবস্থার চাপে আপনাকে সময়মতো খবরদার করতে হচ্ছে।'

তারা সামনাসামনি কুরসির উপর বসেছেন। আতাউল্লাহ্ খান খানিকক্ষণ চরম পেরেশানি ও উদ্বেগের মধ্যে মীর জাফরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ মনে হচ্ছে, আপনি কোনো ভালো খবর নিয়ে আসেননি। আলীবর্দী

খানের মেদিনীপুরের আসার খবর পেয়েই আমার মনে আশঙ্কা জেগেছে যে, আমাদের কোনো সাথী হয়তো তাকে আমাদের ইরাদা সম্পর্কে খবরদার করে দিয়েছে।'

মীর জাফর বললেন ঃ আমার তা বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু আপনি অবশ্যি একটা ভুল করে বসেছেন। আপনি আলীবর্দী খানের খেদমতে হাজির হননি। আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে, মেদিনীপুরে আলীবর্দী খানের অপ্রত্যাশিত আগমনের ফলে আমাদের ষড়যন্ত্র কামিয়াবীর সম্ভবনা অনেকখানি সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তার লশকরের মোকাবিলা করা হবে আত্মহত্যারই নামান্তর। তিনি কটকে এলে আমার ভয় হয়, আপনার ফউজের বেশিরভাগ সিপাহী পরাজয় নিশ্চিত জেনে তাঁর সাথে মিলিত হবে। আপনার জন্য এখন একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে, আপনি ইস্তফা দিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে যান। আমি আপনার তরফ থেকে আলীবর্দী খানকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করছিলাম এবং তিনি আমায় বলেছেন যে, আপনি ইস্তফা দিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে গেলে আপনার উপর কোনো কঠোর ব্যবহার করা হবে না।'

আতাউল্লাহ খান খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে মীর জাফরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ আলীবর্দী খান আপনার কাছেও কি ইস্তফা দাবি করেছেন?'

ঃ না, যদি আপনি তার খেদমতে হাজির হতেন, তাহলে হয়তো এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।'

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ তার খেদমতে হাজির হবার চাইতে মারাঠাদের আশ্রয় নেওয়াই আমি ভালো মনে করি। মীর সাহেব, এতটা ঘাবড়ে গেলেন আপনি? আপনি আমার সাথে সহযোগিতা করলে আমি এখখুনি ফউজকে কুচ করবার হুকুম দিচ্ছি। মীর হাবীব সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়। তার আশ্রয় নিয়ে আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য সময় পাবো আমরা।'

মীরজাফর জওয়াব দিলেন ঃ আমি সব কিছু ভেবে-চিন্তে আপনার কাছে এসেছি। মীর হাবীব এক ডাকু, তার দোস্তির উপর নির্ভর করা চলে না। বাংলার ভিতরকার বিরোধের ফায়দা নেবার জন্য সে আপনার সাথে মিলতে পারে, আর তাও যখন আপনার কামিয়াবী সম্পর্কে তার একিন হবে। কিন্তু আপনি যখন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তার কাছে যাবেন, তখন সে কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে আপনাকে আলীবর্দী খানের কাছে বিক্রি করে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। এখন পরিস্থিতি এমন দাড়িয়েছে যে, আপনি ইস্তফা না দিলেও আলীবর্দী খান আপানাকে

পাঠিয়ে দেবেন। তাই আমার বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ হচ্ছে এই যে, আপনি এখখুনি আজকে লিখে দিন ঃ নানা সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, আমি হুজুরের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি এবং আমার দুশমনরা হুজুরের মন খারাপ করবার জন্য আমার সম্পর্কে রটাচ্ছে যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছি। এ অবস্থায় ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই আমারএখন আমার আবেদন আমার জিন্দেগির বাকি দিন কটি মুর্শিদাবাদে কাটিয়ে দেবার এজাযত দিন। কিন্তু যদি কখনো আমার নেক নিয়ত সম্পর্কে হুজুরের মনে একিন আসে, তাহলে হুজুর আমায় খেদমতের জন্য তৈরি পাবেন। এই হচ্ছে আমার পরামর্শ।'

আতাউল্লঅহ খান খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ মীর সাহেব! আপনার কি বিশ্বাস রয়েছে যে, ইস্তফা দেবার পর মুর্শিদাবাদে যাওয়া আমার জন্য আত্মহত্যার নামান্তর হবে না?'

ঃ না বরং আমার বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদে পৌঁছেই আপনি আলীবর্দী খানের পয়গাম পাবেন যে, তার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। সাথে সাথেই আপনাকে নিযুক্ত করা হবে কোনো বিশেষ পদে।

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ এত শিগগিরই যে আমি বাজি হেরে গেছি, সে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

মীর জাফর সান্ত্বনার স্বরে বললেন ঃ দোস্ত ! বাজি আপনি হারেননি। আলীবর্দী খান তার জীবনের শেষপ্রান্তে পা রেখেছেন। ভবিষ্যৎ আমাদেরই। আমরা কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর ইন্তেজার করতে পারি। আমি আপনাকে পরাজয় স্বীকার করবার অথবা হাতিয়ার সমর্পণ করে দেবার পরামর্শ দিতে আসিনি, বরং হাতিয়ার তুলবার উপযুক্ত সময়ের জন্য ইন্তেজার করবার পরামর্শ দিতেই আমি এসেছি।'

আতাউল্লাহ খান বললেন ঃ মীর সাহেব! আমরা যখন নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করছি, তখন তো আপনি আমায় বলেননি যে, এমনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। এখন যদি এই-ই হয় আপনার পরামর্শ তাহলে আমি ইস্তফা দিতে তৈরি, কিন্তু ইস্তফার জওয়াব আসা পর্যন্ত আমার এখানে থাকাই হবে জরুরি। তারপর যদি আলীবর্দী খান আমায় মুর্শিদাবাদ যেতে নিষেধ করেন, তখন কি করা যাবে?

ঃ জওয়াবের ইন্তেজার করবার প্রয়োজন নেই আপনার। ইস্তফাপত্রে আপনি আমার হাওলা করে দিন এবং অবিলম্বে মুর্শিদাড়াাদে রওয়ানা হয়ে যান। আলীবর্দী খানকে আশ্বস্ত করবার ভার আমার উপর রইলো।'

আতাউল্লাহ খান দরজার কাছে গিয়ে নওকরকে আওয়াজ দিয়ে কাগজ-

কলম আনতে হুকুম দিলেন। তারপর তিনি মীর জাফরকে বললেন ঃ মীর সাহেব, ইস্তফাপত্র লিখতে আপনার সাহায্য দরকার হবে।'

ঃ বহুত আচ্ছা! আমি বলে যাচ্ছি, আপনি লিখুন।'

পরদিন ভোরে আতাউল্লাহ খান মুর্শিদাবাদের পথে রওয়ানা হলেন। কয়েক দিনের মধ্যে মীর জাফর মেদিনীপুরে পৌছে আলীবর্দী খানকে জানালেন ঃ আলীজাহ খোদার শোকর, আমার কথা মেনে তিনি ইস্তফা দিলেন,নইলে তার চক্রান্ত খুবই বিপজ্জনক ছিলো। মুর্শিদাবাদে তিনি হুজুরের জন্য কোনো বিপদের কারণ হবেন না। আমাদের চর হামেশা তার দেখাশুনার জন্য মওজুদ থাকবে মনে হয়, কোনো নাদান দোস্ত, তাকে প্ররোচনা দিয়েছিলো । হুজুরের এজাযত হলে আমি লিখে দিতে পারি যে, হুজুর তার ইস্তফাপত্র মঞ্জুর করেছেন । অতীতের দোষ-ক্রটির জন্য তার উপর কোনো কঠোর ব্যবস্থা করা হবে না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাকে খুবই সতর্ক থাকতে হব।'

আলীবর্দী খান জওয়াবে বললেন ঃ হ্যাঁ তাকে আরো লিখে দাও যে, তার অতীতের ফউজী খেদমত বিবেচনা করে তাদের জীবিকানির্বাহের জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা কর হচ্ছে।'

সাত

মীর হাবীবের কয়েদখানায় মোয়াযযম আলীর জিন্দেগি ছিলো দিন রাত্রির এক বৈচিত্র্যহীন ধারা। বাইরের অবস্থা কিছুই জানা নেই তার। কারাবাসের নিঃসঙ্গতায় আকবর খান হয়ে উঠেছে তার কাছে এক অতি বড়ো সান্ত্বনার উৎস। তারা দুজন বেশিরভাগ সময় কাটান নিজ নিজ খানদান, প্রিয়জন ও বন্ধু-স্বজনদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায়। কখনো কখনো নিদারুণ মর্মবেদনায় মোয়াযযম আলী নির্বাক হয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আকবর খান তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলে ঃ ভাইজান আপনি কেন এত পেরেশান হচ্ছেন? খোদা আমাদেরকে মদদ করবেন, শিগগিরই আমরা এ জালেমদের কয়েকখানা থেকে আজাদ হয়ে যাবো। আপনিই তো বলেছেন, আল্লাহ তার বান্দাদের দোআ কবুল করেন। হর ওয়াক্ত আমি আপনার জন্য দোআ করে থাকি। আপনি বলেছেন, খোদা তার বান্দাদের সবরের পরীক্ষা নেন, কিন্তু আজ আপনাকে বিষণ্ন মনে হচ্ছে।'

হাসবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আকবর খানের খুবসুরত চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মোয়াযযম আলী তখন স্বপ্ন ও ধ্যানের দুনিয়া থেকে বাস্তবে ফিরে এসে তাকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজনবোধ করেন।

ঃ আকবর আমি নিজের কথা ভাবছি না, ভাবছি আমার কওম ও ওয়াতনের কথা। আহা! ওখানে এখন কি হচ্ছে, তা যদি আমি জানতে পারতাম'

তারা দুজন মুখোমুখি বসে বহুবার বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। বর্তমানের হতাশার অন্ধকারে তারা জ্বালতে থাকেন ভবিষ্যতের আশার চেরাগ। আকবর খান তার জন্মভূমির সুন্দর মুগ্ধকর দৃশ্যপরিক্রমা বর্ণনা করে যায়, আর মোয়াযযম আলী তাকে শোনান মুর্শিদাবাদের সেই সব পথঘাট ও বাড়িঘরের কথা, যেখানে কেটেছে তার শৈশবের খেলাধুলার দিনগুলো। তারপর তারা ওয়াদা করেন, কয়েদ থেকে আজাদ হয়ে তারা দেখতে যাবেন একে অন্যের জন্মভূমি।

আকবর খান তার বয়সের ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি অনেকটা গম্ভীর ও বুদ্ধিমান। মোয়াযযম আলীকে সে জানিয়ে দিয়েছে হাবেলীর ভিতর ও বাইরে মারাঠা তাঁবুর যাবতীয় অবস্থা। ফেরার হবার চেষ্টা করবার আগে যখন তার এদিক-ওদিন ঘুরে বেড়াবার আজাদি ছিলো, তখন সে মারাঠা তাঁবুর সব খবর জেনে নিয়েছে। মোয়াযযম আলীকে সে আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে, মারাঠারা গাঁয়ের আসল বাসিন্দাদের বের করে দিয়ে দখল করে বসেছে তাদের বাড়িঘর। বেশিরভাগ বাড়িই হয়েছে এখন তাদের ঘোড়ার আস্তাবল। কোনো কোনো বাড়িতে হয়েছে তাদের গোলাবারুদ ও রসদের ভাণ্ডার। পাহারাদারগণ দলে দলে টহল দিয়ে বেড়ায় দিন-রাত গাঁয়ের পথে-ঘাটে। গাঁয়ের বাইরে চারদিকে মারাঠা সিপাহীদের খিমা। তাদের হাবেলীর চার দেয়ালের ভিতরেও কোনো কোনো কুঠরিতে জমা করা হয়েছে রসদ ও বারুদের ভাণ্ডার।

আকবর খানের কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মোয়াযযম আলীর মনে আঁকা হয়ে গেছে তার কুঠরির বাইরের প্রত্যেকটি প্রাচীর, প্রত্যেকটি গলি ও বাড়িঘরের নকশা। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় কয়েদখানার বাইরের খোলা হাওয়ায়। হাবেলীর ভিতরে অন্যান্য কয়েদি ছাড়া তার সাথীদের সাথেও দেখা হতো মোয়াযযম আলীর, কিন্তু সব সময়েই তার পাশে হাজির থাকতো সশস্ত্র পাহারাদার, তাই কারুর সাথে কথা বলবার মওকা তিনি পেতেন না।

একদিন আকবার খান তাকে জানালো কয়েদখানা থেকে পালাবার এক নতুন কৌশল। মোয়াযযম আলী অনেকক্ষণ ধরে তার কথা শুনলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ আকবর খান, এখান থেকে পালাবার ব্যর্থ প্রয়াস যে আমাদের

পক্ষে কতোখানি বিপজ্জনক হবে, তা তুমি জানো? আমার সাথীদের ফেলে রেখে আমি যেতেও চাই না। আমার মনে হয়, যদি তুমি এ কুঠরির বাইরে থেকে আশপাশের সব অবস্থা জানতে পারো, তাহলে হয়তো পালাবার কোনো উপযুক্ত কৌশল খুঁজে বের করতে পারবো। আমি একটা উপায় চিন্তা করেছি। তুমি হুঁশিয়ারীর পরিচয় দিলে হয়তো আমরা খুব শিগ্‌গিরই মুক্তি পেয়ে যাবো।

পরদিন পাহারাদার খানা নিয়ে এলে মোয়াযযম আলী তাকে বললেন ঃ মীর হাবীবের সাথে আমি একবার দেখা করতে চাই।

পাহারাদার জওয়াব দিলো ঃ তিনি এখানে নেই। তিনি এলে আপনার দরখাস্ত তার কাছে পৌঁছানো যাবে।

মোয়াযযম আলী অসীম চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়ে মীর হাবীরের ইন্তেজার করতে লাগলেন। রোজ ভোরে উঠে তিনি পাহারাদারের কাছে খবর নেন, কিন্তু তিনি রোজই পান হতাশাব্যঞ্জক খবর।

প্রায় দশমাস ইন্তেজার করবার পর প্রহরী বাহিনীর এক অফিসার এসে তাকে খবর দিলো ঃ মীর হাবীব তশ্‌রিফ এনেছেন। আপনার দরখাস্ত তার কাছে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এখনো তিনি কোনো জওয়াব দেননি।'

মোয়াযযম আলী হতাশা ও অসহায়তার ভিতর দিয়ে আরো কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিলেন। একদিন আচানক তার কুঠরির দরজা খুলে গেলো। মীর হাবীব ফউজের দুজন অফিসার ও চারজন সশস্ত্র সিপাহী সাথে নিয়ে এসে ঢুকলেন কুঠরির ভিতরে। মোয়াযযম আলী ও আকবর খান উঠে দাঁড়ালেন।

মীর হাবীব প্রশ্ন করলেন ঃ কি বলতে চাও তুমি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার ধারণা ছিলো, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আপনি এক বাহাদুর সিপাহী, কিন্তু বাহাদুরী ও নির্মমতার মধ্যে তফাৎ অনেক। আমি জানতে চাই, এ নিরপরাধ বালক কি গুনাহ্ করেছে, আর কতোকাল আপনি তাকে কয়েদখানায় আটক রাখতে চান?

মীর হাবীব বললেন ঃ এক কয়েদির জন্য সুপারিশ করার অধিকার অপর কয়েদির নেই। তথাপি ব্যক্তিগতভাবে আকবর খানকে কুঠরিতে বন্ধ করে রাখবার ইচ্ছা আমার ছিলো না, কিন্তু সে ভাগবার চেষ্টা করেছিলো এবং এটাও তার খোশ কিসমতি ছিলো, তার মুখ দেখে আমার অন্তরে দয়া জেগেছিলো।'

মোয়াযযম আলী আকবর খানের দিকে তাকালেন। সে এগিয়ে গিয়ে মীর হাবীবের জামার প্রান্ত ধরে বললো ঃ খোদার দিকে তাকিয়ে আমার কসুর মাফ করুন। আবার পালাবার চেষ্টা করলে আমায় গুলি করবেন।'

ঃ আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি এখানেই খুশি রয়েছো। 'মীর হাবীব বললেন।

ঃ না, না" আকবর খান জাওয়াব দিলো ঃ আমি খোলা হাওয়ার থাকতে চাই।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ কোনদিকে ওর দেশ, তাও জানে না ওরা। আর ও পালিয়ে গেলেও এমন কি বিপদের কারণ হতে পারে?'

মীর হাবীব বললেন ঃ দেখো আকবর, আমি তোমায় আর একটা মওকা দিচ্ছি। কিন্তু আবার ভাগবার চেষ্টা করলে আজীবন তোমায় এমন এক অন্ধকার কোঠায় বন্ধ করে রাখবো, যেখানে দুপুর বেলাও সূর্যের রোশনি দেখা যাবে না।'

আবার তিনি পাহারদারদের উদ্দেশে বললেন ঃ ওকে নিয়ে যাও, কিন্তু একে ভালো করে দেখাশোনা করো।'

আকবর খান এক পাহারাদারের সাথে বেরিয়ে গেলো। মীর হাবীব দরজার কাছে পৌছে আবার ফিরে মোয়াযযম আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি মনে করেছিলাম, তুমি নিজের কথা কিছু বলতে চাইবে।'

ঃ আমি এমন এক লোকের কয়েদখানায় রয়েছি, যার কাছে রহম বা ইনসাফের আবেদন করা নিরর্থক, নিজের সম্পর্কে এর বেশি আর কি বলতে পারি আমি? আমি এখন সেই সময়ের ইন্তেজার করছি, যখন ইনসাফের তলোয়ার আসবে আমার হাতে।'

মীর হাবীব ভিতরে ভিতরে রাগ করলেও বাইরে হেসে প্রশ্ন করলেন ঃ ইনসাফের তলোয়ার তোমার হাতে গেলে তুমি কি করবে?

ঃ তখন আপনাকে আমি এর চাইতে ভালো কোঠায় রাখবো এবং আপনার সাথে এমন কোনো কয়েদি রাখবো না, যাতে আপনি নিজের তকলিফ ভুলে যেতে পারেন।'

ঃ তুমি এক বেওকুফ। সেদিনটি কখনো আসবে না।' বলে মীর হাবীব বেরিয়ে গেলেন।

খুব ভোরে সে তাঁবু ঝাড়ু দেয়, তার বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখে, আবার কখনো বা তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিয়ে আসে। সিপাহীরা তার উপর খুব খুশি, কারণ আগে এসব ছোটখাটো কাজগুলো তাদেরই করতে হতো।

মুরলী দত্তের ছিলো বাঁশি বাজাবার ও তার চাইতেও বেশি শ্রোতাদের প্রশংসা শুনবার শখ। কিন্তু যে ক'টি সিপাহী দায়ে পড়ে তার পাশে এসে জমা হতো, তাদের ছাড়া কেল্লার আর কোনো লোকেরই আকর্ষণ ছিলো না তার এ শিল্পগুণের প্রতি, বরং অন্যান্য সিপাহী ও অফিসার তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করতো। বাঁশি বাজানো ছাড়া গানেরও শখ ছিলো তার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার গলার আওয়াজটা ছিলো দেহের তুলনায় আরো মোটা-কর্কশ।

তার দুর্বলতা কোথায়, আকবর খান তা জানতো। সে প্রাণখুলে মুরলী দত্তের প্রশংসা করতো। বলতো ঃ চাচা মুরলী দত্ত! বাপরে কতো গুণী আপনি। এমনি সুন্দর বাঁশি বাজাতে আর কাউকেও দেখিনি আমি।'

জওয়াবে সে বলে ঃ এ সব বুঝতে হলে বুদ্ধি থাকা চাই। তুমি এদের সবারই চাইতে বড়ো সমজদার।

ঃ চাচা মুরলী দত্ত! আপনার গলার আওয়াজটাও ভারী সুন্দর। আহা! আমি যদি এমনি করে গান গাইতে পারতাম!'

মুরলী দত্ত খুশি হয়ে বলে ঃ গানের জন্য খুব মেহনত করতে হয় বেটা!'

ধীরে ধীরে আকবর খানের উপর মুরলী দত্তের নির্ভরতা বেড়ে চললো। হাবেলীর ভিতরে তাকে ঘুরে বেড়াবার আজাদি দেওয়া হয়েছিলো। কয়েদিদের যখন কিছু সময়ের জন্য বাইরে আনা হতো, তখন কোনো বাহানা করে সে যেতো তাদের কাছে। পাহারাদাররা কাছে থাকতো বলে মোয়াযযম আলীর সাথে কথা বলবার মওকা সে পেতো না সব সময়। কিন্তু পাহারাদারদের মনোযোগ অন্যদিকে নিবিষ্ট হলে সে তার কানের কাছে চুপি চুপি দু'একটা কথা বলে সরে যেতো।

সিপাহী যখন কয়েদিদের জন্য খানা নিয়ে আসতো, তখন সে এগিয়ে গিয়ে কখনো রুটির টুকরি, আবার কখনো বা পানির পাত্রটি বয়ে দিয়ে আসতো। ধীরে ধীরে পাহারাদাররা তার কাছে থেকে এ ধরনের কাজ আদায় করে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। পাঁচ-ছয় সপ্তাহ পরে অবস্থা এমন হলো যে, কয়েদিদের খানা নিয়ে যাবার সময় হলে তারা তাকে হয়তো বলতো কুয়ো থেকে পানি তুলতে, নয় তো লঙ্গরখানা থেকে খানা নিয়ে আসতে।

কুঠরিগুলোর চাবি মুরলী দত্ত হামেশা নিজের হাতে রাখতো। রাতে কয়েদিদের খানা দেবার পর চাবির গোছা সে তাঁবুর মধ্যে একটা কাঠের সিন্দুকে রাখতো আর সিন্দুকের চাবিটা রাখতো সুতোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে। পাহারাদার প্রতিদিন ভোরে কয়েদিদের নিয়ে আসতো বাইরে, আর তারই জন্য তারা চাবি নিতো মুরলী দত্তের কাছ থেকে। একদিন তার শরীরটা ছিলো খানিকটা অসুস্থ, তাই সে শুয়ে শুয়ে সিন্দুকের চাবিটা আকবর খানের হাতে দিয়ে বললো ঃ যাও, তুমি গিয়ে চাবির গোছাটা বের করে দাও তো।'

এমনি করে শুরু হলো। এরপর আকবর খান এ কাজটি নিয়মিত নিজের জিম্মায় নিয়ে নিলো।

এক রাতে হালকা বৃষ্টি পড়ছে। মুরলী দত্ত খানা খেয়ে কিছুক্ষণ বাঁশি বাজালো, তারপর মোটা ভারী গলায় আকবর খানকে কয়েকটি গীত শুনিয়ে শুয়ে পড়লো। খানিকক্ষণ পরেই গভীর ঘুমের মধ্যে এমন করে নাসিকা গর্জন চলতে লাগলো যে, তা হাবেলীর প্রায় সকল সিপাহী ও অফিসারের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো। তার নাসিকা গর্জন আকবর খানকে পেরেশান করে তুললো। রাত্রির শেষ প্রহরে বৃষ্টি থেমে গেলে আকবর খান তার খাট নিয়ে গেলো তাঁবুর বাইরে।

দু'জন পাহারাদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলো একজন প্রশ্ন করলো ঃ কি খবর, আকবর খান?'

ঃ কিছু না। চাচা মুরলী দত্ত বীণা বাজাচ্ছে। তাই আমার ঘুম আসছে না।'

পাহারাদার তার কাছে এসে বললো ঃ আমার তো মনে হয়, তোপের আওয়াজও এর চাইতে বেশি পীড়াদায়ক হবে না। তোমার জায়গায় আমি থাকলে তো মুরলী দত্তের সাথে এক জায়গাতে না থেকে মাটির নিচে থাকাও পছন্দ করতাম। ওকে আবার এসব কথা কখনো বলে দিও না।'

অপর সিপাহী বললো ঃ ভাই আকবর খান! সত্যি কথাটা বলো তো ওর গান কি তোমার সত্যি ভালো লাগে? আধারাত ধরে তো ওর বাঁশি চলতে থাকে। তারপর আমরা যখন ভাবি, এবার হয়তো খানিকক্ষণ ঘুমোবার মওকা পাওয়া যাবে, তখনই তুমি ওকে ধরো গান শোনাতে।'

ঃ ওর গান আমার সত্যি খুব ভালো লাগে।' আকবর খান খাটের উপর শুয়ে পড়তে পড়তে জওয়াব দেন।

ভোর হলে আকবর খানকে তুলে দিয়ে পাহারাদার বললো ঃ যাও, চাবি নিয়ে এসো গে।'

চোখ মলতে মলতে তাঁবুর ভিতরে গিয়ে আকবর খান দেখলো, তখনো

মুরলী দত্তের নাসিকা গর্জন যথারীতি চলছে। মুরলী দত্তের ঘুম না ভাঙিয়ে কাছে গিয়ে সে নিশ্চিন্তে তার গলায় বাঁধা সুতোর গিড়া খুলে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুললো। তারপর কয়েদখানার চাবির গোছা নিয়ে সে বেরিয়ে এলো বাইরে।

খানিকক্ষণ পর সে তার খাটখানা তাঁবুর ভিতরে নিয়ে তার উপরে শুয়েই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো।

আচানক তার কানে গেলো মুরলী দত্তের আওয়াজ ঃ আকবর খান! আকবর খান!! বহুত দেরি হয়ে গেছে। যাও, পাহারাদারদের চাবি দিয়ে এসো। রাতের বেলা আমার ঘুম হয়নি।'

মুরলী দত্ত গলায় ও বুকের উপর হাত ঘুরিয়ে চাবি না পেয়ে চমকে উঠে বললেন ঃ আরে, আমার চাবি গেলো কোথায়?'

আকবর খান নিজের গলা থেকে চাবিটা খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো ঃ এই নিন্। আমি পাহারাদারদের চাবি বের করে দিয়েছি। আপনি তখন ঘুমে অচেতন,তাই আপনাকে জাগানো আমি ভালো মনে করিনি।'

ঃ তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছো।' মুরলী দত্ত চাবির সুতাটা গলায় লাগাতে লাগাতে বললেন ঃ কিন্তু আমার ঘুম এসেছে খুব দেরিতে। যাক, ভালোই করেছো আমার ঘুম না ভাঙিয়ে।'

ঃ এবার আমার ঘুম পাচ্ছে।' খাটিয়ার উপর শুয়ে আকবর খান চোখ বন্ধ করে বললো।

এই ঘটনার কয়েক হফ্‌তা পর। একদিন ভোরে কয়েদিদের আনা হয়েছে কুঠরির বাইরে। মওকা পেয়ে আকবর খান মোয়াযযম আলীকে বললো ঃ মীর হাবীব কাল কোথাও চলে গেছেন। তিনি এখানে না থাকলে ততোদিন পাহারা তেমন কড়া থাকবে না। মেঘ জমে আসছে। আজ রাতে বৃষ্টি হলে আপনি তৈরি থাকবেন।'

৪

সন্ধ্যাবেলা। আসমানে মেঘ জমে আসছে। মুরলী দত্ত তাঁবুর বাইরে খাটের উপর বসে নিশ্চিন্ত মনে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। আকবর খান পাহারাদারদের সাথে কয়েদিদের খানা বিতরণ করে ফিরে এসে চাবির গোছাটা খাটের সামনে রেখে বললো ঃ চাচা মুরলী দত্ত, আজ ভারী গরম। আমি শুনেছি, কোনো কোনো রাগিনী নাকি বৃষ্টি নিয়ে আসে। এমন কোনো রাগ-রাগিনী আপনার জানা আছে?'

মুরলী দত্ত বেপরোয়াভাবে জওয়াব দিলো ঃ রাগ মানুষের জন্য, বৃষ্টি-বাদলের জন্য নয়।' বলে সে আবার বাঁশি বাজাতে লাগলো।

কিছুক্ষণ দেরি করে আকবর খান বলে উঠলো ঃ চাচা মুরলী দত্ত, চাবিগুলো ভেতরে রেখে আসবো?

মুরলী দত্ত মুখে কোনো কথা না বলে গলা থেকে সিন্দুকের চাবিটা বের করে তার হাতে দিলো। আকবর খান চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেলো। তার বুকের মধ্যে তখন তীব্র স্পন্দন চলছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে চাবির গোছাটা সিন্দুকের পিছনে ফেলে রাখলো। তারপর সিন্দুকটা খুলে ঢাকনাটা ধড়াস্ করে ফেলে তালাবন্ধ করে ফিরে এলো মুরলী দত্তের কাছে।

ঃ কী রকম বে-অকুফ তুমি? মুরলী দত্ত ঝঙ্কার দিয়ে বললে ঃ আমার সিন্দুকটা ভেঙে ফেলতে চাও?'

আকবর খানের বুক ধুকফুক করছে প্রবল বেগে। সামলে নিয়ে সে বললো ঃ চাচা! ভিতরে ভারী গরম। দেখো, কি রকম ঘাম ঝরছে আমার।'

ঃ আজ বৃষ্টি হবেই।' আকবর খানের হাত থেকে চাবি নিয়ে গলায় ঝুলাতে ঝুলাতে সে বললো।

আকবর খান মুরলী দত্তের সামনে আর একটা খাটে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর সে আশেপাশে শুয়ে থাকা সিপাহীদের আওয়াজ দিয়ে বললো ঃ ভাই, এদিক এসো না সবাই। আজ চাচা মুরলী দত্তের গান বাজনা খুব জমবে।'

সিপাহীরা মুরলী দত্তের গান-বাজনা উপভোগ করবার চাইতে বরং তার গালিগালাজ থেকে রেহাই পাবার জন্য তার পাশে এসে বসে গেলো।

মুরলী দত্ত বললো ঃ সঙ্গীতের রাগ বুঝতে চাই বুদ্ধি। এবার মন দিয়ে শোনো।'

প্রায় একঘন্টা তারা সবাই অসহায়ভাবে সেখানে বসে রইলো। আচানক বৃষ্টির মোটামোটা ফোঁটা পড়তে শুরু করলো। মেঘ গর্জনের সাথে চলতে লাগলো মুষলধারে বর্ষণ।

আকবর খান বললো ঃ চাচা মুরলী দত্ত, বৃষ্টি পড়ছে। এবার উঠুন। খাটটা তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যাই।

মুরলী দত্ত বাঁশি বাজাতে বাজাতেই চলে গেলো ভিতরে।

খানিকক্ষণ পর আকবর খান ও মুরলী দত্ত তাঁবুর মধ্যে নিজ নিজ খাটে শুয়ে পড়লো। এবার সে বাঁশি রেখে শুরু করলো তার অসংলগ্ন ছেড়ে গলার গান। গান গাইতে গাইতে সে ঘুমিয়ে পড়লো এবং তারপরই তার তীব্র নাসিকাগর্জন অন্ধকার রাত্রির বিভীষিকা তীব্রতর করে তুলতে লাগলো।

আকবর খানের বুকের ধরফরানি আর একবার তীব্র হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ সে পড়ে থাকলো নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে। অবশেষে খাট থেকে নেমে সে একরকম হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছলো সিন্দুকের কাছে। সিন্দুকের পেছন থেকে চাবির গোছা তুলে নিতে সামান্য একটু আওয়াজ হলো আর তার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেনো ভয়ে জমে আসতে লাগলো। কিন্তু মুরলী দত্তের অব্যাহত নাসিকা গর্জন তার দুর্ভাবনা দূর করলো। ফিরে তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর দরজায় গিয়ে সে এবার দাঁড়িয়ে তাকাতে লাগলো বাইরের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পানি আর কাদায় দু'টি সিপাহীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। কয়েদিদের কুঠরির সামনে দিয়ে তারা এগিয়ে চলে গেলো। আকবর খান ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গেলো মোয়াযযম আলীর কুঠরির দিকে। একটির পর একটি চাবি সে দরজার তালায় লাগাবার চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে আবার তার কানে এলো পায়ের আওয়াজ। অমনি সে দরজার সাথে মিশে দাঁড়িয়ে রইলো। ভয়ে ও উদ্বেগে যেনো তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। বিজলির সামান্যতম চমক তার সকল কৌশল ব্যর্থ করে দিতে পারে। মাসের পর মাস চিন্তা-ভাবনা করে সে যা কিছু গুছিয়ে এনেছে, একটি মুহূর্তে তা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।

এক পাহারাদার তার সাথীকে বলছে ঃ চলো ভাই তাঁবুর মধ্যে। এ ঝড় বড্ড ভয়ানক।

ঃ থামো, আমি এখ্খুনি আসছি।' অপর ব্যক্তি জওয়াব দেয়।

ঃ কোথায় চললে?

ঃ জমাদার সাহেবের অবস্থাটা একবার দেখে আসি।'

আকবর খানের কাছ থেকে মাত্রপাঁচ কদম দূরে একজন দাঁড়িয়ে গেলো, অপর লোকটি চলে গেলো মুরলী দত্তের তাঁবুর দিকে।

কয়েকমিনিটের মধ্যেই সে হাসতে হাসতে ফিরে এলো। বললোঃ চলো ভাই। জামাদারজীর এখন দুনিয়ার কোনো খবরই নেই। আমরা গিয়ে এখন তাঁবুর মধ্যে বসে থাকবো। কমবখ্‌ত নিজে মোষের মতো ঘুমুচ্ছে আর এই বৃষ্টিতেও আমাদের মাথা ঢাকবার হুকুম নেই। এসব কুঠরির মধ্যে লুটে নেবার মতো কোন্ ধনভাণ্ডারই না রয়েছে যে, আমরা বারবার এসে উঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছি।'

তারা কথা বলতে বলতে চলে গেলো।

আকবর খান এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর একটা চাবি লেগে গেলো। সে তালা খুলে দরজাটা ঠেলে দিলো ভিতর দিকে।

ঃ ভাইজান! ভাইজান!' বলে সে ডাক দিলো চাপা গলায়।

ঃ আকবর, আস্তে কথা বলো।' মোয়াযযম আলী তার বাহু ধরে বললেন।

আকবর খান বললো ঃ পাহারাদাররা তাঁবুর ভিতরে চলে গেছে।'

ঃ আমি তা জানি। আমাদের সাথীরা ইন্তেজার করছে।'

আকবর খান চাবির গোছা তার হাতে দিতে দিতে বললো ঃ এই নিন। পাহারাদার এসে না পড়লে আমরা সবগুলো কুঠরি খুলতে পারবো।'

মোয়াযযম আলী বেরিয়ে গিয়ে দরজায় শিকল লাগিয়ে বললেন ঃ এর তালাটা কোথায়?'

আকবর খান জওয়াব দিলো ঃ সেটা আমি ছাদের উপর ছুঁড়ে ফেলেছি। মোয়াযযম আলী এগিয়ে গিয়ে আর একটা কুঠরি খুলতে লেগে গেলেন। কয়েকটা চাবি নিয়ে চেষ্টা করতেই তালা খুলে গেলো। তাদেরই দুই সাথী সেখানে ছিলো তাদের প্রতীক্ষায়। চাবির গোছার রশিটা ছিঁড়ে কয়েকটা চাবি তাদের হাতে দিয়ে তিনি বললেন ঃ এ দিয়ে যে ক'টি কুঠরি তোমরা খুলতে পারো তার কয়েদিদের এনে আমার কুঠরিতে জমা করো। দরজা যেমন ছিলো, তেমনি বন্ধ করে যাবে। আমাদের সাথীদের ছাড়া আর সব কয়েদিদেরও আমরা এখান থেকে বের করে নেবো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে মোয়াযযম আলীর আটজন সাথী ছাড়া আরো বারোজন কয়েদি এসে জমা হলো তার কুঠরিতে। তখন একপ্রান্তে মাত্র তিনটি কুঠরি বাকি রয়েছে এবং তার মধ্যে আটক রয়েছে পাঁচজন করে কয়েদি।

মোয়াযযম আলী একটি কুঠরি খুলছেন, এরই মধ্যে আকবর খান ছুটে এসে চাপা গলায় তার কানের কাছে বললো ঃ পাহারাদার টহল দিতে আসছে।

মোয়াযযম আলী জলদি করে কুঠরির দরজা খুলে আকবর খানের বাহু আকর্ষণ করে তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কয়েদিরা দরজার কাছে প্রতীক্ষা করছিলো। মোয়াযযম আলী দরজা বন্ধ করতে করতে আকবর খানকে প্রশ্ন করলেন ঃ পাহারাদার ক'জন?'

ঃ মাত্র দু'জন।' সে জওয়াব দিলো।

মোয়াযযম আলী জলদি করে কুঠরির কয়েদিদের বললেন ঃ তোমাদের ভিতর থেকে তিনজন মজবুত লোক আমার সাথে এসো। পাহারাদারদের ডাক-চিৎকারের মওকা না দিয়েই আমরা তাদেরকে এই কুঠরিতে আটক করবো। কিন্তু মনে রেখো, তোমাদের সামান্যতম ত্রুটি আমাদের সকল কৌশল মাটিতে মিশিয়ে দেবে।'

মোয়াযযম আলী দরজা খুলে দিলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই পাহারাদারদের পায়ের আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। কথা বলতে বলতে যেমন তারা কুঠরির সামনে পৌঁছে গেলো, অমনি মোয়াযযম আলী এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে একজনের গলা চেপে ধরে তাকে ঠেলে দিলেন কুঠরির মধ্যে। অপর লোকটি একবার মাত্র কি হলো;' বলতেই এক কয়েদি গিয়ে তার গর্দান চেপে ধরলো এবং বাকি দু'জন চড় ঘুসি মেরে তাকে আধ-মরা করে ফেলে দিলো কুঠরির ভিতরে।

অন্ধকারে মোয়াযযম আলীকে বলতে হলো না, কেমন আচরণ করা হবে তাদের সাথে। কেউ তাদের কামিজ ছিঁড়ে মুখের মধ্যে ঢোকালো, আর কেউবা পাগড়ি খুলে তাদের হাত-পা বেঁধে রাখলো। কেউ মারলো তাদেরকে চড়-চাপড় ও লাথি।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ভাই, দেখো, আঁধারের মাঝে কোনো সাথীকে আবার মেরো না।

পাহারাদারদের বন্দুক ও তলোয়ার দখল করে নিয়ে মোয়াযযম আলী কয়েদিদের বাইরে বের করে নিয়ে কুঠরির দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন। বাকি দু'টি কুঠরির কয়েদিদের মুক্ত করতে দেরি হলো না খুব বেশি। কয়েদিরা সব মোয়াযযম আলীর কুঠরিতে জমা হলে তিনি আকবর খানকে বললেন ঃ আকবর, তুমি আমাদের সবাইকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করছো এবার বাইরে যাবার পথও দেখাতে হবে তোমাকেই।'

আকবর খান জওয়াবে বললো ঃ হাবেলীর দরজা খুলে বাইরে যাওয়া সম্ভব

হবে না। এখান থেকে বাইরে যাবার রয়েছে মাত্র দু'টি পথ। হয় আমাদেরকে পিছনের দেয়াল খুঁড়তে হবে নইলে ছাদে উঠে পিছন দিকের অন্য হাবেলীতে লাফিয়ে পড়তে হবে। পিছনের হাবেলীতে খাদ্যশস্যের গুদাম ও ঘোড়ার আস্তাবল। ওখানে এখন রয়েছে পনেরো বিশজন পাহারাদার। আমাদের হাতে রয়েছে মাত্র দু'টি বন্দুক আর দু'টি তলোয়ার। আমি অবশ্যি মুরলী দাসের বন্দুক, তলোয়ার, পিস্তল আর বারুদের থলে এনে দিতে পারি আপনাকে, কিন্তু আচানক এই খিমাগুলোর উপর হামলা করে পাহারাদারদের পরাজিত করতে পারলে আমরা আরো বেশি বন্দুক ও তলোয়ার হাসিল করতে পারবো। তা'হলে পাশের হাবেলীর পাহারাদারদের পরাজিত করা হবে সহজ আমাদের পক্ষে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ পাশের হাবেলী থেকে হাতিয়ার হাসিল করা বরং আরো সহজ হবে। কুঠরিগুলোর ছাদ তেমন উঁচু নয়। আমরা সহজেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। আকবর খান সবার আগে তোমার পালা। তুমি আমার সাথে এসো।'

কুঠরির বাইরে বেরিয়ে মোয়াযযম আলী দেয়ালের দিকে উঁকি মেরে দেখে বললেন ঃ তুমি আমার কাঁধে উঠে দাঁড়াও।

আকবর খান তার হুকুম তামিল করলো, কিন্তু ছাদের নাগাল পেলো না হাতে। মোয়াযযম আলী তার মজবুত হাত দিয়ে তার পা'দু'টো ধরে আরো উঁচু করে ধরলে সে ছাদের প্রান্তে ভর দিয়ে উপরে উঠে গেলো।

তারপর মোয়াযযম আলী তেমনি করে আর একটি লোককে ছাদে তুলে দিলেন। বাকি সবাইকে একই তরিকা অবলম্বন করবার হুকুম দিলেন তিনি। দেখতে দেখতে সবাই ছাদে উঠে গেলো, নিচে রইলেন কেবল মোয়াযযম আলী। দু'জন তাদের পাগড়ি পাকিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দিলো। মোয়াযযম আলী নিশ্চিন্ত মনে কুঠরির দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছাদে উঠে গেলেন।

পরের হাবেলীর ঘরগুলোর ছাদ এদিককার ছাদ থেকে প্রায় একগজ নিচু। সাথীদের অপেক্ষা করতে বলে মোয়াযযম আলী মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে হাঁটুতে ভর করে সামনে এগিয়ে গেলেন। পাশের হাবেলীর ছাদের প্রান্তে গিয়ে তিনি প্রাঙ্গণটি দেখে নিলেন। হাবেলীর বেশিরভাগই অন্ধকার। ডানদিকের দেয়ালের মাঝখানে এক প্রশস্ত তোরণে জ্বলছে মশাল। মশালের আলোয় দেউড়ির সামনের একটা ছাউনির কিছুটা নজরে পড়ে। তার নিচে কয়েকটি লোক খাটের উপর শোয়া। মোয়াযযম আলী চাপা গলায় সাথীদের আওয়াজ দিলেন এবং তারা গিয়ে ছাদের প্রান্তে লম্বা কাতারে শুয়ে পড়লো। মোয়াযযম আলী আকবর খানকে ধরে নিচে

নামিয়ে দিয়ে নিজেও ছাদ থেকে ঝুলে নিচে নেমে গেলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তার সকল সাথী পাশের হাবেলীর প্রাঙ্গণে পৌছে গেলো।

মোয়াযযম আলী বাকি লোক ক'টিকে সেখানে থাকতে হুকুম দিয়ে আকবর খান ও আরো তিনজন সাথী নিয়ে পানি-কাদার ভিতর দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে চললেন হাবেলীর আলোর দিকে। ছাউনীর নীচে দু'টি চারপায়ীর মাঝখান দিয়ে তারা একে একে চলে গেলেন দেউড়ির ভিতরে। সেখানে দু'টি লোক খাটের উপর আর সাতজন মেঝের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। ডানদিকের দেয়ালের সাথে জ্বলছে একটি মশাল। তার কাছেই পড়ে রয়েছে তেলের কুপি। বাঁদিকে এক খাটের শিয়রের কাছে দেয়ালের সাথে কয়েকটি বন্দুক আর বারুদের থলে। মোয়াযযম আলী হাতের ইশারায় সাথীদের বললেন তা দখল করে নিতে। তারা হামাগুড়ি দিয়ে সতর্কভাবে বন্দুকগুলো তুলে চলে গেলো বাইরে।

মোয়াযযম আলী মশাল হাতে নিয়ে তার উপর কুপি থেকে তেল ঢেলে দিয়ে ফিরে চললেন। দেউড়ির পথে ছাউনিতে ঢুকে দেখলেন, তার ডান-বাঁয়ে ছ'জন লোক চারপায়ীর উপর ঘুমন্ত। সামনে ছাউনির নিচেই দুই সারিতে কয়েকটি ঘোড়া বাঁধা। মোয়াযযম আলী মশাল উঁচু করে এক হাত দিয়ে ইশারা করতেই তার সাথীরা এগিয়ে এসে দেউড়ির সামনে জমা হলো। তার ইশারা পেয়ে কয়েকজন দেউড়ির ভিতরে ঢুকলো। ইতিমধ্যে ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলো দাপাদাপি করতে লাগলো। ছাউনির নিচে ঘুমন্ত তিনটি লোক উঠলো বিড়বিড় করতে করতে। মোয়াযযম আলীর সাথীরা বন্দুকের বাট দিয়ে মেরে চুপ করিয়ে দিলো তার গলা ধরে। দেউড়ির ভিতরে ও ছাউনির নিচে বাকি পাহারাদার অপ্রত্যাশিত হামলাদারদের দিকে তাকাতে লাগলো ভয় ও পেরেশানির দৃষ্টিতে।

মোয়াযযম আলী বললেন: এ গাঁ এখন আমাদের দখলে। তোমাদের কোনো পালাবার পথ নেই। কেউ হাঁক-চিৎকার দেবার চেষ্টা করলে তাকে গুলি করা হবে। ভালাই চাইলে কোনো কথা না বলে আমার হুকুম তামিল করো।'

খানিকক্ষণ পর মোয়াযযম আলীর সাথীরা পাহারাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে বন্ধ করে দিলো এক শস্যের গুদামে। মোয়াযযম আলী গুদামের দরজা বন্ধ করেছেন অমনি আকবর খান ছুটে এসে বললো ঃ ভাইজান, হাবেলীর ফটকে তালা লাগানো। ওদের কাছে থেকে চাবিটা নিয়ে নিন।'

ঃ চাবি কার কাছে? মোয়াযযম আলী জিজ্ঞেস করলেন পাহারাদারদের।

কোনো জওয়াব না পেয়ে তিনি আবার বললেন ঃ আমি হাবেলীর চাবি চাই। এক মিনিটের মধ্যে চাবি আমার হাতে না এলে আমি গুদামে আগুন লাগিয়ে

দেবো।'

একটি লোক এগিয়ে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে চাবিটা মোয়াযযম আলীর হাতে তুলে দিলো।

দরজার শিকল লাগিয়ে দিয়ে মোয়াযযম আলী সাথীদের বললেন ঃ তোমরা দু'জন দরজার কাছে দাঁড়াও। এরা কেউ চিৎকার করলে এ হাবেলীতে আগুন ধরিয়ে দেবে। বাকি সবাই জলদি করে ঘোড়ায় সওয়ার হও।'

হাবেলীর প্রাঙ্গণে দেয়ালের সাথে ছাউনির নিচে প্রায় দেড়শ' ঘোড়া বাঁধা। পাশে খুঁটির সাথে সাথে ঘোড়ার লাগাম ও জিন টাঙানো। প্রয়োজনমতো ঘোড়া তৈরি করে নিয়ে মোয়াযযম আলীর সাথীরা বাকি তামাম ঘোড়া খুলে নিয়ে জমা করলো দেউড়ির সামনে। তারপর খুলে দেওয়া হলো হাবেলীর ফটক। ঘোড়ারদল তাড়া খেয়ে বেরিয়ে গেলো।

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে গাঁয়ের পাহারাদার ছুটে এলো সেই সঙ্কীর্ণ গলির পথে, কিন্তু সে পিষে গেলো ঘোড়ার পায়ের তলায়।

কয়েক মিনিট পর যখন পাশের হাবেলীর মুহাফিজ বন্দুক ও নাকারার আওয়াজ করে লোকদের খবরদার করছে, তখন মোয়াযযম আলী সাথীদের নিয়ে গাঁয়ের বাইরে মারাঠা ফউজের তাঁবু অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন। তারপর যখন তাঁবুর সিপাহীরা খিমার বাইরে এসে অন্তহীন পেরেশানির মধ্যে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তখন তারা এগিয়ে গেলেন দু'তিন মাইল দূরে।

মুরলী দত্ত হাবেলীর দিক থেকে কোলাহল শুনে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলো। শুয়ে শুয়েই সে আওয়াজ দিতে লাগলো সিপাহীদের। সিপাহীরা তাঁবুতে ছুটে এলে সে প্রশ্ন করলো ঃ ব্যাপার কি?'

ঃ কিছু না, জনাব, এক সিপাহী জওয়াব দিলো ঃ পাশের হাবেলীর ঘোড়া ছুটে চলে গেছে বাইরে।'

ঃ ঘোড়া কি করে ছুটে গেলো?' হতভম্ব হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ কে জানে, কি করে ছুটে গেছে। হাবেলীর দরজা খোলা আর পাহারাদার সব কোথায় গায়েব হয়ে গেছে। মনে হয়, ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনতে বেরিয়ে গেছে তারা।'

ঃ কতগুলো ঘোড়া পালিয়েছে?'

ঃ জনাব, সবগুলোই গেছে। একটাও নেই ওখানে।'

মুরলী দত্ত এবার বিছানা ছেড়ে উঠে সিপাহীকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে গিয়ে

বললো ঃ তুমি এক পাগল। সবগুলো ঘোড়া কি করে পালাতে পারে আপনা আপনি?'

সে এবার হাবেলীর দরজার দিকে ছুটে গেলো। মশালের রোশনিতে সে দেউড়ির সামনে দেখতে পেলো চৌকির মুহাফিজকে।

ঃ ব্যাপার কি, জনাব?' হাঁপাতে হাঁপাতে সে প্রশ্ন করলো ঃ ঘোড়াগুলো আপনা আপনি কি করে বেরিয়ে গেলো?'

ঃ ডাকাত ঘোড়া নিয়ে গেছে?'

ঃ কিন্তু পাহারাদাররা কোথায় গিয়েছিলো?'

ঃ পাহারাদারদের আমরা এক কুঠরি থেকে বের করেছি। তুমি তোমার কয়েদিদের খেয়াল রেখো।'

ঃ কয়েদিদের জন্য ভাবনা নেই, জনাব! কিন্তু এতগুলো ঘোড়ার লোকসান?

মুরলী দত্তের এক সিপাহী ছুটে এসে খবর দিলো ঃ দু'জন সিপাহী কোথায় গুম হয়ে গেছে।'

মুরলী দত্ত জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমরা কয়েদিদের কুঠরি দেখেছো?'

ঃ জী হ্যাঁ, সেসব কুঠরিতে তালাবদ্ধ রয়েছে।'

এর মধ্যে আর এক সিপাহী ছুটে এসে খবর দিলো ঃ কয়েদিরা ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ দিচ্ছে না। ওরা পেছনের দেয়ালে গর্ত করে পাশের হাবেলীতে চলে গেছে কিনা, কে জানে?

মুরলী দত্ত হতভম্ব হয়ে বললো ঃ কয়েদিরা দেড় গজ চওড়া দেয়ালটা খোদাই করতে পারেনি। এরা আমাদেরকে আরো পেরেশান করতে চাইছে।'

চৌকির মুহাফিজ বললো ঃ কয়েদিদের কুঠরিগুলো আমি দেখতে চাই।'

খানিকক্ষণ পর মুরলী দত্ত মশালের আলোয় তার সিন্দুক খালি দেখে চিৎকার করে আকবর খানকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। কয়েকজন অফিসার ও সিপাহী নিয়ে চৌকির মুহাফিজ তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে।

আর এক পাহারাদার ছুটে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে চিৎকার করে বললো ঃ সরকার! ভয়ানক খবর! গোলাম আলীর কুঠরি খালি?'

ঃ তুমি কি করে জানলে, সে কুঠরি খালি? পাগলের মতো উত্তেজিত হয়ে সে প্রশ্ন করলো।

ঃ জনাব, আমি হাতড়ে দেখেছি, সে কুঠরির তালা গায়েব। বাইরে থেকে শুধু শিকল লাগানো রয়েছে। আমি ভিতরে গিয়ে দেখেছি, কেউ নেই।'

মুরলী দত্ত অপরাধীর মতো চৌকির মুহাফিজের দিকে তাকিয়ে বললো

ঃ সরকার, চাবির গোছা গায়েব হয়ে গেছে।'

চৌকির মুহাফিজ কোনো কথা না বলে মুরলী দত্তের বিছানা থেকে বাঁশি তুলে নিয়ে তাকে বেপরোয়াভাবে পিটাতে লাগলেন। :-P

৪

আলীবর্দী খান মেদিনীপুরের সরকারি মহলে রয়েছেন। তাঁর ফউজ তাঁবু ফেলেছে শহরের বাইরে। একভোরে তিনি মহলের প্রশস্ত কামরায় বসে কতগুলো দরখাস্ত ও চিঠিপত্রের জওয়াব লিখাচ্ছেন মীর মুন্শীকে দিয়ে। বাম দিকে এক কুরসিতে সিরাজুদ্দৌলা উপবিষ্ট। মহলের দারোগা ভিতরে ঢুকে আদবের সাথে সালাম করে একখানা চিঠি পেশ করলো।

আলীবর্দী খান মীর মুন্শীকে কয়েকটি কথা বলে দিয়ে দারোগার দিকে মনোযোগ দিলেন। দারোগা বললো ঃ আলীজাহ্, মোয়াযযম আলীর দরখাস্ত। তিনি এই মুহূর্তে হুজুরের কদমবুচি করবার এজাযত চান।'

ঃ মোয়াযযম আলী' কে?' আলীবর্দী খান চিঠি খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন।

দারোগা জওয়াবে বললো ঃ আলীজাহ্ এ সেই নওজোয়ান-যাকে হুজুর সরহদী এলাকায় মুহাফিজ নিযুক্ত করেছিলেন। বহুদিন তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মারাঠাদের কয়েদখানা থেকে ফেরার হয়ে তিনি এইমাত্র পৌঁছলেন এখানে।'

আলীবর্দী খান জলদি করে চিঠি খুলে পড়ে নিয়ে দারোগাকে বললেন,

ঃ ওকে এখখুনি এনে হাজির করো এখানে।'

দারোগা সালাম করে বেরিয়ে গেল। আলীবর্দী খানের দৃষ্টি পুনরায় সেই চিঠির প্রতি নিবদ্ধ হলো।

খানিকক্ষণ পরে মোয়াযযম আলী এসে ঢুকলেন কামরায়। আলীবর্দী খান উঠে তার সাথে গভীর উৎসাহে মোসাফেহা করলেন। সিরাজুদ্দৌলা তার অনুসরণ করলেন। আলীবর্দী খান বললেন ঃ তোমার সম্পর্কে আমরা হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, বসো তোমার কাহিনী আমায় শোনাও।'

মোয়াযযম আলী আলীবর্দী খানের সামনে বসে পড়লেন। তারপর সংক্ষেপে নিজের কাহিনী তাকে বললেন।

তার কথা শেষ হলে আলীবর্দী খান বললেন ঃ আহা ! তুমি মীর হাবীবের কয়েদখানায়, এ যদি আমরা জানতাম ! তোমার গ্রেফ্‌তারি নিশ্চয়ই আতাউল্লাহ্ খানের ষড়যন্ত্রের ফল। সে এখন তার কর্মফল ভুগছে। আমি তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছি।'

মোয়ায্‌যম আলী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ আমার বিশ্বাস, আমার গ্রেফ্‌তারি কেবল আতাউল্লাহ্ খানের ষড়যন্ত্রেরই ফল নয়, তার সাথে আরো কোনো কোনো লোক শরীক ছিলেন।'

আলীবর্দী খান জওয়াব দিলেন ঃ আসলে ষড়যন্ত্র ছিলো আমারই বিরুদ্ধে:আর আতাউল্লাহ্ খান সম্পর্কে তার দীলের মধ্যে সন্দেহ পয়দা হয়েছিলো এবং ফউজের হেফাজত ছাড়া তিনি তোমায় সফর করতে বারণ করেছিলেন।'

ঃ আলীজাহ্ তিনি অবশ্যি আমায় বারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি যে আতাউল্লাহ্ খানের গোপন খবর জানতেন না, তার প্রমাণ এতে পাওয়া যায় না।'

আলীবর্দী বিষণ্নকণ্ঠে জওয়াব দিলেন ঃ আতাউল্লাহ্ খানের গোপন রহস্য জানা সত্ত্বেও যদি তিনি সময়মতো তার ইরাদার খবর না দিতেন, তাহলে উড়িষ্যায় আমায় অন্তহীন বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতো। অবশ্যি তুমি চাইলে তোমায় গ্রেফ্‌তারির সঠিক কারণ নির্ধারণ করা খুব মুশকিল হবে না। মীর হাবীব আমার সাথে শান্তি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন, আর আমি শান্তির শর্ত স্থির করার জন্য মীর জাফরের নেতৃত্বে তার কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছি।

মোয়াযযম আলী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি মীর হাবীবের সাথে শান্তিস্থাপন করতে চান?'

ঃ হ্যাঁ, আমি উড়িষ্যায় মারাঠাদের উপর্যুপরি হামলায় বিব্রত হয়ে পড়েছি। মীর হাবীব বিশেষ শর্তসাপেক্ষে উড়িষ্যার হেফাজতের জিম্মাদারি নিতে তৈরি। দু'বার তার দূত এসেছে আমার কাছে। মীর জাফরের খেয়াল, তিনি আমাদের অধীনে চাকরি করতে রাজি হবেন। মীর জাফর তাকে রাজি করতে পারলে একে মনে করবো অতি বড়ো সাফল্য। মারাঠাদের সাথে মীমাংসার জন্য তার চাইতে যোগ্যতর কোনো লোক হতে পারে না। তুমি ঠিক সময় মতোই এসে পৌঁছে গেছো। আমার ইচ্ছা, তার সাথে সন্ধির শর্ত স্থির করার জন্য তোমায়ও মীর জাফরের সাথে পাঠাবো।'

মোয়াযযম আলী বহুক্ষণ অবাক-বিস্ময়ে আলীবর্দী খানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ আলীজাহ্! যদি আমার গোসতাখি না নেন, তা'হলে আমি কিছু আরজ করবো।'

ঃ বলো।'

ঃ মীর হাবীবের মতো লোকের সাথে আলোচনার জন্য আমাদের প্রয়োজন তলোয়ারের জবান। ভেড়া দিয়ে ভেড়ার হেফাজত করবার যুক্তি আমি বুঝি না। মীর হাবীবকে আমি জানি খুব ভালো করে। সে এক গাদ্দার। গাদ্দারের উপর পুনরায় নির্ভর করা হবে নিকৃষ্টতম আত্মপ্রতারণা। সে যদি কেবল আপনারই দুশমন হতো, তাহলে তার অতীত কার্যকলাপ ভুলে যাবার হক আপনার থাকতো। কিন্তু সে আপনার হুকুমাতের চাইতেও বাংলার বাসিন্দাদের ইজ্জত, আজদি সৌভাগ্যের দুশমন এবং বাংলার কোনো দেশপ্রেমিক মানুষই তার অতীতকে ভুলে যাবার মতো ভুল করবে না।

'আমি আমার দীলের মধ্যে বাংলার ইজ্জত ও আজাদির জন্য এক তীব্র উদ্দীপনা অনুভব করেছি বলেই আপনার ফউজে শামিল হয়েছি। আমার সাথীরা আপনার দুশমনকে বাংলার দুশমন মনে করেছে এবং বাংলার দুশমনকে মনে করেছে তার নিজের দুশমন, তাই আপনার কাঁধা উঁচু রাখবার জন্য পেশ করেছে বুকের খুন। আজ যদি আপনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন তাহলে এই ধরনের লোকদের স্বীকার করতে হবে চরম পরাজয়।'

আলীবর্দী খান বললেন ঃ আহা, এ কওমে তোমার মতো আরো কিছু নওজোয়ান যদি থাকতো। আমি তোমার মনোভাবের কদর করি। কিন্তু আমার অসহায়তার খবর তুমি জানো না। যে অগুণতি ভাগ্যান্বেষীর প্রত্যেকে নিজকে মনে করে হুকুমাতের মসনদের একমাত্র হকদার, কি করে আমি চলবো তাদের সাথে তাল রেখে? বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি বাধ্য হয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য মীর হাবীবের দিকে হাত বাড়িয়েছি।

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আপনার অনন্যোপায় হবার কারণ, আপনি হুকুমাত চালিয়ে যাবার জন্য অথবা গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কতক ভাগ্যান্বেষীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব কায়েম রাখাই যথেষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু আমি এসব ক্ষমতালোভীর কাউকেও কওমের ইজ্জত ও আজাদির রক্ষক মনে করি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, কওমের সমষ্টিগত প্রতিরোধশক্তিই আমাদের সৌভাগ্য ও আজাদির জামানত দিতে পারে। এসব সুযোগসন্ধানী, গাদ্দার ও ক্ষমতার মসনদের বেহায়া দাবিদার জন্ম নিয়েছে আওয়ামের চেতনার অভাব, সংশয় ও হতাশা থেকে। এদের কারুর সাথে দর কষাকষি করার চাইতে আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো কওমের প্রতিরোধশক্তি জাগিয়ে তুলতে। এ হচ্ছে এমন এক দুষ্টক্ষত-যাকে কেটে মূলশুদ্ধ তুলে না ফেলে

এক স্বাস্থ্যবান কওম সৃষ্টি করে তোলা অসম্ভব। যে হুকুমাত এক স্বাস্থ্যবান কওম সৃষ্টি করে তোলার ব্যাপারে উদাসীন, তার কাছে ভিতরের গাদ্দার বাইরের হামলাদারের চাইতেও অনেকখানি বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।'

আলীবর্দী খান তিক্ত কণ্ঠে বললেন ঃ নওজোয়ান, তুমি তোমার সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছে। মীর হাবীবের বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ ও বিদ্বেষের কারণ বুঝে ওঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার দুশমনির পরিবর্তে দোস্তির প্রয়োজন রয়েছে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ মীর হাবীবের দোস্তি হাসিল করবার জন্য আপনার এক মামুলি সিপাহীর খেদমতের প্রয়োজন নেই। বর্তমান অবস্থা যদি আমার একটি সত্যাশ্রয়ী মানুষ হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তা'হলে আমার বর্তমান চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সেই সময়ের ইন্তেজার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যখন আমাদের কিসমতের আমানতদার দোস্ত ও দুশমনের পার্থক্য করতে পারবেন। এখন আপনি আমায় এজাযত দিন।'

বলে মোয়াযযম আলী উঠে দাঁড়ালেন।

আলীবর্দী খান খানিকক্ষণ ক্রোধ এবং ক্রোধের চাইতেও বেশি পেরেশানি ও উত্তেজনার দৃষ্টিতে মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ মোয়াযযম আলী! তুমি নিজের তলোয়ারের শক্তি সম্পর্কে সচেতন। তোমার ইস্তফা মঞ্জুর করা হবে না। দীর্ঘকাল মারাঠাদের কয়েদখানায় কাটিয়ে আসার পর তুমি ছয় মাসের ছুটির হকদার। আমার বিশ্বাস, এই সময়ের মধ্যে তুমি বুঝবে যে, আমার এ পদক্ষেপ ঠিকই হয়েছে। মারাঠাদের মধ্যে ভাঙন আনবার জন্য মীর হাবীবকে হাতে আনবার প্রয়োজন রয়েছে। এবার তুমি যেতে পারো।'

মোয়াযযম আলী বেরিয়ে গেলেন। আলীবর্দী খান সিরাজুদ্দৌলার দিকে তাকাতে লাগলেন।

সিরাজুদ্দৌলা বললেন ঃ জাহাপনা! গোসতাকি করলেও এ এক খাঁটি সিপাহী। কিন্তু আমার ভয় হয়, ছয়মাস পরেও হয়তো উনি আমাদের ফউজে ফিরে আসাটা পছন্দ করবেন না।'

আলীবর্দী খান হেসে বললেন ঃ মাহমুদ আলীর বেটা। আমার বিশ্বাস, এই মুহূর্তে যদি আমাদেরকে কোনো অভিযানে যেতে হয়, তাহলে ও ঘরে ফিরে না গিয়ে আমাদের সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে। তুমি যাও, ওকে ইজ্জত ও সম্মান সহকারে বিদায় করো। একদিন ও তোমার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ারের কাজ করবে।

সিরাজুদ্দৌলা বললেন ঃ তাহলে আপনি ওর উপর রাগ করেননি?'

আলীবর্দী খান বললেন ঃ রাগ? এক বৃদ্ধ তার হাতের লাঠির উপর, সিপাহী তার তলোয়ারের উপর, লেখক তার কলমের উপর এবং শাসক তার শাসনদণ্ডের উপর কি করে রাগ করতে পারে? হ্যাঁ, আমার একটি মাত্র আফসোস, বেটা ও অন্তহীন আবেগ সহকারে কথা বললো, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে কেন ওকে বুকে চেপে ধরলাম না। আহা! আমার আস্ত্রাগারে যদি এই তলোয়ার আগে থাকতো আর প্রতিটি অভিযানে প্রত্যেক দুশমনকে আমি তার তেজ দেখাতে পারতাম! কিন্তু যখন তোমার আমল আসবে, আমার বিশ্বাস, তখন অবস্থা হবে অন্যরূপ। মোয়াযযম আলীর মতো নওজোয়ানের বুকের স্পন্দনে জন্ম নেবে এক নতুন কওম। তুমি গিয়ে বখশীকে বলে দাও, ওকে আর ওর সাথীদের যেনো কয়েদ থাকার সময়ের পুরো বেতন দিয়ে দেয়। এক হফতার মধ্যে আমি মুর্শিদাবাদে ফিরে আসবো। ওখানে আমি চেষ্টা করবো, যাতে ওকে তোমার রক্ষীফউজের অধিনায়ক করে দেওয়া যায়।'

সিরাজুদ্দৌলা কামরা থেকে বেরিয়ে মহলের দরজায় মোয়াযযম আলীর সাথে মিলিত হলেন এবং আওয়াজ দিয়ে তাকে ফিরাতে গিয়ে বললেন ঃ আপনার সাথে কথা বলবার মওকা আমি পাইনি।'

ঃ বলুন।' মোয়াযযম আলী বললেন।

সিরাজুদ্দৌলা বললেন ঃ আমি এখান থেকে সোজা হুগলী চলে যাচ্ছি এবং সম্ভবত কিছুকালের মধ্যে ফিরে আসতে পারবো না মুর্শিদাবাদে। তাই আমার ইচ্ছা, যদি আপনি ইস্তফা দেওয়া সম্পর্কে ইরাদা পরিবর্তন করতে পারেন, তাহলে সোজা আমার কাছে চলে আসুন। ওখানে আমার নিজস্ব ফউজের জন্য নির্ভরযোগ্য লোক প্রয়োজন।'

ঃ আপনি আমায় নির্ভরযোগ্য মনে করেন?' হেসে মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন।

সিরাজুদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ আপনাকে নির্ভরযোগ্য মনে না করলে আমি আপনার পিছু পিছু ছুটে আসতাম না। চলুন, আমরা ধীরস্থীর হয়ে খানিক্ষণ আলাপ করি।'

মোয়াযযম আলী তার সাথে মহলের এক কামরায় প্রবেশ করলেন এবং প্রায় দুঘণ্টা ধরে চললো তাদের মধ্যে আলোচনা। বিদায়ের সময়ে সিরাজুদ্দৌলা উষ্ণ আন্তরিকতা সহকারে মোসাফেহা করতে গিয়ে বললেন ঃ কয়েক হফতার মধ্যে আপনি আমার কাছে পৌছে যাবেন, এ প্রত্যাশা আমি করতে পারি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আপনার সাথে আমি শুধু এই ওয়াদা করতে পারি যে, আমি ইস্তফা দেবার ইরাদা পরিবর্তন করলে আর কারুর কাছে না গিয়ে সোজা আপনারই কাছে চলে যাবো।'

সিরাজুদ্দৌলা বললেন ঃ আমার বিশ্বাস, আপনার ইরাদা খুব জলদি বদলে যাবে।'

খানিকক্ষণ পরে মোয়াযযম আলী বারোজন সওয়ার সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন মুর্শিদাবাদের পথে। এর মধ্যে আটজন ছিলো তার কয়েদখানার সাথী। বাকি লোকেরা পথের বিভিন্ন মনজিলে বিদায় নিয়ে গেছে নিজ নিজ গৃহে।

মেদিনীপুরে কয়েক ঘন্টা থাকার মধ্যেই মোয়াযযম আলী নাজির ও হোসেন বেগের বাড়ির খবর জেনে নিয়েছেন। তাদের মহল্লার এক সিপাহী তাকে জানিয়েছে যে, তার বাপ মুর্শিদাবাদে রয়েছেন। তার ভাই ইউসুফ তার নিখোঁজ হওয়ার পর আজীমাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। মীর মদন হুগলীর ফউজদারী সামলে নেবার পর তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। আফযল বেগ রয়েছেন মুর্শিদাবাদে।

মুর্শিদাবাদ থেকে মীর মদনের বদলির খবর তাকে পেরেশান করে তুলেছিলো, কিন্তু এক ফউজী অফিসারের সাথে আলাপ করে তিনি জেনেছেন যে, মুর্শিদাবাদে কোনো কোনো উমরাহর, বিশেষ করে মীর জাফরের সাথে কঠিন মতবিরোধের দরুন তিনি ঢাকায় যাবার জন্য আলীবর্দী খানের কাছে আবেদন করেছিলেন।

আট

আমেনা ভোরে নামাযের পর বালাখানার এক কামরায় বসে কোরআন শরীফ পড়ছেন। সাবের ছুটে এসে মেয়ে মহলের প্রাঙ্গণে ঢুকে পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠলো ঃ মোয়াযযম আলী! মোয়াযযম আলী এসেছেন!'

আমেনা কোরআন শরীফ বন্ধ করে উঠলেন, কিন্তু তার আর কথা বলবার বা চলবার হিম্মত নেই। পরিচারিকা সাবেরের বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো ঃ কোথায় মোয়াযযম আলী? আল্লাহর কসম, বলো, তিনি কোথায়? কিন্তু সাবের তার কথায় আমল না দিয়ে বালাখানার দিকে মুখ তুলে যথারীতি চিৎকার করতে লাগলো ঃ বিবিজী! বিবিজী! মোয়াযযম আলী এসেছেন।'

মোয়াযযম আলী আকবর খানকে নিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে পরিচারিকা ছুটে বালাখানার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বিবিজী! মোয়াযযম আলী .... বলে পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার আওয়াজ গলার মধ্যে বসে গেলো।

আমেনা কাঁপতে কাঁপতে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। মোয়াযযম আলী তাকে দেখেই জোর কদমে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি এসে দাঁড়ালেন মায়ের সামনে এবং কেমন আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

আম্মাজান! আমি এসেছি। মোয়াযযম আলী আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন। মায়ের চোখে তখন নেমে এসেছে অশ্রুর সয়লাব।

ঃ বাছা আমার! বেটা আমার! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে বলতে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন মা।

মোয়াযযম আলী বে-এখতিয়ার মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর মা বহু কষ্টে সংযত করতে লাগলেন উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ।

ঃ আমার চাঁদ আমার লাল! আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবে। হররোজ আমি তোমায় স্বপ্নে দেখেছি।'

ঃ আব্বাজান কোথায়? মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন।'

ঃ তিনি মসজিদে গেছেন নামাজ পড়তে। এখখুনি এসে পড়বেন।'

বলে মা দরজায় দাঁড়ানো পরিচারিকার দিকে তাকালেন। সে তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে। মা বললেন ঃ তুমি জলদি করে নাশতা তৈরি কর আর সাবেরকে বলো ওর আব্বাজানকে খবর দিতে।

ঃ সাবের আগেই চলে গেছে।' বলে পরিচারিকা নিচে চলে গেলো।

মা ও বেটা গালিচার উপর মুখোমুখি হয়ে বসলেন। মা তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন ঃ এতদিন তুমি কোথায় ছিলে বেটা?'

ঃ আম্মাজান আমি কয়েদখানায় ছিলাম।' বলে উঠে মোয়াযযম আলী সিঁড়ির কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলেন ঃ আকবর খান! তুমি নিচে কেন দাঁড়িয়ে রইলে। এসো উপরে।'

ঃ আকবর খান কে?' মা প্রশ্ন করলেন।

মোয়াযযম আলী হেসে জওয়াব দিলেন ঃ আম্মাজান, আমি আপনার আর এক বেটা নিয়ে এসেছি। ও আমারই সাথে কয়েদখানায় ছিলো, আর ওরই জন্য আমরা মুক্তি পেয়ে এসেছি।'

আকবর খান দ্বিধাকুণ্ঠিত পদে কামরায় ঢুকে মোয়াযযম আলীর মাকে সালাম করলো।

জওয়াবে আমেন বললেন ঃ বেঁচে থাকো বেটা। এসো এসো এখানে।'

দশ মিনিট পর নিচে মাহমুদ আলীর আওয়াজ শোনা গেলো ঃ কোথায় মোয়াযযম আলী?'

মোয়াযযম আলী দ্রুতপদে নিচে নেমে গিয়ে বে-এখতিয়ার তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

খানিকক্ষণ পর তারা বালাখানার সেই কামরায় বসে অশ্রুভেজা হাসি সহকারে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। বাপ-মা'র অগুণতি প্রশ্নের জওয়াবে মোয়াযযম আলী তাদেরকে শোনাতে লাগলেন তার ফেলে আসা দিনগুলোর কাহিনী।

সিঁড়ির উপর থেকে সাবের আওয়াজ দিলো ঃ মীর্যা মোহসেন বেগ এসেছেন।'

ঃ তাকে উপরে নিয়ে এসো। মাহমুদ আলী বললেন।

ঃ তার সাথে আরো অনেক লোক।' সাবের জওয়াব দিলো।

ঃ আচ্ছা, ওদেরকে দেওয়ানখানায় বসাও। আমরা আসছি।'

মোয়াযযম আলী ও তার বাপ লোকদের সাথে মোলাকাত করে ফিরে এসে মোয়াযযম আলী দেখেন, আকবর খান গালিচার উপর গভীর ঘুমে অচেতন। পরিচারিকা নাশতা নিয়ে এলে মোয়াযযম আলী তাকে জাগাতে গেলেন, কিন্তু আমেনা তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন ঃ বেটা ওকে জাগিয়ো না, আমি ওকে আগেই নাশতা খাইয়েছি।'

মাহমুদ আলী জলদি নাশতা সেরে উঠতে উঠতে বললেন ঃ মোয়াযযম! দফতরে আমার কয়েকটি জরুরি কাজ রয়েছে। আমি শিগগিরই ফিরে আসবো। ততোক্ষণ তুমি তোমার মা'র সাথে কথা বলো। ইউসুফকেও আমি খবর দিচ্ছি। সে দু'এক দিনের ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে।'

মাহমুদ আলী চলে যাবার পর মোয়াযযম আলী মায়ের নানারকম প্রশ্নের জওয়াব দিতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে। অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আম্মাজান! ফরহাত আর তার মা কেমন আছেন?'

ঃ তারা বেশ খুশিই আছেন, বেটা! ঃ মা হাসিমুখে জওয়াব দিলেন। সাথে সাথেই তার চোখে চকচক করে উঠলো দু'ফোঁটা অশ্রু।

ঃ কি হলো, আম্মাজান?' মোয়াযযম আলী পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ কিছু না, বেটা! চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে তিনি বললেন ঃ তুমি মীর্যা

সাহেবের সাথে দেখা করে এসেছো না?'

ঃ হ্যাঁ, আম্মাজান! কিন্তু আফযল আমার সাথে এখনো মিলতে আসেনি। মীর্যা সাহেব বলছিলেন, সে কাল শিকারে গেছে। আমি চাচিজানকে একবার সালাম করে আসিগে।'

ঃ হ্যাঁ, বেটা, নিশ্চয়ই যাবে।'

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ আম্মাজান! ফরহাতের আম্মা আপনার সাথে মিলতে আসেন না?'

ঃ হ্যাঁ বেটা, কখনো আমি তার ওখানে যাই, কখনো বা তিনি আসেন আমার এখানে। আগে ফরহাতও তার সাথে আসতো, কিন্তু কিছুকাল সে আর বেরোয় না ঘর থেকে।'

ঃ আম্মাজান! কি হলো? আপনাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?'

ঃ কিছু না, বেটা! মা অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ আহা! তুমি যদি আরো দু'মাস আগে আসতে।'

মোয়াযযম আলী অন্তহীন বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন মায়ের মুখের দিকে।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ বেটা ফরহাতের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

মুহূর্তের মধ্যে মোয়াযযম আলীর কাছে সারা সৃষ্টির গতিপ্রবাহ স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে গেলো এবং প্রবাহমান কালের এক নির্মম আঘাত তাকে আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ উদ্দীপনার সুন্দর সদাবসন্তবিরাজিত উদ্যান থেকে সরিয়ে নিয়ে ফেলে দিলো ঊষর প্রাণহীন মরুপ্রান্তরের বুকে।

ঃ ফরহাতের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! কথা ক'টি যেনো বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমন এক কাহিনীর ভূমিকা, যেখানে নেই কোনো সঙ্গীত, নেই হাসি, নেই আনন্দ-কোলাহল। মোয়াযযম আলী রঙিন স্বপ্ন, মুগ্ধকর দৃশ্য ও মন ভুলানো সঙ্গীতে ভরা এক মনোরম উপত্যকা থেকে নির্বাসিত হয়ে যেনো এসে পড়েছেন এমন এক দুনিয়ায়, যেখানকার মানুষ সূর্যের প্রাণসঞ্চারী কিরণ থেকে এবং রাত্রি সিতারার হাসি ও চাঁদের আলোক বন্যা থেকে বঞ্চিত।

তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মায়ের চোখে সে হাসি হাজারো কান্নার চাইতে পীড়াদায়ক। মোয়াযযম আলী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন ঃ আম্মাজান! ফরহাতের বিয়ের প্রস্তাবে খুশি হননি?'

মা কোনো জওয়াব না দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। স্নেহে তিনি তার মুখের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, বেটা! মীর্যা হোসেন বেগের

তোমার দিকেই ছিলো আকর্ষণ। কতো ছেলের পক্ষ থেকে কতবার তার কাছে প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু তিনি অস্বীকার করেছেন প্রতিবার। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তোমার সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি এক প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। এ মাস খানেক আগের কথা। আমি সেদিন তার ওখানে গিয়েছিলাম, আরো এসেছিলেন শহরের আমীর পরিবারের বিবিরা। ফরহাতের মাকে আমি মোবারকবাদ জানালে তার চোখের পানি উছলে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন ঃ বেন, খোদার মঞ্জুর ছিলো না, নইলে ফরহাত আপনারই থাকবে, এ ফয়সালা মীর্যা সাহেব করে ফেলেছিলেন। আপনি আমার মেয়েকে দোআ করুন।' তারপর আমি যখন দোআ করবার জন্য হাত তুললাম, মনে হলো যেনো ফরহাত আমারই বেটি, আর সে নওজোয়ান শুধু আবেদারই নয়, আমারো জামাতা।'

মাতাপুত্রে যখন এমনি আলোচনা চলছে, ফরহাত তখন তাদের বাড়ির এক কামরায় একা বসে রয়েছে। নাসিরা নাম্নী এক প্রিয় সখী কামরায় প্রবেশ করে অলক্ষ্যে তার পিছনে গিয়ে দুচোখ চেপে ধরে বললো ঃ বলো তো আমি কে?'

ছেড়ে দাও, নাসিরা! বিরক্ত করো না। ফরহাত বিষণ্ন আওয়াজে জওয়াব দিলো।

ঃ ভুল! বিলকুল ভুল! বিদ্রুপের স্বরে নাসিরা বললো ঃ আমি নাসিরা নই, মোয়াযযম আলী। শুনছো, আমার নাম মোয়াযযম আলী।

ঃ নাসিরা খোদার কসম আমায় বিরক্ত করো না। অন্তহীন বেদনাভারাক্রান্ত আওয়াজে বললো ফরহাত।

নাসিরা লজ্জিত হয়ে তার সামনে বসে পড়লো। ফরহাতের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত দেখে সে বললো তোমরা পেরেশান হলে চলবে না। ফরহাত ঃ আমার বিশ্বাস, তোমার আব্বাজান তার ধারণা বদলে ফেলবেন।'

ঃ নাসিরা, খোদার দিকে চেয়ে অমন কথা মুখে এনো না। সারা দেশের লোকের কাছে আব্বাজানের দুর্নামের ভাগি করার চাইতে এই বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরা আমার পক্ষে সহজ।'

ঃ কিন্তু মোয়াযযম আলী এসে গেছেন। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এখন।'

ফরহাত কান্নাভারাক্রান্ত আওয়াজে জওয়াব দিলো। ঃ হ্যাঁ, মোয়াযযম আলী এসেছেন, কিন্তু ফরহাত মরে গেছে তার দুনিয়া থেকে। যেদিন বিয়ে ঠিক হয়েছে, সেদিনই সে মরেছে। এখন আমার বাপ-মা মোয়াযযম আলীর জন্য ফরহাতের কবর থেকে বের করে আনবার চেষ্টা করবেন না।'

মোয়াযযম আলীর দীলের মধ্যে বেড়ে চললো নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের অনুভূতি। ঘরের বাইরে মুর্শিদাবাদের পথঘাট তার কাছে বৈচিত্র্যহীন-আকর্ষণহীন। কখনো কখনো তিনি হোসেন বেগের কাছে যান। হোসেন বেগ তাকে দেখান অন্তহীন বাৎসল্য। তার সাথে আফযলের আচরণও নেহায়েৎ বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেক মোলাকাতের পর মোয়াযযম আলী ফিরে আসেন এক গুরুতর বোঝার অনুভূতি নিয়ে। পাঁচদিন পর ইউসুফ আলী এসে দুদিন বাড়িতে থেকে ফিরে গেলেন কর্মস্থলে।

কয়েদখানা থেকে ফেরার হবার পর মোয়াযযম আলী আকবর খানের কাছে ওয়াদা করেছিলেন, মুর্শিদাবাদ পৌছেই তাকে রোহিলাখণ্ড পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আকবর খান তার বাড়িতে দশ দিন থাকার পর যখন তার জন্মভূমির মাটিতে পৌছবার আকাঙ্ক্ষা জানালো, তিনি বললেন ঃ আকবর খান! পেরেশান হয়ো না। তোমার সাথে আমি নিজেই যাবার ফয়সালা করে ফেলেছি।'

আকবর খানের চোখ দুটি খুশির দীপ্তিতে জ্বলে উঠলো। সে বললো ঃ আপনি আমার সাথে গেলে আরো কয়েক হফতা ওখানে থাকতে পারি।'

চতুর্থ দিন ভোরে মোয়াযযম আলী আকবর খানের সাথে রওয়ানা হলেন। কয়েকদিন সফরের পর তারা অযোধ্যার সীমানা থেকে দশ মাইল দূরে রোহিলাখণ্ডের রাখাল ও কিষাণদের কতকগুলো বস্তি পার হয়ে এক টিলার উপর ঘোড়া থামিয়ে সামনে দেখতে পেলেন এক শস্যশ্যামল সবুজ উপত্যকাভূমি। আকবর খান একদিকে হাতে ইশারা করে বলে উঠলো ঃ ওই আমার গাঁ।

এরপর তারা টিলা থেকে নেমে খানিকক্ষণ ঘন বনের পথ অতিক্রম করে পৌছলেন বায়ু ভরে দোলায়মান সবুজ গমের ক্ষেতে। আকবর খান বললো ঃ এই আমাদের জমিন।

অল্পসময়ের মধ্যে তারা গাঁয়ের ভিতরে প্রবেশ করলো। দেখতে দেখতে গায়ের নিভৃত পথঘাট আকবর খানের আগমন সংবাদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান সবাই তাকে ঘিরে ধরলো। তারা ঘোড়া থেকে নামলেন। গাঁয়ের কতকটি লোক আকবর খানকে দেখতে তার কাছে যেতে ও তার সাথে কথা বলতে বেকারার হয়ে ছুটে এলো।

কিছুক্ষণ পর জনতা এসে থামলো এক কেল্লার মতো বড়ো বাড়ির সামনে। আকবর খান মোয়াযযম আলীকে বললো ঃ ভাইজান, এই আমাদের বাড়ি।'

এক সুদর্শন নওজোয়ান দরজার পথে বেরিয়ে এলেন এবং ভিড় ঠেলে আগে এসে আকবর খানকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। লোকটি আকবর খানের বড়ো ভাই আতহার খান।

কয়েকদিন পর। মোয়াযযম আলী সে এলাকার বাচ্চা-বুড়ো সকলেরই কাছে অপরিচিত নন। সবাই তাকে মনে করে উপকারী বন্ধু। বাপের মৃত্যুর পর আতহার খান হয়েছেন তাদের গোষ্ঠীর সরদার। তিনি হয়েছেন মোয়াযযম আলীর অকৃত্রিম বন্ধু।

এই গাঁয়ে ও আশেপাশের আরো দশটি বস্তিতে রোহিলাতীয় আফগানদের এক গোষ্ঠীর লোকের বাস। তারা সবাই আকবর খানদের খান্দানের সরদারী মেনে চলে। রোহিলাখন্ডের অপর আফগানদের মতো তারা ভালো চাষী ও পশুপালক ছাড়াও ছিলো সিপাহীসুলভ শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী। বাইরের হামলাদারদের বিশেষ করে মারাঠাদের লুটতরাজ থেকে বাঁচবার জন্য প্রত্যেকটি রোহিলা নওজোয়ান নিশানাবাজি, তেগচালনা ও শাহসওয়ারী বিদ্যায় পূর্ণতা হাসিল করা ফরজ মনে করতো। হিন্দুস্তানের বাকি এলাকাকে যখন রাজনৈতিক দাবারু ও লোভী ভাগ্যান্বেষীরা দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-দারিদ্র্যের জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলো, তখনো এরা নিজস্ব মেহনত ও প্রচেষ্টা দ্বারা গড়ে তুলছিলো স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখময় জীবনযাত্রার এক নতুন দুনিয়া। বড়ো বড়ো সুবায় যখন আরামপ্রিয় শাসকরা তাদের প্রজাসাধারণকে মারাঠা ও লুঠতরাজের কবল থেকে বাঁচাতে পারছেন না, তখনো এরা নিজস্ব আজাদি হেফাজত করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়ে থাকতো।

মোয়াযযম আলী খুব বেশি হলে এক হফতা সেখানে থাকবার নিয়ত করে এসেছেন। কিন্তু দেখতে দেখতে তার কেটে গেলো তিনটি মাস। গোড়ার দিকে তিনি আতহার খান ও আকবর খানের সাথে সিংহ শিকারে বেরুতেন, কিন্তু শিকার যখন আর ভালো লাগলো না, তখন শুরু করলেন গাঁয়ের লোকদের সাথে তীরন্দাজি, নেজাহবাজি ও তেগচালনার প্রতিযোগিতায় শরীক হতে।

তিনমাস পর যখন তিনি আতহার খান ও আকবর খানকে খোদা হাফিজ বলছিলেন, তখন তার মনে হচ্ছিলো যেনো প্রিয়তম বন্ধু ও সাথীদের কাছ থেকে তিনি জুদা হয়ে যাচ্ছেন। আতহার, আকবর ও এলাকার আরো কতক লোক তাকে এগিয়ে দিতে এলেন অযোধ্যার সীমান্ত পর্যন্ত। আকবর খানের সাথে মোসাফেহা করতে গেলে অশ্রুসজল চোখে সে বললো ঃ ভাইজান, আবার কবে আসবেন?'

ঃ তা আমি জানি না, ভাই। হয়তো আমি চিরদিনের জন্য তোমাদের মাঝে এসে যাবো, এও হতে পারে যে, আজকের দিনের পর এ জিন্দেগিতে আমাদের আর দেখা হবে না।'

আকবর খানের কাছ থেকে রোখসত হয়ে মোয়াযযম আলী গেলেন আগ্রা ও দিল্লির পথে। দিল্লি থেকে ফিরে তিনি কিছুকাল থাকলেন লাখনৌতে। অবশেষে মুসলমানদের সমসাময়িক দুঃখ-দুর্দশার মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন জন্মভূমির কোলে।

৪

স্বগৃহে মোয়াযযম আলীর নসীবে শান্তি জুটলো না। কিছুকাল তিনি তার কর্মহীন সময় কাটিয়েছেন বই পড়ে। কিন্তু কয়েক হফতা পর বইপত্রে আর তার মন বসলো না। একদিন তার ভাই ইউসুফ ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরলেন এবং এক হফতা থেকে চলে গেলেন। মোয়াযযম আলীর ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এলে তিনি কয়েকবার ইস্তফা লিখবার ইরাদা করলেন, কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই যেনো তার ফয়সালার শক্তি লোপ পেয়ে যায়।

একদিন তিনি খবর পেলেন, সিরাজুদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে এসেছেন। তিনি তার খেদমতে হাজির হলেন। তাকে দেখেই সিরাজুদ্দৌলা প্রশ্ন করলেন ঃ বলুন, এখন আপনার ইরাদা কি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ কয়েকদিন ধরে আমি হুগলী পৌছবার ইরাদা করছিলাম।'

সিরাজুদ্দৌলা বললেন ঃ কয়েকদিন ধরে আমি ভাবছি, হুগলীর কেল্লার অধিনায়ত্ব আমি আপনার হাতে সমর্পণ করবো। এক হফতার মধ্যে আমি ফিরে যাচ্ছি। আপনি তৈরি থাকুন।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ হুগলীর কেল্লার জন্য যদি আপনি আমার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহলে আমার ইচ্ছা, এক হফতা ইন্তেজার না করে কালই আমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

ঃ বহুত আচ্ছা, সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার কাছে আমার হুকুমনামা পৌছে যাবে।'

পরদিন ভোরেই মোয়াযযম আলী রওয়ানা হয়ে গেলেন হুগলীর পথে। আরো কয়েকদিন পরেই হুগলী কেল্লার আরামপ্রিয় সিপাহী ও অফিসাররা পরস্পরের

কাছে অভিযোগ করতে লাগলো যে, নয়া কমাণ্ডার তাদেরকে এক লহমার জন্যও স্থির হয়ে বসতে দেন না।

এক বছর পর মোয়াযযম আলী কয়েক দিন ছুটি নিয়ে ফিরে এসেছেন গৃহে। তিনি জানতে পেলেন যে, পরের হফতায় ফরহাতের শাদী হবার কথা। তার বাপ-মা ও মীর্যা হোসেন বেগের ইচ্ছা, শাদীর তারিখ পর্যন্ত তিনি ফিরে না যান। তাই তিনি সিরাজুদ্দৌলার কাছে লিখলেন তিন হফতার ছুটি ও মুর্শিদাবাদে থাকার এজাযত চেয়ে কিন্তু চিঠির জওয়াব আসার আগেই উড়িষ্যায় এক নতুন গোলযোগের খবর এলো। মারাঠাদের সাথে সন্ধি করতে গিয়ে আলীবর্দী খান মীর হাবীবকে নিযুক্ত করেছিলেন কটকের ফউজদার। মারাঠারা হামলা করে তাকে হত্যা করেছে এবং উড়িষ্যার বেশিরভাগ জেলা তাদের সেনাবাহিনী দখল করে বসেছে।

মোয়াযযম আলী তার বাপের মুখে শুনলেন, আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের ফউজকে অভিযান প্রস্তুতির হুকুম দিয়েছেন এবং ঢাকা ও হুগলীর দুই ফউজদারের কাছে ফরমান পাঠিয়েছেন অবিলম্বে তাদের ফউজ উড়িষ্যা ফ্রন্টে পৌছবার জন্য। মোয়াযযম আলী বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে চলে গেলেন হুগলীর পথে।

দু হফতা পর। হুগলী ও মুর্শিদাবাদের সেনাবাহিনী কটক থেকে কয়েক মনজিল দূরে তাঁবু গেড়েছে। ঢাকা থেকে মীর মদনের লোক লশকরের জন্য ইন্তেজার করছে তারা। মুর্শিদাবাদের ফউজের সাথে এসেছেন মাহমুদ আলী ও আফযল বেগ। পাঁচদিন পরে পৌছলেন মীর মদন পাঁচ হাজার সওয়ার নিয়ে। মীর মদনের ফউজ সেনাঘাঁটিতে প্রবেশ করলে বড়ো বড়ো ফউজী অফিসার তার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়ালেন। মীর মদন ঘোড়া থেকে নামতেই অনেকে তার সাথে মোসাফেহা করলেন। মোয়াযযম আলীর পালা এলে তিনি বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, তোমায় দেখেই আমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আমি সিরাজুদ্দৌলার সাথে মোলাকাতের পর তোমার সাথে স্থির হয়ে আলাপ করবো।'

মীর মদনকে এক আফসার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন সিরাজুদ্দৌলার খিমায়। আফযল ছিলেন কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে। তিনি মোয়াযযম আলীকে আওয়াজ দিলেন ঃ মোয়াযযম আলী! তোমার ভাইজানও এসে গেছেন।'

ঃ তিনি কোথায়?' মোয়াযযম আলী এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ ওই দেখো।' আফযল একদিকে ইশারা করে বললেন।

ইউসুফ আলী প্রায় ত্রিশ কদম দূরে লশকরদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। মোয়াযযম আলী ও আফযল দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন। ইউসুফ আলী একে একে তাদের সাথে মোসাফেহা করলেন। আচানক মোয়াযযম আলীর পিছে আর

একটি নওজোয়ানের দিকে আফযলের নজর পড়লো। তিনি নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

আফযল এগিয়ে গিয়ে তার সাথে হাত মিলিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কি করে এলেন এখানে?'

ঃ আমি ঢাকার ফউজের সাথে এসেছি।' নওজোয়ান জওয়াব দিলেন। আফযল বললেন, আপনি যে ফউজে শামিল হয়েছেন, তাতো জানি না?'

নওজোয়ান অস্বস্তির সাথে জওয়াব দিলেন ঃ এতে হয়রানির কি আছে? আমি দুশো রেজাকারও সাথে নিয়ে এসেছি।'

মোয়াযযম আলী চাপা আওয়াজে প্রশ্ন করলেন ঃ ভাইজান, ইনি কে?'

ঃ ইনি শওকত বেগ। আফযলের বোনের সাথ এর শাদির কথা হয়েছে।'

আফযল বেগ মোয়াযযম আলীর দিকে শওকৎ বেগের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন ঃ ইনি মোয়াযযম আলী ইউসুফ আলীর ছোট ভাই।'

শওকত বেগ এগিয়ে এসে মোয়াযযম আলীর সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ আমার নাম শওকৎ বেগ। আপনার সাথে দেখা হওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। আপনার সম্পর্কে আমি আগেও শুনেছি অনেক কিছু।

শওকৎ বেগ উজ্জ্বল রঙের সুগঠিত দেহ নওজোয়ান এবং তার চেহারা দেখে বয়স পঁচিশ বছরের কাছাকাছি মনে হয়।

খানিকক্ষণ পর মোয়াযযম আলী, মাহমুদ আলী, ইউসুফ, আফযল ও শওকৎ বেগ এক খিমায় বসে মন খুলে আলাপ করছেন। তখনো মোয়াযযম আলী শুধু এইটুকুই জানেন যে, শওকৎ বেগ ঢাকার এক অতি বড়ো জমিদারের ছেলে এবং মীর মদনের ফউজের সাথে তার আগমন তার কাছে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। কিন্তু ইউসুফ আলীর কাছ থেকে তিনি জানলেন যে, নিজস্ব ব্যক্তিগত ফউজের দুশো সিপাহী নিয়ে রেজাকার হিসাবে তিনি এসেছেন মীর মদনের সাথে। মোয়াযযম আলীর কাছে তার এ উদ্যম ছিলো প্রশংসনীয়। শওকৎ বেগকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ মীর্যা সাহেব, আপনি বাংলায় উমরাহর কাছে এক সুন্দর নজির পেশ করলেন। নইলে বর্তমান অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে যে, বড়ো বড়ো লোকের মধ্যে এখনো কোনো সমষ্টিগত বিপদের অনুভূতি পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।'

শওকৎ বেগ জওয়াবে বললেন ঃ সমষ্টিগত বিপদের কোনো বিশেষ অনুভূতি আমারও ছিলো না। আমি কেবল আপনাদের পথ অনুসরণ করছি। আমি শুনেছি মুর্শিদাবাদের উপর হামলা হলে আপনি মহল্লার কিছুসংখ্যক রেজাকার নিয়ে মারাঠাদের সুসংহত ফউজকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। তাই আমারও দীলে

খেয়াল পয়দা হলো আমার চাষীদেরকে ফউজী শিক্ষা দেবার। তারপর মীর্যা হোসেন বেগ যখন আমাদের ওখানে তশরীফ আনলেন এবং আপনার শানদার কৃতিত্বের অন্তহীন প্রশংসা করে আমার কাছেও তবলীগ করলেন, তখন আমার খেয়াল আরো মজবুত হলো। আমার বাড়ি ঢাকা থেকে পনেরো মাইল দূরে। মীর্যা সাহেব তার চিঠিতে বারংবার তাকিদ দিয়েছেন যে, আমার বাড়ির সীমানায় এক মজবুত দেয়াল ও গভীর খন্দক তৈরি করা প্রয়োজন। আমার নিজের বুদ্ধিমতো আমি তার নির্দেশ পালন করবার চেষ্টা করেছি। এবার আমার ইরাদা এই অভিযান শেষ হলে আমি কিছু দিনের জন্য আপনাকে সাথে নিয়ে যাবো। আমার খান্দানের লোকেরা আপনাকে দেখে খুবই খুশি হবেন।'

রাতেরবেলা যখন মোয়াযযম আলী তার ভাই ইউসুফের সাথে নির্জনে আলাপ করবার মওকা পেলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভাইজান মুর্শিদাবাদে আমি শুনেছিলাম আগামী মাসে ফরহাতের শাদী হবে। তার কি হলো?

ইউসুফ জওয়াব দিলেন ঃ এই অভিযান শেষ হওয়া পর্যন্ত ফরহাতের শাদী মূলতবী করা হয়েছে। উড়িষ্যার পরিস্থিতি জেনেই মীর্যা হোসেন বেগ শওকতের বাপক লিখেছেন যে ঃ আফযল ফউজের সাথে চলে যাচ্ছেন উড়িষ্যার অভিযানে। তার ইচ্ছা দেশের অবস্থা ঠিক হওয়া পর্যন্ত ফরহাতের শাদী মূলতবী থাকবে। সম্ভবত মীর্যা সাহেবকে খুশি করবার জন্যই শওকৎ বেগ একটা বড়ো রকমের কৃতিত্বের দাবিদার হতে চাচ্ছেন। আর তিনি এসেছেন মীর মদনের সাথে।'

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি ওর সাথে পরিচিত হলেন কি করে?'

ঃ উনি ঢাকায়ই আমায় খুঁজেছিলেন। একদিন আমার কাছে এসে জানালেন যে, মীর্যা সাহেব ওকে আমার সাথে দেখা করতে লিখেছেন। শওকৎ বেগ বড়ো ভালো মানুষ। একদিন আমাকে উনি নিজের বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। ওদের খান্দান বেশ প্রতিপত্তিশালী। মীর মদনের সাথে ওর বাপের বিশেষ বন্ধুত্ব?'

কয়েক হফতা ধরে বাংলার ফউজ ও মারাঠা ফউজের মধ্যে মামুলি সংঘাত চললো। তারপর মারাঠা সিপাহসালার জানুজী এক তীব্র হামলা চালিয়ে বাংলার ফউজকে বাধ্য করলো মেদিনীপুরের দিকে সরে যেতে। বাংলার ফউজ তখন মেদিনীপুরে ঘাঁটি করে উড়িষ্যার উত্তর সীমান্তের আশেপাশে মারাঠাদের বিক্ষিপ্ত হামলা প্রতিরোধ করার ভিতরেই সীমিত করলো তাদের তৎপরতা। সাথে সাথেই চলতে লাগলো এক চূড়ান্ত যুদ্ধের আয়োজন। আচানক একদিন খবর এলো যে, মারাঠাদের সাথে কোনো আফগান সরদারের যোগাযোগের ফলে বিহারের বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই আলীবর্দী খান মারাঠা সিপাহসালার জানুজীর

সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইরাদা ত্যাগ করে লশকর ফিরিয়ে নেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

ফউজের কোনো সিপাহী অথবা অফিসার উড়িষ্যা প্রদেশটি এমনি করে জানুজীর হাতে ছেড়ে যাবার ব্যাপারে খুশি ছিলেন না। কিন্তু শওকৎ বেগের কাছে এ খবর ছিলো অসহনীয়। শুরু থেকে মীর মদন তাকে কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীর দেখাশোনা করবার ভার দিয়েছিলেন। অন্তহীন চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে কোনো মামুলি লড়াইয়ের ময়দানেও শৌর্য প্রদর্শনের মওকা দেওয়া হয়নি। লশকর ফিরিয়ে নেবার খবর শুনেই তিনি অন্তহীন ক্ষোভ ও ক্রোধ নিয়ে মীর মদনের খিমায় গেলেন এবং তীব্র স্বরে তাকে বললেন ঃ মীর সাহেব, আমি এখানে মাছি মারতে আসিনি। আমার সাথীরা ঘরে ফিরে আমায় বিদ্রূপ করবে।'

মীর মদন হেসে বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোমায় দেওয়া হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী। কোনো সালার অনিবার্য কারণ ছাড়া অনভিজ্ঞ রেজাকারকে কোনো অভিযানে পাঠাতে পারেন না। আরো তুমি জানো যে, মারাঠাদের সাথে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে আমার কেবল পরীক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন সেনাদলকেই পাঠিয়েছি। রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হলেই তোমায় নিশ্চিতরূপে শৌর্য প্রদর্শনের মওকা দেওয়া হবে।

মোয়াযযম আলী খিমার মধ্যে প্রবেশ করে বললেন ঃ আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

ঃ আমি নতুন খবর জানতে পেরেছি যে, নওয়াব সাহেব বিহারের অবস্থা বিবেচনায় উড়িষ্যার ব্যাপারে জানুজীর সাথে মীমাংসা করে ফেলেছেন। কিন্তু আমার ভয় হয়, মারাঠারা কোনো চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা তাদের হস্তক্ষেপ থেকে হেফাজত করবার জন্য সিরাজুদ্দৌলার নির্বাচন তোমার উপর পড়েছে। এখন উড়িষ্যার পরিবর্তে বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের সর্বশেষ কেল্লা হবে তোমাদের মঞ্জিল। সেখানকার কতকগুলো বস্তি ইতিমধ্যে মারাঠা ডাকাতদের হাতে ধ্বংস হয়েছে।

শওকৎ বেগ বললেন ঃ মীর সাহেব, আমি এ অভিযানে মোয়াযযম আলীর সাথী হবো।'

মীর মদন বললেন ঃ না, আমি কোনো রেজাকারকে এহেন বিপজ্জনক অভিযানে পাঠাতে পারি না।'

শওকৎ বেগ চূড়ান্ত ফয়সালার স্বরে বললো ঃ আমি আপনার সামনে হলফ করছি, যতোক্ষণ মোয়াযযম আলী এ অভিযান শেষ করে ঘরে না ফিরবেন, ততোক্ষণ

আমি থাকবো তার সাথে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি আপনার জিদের কারণ বুঝতে পারছি না। যদি জানুজীর সাথে কোনো শান্তিচুক্তি হয়ে থাকে, তবে এ এলাকায় কোনো নিয়মিত যুদ্ধের আশঙ্কা থাকা উচিৎ নয়। বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ডাকাত ও রাহজানদের সাথে বোঝাপড়া করতে প্রয়োজন অত্যধিক অভিজ্ঞ সিপাহীর। আপনার বাহাদুরীর প্রশংসা আমি করি। কিন্তু এর জন্য তো কোনো অনভিজ্ঞ রেজাকারের প্রয়োজন হবে না। এখন আপনার ঘরে ফিরে যাওয়াই উচিত এবং আমার বিশ্বাস, বনে বনে আমাদের সাথে ঘুরে সময় নষ্ট করার চাইতে ওখানে গিয়ে আপনি বাংলার অনেক কল্যাণ করতে পারবেন।'

শওকৎ বেগ উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ আমার জানকে আপনি এতটা দামী মনে করেন তার জন্য আমি শোকরগুজারী করি। কিন্তু আমি দুশমনের সাথে লড়বার নিয়ত নিয়ে এসেছি।' তারপর মীর মদনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমার ধারণা, রেজাকার হিসাবে মারাঠাদের সাথে লড়াই করবার জন্য আমায় কারুর এজাযত নেবার দরকার হবে না। মোয়াযযম আলী আমায় তার সাথী করে নিতে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু কোনো বনের মধ্যে মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করতে তিনি আমায় বাধা দিতে পারবেন না। কিছুতেই ফিরে যাবো না আমি। যেসব সিপাহী যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, কেন তাদের চাইতে আমার জান আপনারা বেশি দামী মনে করেন?'

মীর মদন খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ এই যদি হয় তোমার ফয়সালা, তাহলে আমি মানা করবো না। মোয়াযযম আলী, ওকে নিয়ে যাও তোমার সাথে।

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ বহুত আচ্ছা, কিন্তু আমি ফউজী শিক্ষা নিয়েছি আপনারই কাছ থেকে এবং আমার অফিসার ও সিপাহীরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে যে, আমি শৃঙ্খলা ও সংযমের ব্যাপারে খুবই কঠোর। তাই যতোদিন উনি আমার পরিচালনায় থাকবেন, ততোক্ষণ ওর প্রতি আচরণে আমার কাছ থেকে কোনো বিশেষ সুবিধার প্রত্যাশা করতে পারবেন না।'

মীর মদন শওকৎ বেগের দিকে তাকালে তিনি বললেন ঃ আমি জানি, আমি প্রমোদ সফরের জন্য এখানে আসিনি।'

কিছুক্ষণ পর মাহমুদ আলী, ইউসুফ ও আফযল শওকৎ বেগের ইরাদার কথা জেনে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তার ইরাদায় অটল থাকলেন।

পরদিন ভোরে দু'হাজার সওয়ার মোয়াযযম আলীর নেতৃত্বে অভিযানের পথে পা বাড়াবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। মাহমুদ আলী পুত্রকে বললেন ঃ

মোয়াযযম! শওকৎ বেগের খেয়াল রেখো। খোদা না করুন, ওর কোনো বিপদ ঘটলে আমরা মীর্যা হোসেন বেগকে মুখ দেখাতে পারবো না।'

কয়েক মাস পর। মোয়াযযম আলী এক দূরবর্তী কেল্লায় অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়ে গেছে দুশমনের সাথে, কিন্তু দুরাধিগত বন্য এলাকায় মারাঠারা এক জায়গায় মার খেয়ে অপর জায়গায় সরে গিয়ে কোনো বস্তির উপর হামলা করছে। মোয়াযযম আলী তার ফউজের নিয়মিত সিপাহী ও অফিসারদের যথারীতি কাজে লাগাতে পারেন, কিন্তু শওকৎ বেগ ও তার রেজাকার সাথীরা হচ্ছে তার কাছে এক সমস্যা। তাদেরকে কেল্লার মুহাফিয ফউজের সাথে তিনি রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শওকৎ বেগ জিদ ধরে বসেন তাঁর সাথে প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অভিযানে যাবার জন্য।

একদিন মধ্যরাত্রির দিকে মোয়াযযম আলীর কাছে খবর এলো দুশমনরা কেল্লার বিশ মাইল দূরে শুরু করেছে তাদের লুটতরাজ। তিনি অমনি পাঁচশ সওয়ার তৈরি করবার হুকুম দিলেন। শওকত বেগ এবারও তাকে ধরে বসলো এবং তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। মোয়াযযম আলী ঠিক বুঝেছিলেন যে, এ নওজোয়ান এবারকার অভিযানে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে মূর্খতার সীমানায় যেতে দেরি করবে না। লড়াইয়ে শওকৎ বেগ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি দুশমনের গুলির মুখে বুক পেতে দিতে পারেন। আবার যখন দুশমনদের সিপাহীরা পরাজয় স্বীকার করে বনের পথে পালাতে থাকে, তখনো তিনি মোয়াযযম আলীর হুকুমের প্রতীক্ষা না করে কয়েকজন সাথী নিয়ে ছুটে যান তাদের পিছু পিছু। যেসব সিপাহী তাকে বন ও পাহাড়ের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা মোয়াযযম আলীর কাছে বললো ঃ এ নওজোয়ান যে জিন্দাহ ফিরে এসেছেন, এ নেহায়েত ভাগ্যের ব্যাপার।'

শওকৎ বেগ কয়েক মাইল মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করে ফিরে এসে মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ তুমি নিজের জান বিপদের মুখে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছো। এরপরও যদি তুমি এমনি করতে থাক, তাহলে বাধ্য হয়ে তোমায় কেল্লার ভেতর বন্ধ করে রাখা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না। তোমার আটটি লোক অকারণে প্রাণ দিয়েছে।'

শওকৎ জবাব দিলেন ঃ কিন্তু সে আটজনের প্রত্যেকে কমপক্ষে দু'জন করে মারাঠাকে সাথে নিয়ে মরেছে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ সেই আটটি লোক জিন্দাহ থাকলে এর চাইতেও ভালো ফল হতে পারতো।'

শওকৎ বেগ বললেন ঃ এ আমার পয়লা লড়াই। ভবিষ্যতের জন্য আমি হুঁশিয়ার হয়ে চলবার ওয়াদা করছি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এ লড়াইয়ে তোমার কার্যকলাপ দেখে আমার বিশ্বাস না জন্মাতো যে, তুমি এক ভালো সিপাহী হতে পারবে, তাহলে আজই আমি তোমায় ফেরত পাঠিয়ে দিতাম।'

এই ঘটনার কয়েক মাস পর কেল্লার দক্ষিণে ত্রিশ মাইল দূরে মারাঠা লশকরের তৎপরতার খবর পেলেন মোয়াযযম আলী। দুই তৃতীয়াংশ ফউজ কেল্লায় রেখে বাকি সিপাহী সাথে নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। আট দিন পর তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তার সাথে দুশো কয়েদি। এক ফউজী অফিসারের সাথে কেল্লার দরজায় দেখা হলে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত আওয়াজে খবর দিলেন ঃ জনাব, মীর্যা শওকৎ বেগ জখম হয়েছেন। তার অবস্থা খুবই খারাপ?

মোয়াযযম আলী ঘোড়া থেকে নেমে তাকে উপর্যুপরি প্রশ্ন করলেন ঃ তিনি কোথায়? কি করে জখম হলেন? জওয়াব দিচ্ছো না কেন? আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো?

অফিসার জওয়াব দিলেন ঃ তিনি তার কামরায় পড়ে রয়েছেন। আমাদের কথা তিনি মানেননি। কাল উত্তর দিকে কয়েকটি বস্তিতে মারাঠাদের লুঠ-তরাজের খবর এলো। নায়েব কমাণ্ডার দুশো সওয়ার রওয়ানা করে দিলেন সেদিকে। মীর্যা শওকৎ বেগ অভিযানে হিসসা নেবার জন্য জিদ ধরলেন। আমরা তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি কারুর কথা মানতে রাজি হলেন না।'

ঃ তোমরা সবাই বেওকুফ।'

মোয়াযযম আলী দ্রুত গিয়ে কেল্লার একটি কামরায় প্রবেশ করলেন। শওকৎ বেগ বিছানায় পড়ে রয়েছেন। তার সিনা, গর্দান ও বাহুতে পট্টি বাঁধা। ফউজী চিকিৎসক ছাড়া আরো কয়েকজন অফিসার তার পাশে বসে আছেন। কয়েকজন সিপাহী সেখানে দাঁড়ানো। মোয়াযযম আলী কামরায় প্রবেশ করে শওকৎ বেগের দিকে এক নযর তাকিয়ে দেখলেন। তারপর চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, যখম খুব গুরুতর তো নয়?

চিকিৎসক জওয়াব দিলেন ঃ খুবই গুরুতর।'

মোয়াযযম আলী বিষম উদ্বেগ সহকারে সালারদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি হুকুম দিয়েছিলাম যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে ওর হেফাজত করবার জন্য। এখন আমি জানতে চাচ্ছি, এ কার গাফলতের ফল।'

এক সালার বললেন ঃ আমরা সবাই ওকে ফিরাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু উনি কারুরই কথা শুনতে রাজি হননি। সতর্কতার খাতিরে আমি দেড়শ সিপাহী নিয়ে ওর পিছু পিছু গিয়েছি। মারাঠারা আমাদেরকে দেখেই পালিয়ে গেলো। আমরা প্রায় পাঁচ মাইল তাদের পিছু ধাওয়া করলাম। তারপর ঘন বন দেখে সিপাহীদের ফেরার আসার হুকুম দিলেও উনি কিছুতেই ফিরে আসতে রাজি হলেন না। আমরা বাধ্য হয়ে ওর পিছু পিছু গেলাম এবং চিৎকার করে ওকে ফিরাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু উনি আমলই দিলেন না আমাদের দিকে। আচানক ঘন বনের মধ্যে এক টিলার পেছন থেকে শুরু হলো গুলিবৃষ্টি। দেখতে দেখতে আমাদের পঁচিশজন সিপাহী পড়ে গেলো। তারপর মারাঠারা আমাদের মোকাবিলা না করে পালিয়ে গেলো বনের মধ্যে। উনি তখন গুরুতর জখম হয়ে ফিরেছেন। তার লোকদের কাছেই আপনি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। এতে আমাদের কসুর নেই। হায়! উনি যবরদস্তি কেল্লা থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে কুঠরিতে বন্ধ করে রাখার হুকুম যদি আপনি আমাদেরকে দিতেন।'

মোয়াযযম আলী বিমূঢ়ের মতো শওকত বেগের শয্যার পাশে এক কুরসিতে বসে বললেন ঃ তুমি খুবই অন্যায় করেছো। এখন আমি মুর্শিদাবাদে ফিরে আর মুখ দেখাতে পারবো না।'

শওকত বেগ চোখ খুলে কাতরাতে কাতরাতে বললেন ঃ আপনার সাথীরা বেকসুর। তারা আমায় ফিরাবার চেষ্টা করেছেন। আমি নিজের জিম্মাদারীতে দুশমনের পিছু নিয়েছিলাম।'

মোয়াযযম আলী আশান্বিত হয়ে চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে আবেদনের ভঙ্গিতে বললেন ঃ আপনি ওর জান বাঁচাবার সবরকম সম্ভাব্য চেষ্টা করে দেখুন।'

চিকিৎসক জওয়াব দিলেন ঃ আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমার তরফ থেকে কোন ত্রুটিই হবে না।'

শওকত বেগ আবার চক্ষু মুদলেন।

৪

রাত পর্যন্ত শওকৎ বেগ বেহুশ হয়ে পড়ে রয়েছেন। এশার নামাজের পর মোয়াযযম আলী সীমাহীন উদ্বেগ ও পেরেশানি নিয়ে কেল্লার প্রাঙ্গণে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার কল্পনায় কখনো ভেসে ওঠে হোসেন বেগের, কখনো ফরহাতের, কখনো বা তার মায়ের মুখ। তারা যেনো প্রশ্ন করেন ঃ তুমি শওকৎ বেগকে কেন একা ছেড়ে দিলে? কেন তুমি তার হেফাজত করতে পারলে না? ঢাকার ফউজ যখন ফিরে এলো, তখন কেন তুমি তাকে নিজের সাথে নিয়ে এলে? অসহনীয় লজ্জার বোঝা তাকে পিষে মারছে। তার জবান থেকে বারবার বেরিয়ে আসছে দোআ ঃ মাওলা আমার! যদি তোমার দরবারে আমার কোনো দোআ কবুল হতে পারে, তা হলে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই শুধু শওকতের জিন্দেগি। আমার আল্লাহ! আমি কসম করছি, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ফরহাতের চিন্তা আমার মনে স্থান দেবো না। তুমি জানো, আমার দীলের একান্ত কামনা, ঃ শওকৎ জিন্দাহ থাকুন। ফরহাতের জীবনসাথী হবার তামাম গুণ রয়েছে তার ভিতরে। ফরহাতকে তিনি খুশি রাখতে পারবেন। তুমি জানো, ফরহাতের খুশিই আমার জীবনের সবচাইতে বড়ো আকাঙ্ক্ষা।'

চিকিৎসক শওকতের কামরা থেকে বেরিয়ে মোয়াযযম আলীর কাছে এসে বললেন ঃ ওর হুশ ফিরে এসেছে। তিনি গোপনে আপনাকে কিছু বলতে চান।'

মোয়াযযম আলী দ্রুত পদে কামরায় প্রবেশ করে শওকৎ বেগের শয্যাপার্শ্বে এক কুরসির উপর বসে পড়লেন। চেরাগের রোশনিতে শওকৎ বেগের মুখ দেখলেন রক্তহীন-পাণ্ডুর। বিষণ্নকণ্ঠে তিনি বললেন ঃ শওকৎ, এখন, কেমন?'

শওকৎ বিষাদক্লিষ্ট হাসি টেনে এনে বললেন ঃ দোস্ত, আমার জন্য আপনার পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। আমার আফসোস, আমি আপনার হুকুম অমান্য করেছি। আমি মাফ চাই আপনার কাছে।'

ঃ শওকৎ বেগ! আমার বিশ্বাস, তুমি সেরে উঠবে। তোমার জিন্দাহ থাকার প্রয়োজন রয়েছে।'

শওকৎ বললেন ঃ আপনি হামেশা আমায় বিপদের মুখ থেকে ফিরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি তাতে বিরক্তিবোধ করেছি। ছেলেবেলা থেকে আমি জেদি। আমি হামেশা অনুভব করেছি, যেনো আপনি আমায় বুযদীল মনে করেন।'

ঃ না শওকৎ! আমার শুধু এই ভয় ছিলো যে, তোমার সাহস আমার জন্য কোনো পেরেশানির কারণ না হয়।'

শওকৎ বললেন ঃ সবাইর চাইতে আমার জীবন কেন আপনি বেশি দামী মনে করেছেন, তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ যদি তুমি ফউজের নিয়মিত সিপাহী হতে, তাহলে এসব কথা বলার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু তুমি এসেছো রেজাকার হিসাবে। তুমি সহী-সালামতে ঘরে ফিরে যাবে, এই ছিলো আমার ইচ্ছা। আমি আরো জানতাম যে, তোমার শাদী হবে শিগগিরই এবং তা হবে আমার অতি প্রিয় এক খান্দানের মেয়ের সাথে। এখনো আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, তুমি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যাও। খোদা যেনো মীর্যা হোসেন বেগের সামনে আমায় শরমিন্দা না করেন।'

শওকৎ বেগ বললেন ঃ হয়তো আমি আর ঘরে ফিরে যেতে পারবো না, কিন্তু মীর্যা হোসেন বেগের সাথে দেখা হলে আপনি তাকে অবশ্যি বলবেন যে, আমি সিপাহীর মৃত্যুবরণ করেছি। আমি একটা কথা স্বীকার করতে চাই, আমার সিপাহী হবার আকাঙ্ক্ষা কখনো ছিলো না এবং কেবল আপনারই কারণে আমার অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা পয়দা হয়েছে। ছেলেবেলায়ই আমি আব্বা-মা'র কাছে শুনেছি, মুর্শিদাবাদে এক রইস খান্দানের মেয়ের সাথে হবে আমার শাদী। বড়ো হয়ে শুনলাম, এক গরিব খান্দানের ছেলে জানবাজি রেখে মীর্যা হোসেন বেগের হাবেলীর হেফাজত করেছেন এবং তারই সাথে তিনি মেয়ের শাদীর কথা চিন্তা করছেন। তারপর আপনার কয়েদ থাকার সময়ে মীর্যা সাহেব আমাদের ওখানে এলে তিনি কথা প্রসঙ্গে আপনার কথা তুললেন। তার কথা শুনে আমি অনুভব করলাম যে, আপনি নিখোঁজ হয়েছেন বলেই তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। আমার সামনে তিনি আপনার সামরিক কৃতিত্বের আলোচনা করেছেন এবং বারংবার আমায় এই ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন যে চলতি জমানায় প্রত্যেক নওজোয়ানের জন্য জরুরি হচ্ছে সিপাহী হওয়া। আপনাকে না দেখেই আমার দীলের মধ্যে আপনার সম্পর্কে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব জন্মে গিয়েছিলো। একদিন আমার 'আব্বাজান মীর্যা হোসেন বেগের সামনে আমার তারিফ করলে মীর্যা সাহেব বলেছিলেন ঃ বাংলায় একটি মাত্র নওজোয়ান পয়দা হয়েছিলো আর তার নাম ছিলো মোয়াযযম আলী। তারপর আমাদের শাদীর কথাবার্তা স্থির হয়ে গেলো এবং তার কয়েক হফতা পরেই আপনি ফিরে এলেন।

'আমার শাদীর তারিখ স্থির হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু ঢাকার ফউজ উড়িষ্যার দিকে এগিয়ে যাবার আয়োজন করছে, এমন সময়ে আব্বাজান হোসেন বেগের চিঠি পেলেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন যে, আফযল যুদ্ধের ময়দানে চলে যাচ্ছেন। মারাঠা আমাদের কওমের প্রত্যেক নওজোয়ানকে উড়িষ্যার ময়দানে যাবার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। তাই তার ইচ্ছা লড়াই শেষে আফযলের ফিরে আসা পর্যন্ত শাদী মুলতবি থাকে। তিনি আরো লিখেছিলেন যে, শাদীর সময়ে তার যেসব বন্ধুর হাজির থাকা প্রয়োজন, তারা সবাই ময়দানে চলে গেছেন। তক্ষুণি আমি মীর মদনের কাছে গিয়ে কওমের জন্য আমার খেদমত পেশ করলাম। আমার এখানে

আসার কারণ এখন আপনি বুঝতে পারছেন। মীর্যা হোসেন বেগকে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে, বাংলার কোনো নওজোয়ানের চাইতে আমি কম নই। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিলো, মীর্যা হোসেন বেগের গৃহে আর কারুর পরিবর্তে কেবল আমারই বাহাদুরীপূর্ণ কৃতিত্বের আলোচনা হোক। প্রত্যেক ময়দানে আমি আপনার চাইতে কয়েক কদম আগে থাকবার ইচ্ছা পোষণ করেছি, কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবিদার আমি হতে পরিনি। লড়াই থেকে ফিরে এলে যাদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য মনে করা হয়, তাদের সাথে এক কাতারে আমি দাঁড়াতে পারিনি। প্রত্যেক ময়দানে আপনি আমার আগে রয়েছেন এবং আমি অনুভব করেছি যে, আমি এখানে এক দর্শকের বেশি কিছু নই। এই মুহূর্তে আমার একমাত্র আফসোস, আমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে মনে করেছি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। মীর্যা হোসেন বেগ ঠিকই বলেছিলেন ঃ বাংলা একটি মাত্র নওজোয়ানকে জন্ম দিয়েছে আর তিনি মোয়াযযম আলী।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ বাংলায় আমার চাইতে যোগ্যতর হাজারো নওজোয়ান জন্ম নিয়েছে আর তুমি তাদেরই একজন।'

শওকৎ বেগ বললেন ঃ মোয়াযযম আলী! আমার বিশ্বাস, আমি জিন্দাহ থাকলে আমরা পরস্পরের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারতাম, কিন্তু আমার মনজিল নিকটবর্তী। এই মুহূর্তে যদি মীর্যা হোসেন বেগ এখানে মওজুদ থাকতেন, তা'হলে তাকে আমি বলতাম যে, মোয়াযযম আলী হতে চেষ্টা করেছি, আর তা ছিলো আমার মূর্খতা।'

'মানুষ তার জিন্দেগিতে বিভিন্ন অনেক কিছু করে থাকে। এমন একদিন ছিলো, যখন আপনার নাম ছিলো আমার কাছে গালির মতো। মোয়াযযম আলী, কিছু মনে করবেন না। আজ আমার এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, আপনি মীর্যা হোসেন বেগের প্রতিবেশী এবং মহল্লার প্রত্যেকটি মানুষ আপনার তারিফ করেন, এ সত্য ছিলো আমার কাছে অসহনীয়-পীড়াদায়ক। আজ পর্যন্ত আমি ফরহাতকে কখনো দেখিনি, কিন্তু আমার মা ও বোনদের কাছে তার কথা যা শুনেছি, তা এ ধারণা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যে, এমন মেয়ের জীবনসাথী হওয়া জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো সৌভাগ্য। আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী আর কারুর সাথে তার পরিচয় আমার ভালো লাগতো না। ফরহাতের শাদী দিতে মীর্যা হোসেন বেগের অস্বীকৃতি ছিলো আমার জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো পরাজয় এবং আমার মোকাবিলায় এক গরিব খান্দানের সন্তানকে প্রাধান্য দান ছিলো সে পরাজয়ের চরম পর্যায়। বাপ-মা'র কথাবার্তায় আমার বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, ফরহাতের বাপ-মা'র আকর্ষণ আপনার দিকে। তারপর আপনি যখন নিখোঁজ হয়ে গেলেন তখন আমার মনে হলো যেনো আমার পথ থেকে এক পাহাড় সরে গেছে। কিন্তু ফরহাতের সাথে শাদী ঠিক হয়ে যাবার পরেও আমার মন খুশি হলো

না। কখনো কখনো আমার মনে হতে লাগলো, যেনো তার কাছে আমি মোয়াযযম আলী হতে পারবো না। তারপর আমাদের শাদীর তারিখ মুলতবি রাখার জন্য মীর্যা সাহেব যে চিঠি লিখলেন, তা পড়ে আমার মনে হলো, যেনো আমায় অজ্ঞান, বুযদীল ও নির্লজ্জ বলে নিন্দা করা হচ্ছে। ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে আসার সময়ে আমার সংকল্প ছিলো, একদিন আমি বিজয়-ঝাণ্ডা উড়িয়ে ফিরে যাবো এবং খ্যাতি, ইজ্জত ও সুনামের অসংখ্য উপহার নিয়ে জমা করবো ফরহাতের পায়ের উপর। আমার মূর্খতার কথা শুনে আপনি হাসবেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ না শওকৎ, আমি জানি, তোমার সিনার মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর দীল। কিন্তু হায়, আগেই যদি আমি তোমায় বলে দিতে পারতাম, যে মেয়েরা তাদের জীবনসাথীকে অপরের সাথে তুলনা করে পরিমাপ করে, আমার পরিচিত ফরহাত তাদের থেকে স্বতন্ত্র।'

শওকৎ বেগ বললেন ঃ আপনি তাকে জানেন, আর মুহাব্বতও করেন।'

মোয়াযযম আলী সারা দেহে এক কম্পন অনুভব করলেন। বললেন ঃ শওকৎ! খোদার দিকে চেয়ে অমন কথা বলো না। সে তোমারই জন্য। তার কথা চিন্তা করাও গুণাহ মনে করি। তুমি খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবে এবং সুস্থ হলেই আমি তোমায় ঘরে পাঠিয়ে দেবো।'

শওকৎ বেগ বললেন ঃ দোস্ত! এসব কথায় কোনো ফায়দা নেই। আমি আর ঘরে ফিরে যাবো না, তা জানি। আপনার দিলে দুঃখ দেবার জন্য এসব কথা আমি বলছি না, বলছি এই জন্য যে, এ ছিলো আমার মনের উপর এক বোঝা। এমন একটি লোকের বিরুদ্ধে আমি দীলের মধ্যে বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব পোষণ করেছি, যাকে দেওয়া উচিত ছিলো আমার অন্তরের মুহাব্বত। মোয়াযযম আলী! তুমি মানুষ নও ভাই, তুমি ফেরেশতা! আহা! আফযলের বোন যদি এখন এখানে থাকতো আর আমি তাকে বলে যেতে পারতাম যে, আমি তার ভবিষ্যৎ এক যোগ্যতর লোকের হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি।' বলে শওকৎ বেগ মোয়াযযম আলীর হাত চেপে ধরলেন। মোয়াযযম আলীর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো আর শওকৎ বেগের ঠোঁটের উপর ভেসে উঠলো এক টুকরা মৃদু হাসি।

মোয়াযযম আলী কতক্ষণ নিশ্চল-নিঃসাড় হয়ে বসে রইলেন। তার হাতের উপর শওকৎ বেগের হাতের চাপ ঢিলা হয়ে এলো ধীরে ধীরে। তার শ্বাস স্তিমিত হয়ে এলো। মোয়াযযম আলী চিকিৎসককে আওয়াজ দিলেন। চিকিৎসক শওকৎ বেগের নাড়ি দেখে বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ঃ ওর শেষ মুহূর্ত এসে গেছে।'

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চললো মৃত্যুযাতনা। রাতের শেষ প্রহরে যখন কেল্লার বাইরে গাছের উপর পাখিরা ভোরের পয়গাম দিচ্ছে, তখন শওকৎ বেগের জীবন সফরের যবনিকাপাত হলো।

৪

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর শওকৎ বেগের দেহ দাফন করা হলো এবং তার সাথীরা ফিরে যাবার আয়োজন করতে লাগলো। মোয়াযযম আলী শওকৎ বেগের বাপ ও মীর্যা হোসেন বেগের নামে চিঠি লিখে তাদের হাতে দিয়ে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা মোয়াযযম আলী এক হাজার সওয়ার সাথে নিয়ে মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করবার জন্য বেরিয়ে গেলেন এবং কয়েক মাস তাদের পিছনে কাটিয়ে দিলেন সীমান্তের পাহাড়ে জঙ্গলে। অভিযান শেষ করে ফিরে আসার সময়ে তিনি সাথে নিয়ে এলেন চারশ কয়েদি। এরপর প্রায় দেড় বছর সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রতিরক্ষা চৌকি নির্মাণ ও মারাঠা হামলায় পলাতক লোকদের বিরাণ বস্তি পুনরায় আবাদ করবার কাজে তিনি ব্যস্ত থাকলেন। তারপর তিনি মীর মদনের কাছে আবেদন করে এক মাসের ছুটি নিয়ে রওয়ানা হলেন মুর্শিদাবাদের পথে।

মুর্শিদাবাদ পৌঁছতেই তিনি জানলেন যে, আলীবর্দী খান মৃত্যুশয্যাশায়ী। সিরাজুদ্দৌলা মীর মদন ও সালতানাতের কতক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ডেকে এনেছেন মুর্শিদাবাদে। মীর্যা হোসেন বেগ জাহাজে হজ্জ ও পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত করবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

মোয়াযযম আলীর ছুটির পাঁচদিন গৃহে অতিবাহিত করবার পরই আলীবর্দী খান চিরন্তন জীবনের পথে মহাপ্রয়াণ করলেন এবং মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা অনুভব করলো যে তারা যে প্রতিরক্ষা দুর্গকে মনে করেছে তাদের আজাদি ও সৌভাগ্যের সবচাইতে বড়ো জামানত, তা আজ সত্যি সত্যি ভেঙে পড়েছে। মুর্শিদাবাদের মসজিদে মসজিদে আলীবর্দী খানের মাগফেরাত ও নয়া শাসক নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার সাফল্য ও সৌভাগ্য কামনায় দোআ করা হতে লাগলো।

ইতিমধ্যে মীর মদনকে ঢাকা থেকে ডেকে এনে বাংলার ফউজের সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয়েছে। মোয়াযযম আলী তার সাথে মোলাকাত করে ফিরে এসে মাকে বললেন ঃ আম্মাজান! আমার ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কাল ভোরেই আমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি।'

মা বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন ঃ আমি মনে করেছিলাম, সিরাজুদ্দৌলা ও মীর মদন তোমায় মুর্শিদাবাদে কোনো পদে নিযুক্ত করবেন।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আম্মাজান, আমার ওখানে যাওয়া জরুরি। আমি মীর মদনের কাছে আবেদন করেছিলাম ভাই ইউসুফকে ঢাকা থেকে এখানে

নিয়ে আসতে এবং তিনি তা মঞ্জুর করেছেন।'

মা বললেন ঃ বেটা! কিছুদিন ধরে আমি ভাবছি, মীর্যা হোসেন বেগের ঘরে গিয়ে তোমার শাদী সম্পর্কে কথা বলবো। ফরহাতের মা এখনই আমার এখান থেকে গেলেন। তার কথায় জানা গেলো যে, হজে যাবার আগেই মীর্যা সাহেব আমাদের দিক থেকে ফরহাতের শাদীর প্রস্তাবের প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি তাকে বলেছি ঃ বোন, আমি তো রোজই মোয়াযযমের আব্বাকে মীর্যা সাহেবের কাছে হাজির হতে বলছি, কিন্তু তিনি সাহস করেননি। আপনি রাজি থাকলে আমি এখনই মহল্লায় মিঠাই বিলি করবো। কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন যে, মীর্যা সাহেবের হজ থেকে ফিরে আসার জন্য ইন্তেজার করতে হবে।

মোয়াযযম সংকোচ ও শরম সহকারে বললেন ঃ আম্মাজান, ফরহাত কেমন আছে?

মা জওয়াব দিলেন ঃ ফরহাত কয়েক হফতা অসুস্থ ছিল, কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ।'

কয়েকদিন পর মোয়াযযম আলী আবার গিয়ে পৌঁছালেন সরহদী কেল্লায়।

আলীবর্দী খানের চোখ বন্ধ করার সাথে সাথেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বিছাবার চেষ্টা শুরু করলো। ইংরেজের বাণিজ্য কুঠিগুলো পরিণত হতে লাগলো কেল্লা ও অস্ত্রাগারে। যেসব লোভী ভাগ্যান্বেষী কওমের ইজ্জত ও আজাদিকে পণ্যদ্রব্যের শামিল মনে করতো, তারাও শুরু করলো ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সিরাজুদ্দৌলার কোনো ভুল ধারণা ছিলো না এবং তিনি হুকুমাতের সাথে পূর্বের চুক্তি ভুলে গিয়ে লেগে গেছে কেল্লা তৈরির তৎপরতায়। তাদের সাথে শান্তি আলোচনা পরিণত হয়েছে নিষ্ফল প্রয়াসে এবং সিরাজুদ্দৌলার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বাংলার হুকুমাতের নতুন দাবিদারদের সোজা রাস্তায় আনার একমাত্র পন্থা হচ্ছে ফউজী শক্তি দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করা। তাই একদিন ফোর্ট উইলিয়ামের শ্বেতাঙ্গ মুহাফিজ শুনতে পেলো শেরে বাংলার গর্জনধ্বনি।

মোয়াযযম আলী কয়েক মাস ধরে পশ্চিম সীমান্তের নিজস্ব ঘাঁটি সামলাচ্ছিলেন। সিরাজুদ্দৌলার ইংরেজবিরোধী সংকল্পের খবর জেনে তিনি মীর মদনকে এক চিঠিতে লিখলেন ঃ বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। তাই আমার ইচ্ছা, আমায় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হিসসা নেবার মওকা দেওয়া হোক।'

কয়েক হফতার মধ্যে তার আবেদনের জওয়াব না পেয়ে মোয়াযযম আলী অত্যন্ত অস্থির হয়ে থাকলেন। তারপর একদিন মেদিনীপুরের ফউজদারের তরফ থেকে এক চিঠিতে খবর মিললো যে, নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে নিয়েছেন। চারদিন পর তিনি মীর মদনের একটি চিঠি পেলেন। তাতে তিনি লিখেছেন ঃ আমরা ইংরেজদের শোচনীয়রূপে পরাজিত করেছি কিন্তু তোমার মনে করা উচিত যে, আমাদের এ সাফল্যে তোমাদের কোনো হিস্সা নেই। ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি, কিন্তু বাংলাকে তাদের রাজ্যলাভের কবল থেকে বাঁচাতে হলে হয়তো আরো বহু লড়াই করতে হবে আমাদের এবং আমাদের সীমান্ত এলাকা মারাঠা দুশমনের কবল থেকে হেফাজত করতে পারলে তবেই আমরা এসব যুদ্ধবিগ্রহের সমাপ্তি ঘটাতে পারবো। এক গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী ন্যস্ত করা হয়েছে তোমার হাতে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তুমি নিজেকে সে জিম্মাদারী পালনের যোগ্য প্রমাণিত করেছো। তাই আমার ইচ্ছা, যতোক্ষণ না ইংরেজের সাথে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়, ততোক্ষণ তুমি বাংলার পশ্চিম দরজায় পাহারায় রত থাকবে। তোমার মতো সমজদার নওজোয়ানকে এ কথা বলবার প্রয়োজন নেই যে, কখনো কখনো যুদ্ধরত সিপাহীর তুলনায় নীরব প্রহরারত সিপাহীকে অধিকতর ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়।'

আরো কয়েক মাস চলে গেলো। সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের উপর এক চূড়ান্ত আঘাত দেবার আয়োজন করছেন, এ ছাড়া আর কোনো খবর মোয়াযযম আলীর কাছে আসেনি। একদিন পিতার পত্রে মোয়াযযম আলী জানলেন যে, মীর্যা হোসেন বেগ হজ থেকে ফিরে এসেছেন এবং তার ইচ্ছা, মোয়াযযম আলী কিছুদিনের জন্য ঘরে ফিরে যান। তিনি মেদিনীপুরের ফউজদারের কাছে এক মাসের ছুটির আবেদন পাঠালেন, কিন্তু তিনি জওয়াব পেলেন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমায় একদিনের ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়। নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা দুহফতার মধ্যে পাঁচ হাজার সিপাহী মুর্শিদাবাদে পাঠাবার হুকুম দিয়েছেন আমায়। তিনি তার কারণ আমায় জানাননি, কিন্তু সিপাহসালারের চিঠি থেকে আমি আন্দাজ করেছি যে, শিগগিরই ইংরেজদের সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমার ইচ্ছা, আরো কিছুদিন তুমি ইন্তেজার করো। অবস্থার উন্নতি হলে আমি তোমায় এক মাসের বদলে দুমাসের ছুটি দেবো। বর্তমানে পাঁচহাজার সওয়ারের সংখ্যা পূরণের জন্য তোমার লোকদের প্রয়োজন হবে। চিঠি পাওয়ামাত্র তোমার অতিরিক্ত সিপাহীদের সোজা মুর্শিদাবাদে পাঠাবে। কেল্লা ও সীমান্ত চৌকির হেফাজতের জন্য অপরিহার্য সংখ্যক সিপাহী তোমার কাছে রাখবে।'

মোয়াযযম আলী পাঁচশ সিপাহী কেল্লার হেফাজতের জন্য এবং আরো তিনশ আশপাশের চৌকির দেখাশুনার জন্য রেখে বাকি ফউজকে এক অভিজ্ঞ অফিসারের পরিচালনায় মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হবার হুকুম দিলেন।'

৫

কয়েক হফতায় মোয়াযযম আলী মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে কোনো খবর পেলেন না। তাই তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। একদিন তিনি মাহমুদ আলীর এক চিঠি পেলেন। তাতে তিনি লিখেছেন ঃ আমায় সিরাজুদ্দৌলা তাঁর মুহাফিজ সৈন্যদলের সালারেআলা নিযুক্ত করেছেন। ইউসুফ ও আফযলকেও করে দেওয়া হয়েছে মুহাফিজ ফউজের সালার। আট প্রহরের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হবার জন্য আমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ শিগগিরই তুমি শুনতে পাবে যে, আমরা বাংলাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কবজা থেকে চিরদিনের জন্য নাজাত দিয়েছি।'

একরাত্রে তৃতীয় প্রহরে মোয়াযযম আলী কেল্লায় তাঁর ঘরের ছাদে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছেন, এমন সময়ে এক পাহারাদার তার ঘুম ভাঙিয়ে খবর দিলো যে, আচানক মারাঠা দুশমন সীমান্তের এক চৌকির উপর হামলা করে ত্রিশজন সিপাহীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মোয়াযযম আলী জলদি করে নিচে নেমে গেলেন। সীমান্ত চৌকি থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন সিপাহী কেল্লার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলো। মোয়াযযম আলী তাদের কাছ থেকে হামলার বিবরণ জেনে নিচ্ছেন, এমনি সময়ে দরজার দিক থেকে এক পাহারাদার ছুটে এসে তাকে খবর দিলো যে, বাইরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে বলছে যে, তাদের চৌকিও মারাঠারা দখল করে নিয়েছে।

মোয়াযযম আলী তিনশ সওয়ারকে অবিলম্বে তৈরি হবার হুকুম দিলেন এবং পাহারাদারকে বললেন ঃ তুমি তাকে চিনলে ভিতরে নিয়ে এসো।'

ঃ জী আমি তাকে চিনি।' বলে পাহারাদারও তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেলো। খানিকক্ষণ পরেই একটি লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো।

মোয়াযম আলী কয়েক কদম আগে গিয়ে বললেনঃ তুমি জখমি?'

ঃ জী, আমি কেল্লা থেকে এক মাইল দূরে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।'

ঃ কোন চৌকি থেকে তুমি এসেছো? মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন।

ঃ জী, আমি উত্তরের তৃতীয় চৌকি থেকে এসেছি। বেখবর অবস্থায় মারাঠারা আমাদের উপর হামলা করে আমাদের বেশিরভাগ লোককে কতল করেছে। আমার

বাকি সাথীরা এদিক-ওদিক পালিয়ে গেছে। আমি ঘোড়ায় সওয়ার হবার মওকা পেয়েছিলাম।'

মোয়ায্যম আলী আবদুর রহমান নামক একজন বৃদ্ধ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ মনে হচ্ছে, মারাঠা দুশমন বেশ ব্যাপকভাবে অগ্রগতি শুরু করেছে। আমার হয়তো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে এ অভিযানে। আমার অনুপস্থিতিকালে কেল্লার হেফাযতের জিম্মা থাকবে তোমার উপর। তুমি এক্ষুণি তমাম চৌকির সিপাহীদের হুকুম পাঠাও, যেনো তারা কেল্লায় এসে জমা হয়। মারাঠাদের সংখ্যা বেশি হলে আমি খুব শিগ্‌গিরই ফিরে আসবো। বাইরে থেকে কোনো দ্রুত সাহায্যের প্রত্যাশা করা আমাদের উচিত হবে না। মারাঠারা এগিয়ে এলে এই কেল্লাই হবে আমাদের শেষ আশ্রয়।'

কিছুক্ষণ পর তিনশ' সওয়ার সাথে নিয়ে মোয়ায্যম আলী বেরিয়ে গেলেন কেল্লা থেকে।

সীমান্ত এলাকায় হামলাকারী মারাঠার সংখ্যা এক হাজারের বেশি ছিলো না। শক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে সীমান্ত এলাকার মুহাফিজ ফউজের প্রতিরোধ শক্তি যাচাই করবার সংকল্প নিয়ে এসেছে তারা। ভোরবেলা কেল্লা থেকে কয়েক মাইল দূরে মারাঠাদের কয়েকটি সৈন্যদলের সাথে মোয়ায্যম আলীর সিপাহীদের সংঘর্ষ হলো এবং সাধারণ লড়াইয়ের পর তারা পনেরো বিশটি লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেলো। এরপর তিনি কয়েক মাইল দূরে আরো একদল মারাঠার খবর পেলেন এবং তারা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য করলেন।

মারাঠার আকস্মিক হামলায় ভীতগ্রস্ত বাসিন্দারা সীমান্তবস্তি খালি করে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু মোয়ায্যম আলীর তরফ থেকে জওয়াবী ব্যবস্থা হওয়ায় তারা আবার ফিরে আসতে লাগলো নিজ নিজ গৃহে।

এক সন্ধ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন মারাঠা এক বস্তি লুট করছিলো। মোয়ায্যম আলী খবর পেয়েই পৌছলেন সেখানে। তিনি গ্রেফতার করে নিলেন তাদের ত্রিশজনকে। তাদের পৌছবার আগেই বস্তির চৌধুরীর পাঁচ ছেলে ও আরো দশজন লোককে হত্যা করেছে মারাঠা বর্গিরা। তাদের অপরাধ, তারা মারাঠাদের হাতে কয়েকটি মেয়ের বেহুরমতি চুপ করে বরদাশ্‌ত করতে পারেনি।

মোয়ায্যম আলী রাতভর সেই বস্তিতেই কাটিয়ে দিলেন। ভোরে তিনি আশপাশের বস্তির লোকদের জমা করে তাদেরকে বললেন ঃ চোর- ডাকাতের ভয়ে যারা পালিয়ে যায়, কোনো ফউজ তাদের বাঁচাতে পারে না। ফউজের সাহায্য কেবল তাদেরই কাজে লাগতে পারে, যারা বাহাদুরের মতো বাঁচতে ও মরতে জানে। তাই আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা এই চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য

নিজ বস্তিতে রেজাকার ফউজ গড়ে তোল।'

তারপর তিনি কয়েদিদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মতো খুনপিয়াসী জানোয়ারদের সাথে যুদ্ধবন্দীর মতো আচরণ করা যেতে পারে না। আমি তোমাদেরকে এইসব লোকের দয়ার উপর ছেড়ে দিচ্ছি, যাদের জোয়ান বেটা ও ভাইদের রুহ প্রতিহিংসার জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের বলবো, যেনো তারা তোমাদেরকে মানুষের মতো আচরণের যোগ্য মনে না করে। আমার ইচ্ছা, তোমাদের অপর সাথীরা এ পথে ফিরে এলে যেনো বস্তির বাইরে প্রত্যেকটি গাছের সাথে লটকানো দেখতে পায় তোমাদের লাশ।'

এক পর মোয়াযযম আলী যখন সেই বস্তি থেকে বিদায় নিলেন, তখন বস্তির লোকেরা গাঁয়ের বাইরে ত্রিশজন মারাঠার গলায় ফাঁস দিয়ে গাছের সাথে লটকে দিয়েছে।

কয়েকদিন ধরে নানা জায়গায় গাছের সাথে লটকানো লাশগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, সীমান্তের মুহাফিজ সেই এলাকায় এসে গেছেন।

প্রায় বিশদিনের মধ্যে সরহদী এলাকায় পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠা করে মোয়াযযম আলী কেল্লায় ফিরে এসে কায়েম মোকামের কাছে প্রশ্ন করলেন ঃ মুর্শিদাবাদ অথবা মেদিনীপুর থেকে কোনো খবর এসেছে কি?

ঃ জী না।' কায়েম মোকাম জওয়াব দিলেন।

৫

দু'দিন পর মেদিনীপুর থেকে হাশিম খান নামে এক ফউজী অফিসার ত্রিশজন সওয়ার নিয়ে পৌছলেন মোয়াযযম আলীর কাছে এবং মেদিনীপুরের ফউজদারের এক চিঠি দিলেন তার হাতে। তাতে লেখা রয়েছে ঃ চিঠি পেয়েই তুমি কেল্লার কম্যান্ড হাশিম খানের উপর ন্যস্ত করে মেদিনপুরে চলে এসো। আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে পরামর্শ করতে চাই।

মোয়াযযম আলী চিঠি পড়েই হাশিম খানকে প্রশ্ন করলেন ঃ মুর্শিদাবাদ থেকে লড়াই সম্পর্কে কোনো খবর পাওয়া গেছে কি?'

হাশিম খান জওয়াব দিলেন ঃ লড়াই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। কিন্তু মুর্শিদাবাদ থেকে এক বিশেষ দূত মেদিনীপুরের ফউজদারের কাছে এসেছিলো এবং আমার মনে হয়েছে, সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে, কিন্তু তার আসার খানিকক্ষণ পরেই ফউজদার আমায় এদিকে রওয়ানা করে দিলেন। তাই দূত কি খবর নিয়ে এসেছে, তা আমি জানতে পারিনি। আপনাকে জলদি করে মেদিনীপুরে পাঠাবার জন্য ফউজদার তাকিদ করে দিয়েছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তাকিদ না করলেও আমার দিক থেকে কোনো বিলম্ব হতো না। ওখানে গিয়ে মুর্শিদাবাদের অবস্থা জানবার জন্য আমার মন অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছে।'

প্রায় আধঘণ্টা পর মোয়াযযম আলী তার অফিসার ও সিপাহীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সওয়ার হলেন ঘোড়ার উপর। তার সাথী চারজন নওজোয়ান। কেল্লা থেকে বেরিয়ে তারা মাত্র দু'ক্রোশ গিয়েছেন, তখন দেখলেন এক দ্রুতগামী সওয়ার এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। সে যখন তাদের কাছ থেকে প্রায় দু'শো গজ দূরে, তখন ,মোয়াযযম আলীর এক সাথী বললো ঃ জনাব, মনে হচ্ছে, ও যেনো আবদুল্লাহ খান।'

মোয়াযযম আলী কিছুদূর এগিয়ে ঘোড়া থামালেন এবং সওয়ারকে ইশারা করলেন হাত দিয়ে। আবদুল্লাহ খান কাছে এসে কোনো ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

ঃ আমি মেদিনীপুর যাচ্ছি।' মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ তুমি বাড়ি-

ঘরের খবর শোনাও।'

আবদুল্লাহ্ খান ছিলো মোয়ায্যম আলীর ফউজের পঞ্চাশ সওয়ারের সালার। মুর্শিদাবাদ তার বাড়ি মোয়ায্যম আলীর বাড়ির পাশেই। প্রায় তিনমাস সে ছিলো ছুটিতে। সে কোনো জওয়াব না দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে গর্দান ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মোয়ায্যম আলীর সামনে।

আবদুল্লাহ্ খান গর্দান তুললো। তার দু'চোখে তখন অশ্রুর বান ডেকেছে।

ঃ ব্যাপার কি আবদুল্লাহ?'। মোয়ায্যম আলী প্রশ্ন করলেন।

ঃ কি হলো, আবদুল্লাহ্ ?' মোয়ায্যম আলী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আবদুল্লাহ্ খান কান্না ভারাতুর কণ্ঠে বললো ঃ আমি অতি বড়ো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। আপনি মেদিনীপুরে না গিয়ে সোজা ঘরে ফিরে যান। মুর্শিদাবাদ ওলট পালট হয়ে গেছে।'

মোয়ায্যম আলী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আবদুল্লাহকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেনঃ আল্লার কসম! কি হয়েছে, জলদি বলো।'

আবদুল্লাহ্ অতিকষ্টে কান্না সংযত করে বললোঃ আপনার আব্বাজান ও ইউসুফ শহীদ হয়েছেন। আফযলও শহীদ হয়েছেন। আমি মনে করেছিলাম, আপনি সব খবর পেয়ে থাকবেন। যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি। মীর জাফর বাংলাকে বিক্রি করে দিয়েছেন ইংরেজের হাতে।'

মোয়ায্যম আলী নিঃসাড়-নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি তার বাপ-ভাই ও আফযলের মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু বাংলার ফউজের পরাজয় তার কাছে অবিশ্বাস্য। তিনি বেদনাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ঃ নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা কোথায়? কি করে হলো আমাদের পরাজয়?

ঃ সিরাজুদ্দৌলা সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি পরাজয়ের পর মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। তারপর সেই রাতেই তিনি কোথায় বেরিয়ে গেলেন।'

ঃ কখখোনো হতে পারে না। ইংরেজের হাতে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় আমি কখনো বিশ্বাস করতে পারবো না।'

ঃ ইংরেজরা আমাদেরকে পরাজিত করেনি। নিজেদের ভিতরকার গাদ্দারের হাতে মারা পড়েছি আমরা। মীর জাফর ইংরেজের কাছে বাংলার আজাদি বিক্রি করে দিয়েছেন। মীর মদনও হয়েছেন শহীদ। মীর জাফর ফউজী অফিসারদের নিজের সাথে ভিড়িয়ে নিয়েছিলেন। যখন বিজয় আমাদের নিকটবর্তী, সেই মুহূর্তে তিনি মিলে গেলেন ইংরেজের সাথে। আমি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। গাদ্দারীও দেশের আজাদী বিক্রি করে দেবার দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমাদের তোপখানা নিরব হয়ে থাকলো। আমাদের বেশিরভাগ সওয়ার ছিলো ময়দান থেকে দূরে দাঁড়িয়ে।

সিরাজুদ্দৌলার মুষ্টিমেয় জীবনপণ সংগ্রামী যোদ্ধা সিনা পেতে গুলি নিয়ে গড়িয়ে পড়েছে ময়দানে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা আশা করেছি, আমাদের তোপ আচানক আগুন বর্ষণ করতে শুরু করবে, আমাদের সওয়ার করবে আবার চূড়ান্ত হামলা এবং দেখতে দেখতে দুশমন বাহিনী যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে, কিন্তু কি করে বুঝবো পলাশীর ময়দানে কদম রাখবার আগেই আমরা যুদ্ধে হেরে রয়েছি? ইউসুফ ও আফযলকে আমি দেখেছি আমারই চোখের সামনে পড়ে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে। আপনার আব্বাজান যখন সারা গায়ে জখম নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরলেন তখনো আমি তার সাথে ছিলাম। সিরাজুদ্দৌলা তাকে সাথে করে মহলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর রাত্রে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যাবার সময়ে তিনি তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। মধ্যরাত্রির দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন এবং মহল্লার লোকেরা আপনাকে খবর দেবার জন্য আমায় পাঠিয়ে দিলো।'

মোয়ায্‌যম আলী সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন আমাদের মেদিনীপুরে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা ফিরে যাও কেল্লায়। আমার মন্‌জিল হচ্ছে মুর্শিদাবাদ। আবদুল্লাহ, তোমার ইরাদা কি?'

ঃ আমি আপনার সাথেই রয়েছি।'

মুর্শিদাবাদের পরে কয়েকটি মন্‌জিল অতিক্রম করবার পর মোয়ায্‌যম আলী খবর শুনলেন যে, সিরাজুদ্দৌলাকে কতল করে ফেলা হয়েছে; লর্ড ক্লাইভের অনুগ্রহে মীর জাফর বাংলার হুকুমাতের ভার হাতে নিয়েছেন এবং সিরাজুদ্দৌলার বিশ্বস্ত সাথীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে একে একে।

নয়

এক রাতে মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে মোয়ায্যম আলী ও আবদুল্লাহ খান নিজস্ব মহল্লার নির্জন-নিস্তব্ধ গলিতে প্রবেশ করলেন। আব্দুল্লাহ্ খানের বাড়ির দরজায় মোয়ায্যম আলী ঘোড়া থেকে নেমে বললেন ঃ আবদুল্লাহ, এখন তুমি ঘরে গিয়ে আরাম করো। আমার ঘোড়াটাও নিয়ে যাও।'

আবদুল্লাহ খান মোয়ায্যম আলীর ঘোড়ার বাগ হাতে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলো।

অন্ধকার নিস্তব্ধ গলির মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মোয়ায্যম আলী নিজের বাড়ির দরজায় গিয়ে খট্ খট্ আওয়াজ করলেন, কিন্তু ভিতর থেকে কোনো জওয়াব এলো না। তারপর তিনি সাবেরকে ডাকবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আওয়াজ গলার মধ্যে বসে গেলো।

প্রাঙ্গণের দেয়াল খুব উঁচু নয়। তিনি কয়েক মুহূর্ত দেরি করে দেয়ালের উপর উঠে আঙিনায় লাফিয়ে পড়লেন। বাড়ির বাইরের দিককার আঙিনা অন্ধকার। গলির মতোই সেখানে পানি জমা হয়ে রয়েছে। মোয়ায্যম আলী সামনে দেয়ালের একটা খোলা দরজা পার হয়ে প্রবেশ করলেন ভিতর বাড়ির প্রাঙ্গণে। নিচু তলার কোণে একটি কামরায় দেখা গেলো আলো। কামরার দরজা ও খিড়কি সবই খোলা। আলো অনুসরণ করে সেই কামরার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে মোয়ায্যম আলীর পা কাঁপতে লাগলো। এ সেই ঘর, যেখানকার আনন্দ- কোলাহল প্রতি মুহূর্তে তাকে জানিয়েছে সাদর অভ্যর্থনা। বিজলির চমকে উপরতলার ঘরগুলো দেখা গেলো কবরস্থানের চাইতেও বিষাদময় নিস্তব্ধ। তিনি নওকরকে ডাকবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ সরলো না। তারপর দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে বারান্দা পার হয়ে কোণের কামরাটিতে প্রবেশ করলেন। কয়েক মুহূর্ত তিনি নিঃসাড় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কামরার মাঝখানে। তার মা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন বিছানার উপর। যে নারীর স্বাস্থ্য দেখে আশপাশের যুবতীরা ঈর্ষা করতো, এখন তাকে মনে হচ্ছে যেনো একখানা কঙ্কাল। এক বৃদ্ধানারী তার শয্যাপার্শ্বে এক বেতের কুরসিতে উপবিষ্টা। মোয়ায্যম আলীকে দেখেই সে কুরসি থেকে উঠে এক দিকে সরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ঃ মোয়ায্যম বেটা! তোমার ঘর লুট হয়ে গেছে।' তার হা-হুতাশ কান্নায় এবং কান্না চিৎকারে রূপান্তরিত হচ্ছিলো।

আমেনা চোখ খুললেন। 'আম্মাজান! আম্মাজান!'-বলে মোয়াযযম আলী এগিয়ে গেলেন। মাতা পুত্রের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে দিলেন। পুত্র শয্যাপার্শ্বে নতজানু হয়ে মাথাটি মায়ের বুকের উপর রাখলেন এবং আমেনা মোয়াযযম আলীর মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। তার দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। কান্নার বেগ সংযত করবার চেষ্টায় তার সারা দেহ কাঁপতে লাগলো বেতসের মতো। তিনি বললেন ঃ বেটা আমার! আমার লাল! এই তুফানের মধ্যে এসেছো তুমি। আমার বিশ্বাস ছিলো যে, তুমি নিশ্চয়ই আসবে। আমি শুধু তোমার ইন্তেজার করছি আজো। তোমার আব্বাজানও তোমার ইন্তেজার করেছিলেন, কিন্তু তুমি আসতে পারোনি। আর ইউসুফ! সে আমাদের কারুরই ইন্তেজার করতে পারেনি।'

মোয়াযযম আলী কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। তারপর শিশুর মতো তার কান্নার বাঁধ ভেঙে গেলো। মা তার কম্পিত হাতের মধ্যে তার হাতখানি নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। মোয়াযযম গর্দান তুলে অপর হাতখানি মায়ের পেশানীর উপর রেখে বললেন ঃ আম্মাজান! আপনার জ্বর। আমি চিকিৎসক ডেকে আনি। সাবের কোথায়?

মা বললেন ঃ সাবের এক্ষুণি উঠে গেলো। সারা রাত সে ঘুমায়নি! তোমার চিকিৎসক ডাকবার প্রয়োজন নেই। হাকিম আহমদ জান হররোজ এখানে আসেন। আজ সন্ধ্যায়ও তিনি দেখে গেছেন আমায়। মোয়াযযম! আমার কাছে ওয়াদা করো, তুমি এখানে থাকবে না। ওরা পরশু আমাদের ঘর তল্লাশি করতে এসেছিলো। তোমার আব্বা ও ইউসুফের বন্দুক আর তলোয়ারগুলো ওরা নিয়ে গেছে। পড়শিরা এখন আমাদের বাড়ির দিকে আসতে ভয় পায়। হোসেন বেগের বিবি ও মেয়ে আমার যথেষ্ট খেয়াল রেখেছেন। তারা হামিদাকে এখানে না পাঠালে আমি হয়তো এতদিন ইন্তেজার করতে পারতাম না তোমার জন্য। সাবের ছাড়া আমাদের আর সব নওকর ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। আমার মতো হোসেন বেগও বিছানায় পড়ে রয়েছেন, কিন্তু ফরহাত সকাল-সন্ধ্যায় আমায় দেখতে আসে। বেটা, আমাদের মতো তার ঘরও ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা।'

ঃ আম্মাজান! আমি সবকিছু শুনেছি। পথে আবদুল্লাহ্ খানের সাথে আমার দেখা হয়েছে।'

মা বললেন ঃ ইউসুফ ও আফযল দাফন হয়েছে পলাশীর ময়দানে। আহা! মওতের আগে যদি আমি একবার সেখানে যেতে পারতাম। হোসেন বেগ সেখানে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মীর জাফর তার জায়গিরও বাজেয়াফ্ত করে দিয়েছে। তিনি এখান থেকে হিজ্রত করবার ইরাদা করছেন। আমার ইচ্ছা, তুমিও ওর সাথে চলে যাও।'

ঃ আম্মাজান, আপনি যখন সফর করবার মতো সুস্থ হবেন, তখন আমি এক লহমার জন্যও এখানে থাকবো না।'

মা বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হামিদা, তুমিও দুই রাত ঘুমাওনি। যাও, পাশের কামরায় গিয়ে ঘুমাও।'

হামিদা উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, কিন্তু বাইরে উঁকি মেরে মুখ ফিরিয়ে বললো ঃ বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে আমায় ডাকবেন।'

হামিদা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ বেটা উঠে কুরসির উপর বসো। আমার অনেক কথা বলবার আছে তোমার কাছে।'

মোয়াযযম কুরসির উপর বসে মায়ের নাড়িতে হাত রেখে বললেন ঃ আপনার জ্বর খুব বেশি। আমি হাকিম ডেকে আনি।'

ঃ না না,' মা তার হাত ধরে বললেন ঃ তুমি আমার সামনে বসে থাক।'

ঃ তাহলে সাবেরকে পাঠিয়ে দেই।

ঃ হেকিম ঔষধ দিয়ে গেছেন। আর কি করবেন তিনি? বেটা, তুমি আমার কথা শুনে নেও। আস্তাবলে ডান দিকের শেষ খুঁটোর ঠিক পাশে তোমার আমানত রয়েছে মাটির নিচে পোঁতা। তা তুমি তুলে নিও। এ জিনিস তোমার কাজে লাগবে। আজ আমি সাবেরকে বলবার ইরাদা করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহর শোকর, তুমি এসে গেছো। ওরা যখন তালাশি নিতে এলো, তখন আমার ভয় হচ্ছিলো, কিন্তু তোমার আব্বাজানের ধারণাই ছিলো ঠিক। যদি আমি ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতাম তা'হলে ওরা ঠিক খুঁজে নিয়ে যেতো। ওরা এক এককোণ খুঁজে দেখেছে। সম্ভবত ওরা সন্দেহ করেছে যে, সিরাজুদ্দৌলা তোমার আব্বাকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। জালিমরা তোমার কিতাব পর্যন্ত নিয়ে গেছে। ওরা আমার কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলো, কিন্তু হাকিম আহমদ জান বললেন ঃ এ এখন মৃত্যুপথ-যাত্রী। ওকে বিরক্ত করো না।' ওকে বিরক্ত করো না।' মীর জাফরের বেটা মীরণ ওদের সাথে ছিলো। সে হোসেন বেগের ঘরেও গিয়েছিলো। তিনি তখন শয্যাশায়ী। ফরহাতের মা মীরণকে ভালোমন্দ দু'চার কথা বললে সে তার মুখের উপর এক চড় মারলো। ফরহাত এগিয়ে এলে এক সিপাহী তাকে ফেলে দিলো ধাক্কা মেরে।'

মোয়াযযম আলী রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তার চোখ দুটো হয়ে উঠলো জ্বলন্ত আগুনের মতো লাল।

মা বললেন ঃ বেটা, এ মুলুকে এখন আর ইজ্জত ও শরাফতের স্থান নেই। মুর্শিদাবাদের উপর খোদার কহর নাজিল হয়েছে। হোসেন বেগকে আলীবর্দী খানের উজির সালাম করতেন। আফযল ও আসফের সাথে খেলা করেছেন সিরাজুদ্দৌলা।

আর আজ তাদেরই মা-বোনের ইজ্জত মীর জাফরের মতো নীচাশয় পাষণ্ডের হাতে বিপন্ন।'

মোয়াযযম আলীর কম্পিত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এলো এক উত্তেজনাপূর্ণ আওয়াজঃ আম্মাজান! আর আমি শুনতে পারছি না। আমি এর সকল জুলুমের বদলা নেবো ওদের উপর।'

ঃ না মোয়াযযম তুমি ওয়াদা করো আমার সাথে, আর এখানে থাকবে না। তোমার আব্বাজান মরবার সময়ে এই ভয়ই করেছিলেন যে, তুমি উত্তেজিত হয়ে নিজের জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দেবে এবং তারপর দুনিয়ায় আমাদের নাম নেবার আর কেউ থাকবে না। আমার পর তুমি এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যেয়ো। তোমার আমানত অবশ্যি সাথে নিয়ে যেয়ো। ও জিনিস যেমন তোমার কাজে লাগবে, তেমনি হোসেন বেগেরও সাহায্য করতে পারবে। হীরা বহুত দামী। আমি আমার গহনাপত্র ও কয়েকটি আশরাফী ওরই সাথে পুঁতে রেখেছি। কিন্তু কেউ যেনো এ খবর জানতে না পায়।'

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ হীরা এলো কোথেকে?'

ঃ বেটা, তোমার আব্বাজান জখমি হয়ে সিরাজুদ্দৌলার সাথে পৌছলেন মুর্শিদাবাদে। মহলের এক পাহারাদার এসে আমায় খবর দিলো। তার অবস্থা তখন খুবই খারাপ। সিরাজুদ্দৌলা ও শাহী হাকিম তখন তার পাশে বসেছিলেন। শাহী হাকিম আমায় বললেন যে, জখম গুরুতর এবং এই অবস্থায় সফরের ফলে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে। সিরাজুদ্দৌলার চোখ ছিলো অশ্রুভারাক্রান্ত। তিনি বললেন ঃ আমি ওকে মানা করেছিলাম, কিন্তু কোনো অবস্থায়ই উনি আমার সাথ ছাড়তে রাজি হলেন না। ইউসুফের লাশ দাফনও উনি দেখতে পারেননি।" আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে থাকলাম, কিন্তু তার অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকলো। রাত্রিবেলা যখন সিরাজুদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যাবার ইরাদা করলেন, তখন তাকে ঘরে পৌছে দেবার জন্য পাহারাদারদের হুকুম দিলেন। যখন তার চারপায়ী তুলে নেওয়া হলো, তখন সিরাজুদ্দৌলার মাতার গলার হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি তা নিতে অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন ঃ বোন, এ ইনাম নয়, খেরাজ। আমার দৃষ্টিতে দুনিয়ার তামাম সম্পদ মাহমুদ আলী খানের বিশ্বস্ততার সাথে তুলনীয় হতে পারে না। কিন্তু আমি তার তোহফা কবুল করলাম না। আমরা মহল থেকে বেরিয়ে এলে খাজে সারা আমাদের সাথে এলো। সিপাহী তোমার আব্বাজানকে ঘরে রেখে চলে গেলো, কিন্তু খাজে সারা থাকলো। সে আমায় একটি ছোট্ট থলে দিয়ে বললো ঃ নওয়াব সাহেব এটি পাঠিয়েছেন।' আমি কোনো জওয়াব দিলাম না। সে থলেটি আমার সামনে রেখে চলে গেলো।

'তোমার আব্বাজান পথে বেহুশ হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে তিনি এই বহুমূল্য হীরাভরা থলেটি নিজের কাছে না রেখে আস্তাবলে পুঁতে রাখতে বললেন। তখন আমার কাছে এসব জিনিসের কোনো মূল্য নেই। থলেটি আমি তোমার কিতাবের আলমারীতে রেখে দিলাম মধ্যরাত্রের কাছাকাছি সময়ে তিনি চলে গেলেন। শেষ মূহূর্তে তিনি বারংবার তাকিদ করে গেছেন, যেনো শিগ্‌গিরই আমরা এখান থেকে হিজ্‌রত করে চলে যাই। তিনি ভয় করেছেন, এখানে থেকে তুমি হয়তো কোনো মুসিবতে পড়বে। ভোরবেলা হাকিম আহ্‌মদ জান, মীর্যা হোসেন বেগ ও আশপাশের গরিব লোকেরা ছাড়া আর কেউ তার জানাজায় আসেনি। হোসেন বেগের শরীর তখন খুব খারাপ। হাকিম সাহেব তাকে বাধা দিলেন, কিন্তু তিনি জানায় শামিল হবার জন্য জিদ ধরলেন। পরদিন খবর পেলাম যে, তার ঘরে তালাশি নেওয়া হয়েছে। আমি তখন তোমার জন্য সেই হীরার হেফাযত করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। তাই রাতেরবেলা আমি তা পুঁতে রাখলাম, আর তার সাথেই রাখলাম আমার গহনাপত্র। আজ সন্ধ্যায় আমি ভেবেছিলাম যে তুমি না এলে সাবেরকে সব বলে যাবো, কিন্তু আল্লার শোকর আজ আমার দিল থেকে একটা বোঝা নেমে গেলো। সেখানকার জমিন খুঁড়লে একটি ছোট্ট বাক্স পাবে। তার ভিতরে একটি চামড়ার থলের মধ্যে রয়েছে সেই হীরা আর আমার গহনাপত্র।'

মোয়াযযম আলী নির্বাক। এসব হীরা, জহরত আর আশরাফির প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই তার। তার কল্পনায় কখনো ভেসে ওঠে লড়াইয়ের ময়দানে আহত ভূপতিত ভ্রাতার ছবি আর কখনো ভেসে আসে মরণমুখী পিতার মুখ। কখনো বা তিনি ভাবেন আফযলের কথা। জিন্দেগির সবকিছু তার চোখে হয়ে আসে অবাস্তব-অর্থহীন।

মা বললেন ঃ তোমার অনুপস্থিতিতে ফরহাত তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে, বেটা! যে ছিলো কতো প্রশান্ত স্বভাব, কিন্তু এখন ওর চোখের পানির দিকে তাকানো যায় না। হোসেন বেগের অসুস্থতা সত্ত্বেও সে হররোজ আমার কাছে এসেছে। ওর মাও হামেশা নজর রেখেছেন আমার দিকে। হামিদাকে তিনি পাঠিয়েছেন আমার দেখাশোনার জন্য। আগে আমি তাকে মনে করতাম গর্বিত, কিন্তু বহু উপকার করেছেন তিনি আমার। আহা! তুমি যদি তার বদলা দিতে পারতে! বেটা, আমায় দাফন করো তোমার বাপের কবরের পাশে।'

মোয়াযযম বললেন ঃ না আম্মাজান, আপনি ভালো হয়ে যাবেন।'

মা হাসলেন, কিন্তু তার মুখের সে হাসি অশ্রু ও আর্তনাদের চাইতেও পীড়াদায়ক। কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে তিনি বললেন ঃ বেটা, ইউসুফের মতো পুত্রের মৃত্যুর পর মা এবং তোমার আব্বার মতো স্বামীর চলে যাবার পর কোনো বিবি দুনিয়ায় জিন্দাহ্

থাকতে পারে না। বেটা, সত্যি করে বলো, তোমার কোনো বিপদের আশঙ্কা তো নেই? তুমি তো এখান থেকে বহুদূরে ছিলে, তোমার সাথে মীর জাফরের কি দুশমনি থাকতে পারে?'

মোয়ায্যম আলী তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন ঃ আম্মাজান, আমার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।'

মা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে মোয়ায্যম আলীর হাত ধরে বললেন ঃ বেটা, আমি খোদার কাছে দোআ করেছি, যেনো মওতের আগে শুধু এক মুহূর্তের জন্য আমি তোমায় দেখতে পাই। তারপর আমি খুশি হয়ে জান দিয়ে দেবো। কিন্তু আজ তোমায় চোখের সামনে দেখে আমায় আরো কিছুকাল জিন্দাহ থাকবার সাধ জাগছে। এই হিংস্র জানোয়ারদের হাতে তোমার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই, এ বিশ্বাস নিয়ে যেনো আমি মরতে পারি, বেটা! যদি তোমার বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহলে আল্লাহর দিকে চেয়ে শুধু আমারই জন্য এখানে থেকো না।'

মোয়ায্যম আলী অশ্রু সংযত করবার চেষ্টা করে বললেন ঃ আম্মাজান, আমার দেহের স্নায়ুতে রয়েছে আমার বীর পিতার রক্তধারা। মুর্শিদাবাদ নেকড়ের বাসভূমিতে পরিণত হলেও আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না।'

মা বেদনাতুর অবস্থায় চোখ বন্ধ করে স্তিমিত আওয়াজে বললেন ঃ আমার আল্লাহ্! আমার বেটাকে দুশমনের হাত থেকে বাঁচাও। তুমি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই আমাদের।'

ধীরে ধীরে মোয়ায্যম আলীর হাতের উপর তার হাতের চাপ ঢিলা হয়ে এলো। ঃ আম্মাজান, আম্মাজান! মোয়ায্যম আলী ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলেন।

মা চোখ খুলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মোয়ায্যম আলীর মুখের দিকে। তার চোখ দু'টি ধীরে ধীরে ভরে উঠলো অশ্রুধারায়।

ঃ আম্মাজান!' মোয়ায্যম আলী ধরা গলায় ডাকলেন।

মায়ের ঠোঁট কেঁপে উঠলো। তারপর একবার কম্পনের পর তিনি দু'তিন বার গভীরশ্বাস নিলেন এবং তার চোখ থেকে উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দুগুলো ঝরে পড়লো বালিশের উপর।

ঃ আম্মা! আম্মা! মোয়ায্যম আলী তার হাতে একটুখানি ঝাঁকুনি দিলেন কিন্তু এরই মধ্যে তার জিন্দেগির সফর খতম হয়ে গেছে।

মোয়ায্যম আলী অনেকক্ষণ বসে রইলেন মোহাবিষ্টের মতো; তিনি চিৎকার করে কাঁদতে চাইলেন, কিন্তু কণ্ঠে আওয়াজ নেই। তিনি সেখান থেকে পালাতে চান, কিন্তু তার চলবার শক্তি নেই। তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে, তার মা মরে গেছেন। আমেনার চোখ দু'টো খোলা; মোয়ায্যম আলীর দিকে যেনো এখনো

তাকিয়ে আছে সে চোখ। এ তো হতে পারে না। ঃ আম্মা! আম্মা!! নিজের কম্পিত হাতে তিনি মায়ের নাড়ি হাতড়ে দেখলেন। বারবার তিনি তার গভীর ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বন্ধ করে দিলেন তার চোখ দুটি।

রাত্রির শেষ প্রহরে ঘরের চেরাগ নিবু নিবু হয়ে এসেছে, কিন্তু মোয়ায্যম আলী উঠে তাতে তেল ঢালবার বা নওকরকে ডাকবার প্রয়োজনবোধ করলেন না। কারুর মুখ দেখবার বা কারুর সাথে কথা বলাবার আকাঙ্ক্ষা নেই তার মনে।

অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন চিত্র ভেসে বেড়াচ্ছে তার চোখের সামনে। আধো ঘুমের মধ্যে তিনি দেখছেন তার বাপ-মা, ভাই ও বন্ধুদের ছবি তার চোখের সামনে। কখনো তিনি খেলা করছেন মকতবের ছেলেদের সাথে, আবার কখনো ফউজী জোয়ানদের সাথে অভ্যাস করছেন যুদ্ধকৌশল। তারপর যখন অতীতের স্বপ্নের দুনিয়া ছেড়ে তিনি ফিরে আসেন বর্তমানের তিক্ততাময় বাস্তবের মুখোমুখি, তখন তার দীল ছেয়ে যায় বিদ্বেষ ও ঘৃণায়।

ভোর হয়ে আসছে। তিনি আধোঘুমে চক্ষু মুদে দেখে চলেছেন কখনো মুগ্ধকর আর কখনো ভয়ানক স্বপ্ন। আচানক তিনি তার মাথায় কারুর কোমল হাতের চাপ অনুভব করলেন। তার কানে আসতে লাগলো একটা হালকা কান্নার আওয়াজ তথাপি তিনি যথারীতি চোখ বুজে বসে রইলেন নিশ্চল-নিঃসাড় হয়ে। কার যেনো আঙুলের ছোঁয়া এসে লাগছে তার কপালে। দুর্বল চাপা গলায় কে তাকে ডাকছে ঃ মোয়ায্যম মোয়ায্যম !!'

মোয়ায্যম ফিরে দেখে আচানক উঠে দাঁড়ালেন। এক যুবতি কেমন ঘাবড়ে গিয়ে এক কদম পিছিয়ে গেলো।

ঃ কে? ফরহাত!

ফরহাতের চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। জওয়াব না দিয়ে সে মাথা নত করলো।

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ আম্মাজান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।'

ফরহাত ওড়নায় চোখ মুছে বললো ঃ আমি তা জানি। আমি তাকে আগেই দেখেছি। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বেশ কিছুক্ষণ। আপনি যেমন করে ঘুমাচ্ছিলেন, আমি তাতে ভয় পেয়েছিলাম। আপনার তবিয়ৎ ভালো তো?'

মোয়ায্‌যম আলী ফরহাতের দিকে তাকালেন। জুলুম, চক্রান্ত ও দুষ্কৃতির অন্ধকার দুনিয়ায় সে যেনো এক আলোকরশ্মি। বিষণ্ন আওয়াজে তিনি বললেন ঃ ফরহাত, আমি বড়ো কঠিনপ্রাণ মানুষ।'

ফরহাত বললো ঃ হামিদা কোথায় গেলো? ওর তবিয়ত আরো খারাপ হলে আমাদেরকে খবর দেবার জন্য আমি তাকিদ দিয়েছিলাম তাকে। সাবেরকেও আমি বলেছিলাম।'

মোয়ায্‌যম আলী জওয়াব দিলেন ঃ সে রাতের বেলা ঘরে চলে গেছে। আম্মাজান তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

ঃ আপনি কখন এসেছেন?'

ঃ প্রায় মধ্যরাত্রে আমি এখানে এসেছি। আম্মাজানের অবস্থা তখন খুব উদ্বেগজনক ছিলো না। তিনি বহুক্ষণ আমার সাথে কথা বলেছেন, কিন্তু তারপর আচানক.....। তার মৃত্যু আমি এখনো যেনো বিশ্বাস করতে পারছি না। এখন কতো বদলে গেছে এ দুনিয়া। কতো অবিশ্বাস্য ব্যাপারই না ঘটে গেলো এই ক'দিনেরই মধ্যে। ইউসুফ ও আফযলের মৃত্যুই বা কি করে বিশ্বাস করা যায়? ফরহাত, হায়! আফযল ও ইউসুফ আমার কতো প্রিয় ছিলেন আর তাদের মৃত্যুর অর্থ আমার কাছে কি, তা' যদি আমি তোমায় বলতে পারতাম!'

ঃ আমার তা' জানা আছে।'

ঃ তোমার আব্বাজান কেমন আছেন?'

ঃ সন্ধ্যার দিকে তার তবিয়ত খুব খারাপ ছিলো, কিন্তু মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এখন তার অবস্থা অনেকটা ভালো। নামাজের সময়ে আম্মাজান আমায় চাচিজানের খবর নিতে বললেন। আমি এখন যাই, তারা আমার ইন্তেজার করছেন।'

মোয়ায্‌যম আলী বললেন ঃ ফরহাত, আম্মাজান তোমাদের উপকার বারবার স্মরণ করেছেন, আর আমিও তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকবো।'

ঃ কিন্তু হামেশা আমার দুঃখ থাকবে যে, শেষ মুহূর্তে আমি তার কাছে থাকতে পারিনি।' বলে ফরহাত ধীরে ধীরে পা ফেলে দরজার দিকে গেলো। কিন্তু দহলিজের বাইরে পা ফেলেই সে থেমে গেলো এবং ফিরে মোয়ায্‌যম আলীর দিকে তাকিয়ে বললো ঃ আম্মাজান বলছিলেন, আপনার এখানে আসা বিপজ্জনক। ওরা সকল ভালো মানুষকেই গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মোয়ায্‌যম আলী বললেন ঃ আমার জন্য চিন্তা করো না। কিছুই বিপজ্জনক নেই আমার কাছে।'

ঃ কিন্তু আপনার সতর্ক থাকা অবশ্যি উচিত।'

ঃ আমার বিশ্বাস, আফযলের বোন আমায় বিপদ থেকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেবে না।'

ঃ না, আমি নেকড়ের মোকাবিলা করতে আপনাকে মানা করবো না, কিন্তু শুধু আমি এইটুকু চাই যে, আপনি নেকড়ের নাগালের ভিতর যাবার চেষ্টা করবেন না।'

ঃ এখন তো সারা বাংলাই নেকড়ের বিচরণভূমি হয়ে পড়েছে।'

ফরহাত আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলো।

যে সিতারা তিনি হামেশা দেখেছেন আসমানে উচ্চতায়, তা-ই এসে তার আঁধার ঘরে আলো বিকিরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মোয়াযযম আলী কিছুক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফরহাত, মীর হোসেন বেগের কন্যা, আসফ ও আফযলের বোন এসেছে তার ঘরে। তিনি তাকে দেখেছেন, তার সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু জীবন-বীণার যে তার একদিন তার কল্পনায় তুলেছে ঝঙ্কার, তা আজ নীরব হয়ে গেছে। আকাঙক্ষা, উন্মাদনা ও উদ্দীপনার যে মন্দিরে তিনি ফরহাতের কল্পরূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজ বিরাণ হয়ে গেছে।

৫

বারান্দার অপর কোণে সাবের নিজের বিছানায় ছিলো গভীর নিদ্রায় অচেতন। মোয়াযযম আলী গিয়ে তাকে জাগালেন। সাবের ধরমর করে উঠে বে-এখতিয়ার মোয়াযযম আলীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। সে অনেক কিছু বলতে চায়, কিন্তু গলার আওয়াজ বসে যায়। তার কান্না চিৎকারে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। তারপর যখন কিছুই সংযত হয়ে নিজেদের ধ্বংসকাহিনী শুনাতে চাচ্ছে, তখন মোয়াযযম আলী বললেন ঃ সাবের, সব কিছুই আমি জানি।'

সাবের বললো ঃ আপনার আম্মাজান অসুস্থ। চলুন, তিনি ঐ কামরায় আছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেনঃ তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সাবের স্তব্ধ ও নিঃসাড় হয়ে তাকিয়ে রইলো মোয়াযযম আলীর মুখের দিকে' তারপর ছুটে গিয়ে ঢুকলো কামরার মধ্যে। আবার সে বাইরে বেরিয়ে এলো শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে।

কিছুক্ষণ পর মহল্লার মেয়েরা সেখানে জমা হতে লাগলো এবং মোয়াযযম আলী দেওয়ানখানার বারান্দায় মহল্লার লোকদের সাথে বসে থাকলেন। হোসেন বেগ লাঠিতে ভর করে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি যেনো একটি কঙ্কালে পরিণত হয়েছেন এবং কমজোর হওয়ায় তার পা কাঁপছে। আফযল ও ফরহাতের পিতার এ অবস্থা মোয়াযযম আলীর কাছে অসহনীয়। তিনি বে-এখতিয়ার উঠে গিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে হোসেন বেগকে সিনার সাথে চেপে ধরলেন।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচাজান, আপনার জ্বর। আপনার আরাম করবার প্রয়োজন।

হোসেন বেগ জওয়াবে বললেন ঃ বেটা, এখন আমার আরাম মিলবে কবরে গিয়ে। হোসেন বেগ কিছুক্ষণ বারান্দার মেঝের উপর মোয়াযযম আলীর কাছে বসে রইলেন, কিন্তু মহল্লার লোকেরা তাকে জোর করে শুইয়ে দিলো কামরার মধ্যে বিছানার উপর। কিছুক্ষণ পর যখন মোয়াযযম আলীর মায়ের জানাজা উঠানো হলো, হোসেন বেগ কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচাজান, এ অবস্থায় আপনার জানাজার সাথে যাওয়া উচিত হবে না। আপনি ঘরে ফিরে গিয়ে আরাম করুন।'

মহল্লার এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে হোসেন বেগের হাত ধরে সাহায্য করলে

তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও চললেন নিজের বাড়ির দিকে।

মায়ের লাশ দাফন করার পর মোয়ায্যম আলী ঘরে ফিরে না গিয়ে মীর্যা হোসেন বেগের হাবেলীতে গিয়ে প্রবেশ করলেন। মীর্যা হোসেন বেগ নিচু তলার এক কামরায় শায়িত। ফরহাত ও তার মা মীর্যা সাহেবের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। পরিচারিকা মোয়ায্যম আলীর আগমনের খবর দিলো। ফরহাত উঠে চলে গেলো পাশের কামরায়। মোয়ায্যম আলী কামরায় প্রবেশ করলে ফরহাতের মা অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। হোসেন বেগের ইশারায় মোয়ায্যম আলী বসলেন এক কুরসিতে। হোসেন বেগ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ মোয়ায্যম আলী! আমাদের উপর দিয়ে কি বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেলো, তা একে অপরকে বলবার প্রয়োজন নেই। এখন সবর ছাড়া আর কোনো চারা নেই। তুমি নওজোয়ান এবং তোমার হিম্মৎ আমাদের শেষ অবলম্বন। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো এবং তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কয়েকদিন তুমি খানা স্পর্শ করোনি। আমি তোমার বাড়িতে খানা পাঠাচ্ছিলাম। এখন তুমি আমার সামনেই কিছু খেয়ে নেও।'

ঃ চাচাজান, আমার ভুখ লাগেনি।'

ঃ তা' আমি জানি। কিন্তু আমি বলছি, আমাদের খাতিরে তুমি কিছু খেয়ে নেও।'

তারপর বিবির দিকে ফিরে তিনি বললেন ঃ আবেদা, পরিচারিকাকে বলো খানা নিয়ে আসতে।'

ঃ আমি নিজেই নিয়ে আসছি।' হোসেন বেগের বিবি এই কথা বলে চোখের পানি মুছতে মুছতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আবেদা খানা এনে মোয়ায্যম আলীর সামনে তেপায়ার উপর রাখলেন। হোসেন বেগের পুনরায় অনুরোধে মোয়ায্যম আলী এক লোকমা তুলে দিলেন মুখে। এরই মধ্যে এক নওকর আচানক ছুটে এসে কামরায় ঢুকে বললো ঃ মীর মীরন সশস্ত্র সিপাহী সাথে নিয়ে এসেছে।'

মীর মীরন মীরজাফরের পুত্র। মীর্যা হোসেন বেগ ও মোয়ায্যম আলীর কাছে তার আগমন মামুলি ব্যাপার নয়। মীর্যা হোসেন বেগ শয্যা ছেড়ে উঠে লাঠি হাতে কাঁপতে কাঁপতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মোয়ায্যম আলী জলদি উঠে তার এক হাত ধরলেন। তারা দেওয়ানখানার বারান্দায় গিয়ে নিচে দেখলেন মীর মীরণ ও বিশজন সশস্ত্র সিপাহীকে। মীর মীরণ বয়সের তুলনায় অনেকখানি মোটা। তার মুখে অহঙ্কার, ধূর্ততা নির্লজ্জতা ও শয়তানি যেনো ফুটে উঠছে। সে মীর্যা হোসেন বেগ ও মোয়ায্যম আলীকে দেখে সামনে এগিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললো ঃ তোমারই নাম মোয়ায্যম আলী?'

মোয়ায্যম আলীকে নির্বাক দেখে মীর্যা হোসেন বেগ জওয়াব দিলেন ঃ হ্যাঁ,

ওরই নাম মোয়াযযম আলী,

মীর মীরন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে হোসেন বেগের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ বুড়ো, তুমি চুপ করে থাকো।'

মোয়াযযম আলীর মনে হলো, যেনো কেউ তার বুকে জ্বলন্ত আগুন চেপে ধরেছে। তিনি এক কদম এগিয়ে এসে বললেন ঃ তুমি কি চাও?'

মীর মীরন আগুনের মতো জ্বলে উঠে বললো ঃ বদতমিজ, আমি জানতে চাই, কেন তুমি মুর্শিদাবাদে এসেছো?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ মুর্শিদাবাদে আমার ঘর, তাই।'

মীর মীরন প্রশ্ন করলো ঃ মেদিনীপুরের ফউজদার তোমায় এখানে হাজির হবার হুকুম দেয়নি?'

ঃ মেদিনীপুরের ফউজদার আমায় সেখানে ডেকেছিলেন, কিন্তু তিনি আমায় পলাশীর যুদ্ধের অবস্থা জানাননি।'

ঃ আর এখানে এসে তুমি পলাশীর যুদ্ধের অবস্থা জেনেছো?'

ঃ হ্যাঁ।'

মীর মীরন বললো ঃ আমি তোমার আনুগত্যের হলফ আদায় করতে এসেছি।'

ঃ আনুগত্যের হলফ ? মীর জাফরের জন্য?' মোয়াযযম আলী বিদ্রুপের স্বরে বললেন।

মীর মীরন বললো ঃ বেওকুফ, তুমি মনে করছো, আমি আর কারুর জন্য আনুগত্যের হলফ আদায় করতে এসেছি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ ওফাদারীর হলফ সঙ্গিনের পাহারায় নেওয়া যায় না। মীর জাফর বাংলার নবাব, মেনে নিতে আমি অস্বীকার করছি।'

মীর মীরন পূর্ণশক্তিতে চিৎকার করে সিপাহীদের ডেকে বললো ঃ তোমরা কি দেখছো? ওকে গ্রেফতার করো।'

ঃ থাম।' হোসেন বেগ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন। তারপর আরো দুতিন কদম এগিয়ে গিয়ে মীর মীরনকে তিনি বললেন ঃ মীর মীরন! আল্লাহকে ভয় করো। মোয়াযযম আলীর বাপ ও ভাই বুকের খুনে তোমার বাপের গাদ্দারীর মূল্য দিয়েছেন।'

মীর মীরন সীমাহীন গজবের সাথে এগিয়ে গিয়ে হোসেন বেগের মুখের উপর চড় মারলে তিনি বারান্দায় সিঁড়ির উপর পড়ে গেলেন।

দেখতে দেখতে মোয়াযযম আলী একে একে দুটো ঘুষি বসিয়ে দিলেন মীর মীরনের মুখে। চড় খেয়ে মীর মীরন চিৎ হয়ে পড়ে গোলো।

সিপাহীরা তলোয়ার কোষমুক্ত করলো, কিন্তু মীর মীরন চিৎকার করে বললো ঃ খবরদার! ওকে জিন্দাহ গ্রেফতার করে নেবো।

কয়েকজন সিপাহী তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে মোয়ায্যম আলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু তিনি কোনোরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলেন না। মীর মীরনের হুকুমে মোয়ায্যম আলীকে তারা বাঁধলো আঙিনায় এক গাছের সাথে। মীর মীরন তার গায়ের কামিজ ছিঁড়ে নিক্ষেপ করলো। তারপর সে এক সিপাহীর হাত থেকে কোড়া নিয়ে বললো ঃ তোমার মতো বিদ্রোহীর সাজা মওত নয়, তোমার সাজা হচ্ছে এই। বলো, ওফদারীর হলফ করবে কিনা?'

মোয়ায্যম আলীর উপর কোড়াবর্ষণ শুরু হলে মীর্যা হোসেন বেগ উঠে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এক সিপাহী তলোয়ারের অগ্রভাগ তাঁর বুকের উপর উদ্যত করে তাঁকে এগিয়ে আসতে বাধা দিলো। আচানক ফরহাত কামরা থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে মোয়ায্যম আলী ও মীর মীরনের মাঝখানে দাঁড়ালো। মীর মীরন তাকে হাত ধরে এক পাশে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সে দুহাতে ধরে ফেললো কোড়ার অগ্রভাগ। দুজন সিপাহী ফরহাতকে ধরে সরিয়ে নিলো একদিকে। তাদের হাতের মধ্যে অসহায় হয়ে সে চিৎকার করতে লাগলো ঃ তোমাা কমিনা, তোমরা বুযদীল একটি লোককে বেঁধে তার উপর তোমরা দেখাচ্ছো সিংহের বিক্রম?'

মীর মীরন পর পর মোয়ায্যম আলীর পিঠের উপর আরো কয়েকবার কোড়া মারলো। তিনি বেহুঁশ হলে যখন তার গর্দান শিথিল হয়ে পড়লো তখন সে সিপাহীদের বললো ঃ ওকে কয়েদখানায় নিয়ে যাও। তারপর হোসেন বেগকে লক্ষ্য করে সে বললো ঃ তুমি বুড়ো মানুষ। আব্বাজান তোমার উপর কঠোর আচরণ করতে আমায় নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমাদের দুশমনের জন্য বাংলার মাটিতে কোনো জায়গা নেই। আমি তোমায় হুকুম দিচ্ছি এক হফতার মধ্যে তোমরা বাংলার সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবে।'

মোয়ায্যম আলীর যখন হুঁশ ফিরে এলো তখন তিনি এক সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কুঠরির মধ্যে পড়ে রয়েছেন। দুজন সশস্ত্র সিপাহী তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে এবং তৃতীয় এক সিপাহী বালতিতে কাপড় ভিজিয়ে ভিজিয়ে তার জখমের উপর পানি দিচ্ছে। মোয়ায্যম আলী উঠে পানি চাইলেন। এক সিপাহী কুঠরির কোণায় রাখা মাটির ঘড়া থেকে এক পিয়ালা পানি এনে দিলো তাকে। মোয়ায্যম আলী তা পান করে সিপাহীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ আমি এখন কোথায়?'

এক সিপাহী জওয়াব দিলো ঃ মুর্শিদাবাদের কয়েদখানায়।'

মোয়ায্যম আলী খানিকক্ষণ নিঃসাড় হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর সিপাহীরা কুঠরির দরজা বন্ধ করে চলে গেলো। তিনি সীমাহীন মনঃপীড়ায় কাতর হয়ে উপুর হয়ে শুয়ে থাকলেন মেঝের উপর।

কয়েদখানার যাতনা ও কষ্ট তার কাছে নতুন নয়। আগেও তিনি ছিলেন

কয়েদখানায়। কিন্তু এবারকার কয়েদি জীবনের ভয়াবহ দিক হচ্ছে এই যে, তাকে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে সালতানাতের বুনিয়াদ কায়েম করেছিলেন তারই পূর্বপুরুষ, আজ তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। যে দেশের আজাদির জন্য শহীদ হয়েছেন তার বাপ, তার ভাই আর তার বন্ধুরা, তারই একটুখানি মুক্ত হাওয়ার জন্য তিনি আজ কাঙাল। আটদিন পর আরো তিনজন কয়েদিকে এনে ঢুকানো হলো সেই কুঠরিতে। এরা তিনজনই ছিলেন একদিন বাংলার ফউজের বড়ো বড়ো অফিসার। মোয়াযযম আলী তাদের কাছে জানালেন যে, তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে মীর জাফরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীমূলক ধারণা প্রচারের অভিযোগে। এক অফিসার তাকে বললেন, তার গ্রেফতার হওয়ার পরদিন হোসেন বেগ হিজরত করে চলে গেছেন মুর্শিদাবাদ থেকে এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াফত হয়ে গেছে। তাদের সাথে আরো ত্রিশজন গ্রেফতার হয়েছে এবং আরও বহুলোকের গ্রেফতারির আশঙ্কা রয়েছে। গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের কয়েদখানা ভরে গেছে এবং বিবেচনা করা হচ্ছে নতুন কয়েদিদের অন্যান্য শহরে পাঠাবার প্রস্তাব। শুধু হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তিদেরই কয়েদখানায় পাঠানো হচ্ছে না। যেসব ধনী লোক মীর জাফরকে তার চাহিদা মতো প্রচুর অর্থ দিতে পারছেন না, তাদেরকেও করা হচ্ছে কারাবন্দী। মীর জাফর তার ইংরেজ মুরুব্বিদের খুশির জন্য মুর্শিদাবাদের ধনভান্ডার তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন লর্ড ক্লাইভের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাবার জন্য ক্রমাগত শোষণ করে যাচ্ছেন বাংলার উমরাহ শ্রেণীকে। বড়ো বড়ো জমিদার ও ব্যবসায়ী কড়ার কাঙাল হয়ে হিজরত করে যাচ্ছেন বাংলা থেকে।

মোয়াযযম আলীর আড়াই মাস কেটে গেলো মুর্শিদাবাদের কয়েদখানায়। একদিন কয়েদখানার দারোগা কয়েকজন সশস্ত্র সিপাহীসহ তার কুঠরিতে প্রবেশ করে বললোঃ মোয়াযযম আলী, আজ তোমার মোকদ্দমা পেশ হবে আদালতে।'

মোয়াযযম আলী নাঙ্গা তলোয়ারের পাহারায় কুঠরি থেকে বেরিয়ে চললেন দারোগার সাথে।

কিছুক্ষণ পর তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন কয়েদখানার এক প্রশস্ত কামরায়। তার সামনে আদালতের কুরসিতে উপবিষ্ট মীর নাসির নামে মীর জাফরের খান্দানের এক ফউজী অফিসার। তার ডানে-বায়ে আরো কয়েকজন ফউজী অফিসার বসে আছেন। মীর নাসির উড়িষ্যার বিভিন্ন লড়াইয়ের ময়দানে মোয়াযযম আলীর সাথে ছিলেন। তিনি মোয়াযযম আলীর দিকে তাকালেন এবং সামনে মেঝের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে পড়ে বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, তুমি মেদিনীপুরের ফউজদারের হুকুম পেয়ে সেখানে হাজির না হয়ে মুর্শিদাবাদে চলে এসেছো। দ্বিতীয় অভিযোগ, তুমি হুকুমাতের বিরুদ্ধে লোককে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছো। তৃতীয় অভিযোগ, গ্রেফতারির সময়ে তুমি মীর মীরণের উপর হামলা করেছো। তিনটি অভিযোগই অত্যন্ত সঙ্গিন। তোমার সাফাই দেবার মতো কিছু আছে কি?'

মোয়াযযম আলী তার ডানে-বায়ে ও পিছনে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ানো সিপাহীদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আদালতের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি জানি, এ আদালতে আপনি আমার চাইতেও অসহায়। তাই আমি সাফাই পেশ করে আপনার পেরেশানি আরো বাড়াতে চাই না। কিন্তু যদি আপনি নিতান্তই শুনতে চান তাহলে আমার জওয়াব ঃ আমি সরহদী কেল্লা থেকে মেদিনীপুর রওয়ানা হয়েই জেনেছি আমি যে হুকুমাতের খেদমতে নিযুক্ত ছিলাম, তা খতম হয়ে গেছে এবং হয় মেদিনীপুরের ফউজদার মুর্শিদাবাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর অথবা তিনি এমন এক হুকুমাতের প্রতিনিধি, যার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তারপর মুর্শিদাবাদে এমন লোক আমার কাছে ওফাদারীর হলফ দাবি করেছেন, যার হাত বাংলার স্বাধীনতাকামীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ, আমি মীর

মীরণের উপর হাত তুলেছি। মীর মীরণ আমার কাছে বাংলার সত্যিকার শাসকের পুত্র নয় বরং এমন এক দুর্মখ ও দুশ্চরিত্র লোক, যে আমার কওমের এমন এক সম্মানিত ব্যক্তির উপর হাত তুলেছে, যার নওজোয়ান পুত্ররা বুকের রক্ত দান করেছেন দেশের আজাদির জন্য। আমার আসল অপরাধ, আমি বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছি এবং যে কওমের উমরাহ সামান্য অর্থের বিনিময়ে দেশকে বিক্রয় করে দিতে প্রস্তুত, তারই খেদমত করেছি এক সিপাহী হিসাবে।'

মীর নাসির বললেন ঃ মনে হয় জীবনের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। এসব বক্তৃতার উপযুক্ত স্থান এ নয়। যদি তুমি সাফাই হিসেবে কিছু বলতে চাও আমরা তা শুনতে রাজি।'

ঃ যে আদালত আমার চাইতেও অসহায় সেখানে কোনো সাফাই পেশ করা আমি মনুষ্যত্বের অবমাননা মনে করি। মীর জাফরের এহেন তরফের প্রয়োজন ছিলো না। আমি আপনার মুখ থেকে আমার সম্পর্কে তার হুকুম শুনবার জন্য তৈরি।'

মীর নাসির খানিকক্ষণ ঘাড় নিচু করে চিন্তা করলেন। অবশেষে কলম নিয়ে কিছু লিখে মোয়ায্যম আলীকে বললেন ঃ তোমার অপরাধ অতি সঙ্গিন, কিন্তু তোমার খান্দানের অতীতের খেদমত বিবেচনা করে তোমায় সাত বছর কয়েদখানায় আবদ্ধ সাজা দেওয়া হচ্ছে।'

মোয়ায্যম আলী এক পীড়াদায়ক হাসি সহকারে মীর নাসিরের দিকে তাকালেন এবং মীর নাসির গর্দান ঝুঁকালেন।

মোয়ায্যম আলী ফিরে কয়েদখানার দারোগার দিকে তাকালেন। সে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিলো। দারোগার চোখ দুটি অশ্রুভারে ছলছল করছে। সে মুখ ফিরিয়ে সিপাহীদের বললো ঃ ওকে নিয়ে চলো।'

রাতেরবেলা কয়েদখানার কুঠরিতে যখন মোয়ায্যম আলীর সাথীরা গভীর ঘুমে অচেতন তখন তিনি সিজদায় মাথা নত করে দোআ করছেন ঃ আমার মাওলা আমায় হিম্মৎ দে, যেনো এ পরীক্ষায় আমি উতরে যেতে পারি।'

আরো আট মাস অতীত হয়ে গেলো। এতদিনে মোয়ায্যম আলীর সাথীদের অন্যত্র নেওয়া হয়েছে এবং তিনি প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করছেন কয়েদখানা থেকে ফেরার হবার কৌশল।

দশ

এক রাতে আচানক মোয়ায্‌যম আলীর কুঠরির দরজা খুলে গেলো এবং মশালধারী এক সিপাহী ভিতর দিকে তাকিয়ে বললো ঃ আপনি বাইরে আসুন।

মোয়ায্‌যম আলী বাইরে এসে চারজন সশস্ত্র সিপাহী, কয়েদখানার দারোগা ও মীর নাসিরকে দরজার সামনে দেখলেন। মীর নাসির বললেন ঃ মোয়ায্‌যম আলী, আমি আপনাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি। আপনি পালাবার চেষ্টা করবেন না, ওয়াদা করলে আপনাকে বেড়ি পরানোর তকলিফ করবো না।'

মোয়ায্‌যম আলী জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ওয়াদায় আপনাদের বিশ্বাস হবে?'

ঃ হ্যাঁ।' মীর নাসির জওয়াব দিলেন।

ঃ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন।'

ঃ এ প্রশ্নের জওয়াব আমি দিতে পারবো না।'

মোয়ায্‌যম আলী দারোগার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি জানি, আপনারা কতো অসহায়, কিন্তু যদি কয়েদখানার বাইরে মীর মীরণ আমার জন্য ইন্তেজার করে থাকেন, তা আপনি বিনাদ্বিধায় বলতে পারেন।'

দারোগার পরিবর্তে মীর নাসির বললেন ঃ আমরা এখানে নেক ইরাদা নিয়ে এসেছি, আপনাকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি।'

মোয়ায্‌যম আলী বললেন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি এ মুলুকে এখনো নেকির কোনো ধারণা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে একটা মোজেজাই বলতে হবে। আমি বাধ্য হয়েই ওয়াদা করছি, পালাবার চেষ্টা আমি করবো না। চলুন।'

মোয়ায্‌যম আলী মীর নাসিরের সাথে কয়েদখানার ফটকের বাইরে গেলে দুজন সিপাহী বন্দুক তুলে সামনে দাঁড়ালো। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মীর নাসিরের দিকে তাকালে তিনি বলে উঠলেন ঃ ঘাবড়াবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আপনার ওয়াদার উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু আপনি কোনো অন্যায় করে বসলে আপনার পরিবর্তে জীবনভর কয়েদখানার বিপদ মাথা পেতে নিতে আমি রাজি নই। এরা আমাদের পিছু পিছু আসবে। আপনাকে খবরদার করার জন্য আরো বলে দিচ্ছি যে, এরা দুজনই ভালো নিশানাবাজ।

মোয়ায্‌যম আলী মীর নাসিরের সাথে কয়েক কদম চলবার পর আচানক প্রশ্ন

করলেন ঃ আমি শুধু জানতে চাই, এদেরকে এখান থেকে কতো দূর নিয়ে নিশানাবাজীর হুকুম দেওয়া হবে।'

মীর নাসির জওয়াব দিলেন ঃ মোয়াযযম আলী, ঘাবড়াবেন না। মীর কাসিম আপনাকে ডেকেছেন।'

ঃ মীর কাসিম কে? মীর জাফরের জামাতা?'

ঃ হ্যাঁ, আমি প্রায়ই তার কাছে আপনার কথা বলেছি। আজ তিনি আপনার সাথে মোলাকাতের ইচ্ছা জানিয়েছেন। আপনি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারলে এ মোলাকাতের ফল আপনার জন্য খারাপ হবে না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ যদি মীর কাসিম মনে করে থাকেন যে, কয়েদখানায় থেকে থেকে মীর জাফরের হুকুমাতের প্রতি আমার ধারণা বদলে গেছে, তাহলে তিনি হতাশ হবেন। তাই এখান থেকে আমায় ফিরিয়ে নেওয়াই আপনাদের পক্ষে ভালো হবে।'

ঃ হয়তো মীর কাসিম আপনার সংকল্প জেনে তা দ্বারা প্রভাবিত হবেন এবং বাংলা ও মীর জাফর সম্পর্কে তার ধারণাও হয়তো আপনারই মতো হবে।'

প্রায় এক ঘন্টা চলবার পর মোয়াযযম আলী ও মীর নাসির গিয়ে মীর কাসিমের বিশাল সুদৃশ্য প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। দেওয়ানখানার নিকটে এক আলোকোজ্জ্বল কামরার সামনে পৌঁছে সিপাহী থেমে গেলো। মীর নাসির ও মোয়াযযম আলী প্রবেশ করলেন কামরার মধ্যে। মীর কাসিম এক কুরসির উপর উপবিষ্ট। মীর নাসির বললেন ঃ এই মোয়াযযম আলী।'

মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে মীর কাসিম তাকে বসতে বললেন।

কুরসির উপর বসতে গিয়ে মোয়াযযম আলী প্রথমবার অনুভব করলেন যে, তিনি কয়েদির জীর্ণ পোশাক পরে রয়েছেন। মীর কাসিম কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি। তোমার যাতে কোনো তকলিফ না হয় তার জন্য আমি কয়েদখানার দারোগাকে বলে দিয়েছি। যাকে সোনা দিয়ে পরিমাপ করা উচিত সেই লোকই কয়েদখানায় বন্দী, তার জন্য আমার আফসোস হচ্ছে। বাংলাকে চরম ধ্বংস থেকে বাঁচাবার এখন একটি মাত্র পন্থা রয়েছে এবং তা হচ্ছে মীর জাফরের হুকুমাত থেকে তাকে নাজাত দেওয়া। আমি বুঝতে পারছি যে, এ ধ্বংসের দায়িত্ব আমার উপরও পড়বে কিন্তু আমরা ভুল ধারণা ও ভুল চিন্তায় বিভ্রান্ত ছিলাম। আমাদের ধারণা ছিলো যে, মীর জাফর হুকুমাতের গদীতে আসীন হবার পর যোগ্যশাসক বলে প্রমাণিত হবেন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তার হুকুমাত বাংলার উপর এক অভিশাপ।

তিনি এক কলু, যার মারফতে ইংরেজ বাংলার আওয়ামের রক্তশোষণের কাজ আদায় করে নিচ্ছে। তিনি বাংলার সমৃদ্ধ এলাকাগুলো সঁপে দিয়েছেন ইংরেজের হাতে। বাংলার উমরাহ আজ কড়ির কাঙাল হয়ে হিজরত করে যাচ্ছেন এখান থেকে। আমি ফউজের দেশপ্রেমিক নওজোয়ানদের সাথে আলোচনা করছি। তারা মীর জাফরের ক্ষমতার মসনদ উলটে ফেলার চেষ্টায় আমার সহযোগিতা করতে তৈরি। আমায় সাহায্য করবার ব্যাপারে তাদের প্রধান শর্ত হচ্ছে এই যে, আমি তোমার মতো লোকদের কয়েদখানা থেকে রেহাই দেবার চেষ্টা করবো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ মীর জাফরের ক্ষমতার মসনদ উলটে ফেলার জন্য আপনাকে সবার আগে লড়াই করতে হবে ইংরেজদের সাথে। ইংরেজের সাথে লড়বার জন্য ফউজের কয়েকজন অফিসারের সাহায্যই যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলা।'

মীর কাসিম হেসে বললেন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজের সাথে যুদ্ধ করবার প্রশ্নই ওঠে না। লর্ড ক্লাইভ নিজেই মীর জাফরের প্রতি বিরক্ত।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আর তিনি মীর জাফরের পরিবর্তে আপনাকে গদিতে বসাতে চাচ্ছেন।

মীর কাসিম জওয়াব দিলেনঃ আমি তোমায় শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, যদি আমরা মীর জাফরকে গদি থেকে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত হই এবং লর্ড ক্লাইভের বিশ্বাস জন্মাতে পারি যে, উমরাহ সিপাহী ও দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থক, তাহলে তিনি মীর জাফরের পক্ষ সমর্থন করবেন না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তাহলে এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি আপনাকে মীর জাফরের তুলনায় তার বেশি সহায়ক মনে করছেন।'

মীর কাসিম তার পেরেশানি গোপন করবার চেষ্টা করে বললেন ঃ তুমি বুদ্ধিমান লোক। তুমি জানো, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এমন সামর্থ নেই যে, আমরা ইংরেজের সাথে লড়তে পারি। কিন্তু আমি তোমায় একিন দিচ্ছি যে, যদি হুকুমাত আমার হাতে আসে এবং তোমার মতো লোকদের সমর্থন পাই, তাহলে আমি খুব শিগগিরই এমন এক শক্তি সংহত করে তুলতে পারবো, যদ্দারা এ মুলুক থেকে ইংরেজের প্রভাব লোপ করে দেওয়া সম্ভব হবে।'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ আপনি ইংরেজের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসে তাদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য ফউজ সংহত করে তুলতে চান, কিন্তু আমি জানি লর্ড ক্লাইভ আপনার চাইতে বেশি হুঁশিয়ার প্রমাণিত হবেন। দেখুন, আমি আপনার সাথে সাফ সাফ কথা বলবো। আমি এ অভিযানে আপনার সাথী হবো

মনে করে যদি আপনি আমায় ডেকে থাকেন, তাহলে হতাশ হবেন।'

ঃ এর অর্থ, তুমি মীর জাফরের হুকুমাত নিয়েই সন্তুষ্ট?'

ঃ যে হুকুমাত লর্ড ক্লাইভের সমর্থনে কায়েম হবে, তা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। একই ছিদ্রে দুবার হাত দেবার ভুল আমি করবো না।

ঃ তাহলে এর অর্থ, তুমি সারাজীবন কয়েদখানায় কাটানোই পছন্দ করো?'

মোয়ায্যম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি ছোট কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে বড়ো কয়েদখানায় আসতে চাই না।'

মীর কাসিম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ যদি জিম্মাদারিতে আমি তোমায় কয়েদখানা থেকে আজাদ করে দেই তাহলে তুমি কি করবে?

ঃ মওকা পেলেই আমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবো। বাংলার আবহাওয়ার সাথে আমার আর খাপ খাবে না।'

মীর কাসিম কুরসি থেকে উঠে কিছুক্ষণ কামরার মধ্যে টহল দিয়ে বললেন ঃ এখন যদি আমি তোমায় আবার কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেই, তাহলে আমি কি প্রত্যাশা করতে পারি যে, আমাদের মধ্যে যেসব কথা হলো, তা অপর কারুর কাছে প্রকাশ পাবে না?'

ঃ হ্যাঁ। যদি আপনি সত্যি মীর জাফরের হুকুমাতের তখত উলটে দিতে চান, কয়েদখানায় বসে আমি আপনার জন্য দোয়া করবো। তারপর যেদিন আমি জানবো যে, ইংরেজের সাথে আপনার সংঘাত চলছে, সেদিন হয়তো আমি কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসবার এজাযত চেয়ে আপনার কাছে আবেদন করবো।'

মীর কাসিম প্রশ্ন করলেন ঃ যদি আমি তোমায় এখখুনি আজাদ করে দেই, তাহলে তুমি কোথায় যাবে?'

ঃ তা আমি জানি না। কিন্তু বাংলায় আমি থাকবো না।'

ঃ যাও। তুমি আজাদ।'

মোয়ায্যম আলী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। আনন্দ ও বিস্ময়ের এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন মীর কাসিমের মুখের দিকে।

মীর কাসিম তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ কি দেখছো আমার দিকে তাকিয়ে? আমি বলছি তুমি আজাদ। আর যদি জানতে চাও, কেন আমি তোমায় আজাদ করে দিচ্ছি, তাহলে শোন। পলাশীর যুদ্ধের পর তোমার মতো কতো নওজোয়ানকে আমি বিদ্রোহের দায়ে মৃত্যুদন্ড গ্রহণ করতে দেখেছি। তখন আমি হামেশা আমার দীলকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি এই বলে যে, এরা আমাদের

খান্দানের দুশমন। কিন্তু আজ বাংলার শাসক আমাদের খান্দান নয়, বরং ইংরেজেই হচ্ছে বাংলার ভাগ্যবিধাতা। আজ আমি অনুভব করছি যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সাধারণ কেরানি মীর জাফরের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। আজ থেকে কয়েক মাস আগেও কোনো লোক আমার দিকে যদি তোমার মতো অবাধ্যতার দৃষ্টিতে তাকাতো, তাহলে আমি তার চক্ষু উৎপাটন করে ফেলতাম, কিন্তু এখন আমি সকল যিল্লতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামান্য কর্মচারী আমাদেরকে আওয়াজ দিয়ে না ডেকে আঙুলের ইশারায় ডাকে। তুমি খোশ কিসমত যে, তুমি এক কয়েদির লেবাসেও আমার চোখের উপর চোখ রেখে কথা বলেছো। হায়! আমিও যদি তেমনি লর্ড ক্লাইভের চোখের উপর চোখ রেখে তাকাতে পারতাম! আমি বিশ্বাস করি, ইংরেজের সাথে লড়াই করতে পারি না, কিন্তু মনে হেলো, যদি কখনো মওকা আসে, আমরা তাদের সাথে সেই আচরণই করবো। যেমনটি তারা আমাদের সাথে করেছে।'

তারপর মীর নাসিরের উদ্দেশে বললেন ঃ নাসির! তুমি বাজি জিতে গেলে। ওকে নিয়ে যাও আমার নওকরদের বলবে, যেনো ওকে নতুন লেবাস ও ঘোড়া দিয়ে দেয়। ওকে মুর্শিদাবাদের বাইরে পৌঁছে দেওয়ার জিম্মাদারি তোমার উপর রইলো।'

কামরা থেকে বেরুবার সময়ে মোয়াযযম আলী মীর কাসিমের চোখে অশ্রু লক্ষ্য করলেন। বাইরে এসে তিনি মীর নাসিরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি মীর কাসিমের সাথে কোন বাজি জিতলেন?'

মীর নাসির জওয়াব দিলেন ঃ মীর কাসিমের ধারণা ছিলো, আপনি কয়েদ থেকে রেহাই পাবার আশায় তাকে মুজরা দিতে রাজি হবেন, আর আমার রায় ছিলো তার উলটো। তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন ঃ যদি মোয়াযযম আলী আমার সামনে এসেই আমার পায়ে না পড়ে তাহলে আমি তোমায় দশ আশরফী ইনাম দেবো।' আমি বলেছিলাম, 'যে মোয়াযযম আলীর মোকদ্দমা আমার সামনে পেশ হয়েছিলো, তিনি তার ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। তিনি সেই লোকদের একজন, যারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে হাসতে পারেন।'

কিছুক্ষণ পর মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার রেহাইর জন্য আমি আপনাদের শোকরগুজারী করি, কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারি না, মীর জাফর ও মীর মীরণ আমার সম্পর্কে জানলে তখন আপনাদের জওয়াব কি হবে?'

ঃ মীর জাফর ও মীর মীরণের মাথায় ইংরেজের জন্য টাকা যোগাড় করা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই এখন ঢুকবার অবকাশ পাচ্ছে না। তা ছাড়া মীর কাসিম এমন বে-এখতিয়ার লোক নন, যিনি নিজ দায়িত্বে একজন কয়েদিকে রেহাই দিতে পারবেন

না। তবে আমার মতে আপনি জলদি করে মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে যান। যতো জলদি করে সম্ভব বাংলার সীমান্তের বাইরে চলে যান। হয়তো আমাদেরকে দুএকদিন পরেই খবর রটাতে হবে যে, এক বিপজ্জনক কয়েদিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। মীর কাসিমের সিপাহী আপনাকে শহরের বাইরে পৌঁছে দেবে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এখান থেকে আমার একা চলে যাওয়াই কি ভালো নয়?' আমার সাথে সিপাহী দেখলে লোক খামাখা আমার দিকে নজর দেবে। শহর ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি কয়েক মিনিটের জন্য আমার বাড়িতে যেতে চাই, সেজন্যও আমার একা যাওয়া ভালো।'

মীর নাসির বললেন ঃ আমি যতোটা জানি, আপনার বাড়ি নিলাম হয়ে গেছে এবং সেখানে অপর কোনো লোক থাকেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি আমার নওকরদের সন্ধান না করে যেতে পারছি না। মহল্লায় আমার এক দোস্ত রয়েছেন। তিনি হয়তো তার খবর জানেন। ওখানে যেতে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই, তাহলে আমি নিশ্চিত বলছি, আপনারা যে আমায় কয়েদখানা থেকে বের করে দিয়েছেন, তা আমি বলবো না। আমি বলবো যে, আমিই ফেরার হবার চেষ্টা করেছি।'

মীর নাসির বললেন ঃ নওকরের সমস্যা এত বেশি জরুরি হলে আমি আপনাকে বাধা দেবো না। কিন্তু আপনার খুবই সতর্ক থাকা উচিত। আমরা অনেক কয়েদির রেহাই সম্পর্কে বিবেচনা করছি, তার জন্যও আপনার সতর্ক থাকার প্রয়োজন।'

ঃ আমি পুরোপুরি হুঁশিয়ার হয়ে চলবো। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ঃ মীর্যা হোসেন বেগ মুর্শিদাবাদ থেকে হিজরত করে কোথায় গেলেন?'

ঃ তার সম্পর্কে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে কাফেলার সাথে তিনি গেছেন, তারা গেছে লাখনৌর দিকে। কাফেলায় এমন লোকও ছিলো, যারা লাখনৌর আগে আগ্রা, দিল্লি ও হায়দারাবাদ যাবে।'

কথা বলতে বলতে তারা গিয়ে ঢুকলেন দেউড়ির সাথে এক কামরায়। মীর নাসির বললেন ঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য নতুন লেবাস ও ঘোড়ার ইন্তেজাম করছি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনার অসুবিধা না হলে আমার একখানা খনজরও প্রয়োজন।'

মীর নাসির কামরা থেকে বাইরে বেরুতে বেরুতে বললেন ঃ খনজর ছাড়া আমি আপনাকে বন্দুক এবং পিস্তলও এনে দিতে পারবো।'

৫

প্রায় এক ঘন্টা পর মোয়ায্যম আলী ফউজী অফিসারের লেবাস পরে নিয়ে ঢুকলেন তাঁর মহল্লার এক সুনসান গলির ভিতরে। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে এক বাড়ির দরজায় খটখট আওয়াজ দিলেন।

ঃ কে ওখানে?' ভিতর থেকে আওয়াজ এলো।

ঃ আব্দুল্লাহ খান! দরজা খোলো।'

দরজা খুললে মোয়ায্যম আলী জলদি ভিতরে পা রেখে বললেন। ঃ আবদুল্লাহ! আমি মোয়ায্যম আলী।'

আবদুল্লাহ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এর মধ্যে মোয়ায্যম আলী ঘোড়াটা ভিতরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আবদুল্লাহ খান, তুমি ভয় পেয়ে গেলে?' তিনি বললেন।

আবদুল্লাহ বে-এখতিয়ার তাকে বুকে চেপে ধরলো। বললো ঃ আমি যে জেগে আছি, তা-ই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ কথার সময় নেই এখন। বলো, সাবের কোথায়?

ঃ সাবের আপনার বাড়িতেই থাকে। আপনার গ্রেফতারির পর হুকুমাত আপনার বাড়ি নিলাম করে দিয়েছে। এখন ওখানে থাকেন এক ফউজী অফিসার আর সাবের এখন তার নওকর। হোসেন বেগ হিজরত করে যাবার সময়ে ওকে সাথে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ও বললো, মরার সময় পর্যন্ত ও আপনার জন্য ইন্তেজার করবে।'

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ বাড়ির বাইরের দিকটায় এখন সাবেরের সাথে আর কে থাকতে পারে, তুমি জানো?'

ঃ কোনো মেহমান না থাকলে আর একটি নওকর অবশ্যি থাকবে।'

বাড়ির ছাদ থেকে নারী-কন্ঠের আওয়াজ এলো। তারপর মোয়ায্যম আলীর দিকে ফিরে বললো ঃ আমি এখনো জিজ্ঞেস করিনি, কি করে আপনি কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।'

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ এসব কথার সময় নেই এখন। তুমি এখখুনি তিন চারজন নির্ভরযোগ্য দোস্তকে ডেকে আন। আমি এখানেই ইন্তেজার করবো তোমার।'

কিছুক্ষণ পর মোয়ায্যম আলী আবদুল্লাহ ছাড়া তাদের মহল্লার নেকাবে মুখঢাকা আরো চারজন নওজোয়ানসহ নিজ বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ালেন। চাঁদের রোশনীতে

এদিকে-ওদিক দেখে নিয়ে তিনি দেয়াল ডিঙিয়ে আঙিনায় প্রবেশ করলেন। আঙিনায় আস্তাবলের সামনে দুটি লোক শুয়ে রয়েছে খাটের উপর। মোয়াযযম আলী নিঃশব্দে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বাইরের দরজা খুলে দিলেন। আবদুল্লাহ ও তার সাথীরা ঢুকলো আঙিনায়। মোয়াযযম আলীর ইশারায় তারা দাঁড়িয়ে গেলো আস্তাবলের সামনে শায়িত লোক দুটির খাটের পাশে। একটা খাটের উপর শুয়ে রঁয়েছে একটি সুগঠিত দেহ নওজোয়ান। মোয়াযযম আলী ইশারা করা মাত্র আবদুল্লাহ তার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বললো ঃ যদি ভালাই চাও, চুপ করে থেকো।'

পাশে সশস্ত্র সিপাহী দেখে সে কোনোরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলো না। মোয়াযযম আলীর সাথীরা তার মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিলো বেশ ভালো করে। তারপর তাকে বেঁধে রাখলো খাটের সাথে।

তারপর মোয়াযযম আলী সাবেরকে তুলে তার মুখের উপর হাত রেখে বললেনঃ সাবের! চুপ করে থাক, ভয় নেই। আমি মোয়াযযম আলী।'

সাবেরের উদ্বেগপূর্ণ, অসহায় ও নির্বাক চাউনি যেনো মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে হাজার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ সাবের, আমার সাথে এসো। আর সবাই এখানে থাক। আমরা এখখুনি আসছি।'

সাবের কোনো কথা না বলে মোয়াযযম আলীর সাথে আস্তাবলে প্রবেশ করলো। খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের রোশনি পড়ছে আস্তাবলের ভিতরে। দুটো ঘোড়া সেখানে বাঁধা রয়েছে। মোয়াযযম আলী বললেন ঃ সাবের, ঘোড়ায় জিন লাগাও।'

তারপর তিনি আস্তাবলের অপর দিকটায় গিয়ে শেষ খুটোটার কাছে বসে পড়লেন। সাবের ঘোড়ার জিন বেঁধে এসে দেখলো মোয়াযযম আলী খঞ্জর দিয়ে মাটি খুঁড়ছেন।

আপনি কি করছেন? সাবের পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ সাবের, আমি চুরি করছি।'

ঃ চুরি ! কি চুরি করছেন?'

ঃ আমি নিজের ঘরে নিজেরই মাল চুরি করছি। তুমি ঘোড়া নিয়ে বাইরে যাও। আমি আসছি এখখুনি।'

সাবের ঘোড়ার বাগ ধরে বাইরে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে বগলে একটি ছোট্ট থলে চেপে ধরে মোয়াযযম আলী বেরিয়ে এলে একজন সাথী প্রশ্ন করলো ঃ এ কি জিনিস?'

ঃ এ আমাদের রাহা খরচ। এসো, এবার চলি।'

প্রায় আধঘন্টা পর মহল্লার বাইরে এসে মোয়ায্যম আলী ও সাবের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আবদুল্লাহ ও তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন।

আবদুল্লাহ অশ্রুসজল চোখে প্রশ্ন করলো ঃ আপনার মনজিল কোথায়?'

মোয়ায্যম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি এক মনজিলহীন মুসাফির। আমি যাচ্ছি মীর্যা হোসেন বেগের সন্ধানে। লাক্ষ্মৌয়ে তাঁকে না পেলে যাবো দিল্লি। সেখানে না পেলে হায়দারাবাদ। তারপর খোদা জানেন, কোন কোন শহরে বস্তিতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে।'

আবদুল্লাহ খান বললো ঃ একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। আপনার গ্রেফতারির প্রায় ছমাস পর আকবর খান এখানে এসেছিলেন। তিনি দুদিন ছিলেন আমার কাছে এবং ফিরে যাবার সময়ে আমায় বলে গেছেন, আল্লাহ তওফিক দিলে তিনি এক ফউজ নিয়ে মুর্শিদাবাদে আসবেন আপনাকে কয়েদখানা থেকে বের করতে।'

মোয়ায্যম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ মীর্যা হোসেন বেগের কথা তুমি ওকে জিজ্ঞেস করছিলে?'

ঃ জী হ্যাঁ, কিন্তু মীর্যা হোসেন বেগ সম্পর্কে তিনিও ছিলেন বেখবর এবং তিনি বলেছিলেন তিনি লাক্ষ্মৌ গিয়ে তার সন্ধান করবেন। যদি তাঁকে পান, তবে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।

সাবের বললো ঃ আকবর খান আমায় সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি যে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আমি মনিবের ইন্তেজার করবো'

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মোয়ায্যম আলী আবদুল্লাহ ও তার সাথীদের বললেন ঃ তোমরা আমার ফেরার হওয়া সম্পর্কে মহল্লার কারুর কাছে কোনো কথা বলো না। মীর জাফরের লোকেরা জানলে নিশ্চয়ই পিছু পিছু ছুটবে আমার।'

ভোরবেলা মোয়ায্যম আলী ও সাবের ফজরের নামাজ আদায় করলেন এক বর্ষাতি নদীর কিনারে। নামাজের পর দোআর জন্য হাত তুললে বে-এখতিয়ার তার চোখে নেমে এলো অশ্রুর সয়লাব। এ অশ্রু এক সর্বহারা হতাশা মানুষের শেষ পুঁজি-যা তিনি ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন তার স্বদেশের মাটিতে। তিনি আসমানের দিকে মুখ তুলে বললেন ঃ জাযা ও সাজার মালিক, আমার বদনসীব কওমকে কয়েকটি ব্যক্তি বিশেষের দুষ্কৃতির জন্য সাজা দিও না। মিল্লাতের ইজ্জত বিকিয়ে দিলো যারা, তাদের খাতিরে আমাদেরকে নাজাত দাও। তোমার বান্দাদের তারা তোমার রহমত থেকে হতাশ করে দিচ্ছে।'

৫

'আপনি মীর্যা হোসেন বেগ সম্পর্কে কিছু জানেন? তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের খুব বড়ো রইস এবং ওখান থেকে তিনি হিজরত করে এসেছিলেন লাখনৌয়ে। হয়তো এখানে ওর কোনো আত্মীয় ছিলেন-পলাশীর যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ থেকে হিজরত করে এসে লাখনৌর বাসিন্দা হয়েছেন, এমন লোকের ঠিকানা দিতে পারেন?' -মোয়াযযম আলী লাখনৌয়ে কয়েক দিন থেকে অসংখ্য লোককে এই ধরনের প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু কেউ তাকে দিতে পারেনি কোনো সান্ত্বনাদায়ক জওয়াব।

লাখনৌয়ে এসে মোয়াযযম আলী দুটি দিন কাটালেন এক সরাইখানায়। তৃতীয় দিন তিনি থলে থেকে একটি হীরকখণ্ড বের করে লাখনৌর এক জওহরীর কাছে বিক্রয় করে দিলেন বারোশ আশরাফির বিনিময়ে। সেদিনই তিনি ভাড়া করলেন একটি ছোট্ট বাড়ি। তারপর তার নিয়মিত কাজ হলো খুব ভোরে উঠে বালিশের নিচ থেকে জওয়াহেরাতভরা থলে বের করে কোমরে বেঁধে নেওয়া এবং মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ে হোসেন বেগের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। গহনাগুলো তিনি এক সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতেন আর তার হেফাজতের ভার ছিলো সাবেরের উপর। ঘোড়াগুলোর দেখাশুনা ও খানা পাকানোর জন্য তিনি রেখে একটি নওকর রেখেছেন। তার নাম দীলাওয়ার খান। সারাদিন শহরের মহল্লায় গলিতে গলিতে হোসেন বেগের সন্ধান করে সন্ধ্যায় তিনি ঘরে ফিরে আসেন শ্রান্ত দেহে এবং ক্লান্তির চাইতেও বেশি করে ভেঙে পড়েন হতাশায়। রাত্রে ঘুমাবার সময়ে হীরের থলেটি কোমর থেকে খুলে তিনি রেখে দেন বালিশের নিচে। সাবের ছাড়া আর কোনো মানুষই জানে না তার দৌলতের খবর। সব চাইতে ছোট্ট হীরের টুকরোটি বিক্রি করে দিয়ে মোয়াযযম আলী বুঝে নিয়েছেন যে, লাখনৌর বিশিষ্ট আমীর শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে তিনি একজন, কিন্তু তার সে দৌলতের সাথে জড়িত রয়েছে অতীতের তিক্ত স্মৃতি।

আমীরের লেবাসে লাখনৌর রইস, হুকুমাতের বড়ো বড়ো কর্মচারী ও ফউজী অফিসারদের সাথে মেলামেশা করবার অবকাশ মিললো না। দশদিন কঠোর অনুসন্ধানের পর একদিন দুপুরবেলা লাখনৌর এক বাজারের পথে অতিক্রম করে যাবার সময়ে এক বৃদ্ধ তার সামনে এসে আচানক দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভালো করে তাঁর দিকে তাকিয়ে মোয়াযযম আলী বলে তাকে বুকের সাথে চেপে ধরলেন।

ঃ আপনি শের আলী?' একটুখানি চুপ করে থাকার পর মোয়াযযম আলী বললেন।

ঃ হাঁ, তিনি বিষণ্ন আওয়াজে জওয়াব দেন ঃ আমার জানা ছিলো যে, তুমি আমায় খুব সহজে চিনতে পারবে না। এখানে মুর্শিদাবাদের কয়েকজনের সাথে আমার দেখা হয়েছে, কিন্তু দুএকজন ছাড়া কেউ আমায় চিনতেই পারেনি। তুমিও তো বদলে গেছো অনেকটা। তুমি কয়েদখানা থেকে কবে রেহাই পেলে আর এখানেই বা কবে এলে?'

ঃ আমি প্রায় দশদিন এখানে আছি। মীর্যা হোসেন বেগকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। হয়তো আপনি তার সম্পর্কে কিছু জানেন।'

শের আলী জওয়াব দিলেন ঃ মীর্যা সাহেব আর এ দুনিয়ায় নেই।'

এক মুহূর্তে মোয়াযযম আলীর দেহের রক্ত-প্রবাহ যেনো থেমে গেলো। বিস্ফারিত চোখে তিনি চেয়ে রইলেন শের আলীর মুখের দিকে।

শের আলী বললেন ঃ আমি তার একমাস পরে মুর্শিদাবাদ থেকে হিজরত করেছি। লাখনৌয়ে পৌঁছে এমন কয়েকজন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছে, যারা মীর্যা সাহেবের সাথে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাদের মুখে আমি শুনেছি যে, মীর্যা অযোধ্যার সীমান্তে পৌঁছেই পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং ওখানকার এক বস্তির জমিদার তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। লাখনৌয়ে থাকতেন মীর্যা সাহেবের মামাতো ভাই এবং আমার ধারণা ছিলো যে, তিনি তার কাছেই এসেছেন। আমি তার সন্ধান করতে গিয়ে জানলাম যে, পলাশীর যুদ্ধের কয়েক মাস আগেই তিনি লাখনৌ থেকে হিজরত করে চলে গেছেন দাক্ষিণাত্যে। মীর্যা সাহেব যে বস্তিতে ছিলেন বলে আমি খবর পেয়েছিলাম, তারপর সেখানেই চলে গেলাম আমি। সেখানে গিয়ে গাঁয়ের জামিদারের কাছে শুনলাম কয়েকদিন জীবন-মৃত্যুর সংঘাতের মাঝে পড়ে থাকার পর মীর্যা সাহেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। সেই গাঁয়ের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে এবং জমিদার আমাকে তার কবরও দেখিয়েছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তার সাথে তো তার বিবি আর মেয়েও ছিলেন।'

ঃ সেই গাঁয়ের জমিদার কিছুদিন তাদেরকে তার বাড়িতে রেখেছিলেন মেহমান হিসাবে। কিছুদিন পর বাংলার মুহাজিরদের আর এক কাফেলা যাচ্ছিলো সেই বস্তির উপর দিয়ে তারাও শামিল হলেন সেই কাফেলার সাথে। কাফেলার কতকলোক এসেছে লাখনৌ ফয়যাবাদ, আর কতক গেছে আগ্রা ও দিল্লি। লাখনৌ এসেও আমি তাদের সন্ধান করেছি, কিন্তু কোনো খবরই জানতে পারিনি। তাদের সাথে দুজন নওকরও ছিলো এবং আমার ধারণা মীর্যা সাহেবের বিবি ও সাহেবজাদি লাখনৌয়ে তাদের স্বজনদের খোঁজ করে দিল্লি অথবা হায়দারাবাদ চলে গেছেন; 'কেননা সেই দুটি শহরেই রয়েছে তাদের খান্দানের বহু লোক।

মোয়ায্যম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ মীর্যা সাহেবের মামাতো ভাইয়ের নাম আপনার জানা আছে?'

ঃ হ্যাঁ, তার নাম আরশাদ বেগ।'

ঃ দিল্লিতে আপনি তো কোনো আত্মীয়ের নাম জানেন?'

ঃ না।'

শের আলীর লেবাস তার দারিদ্র্য ও অভাবের পরিচয় দিচ্ছিলো।

মোয়ায্যম আলী জিজ্ঞেস করলেনঃ এখানে আপনি কি করছেন?'

শের আলী জওয়াব দিলেন ঃ কিছুই না। মুর্শিদাবাদ থেকে আসার সময়ে আমার হাতে কিছু টাকা পয়সা ছিলো। এখানে এক সাথী আমায় বেনারস গিয়ে কোনো কারবার করবার পরামর্শ দিলো। বেনারস গিয়ে ব্যবসার লাভের পরিবর্তে আমার সামান্য পুঁজিও শেষ হয়ে গেলো। এখন আমি একটা কিছু চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার মতো বুড়ো মানুষের কোনো জায়গা নেই এখানে।'

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ আপনাকে আর চাকরি খুঁজতে হবে না। চলুন আমার সাথে।'

ঃ কোথায়?'

ঃ আমার বাড়িতে।'

ঃ কিন্তু আমিতো তোমার উপর বোঝা হয়ে থাকবো না। আগে বলো, তুমি এখন কি করছো?'

মোয়ায্যম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি এখনো ফয়সালা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু যদি আপনার তেজারতের শখ থাকে, তাহলে সম্ভবত আমি আপনার সাথে শরীক হতে পারি।'

ঃ কিন্তু তেজারতের জন্য পুঁজির প্রয়োজন।'

ঃ পুঁজির জন্য আপনি পেরেশান হবেন না। আমার কাছে অনেক কিছু রয়েছে।'

শের আলী বললেন ঃ আমি নিজের গরজে তোমায় তেজারতের পরামর্শ দেবো না। তুমি এক সিপাহী এবং তোমার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা তুমি অযোধ্যার ফউজে কোনো উচ্চপদ হাসিল করতে পারো।'

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ চাচা শের আলী, আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় আর ফউজের চাকরির কথা বলবেন না। আমি ফয়সালা করে ফেলেছি যে, যেসব নামেমাত্র শাসক কওমকে যিল্লৎ ও দুর্গতি ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি, তাদের জন্য বাকি জীবনে আমি কখনো অস্ত্রধারণ করবো না।'

মোয়ায্যম আলী আরো দু'হফতা লাখনৌয়ে থাকলেন। এ সময়টা তিনি প্রতিদিন

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকলেন, ফরহাত ও তার মায়ের সন্ধানে। রাতেরবেলা যখনই শের আলীর সাথে তার কথাবার্তার মওকা আসে, তখনই শের আলী বলেন ঃ মোয়াযযম তোমার কাছে কারুনের ধন-ভাণ্ডার থাকলেও আমাদের এমনি বসে থাকা উচিত হবে না। কিছু-না-কিছু কাজ আমাদেরকে অবশ্যি করতে হবে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দেন ঃ চাচাজান, আমি চিন্তা করছি। পেরেশান হবেন না। শিগগিরই আমি আপনাকে লাগিয়ে দেবো একটা কিছু কাজে।'

এক রাত্রে তৃতীয় প্রহরে শের আলী ছিলেন নিদ্রামগ্ন। মোয়াযযম আলী তার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন ঃ চাচা শের আলী, আমি বাইরে যাচ্ছি কিছুদিনের জন্য। দীলাওয়ার খান আমার সাথে যাবে। সাবের থাকবে আপনার খেদমতে। এইনিন, এই থলের মধ্যে রয়েছে পাঁচশ আশরাফি। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত আপনাদের খরচের জন্য এ অর্থ যথেষ্ট হবে।'

ঃ কোথায় যাচ্ছো তুমি?' শের আলী পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন।'

ঃ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরহাত ও তার মায়ের সন্ধান করা। এখন আমি প্রথমে যাবো ফয়যাবাদ। তারপর রোহিলাখণ্ডে এক দোস্তের কাছে আমায় যেতে হবে। তারপর সম্ভবত আমার আগ্রা, দিল্লী ও হায়দারাবাদে যেতে হবে।'

শের আলী বললেন ঃ তাহলে আমিও তোমার সাথে যেতে চাই।'

ঃ না এ বয়সে এত দীর্ঘসফর আপনার জন্য ঠিক হবে না। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি ফয়সালা করুন কি কারবার শুরু করা আমাদের উচিত।'

খানিকক্ষণ পর মোয়াযযম আলী ও দীলাওয়ার খান ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন। বাড়ির দরজার সামনে এসে শের আলী ও সাবের তাদেরকে বিদায় দিলেন। দীলাওয়ার খান প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক, সুগঠিত দেহ, দীর্ঘাকৃতি জোয়ান এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সে হয়ে উঠেছে মোয়াযযম আলীর বিশ্বস্ত সাথী।

ঘন বনের মধ্যে সূর্যাস্তের বেশ কিছুক্ষণ আগেই সন্ধ্যার আভাস দেখা দিয়েছে। বিষণ্ণ বেদনাতুর পরিবেশে মোয়াযযম আলী ও দীলাওয়ার খান ক্লান্ত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে চলেছেন মামুলি গতিতে। কখনো কখনো শিয়াল, খরগোশ, হরিণ বা নেকড়ে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পায়ে চলা পথের উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অপর দিকে।

একটি ছোট নদী পার হয়ে গিয়ে মোয়াযযম আলী বললেন তার সাথীকে ঃ এখান থেকে আরেকটু সামনে ডান দিকে দেখবে আর একটা পায়ে চলা পথ। সেই পথ ধরেই যেতে হবে আকবর খানদের গাঁয়ে। একটুখানি খেয়াল রেখো, সেই মেঠো পথটি ছেড়ে আগে চলে গেলে সারা রাত ঘুরতে হবে বনের মধ্যে পথ ভুলে।'

দীলাওয়ার খান জওয়াব দিলেন ঃ জনাব এ বনটাকে পথ ভুলে বেড়াবার উপযুক্ত জায়গা মনে হচ্ছে না। এর চাইতে পিছনের বস্তিতে থেকে যাওয়াই ছিলো ভালো।'

মোয়াযযম আলী কোনো কথা না বলে ঘোড়ার গতি দ্রুততর করে দিলেন। প্রায় আধঘন্টা চলার পর ডান দিকে দেখা গেলো একটা পায়ে চলা পথ। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে তিনি বললেন ঃ এবার আমরা পৌঁছে গেছি। এখান থেকে খানিকটা দূরে গেলেই এক টিলা। টিলা পার হয়ে আমরা কিছুদূর যাবো এক ঝিলের কিনার বেয়ে। তারপর আর একটা বড়ো টিলা। সেই টিলা পার হলে আমরা বন ছাড়িয়ে বেরুবো আকবর খানদের গাঁয়ের ক্ষেতে।'

দীলাওয়ার খান নীরবে মোয়াযযম আলীর পিছু পিছু চললো। সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা পথ ধরে চলবার পর একটি ছোট টিলার কাছে পৌঁছেই ঘোড়া সহসা থেমে গিয়ে কান খাড়া করলো এবং সামনে চলতে চাইলো না। মোয়াযযম আলী ও দীলাওয়ার খান পেরেশান হয়ে তাকাতে লাগলেন এদিক-ওদিক। অমনি তাদের কানে এলো এক ছাগলের ডাক। দীলাওয়ার খান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো ঃ ওটা পাল থেকে পিছিয়ে পড়া ছাগলের আওয়াজ, না হলে আমরা এক বস্তির কাছে এসে গেছি।'

ঃ আমি যতোটা জানি, এখান থেকে আশেপাশে কোনো বস্তি নেই, আর এহেন বনের মধ্যে কোনো পাল-ছাড়া ছাগলেরও থাকবার কথা নয়'। বলে মোয়াযযম আলী ঘোড়াকে চাবুক লাগালেন। আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়া কয়েকবার লাফ দিলো, কিন্তু টিলার চূড়া থেকে প্রায় বিশ কদম দূরে গিয়ে আর সামনে না এগিয়ে পিছনের পায়ের

উপর ভর করে দাঁড়ালো। মোয়াযযম আলী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন দীলাওয়ার খানের ঘোড়াও চেষ্টা করছে পিছু হটে যেতে। মোয়াযযম আলী বন্দুক সামলে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং তার দেখাদেখি দীলাওয়ার খানও একই পন্থা অনুসরণ করলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তুমি ঘোড়া সামলাও। ওরা হয়তো কোনো হিংস্র জানোয়ারের গন্ধ পেয়েছে। আমি আগে গিয়ে দেখে আসি।'

দীলাওয়ার খান ঘোড়ার বাগ ধরলো। মোয়াযযম আলী ঘন বনের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকালেন এবং সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগলেন। টিলার সামনেই একটি ছোট ঝিল এবং ঝিলের কিনার দিয়ে পায়ে চলা পথ একটি অর্ধবৃত্ত রচনা করে অদৃশ হয়ে গেছে গাছপালার ভিতরে। ঝিলের কিনারে গাছপালা অপেক্ষাকৃত কম। তখনো ছাগলের ভয়ার্ত চিৎকার যথারীতি শোনা যাচ্ছে। মোয়াযযম আলী পিছনে ফিরে দীলাওয়ার খানকে ইশারা করলেন এবং তারা ভীতিগ্রস্ত ঘোড়া দুটোকে টেনে নিয়ে সে এগুতে লাগলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ যদি আমি ভুল না করে থাকি তাহলে শিগগিরই কোনো শিকারির সাথে আমাদের দেখা হবে। পায়ে চলা পথের ধারেই কোনো গাছের সাথে বাঁধা রয়েছে ছাগল। আশপাশেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ অথবা চিতা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাদের এখান থেকে জলদি বেরিয়ে যাওয়া ভালো। তুমি ঘোড়া দুটো ঝিলের কাছে রেখো আর আমি থাকবো জঙ্গলের দিকে।'

দীলাওয়ার খান ঘোড়ার বাগ টেনে বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম, বাঘকে আমি ডরাই না, কিন্তু ছাগলের প্রত্যেকটি চিৎকারের সাথে আমার এক সের করে রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। যদি ওটা কোনো ভূত-প্রেত না হয়, তবে ওকে দেখামাত্রই আপনি গুলি করে দেবেন।'

টিলা থেকে নিচে নামতেই মোয়াযযম আলী ডানপাশে ঘন ঝাড়ের ভিতরে শুনলেন পাতার হুড়হুড় আওয়াজ। তিনি জমিনের উপর বসে পড়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ গাছের ফাঁকে ঝাড়ের মধ্যে দেখা গেলো এক বাঘ। মোয়াযযম আলী দ্রুত বন্দুক সোজা করলেন। বাঘ তাঁর দিকে তাকালো এক মুহূর্তের জন্য। তারপর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গর্জন করে লাফিয়ে এলো সামনের দিকে। মোয়াযযম আলী গুলি চালিয়ে দিলেন। জখমি জানোয়ারটা কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে পূর্ণ শক্তিতে শেষবারের মতো এক লাফ দিয়ে মোয়াযযম আলীর কাছ থেকে কয়েক কদম দূরে এসে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে গেলো।

মোয়াযযম আলী মুহূর্তকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর থলে থেকে

বারুদ বের করে বন্দুক ভর্তি করে নিতে গিয়ে পিছনে ঝাড়ের মধ্যে আবার শুনতে পেলেন কিসের শব্দ। ফিরে দেখে তিনি একবার হতভম্ব হয়ে গেলেন। পনেরো বিশ গজ দূরে এক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে এক বাঘিনী। চিৎকার করে সে এগিয়ে আসতে লাগলো মোয়াযযম আলীর দিকে। আর তার বন্দুক ভর্তি করারও সময় নেই। বন্দুক ফেলে দিয়ে তলোয়ার খুলে নিয়ে তিনি একদিকে সরে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার পা এক গাছের শিকড়ে লাগলে তিনি পড়ে গেলেন। সাথে সাথেই বনভূমি শব্দিত করে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেলো। এক মুহূর্ত আগে মোয়াযযম আলীর চোখে ভেসে উঠেছিলো মৃত্যুর রূপ। এবার উঠে তিনি দেখতে পেলেন তার চারগজ দূরে সেই হিংস্র বাঘিনী ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। তারপর তার কানে এলো এক মুগ্ধকর আওয়াজ; আপনার চোট লাগেনি তো?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব না দিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন। ডান দিকে এক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এক নওজোয়ান এবং বিজয়দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। তার মুখের উপর এক মনোমুগ্ধকর হাসি এবং তার দুধে আলতায় মেশানো সুন্দর মুখের উপর যেনো ছুটে বেড়াচ্ছে যৌবনের উদ্দাম রক্তধারা।

ঃ ভাইজান!' কাছে এসে বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে উঠলেন নওজোয়ান। বন্দুক ফেলে ছুটে এসে তিনি মোয়াযযম আলীকে চেপে ধরলেন বুকের মধ্যে।

ঃ আকবর! তুমি-তুমি এত জলদি জোয়ান হয়ে গেছো।'

আকবর বললেন ঃ ভাইজান বাঘ মারার পর আপনার এতটা বেপরোয়া হওয়া উচিত হয়নি। বাঘিনী আপনার মাথার উপর এসে পড়েছিলো আর কি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি বন্দুক ভর্তি করছিলাম। আল্লাহ্‌র শোকর তুমি ঠিক সময়ে এসে গেছো। ছাগলের চিৎকার শুনে আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, জঙ্গলে কোনো শিকারী রয়েছেন।'

আকবর খান বললেন ঃ এই জোড়াটি আমাদের অনেকগুলো গরু-মহিষ মেরে ফেলেছে। তাই আমি আজ এক ছাগল বেঁধে রেখেছিলাম। আপনি যখন টিলা থেকে নিচে নামছিলেন, তখন আমি বাঘটাকে দেখলাম আপনার নাগালের মধ্যে যেতে। আমি ভাবলাম হয়তো কোনো মুসাফির পথ ভুলে এসেছে এদিকে। আমি আপনাকে খবরদার করবার জন্য নিচে নেমে এলাম, কিন্তু আপনি গাছের আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর বন্দুকের আওয়াজ শুনে এদিকে এসে দেখতে পেলাম বাঘিনীকে। আমি মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। আপনি কবে রেহাই পেলেন কয়েদখানা থেকে?'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আকবর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা স্বস্তির

সাথে বসে আলাপ করবো?

ঃ চলুন।' আকবর খান বললেন ঃ আপনার সাথীটি কে? আমি তাকে ঝিলের কিনারে দেখেছি আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়ার উপর জোর-জবরদস্তি করতে।

ঃ ও আমার নওকর।'

তারা নিজ নিজ বন্দুক তুলে নিয়ে চললেন। পথে আকবর খানের আরো তিনজন সাথী এসে শামিল হলো তাদের দলে। ঝিলের দিক থেকে দীলাওয়ার খানের ডাক-চিৎকার তখনো শোনা যাচ্ছে। গাছপালা ও ঝড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে তারা দেখতে পেলেন এক মনোরম দৃশ্য। দীলাওয়ার খান কিনার থেকে খানিকটা দূরে পানির মধ্যে ভীত ঘোড়া দুটোর বাগ ধরে তাদেরকে অবিশ্রান্ত গালাগালি দিচ্ছে। একটি গেঁয়ো লোক এক হাতে ছাগলের রশি ধরে কিনারে দাঁড়িয়ে তার কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। একটা ঘোড়া আচানক লাফ দিয়ে দীলাওয়ার খানের হাত থেকে বাগ ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো খানিকটা দূরে। এমনি পেরেশানির মধ্যে গেঁয়ো লোকটার হাসি দীলাওয়ার খানের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো ঃ বাপু তুমি তো এক আজব বেওকুফ! এতে হাসবার কি আছে হে? আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে এ ছাগলটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। বেওকুফ জানোয়ার ওকেও মনে করছে বাঘ।'

গেঁয়ো লোকটি উচ্চহাস্য করে বললো ঃ আরে না। ঘোড়া ছাগলকে বাঘ মনে করেনি বরং তোমায় ভূত মনে করে ভয় পেয়েছে।

নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ও এমনি করে ভূত বলাটা দীলাওয়ার খানের পছন্দ হলো না। সে গেঁয়ো লোকটার কথার জওয়াব দেবার মতো কথা খুঁজছে, এরই মধ্যে তার নজর পড়লো মোয়াযযম আলী ও তার সাথের লোকদের প্রতি। অমনি তার রাগটা যেনো হঠাৎ উবে গেলো। সে মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে বললো ঃ আপনি ভালো আছেন তো?

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি বিলকুল ঠিকই আছি। আমি দুটো বাঘ মেরে এনেছি। এখন আর কোনো বিপদ নেই। তুমি উঠে এসো।'

দীলাওয়ার খান বিরক্তির স্বরে বললো ঃ আপনারা মনে করছেন আমি বাঘের ভয়ে পানিতে নেমেছি। খোদার কসম, এগুলো ঘোড়া নয় গাধা। আবার কখনো এমন হলে আমি এগুলোকে সামলানোর চাইতে বরং বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে যাবো।'

আল্লাহর শোকর, আমি সাঁতার কাটতে জানি, নইলে আমার লাশও পেতেন না।

আকবর খান হাসি চাপতে গিয়ে বললেন ঃ না ভাই! এ দিকে ঝিলে পানি খুব বেশি নয়। সাঁতার না জানলেও তোমার ডুবে মরবার ভয় নেই।'

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ দীলাওয়ার খান! তুমি আর ডাক-চিৎকার না দিয়ে উঠে এসো তো! ঘোড়া আপনি আমাদের কাছে এসে যাবে।'

ঃ না জনাব, ছাগল যতোক্ষণ কিনারে রয়েছে এগুলো ততোক্ষণ উঠবে না।'

ঃ ভাই তুমি তো উঠে এসো।'

দীলাওয়ার খান খানিকটা দ্বিধা করে ঘোড়ার বাগ ছেড়ে দিয়ে উঠে এলো। সে কিনারে ঘোড়া দুটোও পিছু পিছু আসতে লাগলো। দীলাওয়ার খান বললো ঃ আমার মনে হয় এ দুটোকে গুলি করে দেই।'

আকবর খানের ইশারায় দুটি লোক ঘোড়া দুটোকে ধরলো এবং তারা ঝিলের কিনারে পায়ে চলা পথ ধরে চলতে লাগলেন। সন্ধ্যা-গোধূলি রাতের অন্ধকারে রূপান্তরিত হচ্ছে। বনের মধ্যে শোনা যাচ্ছে শিয়াল, নেকড়ে ও অন্যান্য বুনো জানোয়ারের ডাক-চিৎকার।

মোয়ায্যম আলী আকবর খানের অগুণতি প্রশ্নের জওয়াবে বলে যাচ্ছেন তার কয়েদি জীবন ও রেহাইর কাহিনী। তিনি যখন তার কাহিনী শেষ করলেন, তখন আকবর খান বললেন ঃ আপনি লাখনৌ এসেছেন জানলে আমি সাথে সাথেই ওখানে চলে যেতাম।

ঃ লাখনৌয়ে আমি খুব অল্প সময়ই ছিলাম। ওখান থেকে ফয়যাবাদ ও অযোধ্যার কয়েকটি শহর ঘুরে আমি তোমার এখানে এসেছি। আমার মনে হয়েছিলো, তুমি হয়তো মীর্যা সাহেবের কোনো খবর জেনে থাকবে।'

আকবর খান বিষণ্ণ আওয়াজে বললেন ঃ আহা! আমি যদি জানতে পারতাম। মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে আমি লাখনৌয়ে তাদের খোঁজ করেছি। আপনি দিল্লি, আগ্রা ও হায়দারাবাদ যেতে চাইলে আমিও যাবো আপনার সাথে।'

মোয়ায্যম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার ভাইজানের খবর কি?'

ঃ প্রায় তিন মাস হলো, ভাইজান মারা গেছেন। মারাঠারা হামলা করেছিলো আমাদের এলাকার উপর। তখন তিনি লড়াই করে শহীদ হয়েছেন!'

কয়েক মুহূর্ত মোয়ায্যম আলীর মুখ দিয়ে কথা সরলো না। অবশেষে আকবর খানের কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন ঃ আকবর, ওর মৃত্যুতে আমার খুবই আফসোস হচ্ছে।'

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান বাহাদুরের মতোই জান দিয়েছেন। তার শরীরে তিনটি গুলি ও পাঁচটি তলোয়ারের আঘাত ছিলো।'

মোয়ায্যম আলী পাঁচদিন আকবর খানের বাড়িতে থাকলেন। তারপর তিনি যখন আগ্রা ও দিল্লি যাবার ইরাদা জানালেন, তখন আকবর খানও যেতে চাইলেন

তার সাথে। কিন্তু মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আকবর খান! তুমি এখন তোমার এলাকার সরদার। তোমার ঘরে থাকা জরুরি। আমি তোমার মনোভাবের কদর করি, কিন্তু আমার সাথে গিয়ে আমার কোনো সাহায্য করতে পারবে না।'

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান! আমি আপনার জন্যই যেতে চাচ্ছি না। আমার আগ্রা ও দিল্লি দেখবার শখ রয়েছে। হায়দারাবাদও আমি দেখতে চাই। চাচাজান রয়েছেন, তাই এখানে আমি কিছুদিন না থাকলেও খুব অসুবিধা হবে না।'

মোয়াযযম আলী একটুখানি চিন্তা করে বললেন ঃ বহুত আচ্ছা, এই যদি হয় তোমার ইরাদা, তাহলে তৈরি হও। আমরা পরশু ভোরে এখান থেকে রওয়ানা হবো।'

আকবর খান বললেন ঃ আমি বিলকুল তৈরি।'

তৃতীয় দিন রাত্রির শেষ প্রহরে আকবর খান মোয়াযযম আলীকে জাগিয়ে বললেনঃ ভাইজান উঠুন। ভোর হয়ে এলো।'

মোয়াযযম আলী তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেউড়ির সামনে দেখলেন এক কাতার ঘোড়া দাঁড়ানো। আকবর খানের চাচা কয়েকজন সশস্ত্র নওজোয়ানের সাথে আলাপ করছেন। মোয়াযযম আলী আকবর খানকে প্রশ্ন করলেন ঃ এরা সবাই আমাদের সাথে যাবে?'

ঃ চাচাজান বিশজন লোক পাঠাবার ইচ্ছা করেছিলেন। আমি বহু কষ্টে তাকে আটজন লোক দিতে রাজি করেছি।'

আকবর খানের চাচা তার দিকে ফিরে বললেন ঃ আমি এখনো বলছি, তোমাদের আরো বেশি লোক নেওয়া উচিত।'

আকবর খান বললেন ঃ চাচাজান! আমি যাচ্ছি দিল্লি দেখতে। দিল্লি লুট করতে তো যাচ্ছি না।'

ঃ বাছা! দিল্লি লুট করতে হলে এখান থেকে তোমার নেবার প্রয়োজন নেই। আজকালকার দিনের অবস্থা হচ্ছে ; যদি তুমি লালকেল্লার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করো যে, তুমি দিল্লি লুট করতে এসেছো, তাহলে সেখানে তুমি পাবে হাজার হাজার মদদগার। রাস্তায় তোমাদের হেফাজতের জন্য হবে লোকের প্রয়োজন।'

তারপর তিনি মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ আপনি আকবর খানের খেয়াল রাখবেন। যে আটজন লোক আমি আপনাদের সাথে দিচ্ছি, তারা আমাদের গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ নিশানাবাজ। বিপদকালে আপনি এদের উপর ভরসা করতে পারবেন।'

খানিকক্ষণ পর এগারো জন লোকের একটি কাফেলা বেরিয়ে গেলো গাঁয়ের বাইরে।

এগারো

দিল্লি পর্যন্ত সফরের পথে মোয়ায্যম আলীর কল্পনা কেন্দ্রীভূত রয়েছে ফরহাতের উপর। পথের আলোয় ঝলমল শহরগুলো থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসে তিনি দীলকে আশ্বাস দেন, হয়তো ফরহাত আগের কোনো বস্তিতে তারই জন্য ইন্তেজার করছে। তারপর বস্তির লোকদের সাথে আলাপ করে হতাশ হয়ে ফরহাতকে খুঁজে ফেরেন বন ও মরুভূমিতে। কখনো কোনো কাফেলার সাথে দেখা হলে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনারা কোথায় যাবেন? মুর্শিদাবাদের কোনো লোক নেই তো আপনাদের সাথে?' পথচারীরা তার কথা শুনে হেসে চলে যেতো। আকবর খানকে তিনি বলেন ঃ আকবর, আমি হয়তো দিওয়ানা হয়ে গেছি। আমি জানতাম কাফেলায় ওরা নেই। তবু আমি জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারিনি। আমি জানি, দিল্লি গিয়েও আমায় হতাশ হয়েই ফিরতে হবে, তবু আমি এমনি করে আত্মপ্রতারণায় ডুবে থাকতে চাই। এই মিথ্যা আশাই এখন আমার জিন্দেগির শেষ অবলম্বন। আফসোস, আমি তোমাদেরকেও খামাখা আমার সাথে টেনে এনে পেরেশান করছি।'

আকবর খান তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন ঃ ভাইজান, আল্লাহর রহমতে আপনি হতাশ হবেন না।'

এক সন্ধ্যায় তারা দিল্লি থেকে দুই মনজিল দূরে এক ছোট বস্তিতে প্রবেশ করলেন। এক শরীফ রাজপুত সেনাপতির চৌধুরী। তিনি তাদেরকে রাখলেন নিজের কাছে। মোয়ায্যম আলী তাকে বললেন যে, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের সন্ধানে তিনি চলেছেন দিল্লির পথে। বৃদ্ধ রাজপুত বললেন ঃ বাছা! আমার ভয় হয়, যদি আপনারা দিল্লির শান-শওকতে গিয়ে দিল্লিতে পৌছেন, তাহলে আপনাদের অবশিষ্ট প্রিয়জনকে আজীবন আপনাদের সন্ধান করতে হবে। দিল্লিতে এখন চলেছে মারাঠা রাজ। সেখানে আপনাদের জন্য সবচাইতে বিপজ্জনক হবে আপনাদের লেবাস, ঘোড়া আর হাতিয়ার। তারপর যদি আপনারা মারাঠার নজর এড়িয়ে শহরে ঢুকতে পারেন, তাহলেও এতগুলো লোক ওখানে আপনার যথেষ্ট শিরঃপীড়ার কারণ হবে। দিল্লিতে কোনো বিপদ হলে আট দশজন লোক আপনার কোনো সাহায্য করতে পারবে না। আপনি শহরে ঢুকলে কেউ যদি আপনাকে খুব বড়ো আমীর বলে সন্দেহ না করে, তবেই আপনার মঙ্গল।'

মোয়ায্যম আলী জওয়াব দিলেন ঃ দিল্লির অবস্থা আমি পথে শুনেছি। এতগুলো

লোক সাথে নিয়ে যাওয়া আমিও ভালো মনে করছি না। আমার ইরাদা, সামনের মনজিল থেকে ওদেরকে আমি ফিরিয়ে দেবো, অথবা কোনো বস্তিতে রেখে যাবো আপনি ওদেরকে এখানে রাখলে খুবই মেহেরবানী হবে।'

মেজবান জওয়াব দিলেন ঃ আপনার সাথীদের আমার এখানে থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না।' আপনার ঘোড়াটাও এখানে রেখে গেলেই ভালো হবে। কাল আমাদের গাঁ থেকে কতকলোক দিল্লিতে যাবে আনাজ-তরকারি নিয়ে। আপনি যদি গেঁয়ো পোশাক পছন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি তাদের সাথে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার নাঙ্গা পায়ে চলতেও কোনো আপত্তি নেই। আমি কেবল একজন লোক সাথে নিয়ে যাবো। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমার বাকি সাথীরা থাকবে এখানেই।' তারপর আকবর খানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আকবর খান! তুমি যদি ফিরে না যেতে চাও তাহলে কয়েকদিন এখানে থাকতে হবে তোমার। আমি যাবো শুধু দীলাওয়ার খানকে সাথে নিয়ে।'

আকবর খান জিদ করে বললেন ঃ না ভাইজান, আমি অবিশ্যি যাবো আপনার সাথে। দীলাওয়ার খানকে আমার নওকরদের সাথে রেখে যান।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ না আকবর, তোমার এখানে থাকা জরুরি।

মেজবানের সামনে আকবর খান মোয়াযযম আলীর সাথে তর্ক করাটা পছন্দ করলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন তারা একটি ছোট হাবেলীর আঙিনায় শুয়েছিলেন তখন আকবর খান আওয়াজ দিলেন ঃ ভাইজান!'

ঃ কি ব্যাপার আকবর?' তোমার ঘুম আসছে না? চারপায়ীর উপর পাশ ফিরতে ফিরতে মোয়াযযম আলী বললেন।

ঃ না ভাইজান আমি চিন্তা করছি, কেন আপনি আমায় নেবেন না আপনার সাথে।'

ঃ আকবর, দিল্লির পরিস্থিতি ভালো হলে আমি অবশ্যি তোমায় সাথে নিতাম।'

ঃ দিল্লির অবস্থা তো কখখনো ভালো নয়। আপনি যদি সেখানে যেতে কোনো বিপদের আশঙ্কা করেন, তাহলে আমি কি করে আপনার সাথে না গিয়ে পারি?'

মোয়াযযম আলী উঠে বসতে বসতে বললেন ঃ আকবর, তোমায় এখানে রেখে যাবার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। শোনো, আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে, যা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। এ জিনিস আমি শুধু তোমার কাছে রেখে যেতে পারি। আমার বিশ্বাস তুমিই পারবে এর হেফাজত করতে।'

আকবর খান জলদি উঠে বসে কৌতূহলের স্বরে বললেন ঃ কি জিনিস, ভাইজান?'

ঃ এখখুনি বলছি।' মোয়াযযম আলী তার কামিজের নিচে কোমরে বাঁধা থলেটি খুলে আকবর খানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ এই নেও।'

আকবর খান চারপায়ীর উপর বসেই হাত বাড়িয়ে থলেটি ধরে প্রশ্ন করলেন ঃ কি আছে এতে?'

ঃ হীরা! মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ থলেটি তোমার কোমরে বেঁধে রেখো। কাউকেও বলো না যেনো।'

আকবর খান বললেন ঃ যদি এ সত্যি সত্যি হীরাই হয়, তাহলে বিশ্বাস করুন আপনি ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এক মুহূর্তের জন্য ঘুমোতে পারবো না।'

আকবর, এ তোমরা ঘুমের চাইতে বেশি দামী নয়। এখন আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ো। আর দেখো, দিল্লিতে যদি আমার বেশি দেরি হয়, আমি দীলাওয়ার খানকে ফেরত পাঠিয়ে দেবো। তারপর তোমার এখানে না থেকে ঘরে ফিরে যাওয়াই হবে ভালো। আমি জিন্দাহ থাকলে তোমার ওখানে পৌঁছে যাবো।'

৫

তৃতীয় দিন মোয়াযযম আলী ও দীলাওয়ার খান গাড়োয়ানের লেবাসে গিয়ে পৌছলেন দিল্লিতে। শহরের উপকণ্ঠে মারাঠা সিপাহী বাইরে থেকে আসা প্রত্যেক সাদা পোশাকপরা লোকের তালাশি নিচ্ছে। তাদের যার কাছে যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে তাই তারা কেড়ে নিয়ে জমা দিচ্ছে মারাঠা সরকারে। কখনো কখনো শহরে প্রবেশ করতে গিয়ে কোনো কোনো লোককে তাদের ভালো কাপড়-চোপড়ের বদলে কোনো মারাঠা সিপাহীর জীর্ণ পোশাক পরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু শহরে যারা খাদ্যবস্তু সবজি ও জ্বালানি এনে পৌছায়, তাদের প্রবেশের পথে কোনো বাধা নেই। মোয়াযযম আলী গিয়ে থামলেন জামে মসজিদের কাছে এক সরাইখানায়। কিছুক্ষণ পরেই বাজারে, গলিতে ও খানকায় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন ফরহাত ও তার মাকে। সরাইর মালিকের সাহায্যে তিনি কয়েকজন ঘোষণাকারী সংগ্রহ করে তাদেরকে লাগালেন মুর্শিদাবাদের মীর্যা হোসেন বেগের পরিবার-পরিজনের সন্ধানে।

দিল্লিতে থাকার সময়ে মুসলমানদের শোচনীয় ধ্বংসমুখী অবস্থা দেখে মোয়াযযম আলী অন্তরে অনুভব করলেন সীমাহীন মর্মপীড়া। নামেমাত্র শাহান শাহর হুকুমাতে লালকেল্লার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উমরাহ পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। লালকেল্লার বাইরে ডাকাত দস্যুদের বিচরণভূমি। বাজারের গলিতে ছুটে বেড়াচ্ছে মারাঠা সিপাহীদের ঘোড়া। শাহানশাহর যাবতীয় হুকুম মারাঠা সরদারের ইচ্ছা অনুযায়ী জাশরখী হচ্ছে। দিল্লির আগে মারাঠা জুলুমের সয়লাব এগিয়ে চলেছে লাহোর, মুলতান ও সিরহিন্দের দিকে। মোটকথা উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্তান পরিণত হয়েছে নেকড়ে-স্বভাব মানুষদের বিস্তীর্ণ শিকারভূমিতে। শাহানশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর যে প্রতিরক্ষা দুর্গ তৈরি করে গিয়েছিলেন তা এক একটি করে ভেঙে পড়ছে। দুরদারাজ শহর ও বস্তির লোকেরা শাহানশাহ, উজির ও উমরাহের কাছে আসে তাদের ফরিয়াদ নিয়ে কিন্তু দিল্লিতে পৌছে তারা জানতে পারে যে, লালকেল্লার বাসিন্দারা তাদের চাইতেও দুর্বল, অসহায় ও মজলুম। নির্যাতিত মানবতা প্রতীক্ষা করে তাদের নাজাতদাতার। মানবতা ও শরাফতের কোনো স্থান নেই সারা দেশে। মজলুম অসহায়-সম্বলহীন মুসলমান গোপনে গোপনে মসজিদ ও বোযর্গানে দ্বীনের খানকায় গিয়ে করে দোআ। ওলামায়ে দ্বীন আহমদ শাহ আবদালীর কাছে পয়গাম পাঠান ঃ মারাঠা জুলুম আজ চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে। এখন আপনিই হচ্ছেন এ

দেশের মজলুম মুসলমানের শেষ ভরসাস্থল।'

মোয়াযযম আলী আট দিন দিল্লিতে কর্মব্যস্ত থাকলেন। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের কতক লোকের সাথে তার দেখা হয়েছে। তারা হোসেন বেগের সাথে হিজরত করে এসেছে। তিনি পীড়িত হয়ে পথে এক বস্তিতে থেকে গিয়েছিলেন, এর বেশি কিছু বলতে পারে না।

সারাদিনের অনুসন্ধানের পর মোয়াযযম আলী সরাইখানা পৌঁছলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখলেন দীলাওয়ার খানের কাছে উপবিষ্ট। দীলাওয়ার খান উঠে এসে বললো ঃ জনাব উনি মীর্যা হোসেন বেগের আত্মীয়। মোয়াযযম আলীর বুক ধরফর করে উঠলো।

বৃদ্ধ বললেন ঃ মীর্যা হোসেন বেগ আমার দূর সম্পর্কে আত্মীয়। আজ আমি জামে মসজিদে ঘোষণা শুনলাম আপনি তাদেরকে তালাশ করছেন।'

মোয়াযযম আলীর মন বসে গেলো। তিনি বললেন ঃ মীর্যা সাহেব মারা গেছেন। আমি তার স্ত্রী কন্যার সন্ধান করছি। আপনি তাদের সম্পর্কে কিছু জানেন কি?'

বৃদ্ধ জওয়াব দিলেন ঃ আমি কিছু জানি না। আমি আপনার নওকরের কাছে শুনলাম তার ঘরবাড়ি ধ্বংসের কাহিনী। তবে পরিবারকে যখন লাখনৌয়ে পাননি, তখন হায়দারাবাদে যাওয়াই আপনার উচিত।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ মীর্যা সাহেবের মামাতো ভাই লাখনৌ থেকে হিজরত করে চলে গেছেন হায়দারাবাদে। সম্ভবত মীর্যা সাহেবের বিবি ও সাহেবজাদি লাখনৌয়ে তার সন্ধান করে চলে গেছেন হায়দারাবাদে। কিন্তু আমি শুনেছি, দিল্লিতেও নাকি মীর্যা সাহেবের কোনো আত্মীয় আছেন। আপনি এমন কোনো নিকট আত্মীয়কে জানেন যাদের কাছে ওরা এসে থাকতে পারেন?'

বৃদ্ধ জওয়াব দিলেন ঃ এখানে মীর্যা সাহেবের দুই খালাতো ভাই ছিলেন। বড়ো আবদুল জব্বার আর ছোটটির নাম আবদুল করিম। আবদুল জব্বার চার বছর আগে মারা গেছেন এবং আবদুল করিম তাদের খান্দানের বাকি লোকদের নিয়ে হিজরত করে গেছেন দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্যের কোথায় তারা থাকতেন তা আমার জানা নেই। অবশ্যি হায়দারাবাদে আপনি তাদের সন্ধান পাবেন। এখন আমার ইচ্ছা আপনি যতোদিন এখানে আছেন এ সরাইখানার বদলে আমার ওখানেই থাকবেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি আপনার শোকরগুজারী করছি। কিন্তু এখন আমার এখানে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইনশাআলাহ, আমরা কালই এখান থেকে রওয়ানা হবো।'

পরদিন ভোরে মোয়াযযম আলী দিল্লি থেকে রওয়ানা হবার সময়ে লালকেল্লার

দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং আসমানের দিকে মুখ তুলে দোআ করলেন ঃ মাওলায়ে করীম! আমার অসহায় কওম তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। যাদের দুষ্কৃতির জন্য আমাদের ইজ্জত ও আজাদি ঝাণ্ডা একে একে ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে, তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আমাদেরকে দিও না। লালকেল্লার প্রাচীররাজি আজ প্রতীক্ষা করছে এমন কোনো মহৎ মানুষের, যিনি আমাদের ইজ্জত ও সৌভাগ্যের দুশমনদের সাথে লড়াই করবার হিম্মতের অধিকারী। এ হতাশা ও অসহায়তা আমাদের উত্তরাধিকার এবং আজ আমাদের এমন এক পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি লড়তে পারবেন আজকের দিনের এ ঝড়-তুফানের সাথে। আমরা অন্ধকার রাতের মুসাফির এবং আমাদের প্রয়োজন এক আলোর মিনার।'

দুদিন পায়দল সফর করার পর মোয়াযযম আলী আবার গিয়ে মিলিত হলেন তার সাথীদের সাথে। চতুর্থ দিন তারা রওয়ানা হলেন দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদের পথে। ছয় মনজিল অতিক্রম করে যাবার পর তাদের দলে শামিল হলো আরো ছয়জন সওয়ার। তারা বললো যে, তারা দিল্লি ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছে নিজামের ফউজের চাকরি পাবার আশায়। পথের বস্তিগুলোয় মোয়াযযম আলী খবর পেলেন যে, প্রায় আড়াইশ মুসাফিরের একটি কাফেলা এক হফতা আগে এই পথ ধরে চলে গেছে। মোয়াযযম আলীর নতুন সাথীরা পথ চলতে চলতে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে তার সাথে। আকবর খান তাদের মনে খানিকটা ভয় জন্মিয়ে দেবার জন্যই বলে দিয়েছেন যে, মোয়াযযম আলী এর আগে ছিলেন বাংলার ফউজের এক বড়ো অফিসার।

কয়েকদিন সফরের পর মোয়াযযম আলী আর তার সাথীরা খানিকটা বিশ্রাম নেবার জন্য থেমে গেলেন এক পাহাড়ি নদীর কিনারে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘন গাছের ছায়ায় আরাম করে তারা আবার পথ চলা শুরু করতে যাচ্ছেন, অমনি সামনের পাহাড়ের পিছন দিক থেকে শোনা গেলো বন্দুকের আওয়াজ। তারা জলদি করে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে গেলেন। পাহাড়-চূড়া থেকে খানিকটা এদিকে থাকতে মোয়াযযম আলী হাতের ইশারায় থামতে বললেন সাথীদের এবং নিজে ঘোড়া থেকে নেমে ঝোপ ও গাছের আড়াল দিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। বন্দুকের আওয়াজ ছাড়া নারী ও শিশুদের চিৎকারধ্বনিও আসতে লাগলো তার কানে। চূড়ায় উঠে তিনি দেখতে পেলেন এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমি। উপত্যকার ডান দিকে এক পাহাড়ের প্রান্তদেশে প্রায় আড়াইশ লোকের এক কাফেলা মারাঠাদের বেষ্টনীর ভিতরে পড়ে

গেছে। কাফেলার মুহাফিজ ও হামলাদাররা একে অপরের দিকে গুলি ছুঁড়ছে গাছের আড়াল থেকে। মোয়াযযম আলী জমিনের উপর শুয়ে পড়ে পরিস্থিতি যাচাই করে নিলেন। হামলাদারদের সংখ্যা শখানেকের বেশি হবে না। কিন্তু কাফেলায় লড়াই করার লোক বেশি নেই। মোয়াযযম আলী ফিরে সাথীদের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন ঃ এই পাহাড়ের নিচের উপত্যকায় এক কাফেলা দুশমনের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে দুজন ঘোড়া নিয়ে থাক। আকবর খান, তুমি আটজনকে নিয়ে পাহাড় চূড়া থেকে খানিকটা নিচে পাথর ও ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাক। বাকি সাতজন আমরা ডান দিকে আর একটা পাহাড়ে পৌছবার চেষ্টা করছি। উপর থেকে আমাদের গুলি যথেষ্ট পেরেশানির কারণ হবে হামলাদারদের কাছে। আমার বিশ্বাস মারাঠারা ভয় পেয়েই পালিয়ে যাবে, কিন্তু তারা যাতে এ পাহাড়ের দিকে না আসতে পারে, সেদিকে নজর রাখবে তোমরা। তোমাদের গুলিতে পেরেশান হয়ে যদি ওরা উপত্যকার বাম দিকে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝবে আমরা যুদ্ধে জিতে গেছি। আমরা যে সংখ্যায় এত কম, তা যদি ওদেরকে তোমরা বুঝতে না দাও তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা পিছিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমার ইচ্ছা।'

এক ঘণ্টার ভেতরে কাফেলার সাতজন লোক হালাক ও এগারো জন জখমি হয়ে গোলো। মারাঠারা তখন তাদের উপর চূড়ান্ত হামলা করবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আচানক তাদের পিছন দিকে পাহাড় চূড়া থেকে ক্রমাগত গুলিবর্ষণ হতে লাগলো এবং সাতজন গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো। মারাঠারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে লাগলো। তারপর অপরদিকে পাহাড় থেকে আকবর খান ও তার সাথীরা গুলি চালালেন এবং আরো ছয়জন লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। মারাঠারা দুদিকের পাহাড়েই বিপজ্জনক মনে করে একত্র হতে লাগলো উপত্যকার মাঝখানে। কাফেলার মুহাফিজ হয়রান হয়ে তাকাতে লাগলো ডানে-বায়ে পাহাড়ের দিকে। মোয়াযযম আলী ছুটে নিচে নেমে বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন। ঃ কি দেখছো তোমরা? এ-ই তো হামলার সময়। দুশমন পিছু হটে যাচ্ছে। কাফেলার মুহাফিজরা তকবীরধ্বনি করে এবার দুশমনের উপর উপর্যুপরি গুলি চালাতে লাগলো। তারপর কতকলোক বন্দুক ফেলে তলোয়ার নিয়ে পিছু ধাওয়া করলো তাদের। কয়েক মিনিটের মধ্যে ময়দান খালি হয়ে গেলো। মারাঠারা পাহাড়ের অদূরে ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আকবর খান সাথীদের ঘোড়া নিয়ে আসার হুকুম দিয়ে ছুটে এলেন মোয়াযযম আলীর কাছে। কাফেলার মুহাফিজরা এবার তাদের পাশে জমা হতে লাগলো। মোয়াযযম আলী কিছুক্ষণ তাদের সাথে আলাপ করে গেলেন কাফেলার তাঁবুর দিকে।

কয়েক কদম দূরে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন দুধে-আলতায় মিশ্রিত

রঙের এক আধাবয়সী ভদ্রলোক। তিনি মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ একটু সময় আগে আজি ভাবছিলাম আল্লাহ যদি আমাদেরকে এ জালেমদের হাত থেকে বাঁচাতে চান তাহলে তিনি আমাদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠাতে পারেন। আপনি ফেরেশতা না হলে আমি আপনার সাথে পরিচিত হতে চাই। আমার নাম ফখরুদ্দীন। এই কাফেলার সাথে আমি যাচ্ছি হায়দারাবাদ।'

মোয়াযযম আলী তার সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ আমার নাম মোয়াযযম আলী আর ইনি আমার দোস্ত আকবর খান। আমাদেরও মনজিল হায়দারাবাদ। আমাদের আফসোস আমরা সময়মতো এসে পৌছতে পারিনি, নইলে এতগুলো জান বিনষ্ট হতো না।'

ফখরুদ্দীন সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা শহীদানের কবর খুঁড়বার ও জখমিদের এক জায়গায় জমা করার ইন্তেজাম করো। তারপর তিনি মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ আপনার বাকি লোক কোথায়?'

ঃ তারা পাহাড়ের পিছন থেকে ঘোড়াগুলো আনতে গেছে।

কাফেলার নারী ও শিশুরা গা ঢাকা দিয়েছিলো ঘন গাছপালা ও ঝোপের আড়ালে। দুটি বালিকা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এলো ফখরুদ্দীনের দিকে। বড়োটির হাতে বন্দুক। ফখরুদ্দীনের কাছে দুটি অচেনা লোক দেখে সে কয়েক কদম দূরে থেমে গেলো। অপর বালিকাটির বয়স বারো বছরের কাছাকাছি। সে ছুটে এসে ফখরুদ্দীনের গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মোয়াযযম আলী বড়ো মেয়েটির দিকে তাকালে সে সংকুচিত হয়ে মুখের নেকাব ঠিক করে দিতে লাগলো। মোয়াযযম আলী দ্বিতীয়বার তার দিকে নজর ফিরাতে পারলেন না, তথাপি কয়েক মুহূর্ত তার মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো একটি সুন্দর মুগ্ধকর চিত্র।

ফখরুদ্দীন ছোট মেয়েটিকে বললেন ঃ বিলকিস! বেটি! তোমার মায়ের কাছে গিয়ে বসো। আতিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বলো, আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। খোদা আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন তার ফেরেশতা।'

ঃ ফেরেশতা? বিলকিস হয়রান হয়ে বললো ঃ ফেরেশতা কোথায়?'

ফখরুদ্দীন মৃদু হেসে মোয়াযযম আলী ও আকবর খানের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ফেরেশতা নয় তো কি?'

বিলকিস হয়রানি ও কৃতজ্ঞতার মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে তাদের দিকে তাকালো। তার দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে থাকলো আকবর খানের মুখের উপর। আকবর খান যেনো তার

চোখে এক সত্যিকার ফেরেশতা।' সে তার বোনের দিকে ছুটে গেলে ফখরদ্দিন, মোয়াযযম আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমার ভাগ্নী এরা। এদের বাপ মারা গেছেন। তাই আমি এদেরকে দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছি। আজকালকার দিনে দিল্লিতে প্রবেশ করা মামুলি ব্যাপার নয়। ভাগ্যক্রমে পুনার এক হিন্দু ব্যবসায়ীর সাথে রয়েছে আমার কারবারী সম্পর্ক এবং তিনি মারাঠা হুকুমাতের কাছ থেকে এক ছাড়পত্র নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার কাছে। আরো সৌভাগ্যের কথা, পথে আমি এই কাফেলা পেয়ে গেলাম। এরা উত্তরের শহরগুলো থেকে হায়দারাবাদে যাচ্ছে রুজির সন্ধানে। জখমিদের দেখে আসি।'

মোয়াযযম আলী সন্ধ্যার মধ্যে আর এক মনজিল অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাফেলার হেফাজতের ধারণায় তিনি তার ইরাদা পরিত্যাগ করলেন।

৪

রাত ছিলো ঠান্ডা। এশার নামাজের পর কাফেলার তাঁবুর কোথাও জ্বলছে আগুনের কুণ্ড। পুরুষ, নারী ও শিশু ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জমা হয়েছে আগুনের পাশে। কয়েকজন লোক হাতিয়ার নিয়ে তাঁবুর আশেপাশে পাহারা দিচ্ছে। আতিয়া, বিলকিস ও তাদের মা বসে রয়েছেন একটি ছোট খিমায়। খিমা থেকে কয়েক কদম দূরে ফখরদ্দিন, মোয়াযযম আলী, আকবর খান ও আরো কয়েকজন লোক বসে আগুনের তাপ উপভোগ করছে।'

একজন বলে উঠলেন ঃ যেসব এতিম ও বিধবার মুরুব্বীরা লড়াই করে মারা গেছেন, তাদের কি ব্যবস্থা করা যাবে? তাদের বোঝা আমাদের সবাইকে নিতে হবে।'

ফখরদ্দিন বললেন ঃ তাদের বোঝা আপনাদের কাউকেও নিতে হবে না। হায়দারাবাদে তাদের দেখাশোনার জিম্মা থাকবে আমার উপর।'

ফখরদ্দিনের সাথে আলাপ করে মোয়াযযম আলী জানলেন যে, তিনি ইরানী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক প্রতিপত্তিশালী পরিবারের লোক। কয়েক বছর আগে তিনি দিল্লি থেকে হিজরত করে হয়েছেন হায়দারাবাদের বাসিন্দা। তার ব্যবসায়-কারবার দাক্ষিণাত্য থেকে মহীশূর ও কর্ণাটক পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

ফখরদ্দিনের প্রশ্নের জওয়াবে মোয়াযযম আলী সংক্ষেপে তার কাহিনী বললে তার কথা ফখরদ্দিনের মর্মস্পর্শ করলো। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ আপনি পেরেশান হবেন না। আপনার প্রিয়জন হায়দারাবাদে থাকলে আমি ওখানে গিয়েই তাদের সন্ধান করতে পারবো। হায়দারাবাদে আপনি থাকবেন আমার মেহমান।

খানিকক্ষণ পর কয়েকজন লোক উঠে তাদের সাথীদের কাছে চলে গেলেন, আর বাকি লোকেরা সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন আগুনের কুণ্ডের কাছে। ফখরুদ্দিন বহুক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন মোয়াযযম আলীর সাথে। প্রথমে আলোচনা চললো বাংলার অবস্থা নিয়ে এবং মোয়াযযম আলী মীর জাফরের কাষ্ঠপুত্তলি হুকুমাত সম্পর্কে বর্ণনা করলেন নিজের মনোভাব। তারপর উঠলো অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড ও দিল্লির কথা। অবশেষে দাক্ষিণাত্যের কথা উঠলে ফখরুদ্দিন বললেন ঃ উত্তর ও পূর্ব থেকে হিজরত করে আসছে যেসব মুসলমান, তাদের শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে দাক্ষিণাত্য। দিল্লির অতীত দিনের শান-শওকত আপনি দেখতে পাবেন হায়দারাবাদে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ভবিষৎ সম্পর্কে আমি আশান্বিত নই। কর্ণাটকের মতো ইংরেজ ফরাসীদের প্রতিপত্তি এখন দাক্ষিণাত্যের দরবারে পৌঁছে গেছে। অপর দিকে মারাঠা শক্তি অতি দ্রুত সংহত হচ্ছে এবং তারা শুধু দাক্ষিণাত্যের উপর নয়, বরং সারা হিন্দুস্থানের উপরে তাদের আধিপত্য কায়েম করবার চেষ্টা করছে। বাইরের বিপদের মোকাবিলা করবার মতো সামর্থ্যের অভাব নেই দাক্ষিণাত্যের, কিন্তু নিজামুল মুলক আসফ জাহের ওফতের পর তার পুত্রদের গৃহযুদ্ধ মুসলমানদের এই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা দুর্গের বুনিয়াদ অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে। এখন কে বলবে, এই ষড়যন্ত্র ও আত্মকলহের পরিণাম কি হবে? কিন্তু আমি যে ব্যক্তির সাফল্যের ভয় করছি, তিনি হচ্ছেন মীর নিজাম আলী। তিনি নিজের ভাইকে অপরের সাথে লড়াই করতে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমার আশঙ্কা হয়, যেদিন দাক্ষিণাত্যের হুকুমাত তার হাতে চলে যাবে, সেদিন তিনি বাংলার মীর জাফর ও কর্ণাটকের মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহর চাইতেও বিপজ্জনক প্রমাণিত হবেন। তিনি ইংরেজদের দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়েছেন, কিন্তু এসব অবস্থা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের ভবিষৎ সম্পর্কে খুব বেশি হতাশ হইনি। আমাদের পাশেই উত্থান হচ্ছে এক নতুন শক্তির। যদি আমার অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত না হয়, তাহলে খুব শিগগিরই শিয়াল ও নেকড়ের এ শিকারভূমিতে শোনা যাবে এক ব্যাঘ্রের গর্জন। এমন একটি মানুষকে আমি দেখছি, যিনি একাধারে এক জাগ্রত চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক ও মহাশক্তিমান সিপাহী।'

আকবর খান মোয়াযযম আলীর পাশে তন্দ্রার নেশায় ঢুলছিলেন। আচানক বলে উঠলেন ঃ জী, তিনি কে?

ঃ আপনি তাকে জানেন না। কিন্তু কয়েক বছর তিনি যদি জিন্দাহ থাকেন এবং আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, তাহলে তিনি হবেন দক্ষিণ ভারতের মুসলমানের শেষ

মুহাফিজ। তার নাম হায়দার আলী এবং তিনি বর্তমানে মহীশূরের ফউজে একজন অফিসার, কিন্তু সেদিন সুদূর নয়, যেদিন ইংরেজ ও মারাঠা তাকে তাদের এক শক্তিশালী ও বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে বাধ্য হবে। আপনি যখন আমায় বাংলায় আপনার সিপাহী-জীবনের কাহিনী শুনাচ্ছিলেন তখন আমি অনুভব করছিলাম যে, কোনো এক দিন আপনার আখেরি মনজিল হবে মহীশূর । দুবার আমার সাথে তার দেখা হয়েছে এবং বিশ্বাস করুন, আমার জীবনে আমি কোনো ব্যক্তিত্ব দ্বারা এতখানি প্রভাবিত হইনি। যেসব ভাগ্যান্বেষী তাদের রাজনৈতিক ভবিষৎ ইংরেজের সাথে জড়িত করে নিয়েছে, আপনার মতো তিনিও তাদেরকে মনে করেন মুলুকের নিকৃষ্টতম দুশমন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ যদি তার উদ্দেশ্য হয় মহৎ, তাহলে আল্লাহর দরবারে আমাদের দোয়া করা উচিত, যারা তাদের কল্যাণকামী মানুষের মাথা কেটে নিয়ে দুশমনের সামনে পেশ করতে তৈরি, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে খোদা যেনো তাকে হেফাজত করেন।'

পাশের খিমায় আতিয়া, বিলকিস ও তাদের মা আলোচনা করছেন সারা দিনের ঘটনা নিয়ে। আতিয়া বললো ঃ মামুজান, সারা রাত বাইরে বসে থাকবেন?'

ঃ তিনি আসবেন, বেটি! তুমি এখন ঘুমাও।'

বিলকিস আতিয়ার কাছে সরে এসে কানে কানে বললো ঃ আপাজান, আপনি ফেরেশতা দেখেছেন?'

ঃ না। কিন্তু এ সময়ে বসে বসে তোমার ফেরেশতার কথা মনে উঠলো কেন?'

ঃ কেন? আজ যে, আমি ফেরেশতা দেখেছিদুই ফেরেশতা একজন বড়ো আর একজন ছোট। এখন ওরা মামুজানের সাথে কথা বলছেন। দেখুন না ওদিকে।' বলে বিলকিস খিমার দরজার পর্দা তুললো।

মা বললেন ঃ পাগলী! এখন আরাম করে ঘুমাও গে। ওরা আমাদের জান বাঁচিয়েছেন আর তোমরা ওদের নিয়ে ঠাট্টা করছো!'

ঃ আমি ঠাট্টা করছি না আম্মাজান! মামুজান বলছিলেন, ওরা ফেরেশতা'

ঃ তিনি ঠিকই বলেছেন। ওরা যদি আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা হয়ে না আসতেন, তাহলে আমাদের লাশ সরাবার লোকও থাকতো না।'

পরদিন ভোরে কাফেলা আবার শুরু করল পথ চলা। প্রায় চার ক্রোশ পথ চলবার পর কাফেলা গিয়ে ঢুকলো এক বস্তিতে। কয়েকজন জখমি লোকের ঘোড়ায় চড়ে চলবার সামর্থ ছিল না। ফখরুদ্দিনের অনুরোধে গাঁয়ের জমিদার উপযুক্ত ভাড়ায় সাতটি গরুর গাড়ি ঠিক করে দিলেন। জখমি লোক ছাড়া কাফেলার কতক নারী ও শিশু ঘোড়ার উপর দীর্ঘ সফরে বিরক্ত হয়ে সওয়ার হলো গরুর গাড়িতে। এক গাড়িতে ফখরুদ্দিনের বোন ভাগ্নিরা বসে গেলেন।

গাঁয়ের লোকদের কাছে অনুসন্ধান করে মোয়াযযম আলী জানলেন যে, মারাঠা ডাকাত দলের এ এলাকার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তারা বাইরে থেকে এসে দু'দিন আগে লুট করে গেছে এ গাঁয়ের দশ ক্রোশ উত্তরে একটি ছোট শহরে।

পরের মনজিলে একজন জখমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। দু'দিন পরে মারা গেলো আর একজন।

হায়দারাবাদ পৌঁছতে পৌঁছতে কাফেলার বাচ্চা বুড়ো সবারই দৃষ্টিতে মোয়াযযম আলী হয়ে উঠলেন নায়ক। সশস্ত্র লোকেরা তাকে মনে করতো তাদের কমাণ্ডার। বুড়ো-বুড়িদের কাছে তিনি হলেন এক ভাগ্যবান বেটা আর নওজোয়ান ও ছোট্ট বাচ্চাদের কাছে এক স্নেহপ্রবণ ভাই। বিলকিস কখনো কখনো গাড়ির পর্দা সরিয়ে আকবর খানের দিকে তাকায় আর আতিয়ার কানের কাছে বলে ঃ আম্মাজান,উনি নিশ্চই কোন শাহীখান্দানের ছেলে।' কখনো বা পায়দল চলবার বাহানা করে সে লাফিয়ে পড়ে গাড়ি থেকে, আবার কিছুক্ষণ ছুটে চলবার পর ফখরুদ্দিনকে বলেঃ 'আমি ঘোরায় সওয়ার হবো।' ফখরুদ্দিনের নওকর তাকে তুলে দেয় ঘোড়ার পিঠে। তারপর আকবর খানের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য একটা কিছু কথা বলে ওঠে ঃ হায়দারাবাদ এখান থেকে আর কতো দূরে? আপনি হুমায়ুনের মাঁজার দেখেছেন? লালকেল্লা আর জামে মসজিদ দেখেছেন? মামুজান বলছিলেন, আপনি বাঘ শিকার করেন। আপনি কখনো হাতি মেরেছেন?

একদিন সে কেমন ভোলা মন নিয়ে বললো ঃ একথা সত্যি যে, এক শাহী খান্দানের সাথে আপনার সম্পর্ক রয়েছে?'

আকবর খান তার প্রশ্ন শুনে হেসে উঠলেন এবং বিলকিসের নিষ্পাপ মুখখানি লজ্জায় থমথমে হয়ে উঠলো।

ঃ ব্যাপার কি আকবর? মোয়াযযম আলী তার ঘোড়া এগিয়ে নিতে গিয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ কিছু না। আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ বিলকিস বলছে, আমার নাকি শাহী খান্দানের সাথে সম্পর্ক আছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এতে ওর কোনো কসুর নেই। আজকাল দিল্লির প্রত্যেক তৃতীয় ব্যক্তিই দাবি করে যে, শাহী খান্দানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে।'

আকবর খানের হাসি ও মোয়াযযম আলীর গায়ে পড়ে কথা বলাটা বিলকিসের পছন্দ হলো না। সে এক নওকরকে আওয়াজ দিলো ঃ ঘোড়া সামলাও। আমি গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।'

ঘোড়া থেকে নেমে গাড়িতে উঠতে গেলে আতিয়া বিরক্তির স্বরে তাকে বললো

ঃ ব্যাস! ঘোড়ায় চড়ার শখ মিটে গেলো।'

বিলকিস কিছুক্ষণ মুখ ভার করে বসে রইলো। হঠাৎ সে বলে উঠলো ওরা দু'জনই গোঁয়ার।'

আতিয়া হেসে ফেললো, কিন্তু মা তাকে শাসনের স্বরে বললেন ঃ ভারী বদজবান হয়েছো তুমি।'

খানিকক্ষণ পর আতিয়া তার কানের কাছে বললো ঃ এবার সত্যি কথাটা বলো তো, ওর সাথে তুমি কি বলেছো?'

ঃ আমি ওকে কি বলেছি?'

ঃ আচ্ছা, তোমার বাদশাহ সালামতকে ডেকে বলে দিই যে, মালেকায়ে আলিয়াহ রাগ করে এসে গরুর গাড়িতে চেপেছেন।'

ঃ আম্মাজান!' বিলকিস কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো ঃ আপাজান আমায় গাল দেন।'

মা বললেন ঃ আতিয়া, ছেড়ে দাও। ওকে বিরক্ত করো না।'

হায়দারাবাদে পৌঁছে মোয়াযযম আলী ফখরুদ্দিনের শান-শওকৎ দেখতে পেলেন তাঁর প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি। দোতালা বসতবাড়ির সাথে মেহমানখানাটি এমন প্রশস্ত যে, সেখানে একই সময়ে শ'খানেক মেহমান থাকতে পারেন। মেহমানখানার পাশেই প্রশস্ত দফতরখানায় আট-দশজন মুন্সী কাজে নিযুক্ত। ঘোড়া, হাতী ছাড়া তিনি আরো ব্যবসা করেন অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ রেশম, চন্দন ও গরম মশলার। শহরের অপর দিকে এক বিরাট বাড়িতে আস্তাবল ও গুদাম। কাফেলা হায়দারাবাদে পৌঁছলো সন্ধ্যার একটু আগে। ফখরুদ্দিনের এক নওকর কয়েক ঘন্টা আগে এসে খবর দিয়েছে তাদের আগমনের। আগেই মেহমানখানার নিচের তলায় লা-ওয়ারিস বাচ্চা, নারী ও অসহায় লোকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোয়াযযম আলী ও আকবর খানের জায়গা হয়েছে উপর তলায়। তাদের নওকররা ফখরুদ্দিনের নওকরদের সাথে চলে গেছে অপর হাবেলীতে। কাফেলার বাকি লোকেরা বিদায় নিয়ে গেছে হায়দারাবাদে নিজ নিজ ঠিকানায়।

রাতেরবেলা মেহমানদের খানা শেষ হয়ে গেলে মোয়াযযম আলীকে লক্ষ্য করে ফখরুদ্দিন বললেন ঃ এবার আপনি আরাম করে ঘুমান। আমি আপনাকে

আশ্বাস দিচ্ছি, ভোরে আমার ছাড়া আপনি সবার আগে যে লোকটি দেখতে পাবেন, তিনি মীর্যা হোসেন বেগের কোনো আত্মীয়।'

মোয়াযযম আলী ঃ কিন্তু হায়দারাবাদ তো খুব বড়ো শহর। আপনি এত শিগ্‌গির কি করে খোঁজ-খবর করবেন।

ফখরুদ্দিন জওয়াব দিলেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কাছে দেড়শ নওকর। তা ছাড়া এখখুনি আমি যাচ্ছি শহরের কোতোয়াল ও ফউজের কয়েকজন বড়ো অফিসারের কাছে। মীর্যা হোসেন বেগের কোনো আত্মীয় হায়দারাবাদে থাকলে তাদের সন্ধান করবার জন্য এক রাত্রিই যথেষ্ট।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ মোয়াযযম আলীর চোখে ঘুম এলো না। ভোরে যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন সূর্য অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে। ঘরের মধ্যে অপর বিছানায় আকবর খান তখনো গভীর নিদ্রামগ্ন। তিনি লেবাস বদলে কামরার বাইরে যাবার জন্য ইরাদা করছেন, অমনি ফখরুদ্দিন কামরায় ঢুকে বললেন ঃ মীর্যা হোসেন বেগের একজন আত্মীয় পাওয়া গেছে। ভোর হতেই তিনি এখানে এসেছেন। তার সাথে তার ছেলেও আছেন। আপনি গভীর ঘুমে অচেতন ছিলেন বলে আপনাকে জাগানো ভালো মনে করিনি। এবার আসুন, ওরা নিচে আপনার ইন্তেজার করছেন।'

ঃ আমার ঘুম এমন জরুরি ছিলো না।' অভিযোগের স্বরে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ওরা আপনাকে কি বলেছেন?

ফখরুদ্দিন বিষণ্ণ আওয়াজে বললেন ঃ মীর্যা সাহেবের পরিবারের খবর তাদের জানা নেই।

মোয়াযযম আলী মুহূর্তের মধ্যে পথহারা মুসাফিরের মতো তাকালেন ফখরুদ্দিনের দিকে।

ঃ আমার আফসোস হচ্ছে।' ফখরুদ্দিন বললেন ঃ আচ্ছা, এবার চলুন।'

মোয়াযযম আলী ফখরুদ্দিনের সাথে নিচে নেমে এসে এক কামরায় প্রবেশ করলেন। গালিচার উপর উপবিষ্ট রয়েছেন তিনজন বায়োবৃদ্ধ ও পাঁচজন নওজোয়ান। মোয়াযযম আলীকে দেখে তারা উঠে দাঁড়ালেন। একে একে সবারই সাথে মোসাফেহা করে মোয়াযযম আলী বসে পড়লেন তাদের সামনে গালিচার উপর। তারপর বললেন ঃ আমার ধারণা ছিল মীর্যা হোসেন বেগের পরিবার হায়দারাবাদে এসেছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে তারা রওয়ানা হয়েছিলেন লাখ্নৌর দিকে। আমি তাদের খোঁজে লাখ্নৌ পৌঁছে জানলাম তাঁর আত্মীয়-স্বজন ওখান থেকে হিজরত করে গেছেন। মীর্যা সাহেব সম্পর্কে আমি শুধু জানতে পেরেছি যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

তার বিবি ও মেয়ের কোনো সন্ধান আমি পাইনি। আমি তাদের খোঁজ করেছি ফয়যাবাদ, আগ্রা ও দিল্লি ছাড়া আরো কয়েকটি শহরে।'

এক বৃদ্ধ বললেন ঃ লাখনৌয়ে আমি ছাড়া তার আত্মীয় আর কে ছিলেন? আমি মীর্যা সাহেবের মামাতো ভাই। দুর্ভাগ্যবশত আমি পলাশীর যুদ্ধের আগেই লাখনৌ ছেড়ে এসেছি।'

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি আরশাদ বেগ।'

ঃ আপনাদের মধ্যে আবদুল করীম কে?'

অপর এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমি! কিন্তু মীর্যা হোসেন বেগের বিবি ও মেয়ের সম্পর্কে আমিও কোনো খবর পাইনি। তারা এখানে এসে আমাদের সাথে দেখা করেননি, এমন তো হতে পারে না।'

তৃতীয় এক ব্যক্তি মোয়াযযম আলীকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি মাহ্‌মুদ আলী খানের বেটা?

ঃ জী হ্যাঁ।' মোয়াযযম আলী বিষণ্ণকণ্ঠে জওয়াব দিলেন।

তিনি বললেন ঃ আমি শওকত বেগের বাপ।'

মোয়াযযম আলী তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কবে এলেন এখানে?'

ঃ আমায় পলাশী যুদ্ধের পর দেশ ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা ছেড়ে আসার সময়ে আমি মুর্শিদাবাদে মীর্যা হোসেন বেগের সন্ধান করেছিলাম কিন্তু তিনি আমার আগেই হিজরত করেছেন। আমারও ধারণা ছিলো, তিনি লাখনৌ গিয়ে থাকবেন। ওখানেও আমি তার সন্ধান করেছিলাম।

মোয়াযযম আলী বেদনাতুর আওয়াজে বললেন ঃ আর আমি ভাবছিলাম যে, এখান থেকে ঢাকায় গিয়ে তাদের সন্ধান করবো।'

মীর্যা হোসেন বেগের আত্মীয়-স্বজনের সাথে মোলাকাতের পর মোয়াযযম আলীর অবস্থা হলো এমন এক মুসাফিরের মতো, যার সামনে নেই কোনো মনজিল, নেই কোনো পথের নিশানা। হায়দারাবাদের কোলাহলপূর্ণ গলি আর বাজার সবই তার দৃষ্টিতে নিঝুম সুনসান। মীর্যা হোসেন বেগের বিবি ও সাহেবজাদির সন্ধান দেবার জন্য ফখরুদ্দিন পাঁচশ আশরাফি ইনাম ঘোষণা করেছেন এবং ঘোষণাকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের গলিতে গলিতে। কিন্তু ফরহাত ও তার মায়ের কোনো সন্ধান মিলছে না।'

তাহের খানের কাছে হায়দারাবাদের আড়ম্বরময় শহর যেনো এক আজব দেশ। তিনি খুব ভোরে উঠে কোনো নওকরকে সাথে নিয়ে চলে যান বাইরে।

হায়দারাবাদের ফউজী শিক্ষাকেন্দ্রের নওজোয়ান অফিসারদের নেযাবাজি, শাহসওয়ারী ও পোলো খেলা তার বেশ ভালো লাগে। কখনো তিনি ফখরদ্দিনের আস্তাবলে গিয়ে একটি সুন্দর দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে যান বেড়াতে। মোয়াযযম আলীর বেদনা ও মর্মপীড়া তীব্রভাবে বাজে তার বুকে এবং বারংবার তাকে তিনি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মোয়াযযম আলীর সাথে বেকার বসে কাটাতে তিনি পারেন না। তিনি প্রায়ই বলেন ঃ ভাইজান, আজ-অমুক জায়গায় নেযাবাজি হচ্ছে-আজ অমুক ময়দানে ফউজী অফিসারদের পোলো খেলা-আজ ফখরদ্দিনের আস্তাবলে কয়েকটা নতুন ঘোড়া এসেছে, চলুন, আপনাকে দেখাবো।'

মোয়াযযম আলী কখনো কখনো তার দীলকে জোর করে সংযত করেন কিন্তু প্রায়ই বলেন ঃ তুমি যাও, আকবর! আমার তবিয়ত ভালো নেই।'

একদিন আসমানে মেঘ জমেছে। আকবর খান বেরিয়ে গেছেন কোথায়ও বাইরে। কামরায় রয়েছেন মোয়াযযম আলী একা। তার কামরার সামনে দীর্ঘ বারান্দার এক ধার বসতবাড়ির সাথে মিলেছে। আচানক মুসলধারে বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। মোয়াযযম আলী কামরা থেকে একটা কুরসি টেনে নিয়ে বসলেন বারান্দায়।

কিছুক্ষণ পর বারান্দার ডানদিকের কোণে, একটা দরজা খুলে গেলো এবং বিলকিস সংকোচ ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে বেরিয়ে এলো।

ঃ এসো বিলকিস! মোয়াযযম আলী স্নেহের সাথে বললেন ঃ তোমায় কাল থেকে দেখিনি। কোথায় গায়েব হয়েছিলে?'

বিলকিস বললো ঃ আপাজানের জ্বর ছিল। তাই তার কাছে ছিলাম।'

ঃ এখন কেমন তোমার আপাজান।'

ঃ এখন বিলকুল সুস্থ। আম্মাজান জিজ্ঞেস করছেন, আপনার তবিয়ত ভালো তো?'

ঃ হ্যাঁ আমি বেশ ভালোই আছি।'

ঃ মামুজান বলেছিলেন। আপনারা এখান থেকে খুব শিগ্‌গির চলে যাচ্ছেন।'

ঃ হ্যাঁ আমার ইরাদা, আগামী হফ্‌তায় এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

ঃ না, আপনি যাবেন না' বিলকিস্ মুখ ভার করে বললো ঃ আপনি এখানে থাকলে নিশ্চয়ই আপনার আত্মীয়দের সন্ধান পাবেন। তাদের সন্ধান যাতে পান,

তার জন্য আমি হররোজ দোআ করছি। আম্মাজান আর আপাজানও দোআ করেন আপনার জন্য। আমি আরো দোআ করি যে, আপনি এখানে থাকুন।' মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ বিলকিস্‌ বড্ড ভালো মেয়ে তুমি, কিন্তু তুমি আমায় হায়দারাবাদ রাখবার জন্য দোআ করো না।'

ঃ কেন? হায়দারাবাদ খুব ভালো শহর, কিন্তু আমি এখানে এক মুসাফির। বিলকিস্‌ হতাশ হয়ে বললো ঃ আপনার বুঝি বাড়ির কথা মনে পড়ে?'

ঃ আমার কোন বাড়ি-ঘর নেই।' মোয়াযযম আলী জবাব দেন।

ঃ তা হলে আপনি এখানে কেন থাকবেন না?'

ঃ আমি লাখ্‌নৌ যেতে চাই।

ঃ লাখনৌয়ে আপনার আত্মীয়রা থাকবেন?'

ঃ না।'

বিলকিস্‌ আঙ্গিনার দিকে ইশারা করে বললো ঃ আব্বাজান এলেন।'

মোয়াযযম আলী আঙিনার দিকে তাকালেন। ফখরুদ্দিন এক ছাতা মাথায় দিয়ে এগিয়ে আসছেন সিঁড়ির দিকে। মোয়াযযম আলী উঠে কামরা থেকে আর একটা কুরসি নিয়ে এলেন। ফখরুদ্দিন উপরে উঠে এলে বিলকিস্‌ চ'লে গেলো।'

ফখরুদ্দিন কুরসির উপর বসে বললেন ঃ আকবর খান কোথায়?'

ঃ জী, তিনি বৃষ্টির একটু আগেই বাইরে গেলেন। আমি মনে করেছিলাম, বুঝি আপনার আস্তাবলে ঘোড়া দেখছেন।'

ঃ ওর ঘোড়ার শখ বেশি। একজোড়া ভালো আরবি ঘোড়া আমি ওকে দেবো। বড্ড গুণী ছেলে। ওকে যদি আপনি আমার কাছে রেখে যান, তা'হলে কয়েক বছরে আমি ওকে ভালো ব্যবসায়ী বানিয়ে দিতে পারি। ঘোড়ার ব্যবসা করারও শখ আছে ওর।'

ঃ এ শখ ওর বাপের কাছ থেকে পাওয়া।'

ফখরুদ্দিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ আমি আপনার সাথে একটা জরুরি আলোচনা করতে।'

ঃ বলুন।'

ফখরুদ্দীন খানিকক্ষণ ঘাড় নিচু করে চিন্তা করার পর বললেন ঃ আমার আফসোস্‌ হায়দারাবাদে আমি আপনার কোনো সাহায্য করতে পারিনি। আপনার মুখ দেখেই বোঝা যায় আপনি একটা দুঃখের দহনে জ্বলছেন। আপনি সেই নওজোয়ানদেরই একজন, আল্লাহ্‌ যাদেরকে দিয়েছেন পাহাড়ের বুক বিদীর্ণ করবার হিম্মৎ। জিন্দেগির প্রতি আপনার এ বিতৃষ্ণা খুবই মর্মান্তিক। এখনই আমি সিপাহ্‌সালারের সাথে

মোলাকাত করে এসেছি। আমি আপনার কথা বলেছি তার কাছে এবং আপনার অতীত কাহিনী শুনে তিনি বললেন ঃ এই ধরনের নওজোয়ান যদি হায়দারাবাদের ফউজে শামিল হন তা' আমাদের সৌভাগ্য।' তিনি আপনাকে কোনো উচ্চপদ দিতে তৈরি। আমার বিশ্বাস, এখানে আপনার ভবিষৎ হবে অতি উজ্জ্বল এবং আপনি আপনার ব্যাথাতুর দুঃখভারাক্রান্ত জিন্দেগিতে ফিরে পাবেন নব জীবন স্বাদ।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ জিন্দেগির প্রতি আমার অনুরাগ আজো খতম হয়ে যায়নি, কিন্তু আমি ফয়সালা করেছি, ভবিষ্যতে আমি আর ফউজের চাকরি করবো না। আমার যে সব প্রিয়জন ও বন্ধুদের রক্তে বাংলার মাটি রঙিন হয়ে উঠেছিলো তাদের নিষ্কাম কোরবানীর স্মৃতিই আমার জন্য যথেষ্ট।'

ফখরদ্দিন আবার কিছুক্ষণ মাথা নত করে চিন্তা করে বললেন ঃ কথাটা আমার কাছে আজব মনে হয় এবং আপনার কাছেও আজব মনে হবে, কিন্তু আমরা যে যুগ অতিক্রম করে চলেছি, তাতে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির প্রাচীর ভেঙে যাচ্ছে। আমার এবং আমার চাইতেও বেশি করে আমার বোনের আকাঙ্ক্ষা, আপনাকে তার বড়ো মেয়ের জীবনসাথী দেওয়া যাক্ । এর কারণ এ নয় যে, আপনি আমাদের জান বাঁচিয়েছেন, বরং তার কারণ, আমি আমার এতিম ভাগ্নীর জন্য আপনার মতো নেক ও নির্ভরযোগ্য জীবন-সাথীর সন্ধান পাওয়া আল্লাহর ইনাম বলে মনে করি। আমার ভাগ্নী সম্পর্কে আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, সে এক নেক মা ও শরীফ বাপের বেটি। তার গুণের দিক বিবেচনা করলে আমি তার জন্য কোনো দেশীয় রাজ্যের মালিকের সন্ধানও করতে পারি, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাকেই যদি তার ভবিষ্যতের ফয়সালা করবার এখতিয়ার দেওয়া যায়, তা'হলে সে আপনার মতো মহৎ স্বভাব মানুষের সাথে কষ্টের জিন্দেগি যাপন করাই পছন্দ করবে।'

মোয়াযযম আলী বেশ কিছুক্ষণ মাথা নুইয়ে চিন্তা করলেন। তারপর তিনি অশ্রুজল চোখে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, আপনি যেনো এক বিরাট পাহাড়ের ভার আমার গর্দানের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনার শোকরগুজারী করি। দুনিয়ায় যে আজো উদারতার অস্তিত্ব রয়েছে, তা আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন আমার কাছে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি অসহায়। আমি জানি, আমি যতোই কৃতজ্ঞতা সহকারে জওয়াব দেবো, তা' শরাফত ও মানবতার খেলাফ মনে হবে। আপনার কাছে আমি একটি ঘটনা বলছি, শুনুন ঃ কয়েক বছর আগের এ-ঘটনা। আমার এক দোস্ত ছিলেন আমার ভাইয়ের মতো প্রিয়। লড়াইয়ের ময়দানে জখমি হবার পর তিনি আমার কোলের উপর মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তার বোন ছিলো তার চোখে সারা দুনিয়ার চাইতে প্রিয়। তিনি শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন

যেনো আমিই হই তার ভবিষ্যতের আমানতদার। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি সে মেয়েটিকে জানতাম। আমার বিশ্বাস ছিলো যে, তার ভাইয়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু কিছুকাল পর আমি বন্দী হয়ে চলে গেলাম মারাঠার কয়েদখানায়। তারপর কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আমি যখন ফিরে এলাম, তখন তার শাদি ঠিক হয়ে গেছে। দুনিয়া আমার চোখে অন্ধকার হয়ে গেলো। তারপর ঘটনাক্রমে আমি ও তার ভাবী স্বামী একই ময়দানে লড়াই করছিলাম মারাঠাদের বিরুদ্ধে। আমরা দু'জন হয়েছিলাম পরস্পরের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তিনি আমার চাইতে কোনো দিক দিয়ে কম ছিলেন না। মেয়েটির ভাবী স্বামীর জন্য আমি দীলের মধ্যে এক ভ্রাতৃস্নেহ অনুভব করতাম। সে নওজোয়ান এক লড়াইয়ে মারা গেলেন। তারপর আমার বাপ-মা যখন আমাদের ভবিষ্যতের ফয়সালা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখনই বাংলায় ঘটলো বিপ্লব।'

ফখরদ্দিন তার কথায় প্রভাবিত হয়ে বললেন ঃ আর সে মেয়েটি মীর্যা হোসেন বেগের বেটি?

ঃ জী হ্যাঁ।'

ঃ আমি দোআ করি, যেনো আপনি তার সন্ধানে কামিয়াব হন।'

কিছুক্ষণ পর ফখরদ্দিন উঠে জানানা মহলে চলে গেলেন এবং মোয়াযযম আলী একা বসে রইলেন নিশ্চল হয়ে। মোয়াযযম আলী আতিয়াকে দেখেছেন মাত্র এক নজর আর তা' দূর থেকে। কিন্তু তার রূপের একটুখানি ঝলকই কোনো নওজোয়ানের দীলের স্পন্দন দ্রুততর করবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মোয়াযযম আলীর বুকের মধ্যে তেমন দীল ছিলো না। সকল সৌন্দর্য সত্ত্বেও আতিয়া ফরহাত নয়।

ঃ ফরহাত! ফরহাত!! ধ্যানমগ্ন মোয়াযযম আলী অলক্ষ্যে এমনি আওয়াজ করতে করতে কামরায় ফিরে লুটিয়ে পড়লেন শয্যার উপর। আপন মনে তিনি বলতে লাগলেন ফরহাত! ফরহাত!! তুমি কোথায়? আহা! আমার আওয়াজ যদি তোমার কানে পৌঁছতো!'

পরদিন রাতে মোয়াযযম আলী ও আকবর খান তাদের কামরায় বসেছিলেন। ফখরুদ্দীন ভিতরে এসে তাদের কাছে বসে বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, হায়দারাবাদের ফউজে চাকরি সম্পর্কে আমার ধারণা আপনি উল্টে দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বেকার বসে থেকে আপনার মনে শান্তি আসবে না। যদি আপনি তেজারত শুরু করতে চান, আমি আপনাকে ও আকবর খানকে আমার শরীক করে নিতে তৈরি। আমার সাথে শরীক হওয়া আপনি পছন্দ না করলে আমি আপনাকে খুশি হয়ে উপযুক্ত অর্থ করযে হাসানাহ্ (বিনা সুদে ঋণ) দিতেও রাজি। আপনি

যখন ইচ্ছা তা' আমায় ফেরত দেবেন। আমি শুধু চাই, আপনি একটা কাজে লেগে থাকুন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তেজারত সম্পর্কে আমি নিজেও কিছুদিন থেকে চিন্তা করছি। সম্ভবত আমি এখান থেকেই তা'শুরু করবো এবং লাখনৌ যাবার সময়ে কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে যাবো সাথে। পুঁজি সম্পর্কে আমি আপনাকে তকলিফ দিতে চাই না।'

ঃ কিন্তু পুঁজি ছাড়া তো তেজারত হয় না।'

ঃ পুঁজি আমার কাছে যথেষ্ট রয়েছে।' বলতে বলতে মোয়াযযম আলী কামিজের তলায় হাত ঢুকিয়ে কোমরে-বাঁধা থলে বের করলেন। তার ভিতর থেকে একটা হীরা বের করে ফখরুদ্দিনের হাতে দিয়ে বললেন ঃ আপনার ধারণা এর দাম কত হবে?'

ফখরুদ্দীন চেরাগের রৌশনীতে হীরা- উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে বললেন ঃ এই ধরনের আরও আট দশটি হীরা আপনার কাছে থাকলে আমি বলতে পারি ঃ আপনি লাখনৌর সব চাইতে বড়ো আমীর লোক।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এ থলের মধ্যে ত্রিশটি হীরা রয়েছে, কিন্তু আমি এর সবগুলো চিনিও না। এর চাইতে ছোট একটি হীরা আমি লাখনৌয় বারোশ' আশরাফির বিনিময়ে বিক্রি করেছিলাম। এখন এগুলো বিক্রি করার জন্য আমি আপনাকে তক্‌লিফ দিতে চাই।'

ঃ লাখনৌয়ে কেউ আপনকে ঠকিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ হীরার বদলে আপনি তার পাঁচগুণ বেশি দাম পাবেন।'

মোয়াযযম আলী থলেটা তার হাতে দিয়ে বললেন ঃ এগুলোও দেখে নিন। ফখরুদ্দিন থলেটা হাতের তালুর উপর করে বললেন ঃ এ হীরা অত্যাধিক মূল্যবান, কিন্তু আপনি এসব পেলেন কোথায়?

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ এ হচ্ছে আব্বাজানকে দেওয়া নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার আখেরী ইনাম।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ এবার আমার মেহমানখানায় পাহারা বসাতে হবে। আপনি আর কাউকেও বলেননি তো?'

ঃ না।'

ঃ আপনাকে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

বারো

একদিন ভোরবেলা সাবের শের আলীর জন্য নাশতা তৈরি করছে, অমনি কে যেনো বাইরে থেকে দরজায় খট্ খট্ করে আওয়াজ দিলো ঃ সাবের দরজা খোলো।'

সাবের ছুটে গিয়ে দরজা খুলে সামনে দেখলো, দীলাওয়ার খান ঘোড়ার বাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাবের ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো, মোয়াযযম আলী খান কোথায়?'

ঃ তিনি সন্ধ্যার দিকে এসে পৌছবেন।' দীলাওয়ার আঙিনায় পা রাখতে রাখতে বললো।'

ঃ সাবের, কে ওখানে? এক কামরা থেকে শের আলীর আওয়াজ শোনা গেলো।

ঃ জী, দীলাওয়ার খান এসেছে।'

শের আলী জলদি করে বাইরে এলেন। সাবের দীলাওয়ার খানের কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলো, কিন্তু সে ঘোড়ার বাগ তার হাতে দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে শের আলীকে বললো ঃ জনাব, খান সাহেব আসছেন। তিনি খবর পাঠালেন যে তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত এসে পৌছবেন। তিনি আশিটা ঘোড়া নিয়ে আসছেন সাথে করে। তাই আপনি শিগ্‌গির করে শহরের বাইরে এমন একটা বাড়ি ভাড়া নিবেন, যেখানে ঘোড়াগুলো ছাড়াও আরও পনেরো বিশজন লোক থাকতে পারবে। খান সাহেব আরও বলে দিলেন, ভিতরে বসতবাড়ি রয়েছে। এমন কোনো প্রশস্ত হাভেলী শহরের বাইরে পাওয়া গেলে আরো ভালো হবে। ভাড়ার বদলে দাম দিয়ে যদি এমন কোনো উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায়, তা'হলে খরিদ করে নেবেন। তিনি এসেই দাম দিয়ে দেবেন। তিনি আরও ব্বলেছিলেন যে, ঘোড়ার তেজারতের জন্য আমাদের স্থায়ীভাবে লাখনৌয়ে একটি বেশ প্রশস্ত বাড়ির প্রয়োজন হবে।'

শের আলী দীলাওয়ার খানের কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করে নাস্তার অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

দিনের তৃতীয় প্রহরে শের আলী দীলাওয়ার খানকে সাথে নিয়ে পশ্চিম দরজায় মোয়াযযম আলীর প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। আসরের নামাজের খানিকক্ষণ পরেই সড়কের উপর দূরে দেখা গেলো এক কাফেলা। দীলাওয়ার খান বললেন ঃ জনাব ওরা এলেন।'

কিছুক্ষণ পর কাফেলা কিছু দূরে সড়ক থেকে নেমে এক ক্ষেতের মধ্যে থেমে গেলো। শের আলী ও দীলাওয়ার খান দ্রুত কদম ফেলে এগিয়ে গেলেন।

মোয়াযযম আলী শের আলীকে দেখেই নেমে পড়লেন ঘোড়া থেকে। আকবর খান তার অনুসরণ করলেন।

শের আলী সামনে এগিয়ে বারবার মোসাফেহা করে বললেন ঃ আপনার এখানে থেমে যাবার প্রয়োজন নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। শহরের অপরদিকে শহরতলীর এক বস্তিতে একটি বেশ খোলা হাবেলী মিলে গেছে। হাবেলীর মালিক নেহায়েত শরীফ লোক এবং তিনি আমায় বলছেন, আমরা পনেরো বিশ দিন আমাদের ঘোড়া ও নওকরদের ওখানে রাখতে পারবো আর তার জন্য কোনো ভাড়া নেবেন না । তারপর উপযুক্ত দাম পেলে তিনি হাবেলীটি বিক্রি করে দেবেন আমাদের কাছে। হাবেলীর ভিতর রয়েছে একটি নতুন দোতালা বাড়ি। একদিকে নওকরদের থাকবার মতো কতকগুলো পুরনো কুঠরি রয়েছে। ঘোড়াগুলো আঙিনায় বেঁধে রাখা যাবে, তারপর মালিকের সাথে কথাবার্তা বলে তৈরি করে নেওয়া যাবে আস্তাবল। সেখানে জায়গা আছে যথেষ্ট।

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি হাবেলীর দাম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

ঃ জী হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি সোজা আপনার সাথে আলাপ কড়তে চান।'

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে তারা প্রবেশ করলেন শহরের অপর দিককার এক বস্তিতে। হাবেলীর মালিক দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শের আলী মোয়াযযম আলীর সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি আপনার বহুত শোকরগুজারী করছি। আপনি এমনি করে মেহেরবানী না করলে আমাদের যথেষ্ট পেরেশানির কারণ হতো।

হাবেলীর মালিক বললেন ঃ এ জায়গাটা একটা কাজে লাগছে, তাতেই আমি খুশি। এ হাবেলী আগে ছিলো এক সরাই। গোড়ার দিকে এর রওনক ছিলো যথেষ্ট। এখন শহরে অনেকগুলো নয়া সরাই তৈরি হয়েছে, তাই মুসাফির এখানে থাকতে চায় না। গত বছর আমি যখন হাবেলীটি খরিদ করলাম, তখন এর অবস্থা ছিলো নেহায়েত ভাঙা। আমি এর মেরামত করিয়েছি। এর মধ্যে কাজের মতো ঘর ছিলো মাত্র একটা। তার উপর আমি বালাখানা তৈরি করিয়ে নিয়েছি। তিন চার মাস আমি সরাইর কারবার চালাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো ফায়দা হলো না। কখনো কোনো বড়ো কাফেলা এসে তারা দু'একদিন থাকতো নিরুপায় হয়ে। তারপর চলে যেতো শহরে । তাই

সরাইর কারবার আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আপনার কারবারের জন্য এ জায়গা খুবই উপযুক্ত হবে। আপনি খরিদ করতে চাইলে আমি মুনাফা ছাড়াই বিক্রি করবো এ হাবেলী। খুব তাড়াহুড়ো করে কাজ নেই। আপনি এর ভিতর-বাইরে সব কিছু দেখে নিন ভালো করে।'

ঃ চলুন এখখুনি দেখে নিচ্ছি।' বলে মোয়াযযম হাবেলীর মালিকের সাথে ভিতরে গেলেন।

আঙিনায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে বললেন ঃ এই জায়গা আমাদের কাজে লাগবে। এবার দাম বলুন।'

ঃ না, আপনি ভালো করে দেখে নিন। আসুন, আপনাকে বাড়িটি দেখাচ্ছি।'

হাবেলীর মালিকের অনুরোধে মোয়াযযম আলী চললেন তার সাথে। নিচু তলায় পাচিটি কামরা দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন উপরে। সেখানে তিনটি প্রশস্ত কামরার সামনে এক বারান্দার সামনে ছোট আঙিনার মতো খোলা ছাদ।

মোয়াযযম আলী উপর থেকে হাবেলীর সব দিক দেখে নেবার পর তাকে বললেন ঃ এবার আপনি বিক্রির কথা বলুন।'

মালিক বললেন কিন্তু জনাব, ওদিকে দেয়ালের সাথে কয়েকটি কুঠরি রয়েছে। নিচে নেমে সেগুলোও দেখে নিন।'

ঃ ওগুলো দেখতে হবে না। আমি জানি এর অনেক কিছু আমায় নতুন করে তৈরি করতে হবে। আপনি এবার বিনাদ্বিধায় দামটা বলুন তো।'

মালিক জওয়াব দিলেন ঃ জনাব, আমি আপনাকে কাগজপত্র দেখাতে পারি। আমি সাত হাজারে এ হাবেলীটি খরিদ করেছিলাম, আরো প্রায় আড়াই হাজার টাকা এর পিছনে খরচ করেছি। হাবেলীর সওদা কতক লোকের সামনে হয়েছিলো। ভোর পর্যন্ত আমি তাদেরকেও এনে পেশ করবো আপনার সামনে।'

ঃ না, না, তার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা দিতে তৈরি। আপনার মুনাফা হবে পাঁচশ।'

ঃ সে পাঁচশ টাকা আমি মুনাফা মনে না করে মনে করবো এক আমীরের ইনাম। দশ হাজারেই আমি রাজি। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ, আমি যখন হাবেলী খরিদ করি, তখন দু'জন গরিব মহিলা এখানে থাকতেন। সরাইর সাবেক মালিক আমায় অনুরোধ করেছিলেন, যেনো আমি তাদেরকে এখানে থাকতে দেই। তারা আশ্রয়হীন এবং গাঁয়ের লোকদের কাপড়-চোপড় সেলাই করে দিয়ে তাদের পেট চলে। কখনো কখনো আমার বিবি তাদেরকে দেন কিছু কিছু সাহায্য। এখানে যখন কোনো মুসাফির আসতো, তখন তাদের খুব তকলিফ হতো। তারা সারাদিন পড়ে থাকতেন কুঠরির

দরজা বন্ধ করে। আমি কোণায় এক কুঠরির সামনে তাদের পর্দার জন্য তৈরি করে দিয়েছি একটা ছোট দেয়াল। ওরা নেহায়েত নেক স্বভাব এবং আপনাদের মতো খোদাভীরু লোকদের আমানতের দাবিদার। তাই আমার অনুরোধ আপনি তাদেরকে ওখানে থাকতে দেবেন।

মোয়াযযম আলী জিব থেকে কয়েকটি সোনাচাঁদির মুদ্রা বের করে করে হাবেলীর মালিকের হাতে দিয়ে বললেন ঃ ওদের কোন তকলিফ হবে না। আমার তরফ থেকে এগুলো আপনি ওদেরকে দেবেন এবং ভোরে এসে আপনার পাওনা উসুল করে নেবেন।'

তারপর মোয়াযযম আলী শের আলী খানের উদ্দেশে বললেন ঃ এখন ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা এবং নওকরদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আপনার জিম্মায় রইলো। আমি আকবর খানকে নিয়ে শহরের বাড়িতে যাচ্ছি। আমরা খুবই ক্লান্ত। কাল আমরা আসবো এখানে।'

৫

পরদিন মোয়াযযম আলী শহরের বাড়ি থেকে তার স্বল্প পরিমাণ জিনিসপত্র নিয়ে এসে উঠলেন নতুন বাড়িতে।

উপর তলার কামরা তিনি ঠিক করলেন নিজের থাকার জন্য। শের আলী নিচু তলার এক কামরায় সাজাচ্ছিলেন তার দফতর। শহর থেকে ঘোড়ার খরিদদার ক্রমাগত এসে জমা হতে লাগলো সেখানে। হাবেলীটি যেনো একটা চমৎকার বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে। আশপাশের লোক এসে জমা হচ্ছে শুধু ঘোড়া দেখবার জন্য। সারাদিন সাবের দানা পাকাতে ও বরতন সাফ করতে ব্যস্ত। ফুরসত পেলে সে একবার ঘুরে আসে হাবেলীর চারদিকে। যে দু'টি সাদা ঘোড়া ফখরুদ্দিন আকবর খানকে দিয়েছেন, সবচাইতে তার বেশি পছন্দ সে দু'টি। তার পছন্দের কারণ, মোয়াযযম আলী ও আকবর খান দু'জনই তাদের তারিফ করেছেন। দেহাতী লোকদের হাত ধরে সে নিয়ে যায় ঘোড়াগুলোর কাছে, আর জিজ্ঞেস করে ঃ তোমার ধারণায় এগুলোর দাম কতো হবে? তারা আন্দাজ করে একটা কিছু দাম বললেই সে ধিক্কার দিয়ে উঠে ঃ কি বলবো তোমাদের পছন্দের কথা? এগুলোর দাম তোমাদের সারা গাঁয়ের চাইতেও বেশি।'

তিনদিনে মোয়াযযম আলী বিশটি ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন। চতুর্থ দিন এক সুদর্শন আগন্তুক তার কাছে এসে ত্রিশটি ঘোড়া বাছাই করে তার দাম জেনে নিয়ে বললেন ঃ বেনারসের রাজার জন্য আমি এ ঘোড়াগুলো খরিদ করতে চাই, কিন্তু ঘোড়াগুলো বেনারস পৌঁছে দেবার জিম্মা আপনাকে নিতে হবে। এর দামও আপনি ওখানেই পাবেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ বেনারস পৌছে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু রাজা এ ঘোড়া পছন্দ না করলে তখন.....?

ঃ আমি রাজার চাচাতো ভাই।' আগন্তুক জ্বালালেন।

ঃ আপনি কবে যেতে চান?'

ঃ কাল'

মোয়াযযম আলী শের আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ চাচা! বেনারস যাওয়া আপনি পছন্দ করবেন?'

ঃ কেন না? আমি এখ্খুনি যেতে তৈরি।'

ঃ বহুত আচ্ছা। কাল আপনি ওর সাথে যাবার জন্য তৈরি থাকবেন।'

দু'দিন পর লাখনৌয়ে খবর রটলো যে দত্তাজী সিন্ধিয়ার সৈন্যদল নজীব খানকে পরজিত করবার জন্য সাহরানপুরের দিকে এগিয়ে আসছে। রোহিলাখণ্ডের মুসলমানদের কাছে নজীব খান এক অতি বড়ো কওমী নেতা। তাই খবর শুনেই আকবর খান সাথীদের ঘোড়ায় জিন লাগাবার হুকুম দিয়ে ভ্যালাখানায় মোয়াযযম আলীর কামরায় প্রবেশ করলেন। মোয়াযযম আলী জানালার কাছে এক কুরসির উপর বসে এক কিতাব দেখছেন। তিনি কিতাব বন্ধ করে কুরসির দিকে ইশারা করে বললেন ঃ আকবর, বসে পড়।

আকবর তার কাছে কুরসির উপর বসলে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমাদের শুরু বেশ ভালোই হলো। ঘোড়াগুলো এত জলদি বিক্রি হয়ে যাবে, সে আশা আমি করিনি। আমি শেখ ফখরুদ্দিনকে খবর পাঠাচ্ছি আমাদের জন্য আরো দু'শো ঘোড়া খরিদ করতে। তার জওয়াব পেলেই আমায় যেতে হবে ওখানে। এখন আমার জিন্দাহ থাকার জন্য একটি কিছু আকর্ষণের প্রয়োজন।'

আকবর খান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন ঃ ভাইজান, মারাঠা ফউজ নজীবুদ্দৌলার পিছু ধাওয়া করবার জন্য এগিয়ে আসছে সাহরানপুরের দিকে। এখ্খুনি আমি খবর পেয়েছি। আপনার এজাযত পেলে আমি অবিলম্বে ঘরে ফিরে যেতে চাই।'

ঃ এ অবস্থায় তোমার আমার কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিলো না। তুমি কবে যেতে চাও?'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ আমার সাথীরা ঘোড়ার উপর জিন লাগাচ্ছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ বহুত আচ্ছা। তুমি নিচে যাও। আমি এখখুনি আসছি।'

আকবর খান কুরসি থেকে উঠে বললেন ঃ ভাইজান, আপনি রাগ করলেন না তো! আমি ওয়াদা করছি, অবস্থার উন্নতি হলে আমি খুব শিগ্‌গিরই ফিরে আসবো।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ মারাঠার অগ্রগতির খবর পেয়েও তুমি ঘরে ফিরে যাবার জন্য তৈরি না হলেই বরং আমার আফ্‌সোস্ হতো। রোহিলাখণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর সরদার হিসাবে তোমার জিম্মাদারী আমার চাইতে বেশি আর কে বুঝবে? একথা তোমায় বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যেদিন আমি বুঝবো যে, আমায় তোমার প্রয়োজন অথবা আমি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি, সেদিন না ডাকাতেই আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো।'

আকবর খান কামরার বাইরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পর মোয়াযযম আলী বালাখানা থেকে নিচে হাবেলীর প্রাঙ্গণে এসে দেখলেন, আকবর খান ও তার সাথীরা ঘোড়ায় জিন লাগানো শেষ করেছেন। মোয়াযযম আলীর এক হাতে টাকার থলে। এগিয়ে এলে তিনি অপর হাতখানি আকবর খানের কাঁধে রেখে বললেন ঃ আকবর, এই লও।'

ঃ এতে কি আছে?' আকবর খান প্রশ্ন করলেন।

ঃ এর মধ্যে তোমার হিস্‌সার কিছু অর্থ রয়েছে। আবার যখন মোলাকাত হবে। তখন নিশ্চিত মনে হিসাব করা যাবে। এর মধ্যে তোমার সাথীদের জন্য রয়েছে ষাট আশ্‌রাফি।'

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান, আপনি আমায় শরমেন্দা করবেন না। নওকরদের সম্পর্কে আমি আপনাকে মানা করবো না, কিন্তু আমি এক কড়িও কবুল করবো না'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ যে লোক নিজের হক উসুল করে নেয় না, সে পরধনভোগীকে প্রশ্রয় দেয়।'

ঃ কিন্তু এ তেজারতিতে আমার তো কোনো হিস্‌সা ছিলো না।'

ঃ সে চিন্তা আমার।' মোয়াযযম আলী জোর করে থলেটি তাকে দিলেন। আকবর খান আবার বললেন ঃ ভাইজান আমার অর্থের কোনো প্রয়োজন নেই।'

ঃ তোমার অর্থের প্রয়োজন আমার চাইতে বেশি। আমি চাই আমার সাথে তেজারতিতে তুমি যে মুনাফা কামাবে, তার প্রতিটি কড়ি তোমার এলাকার লোকদের অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য ব্যয় করো। এই মুলুকে রোহিলাখণ্ডই একমাত্র অংশ, যেখানকার লোক দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থসর্বস্ব নিষ্কর্মা শাসকদের ক্ষমতা লোভের

কবল থেকে আজাদ।'

আকবর খান লা-জওয়াব হয়ে বললেন ঃ আপনার হুকুম অমান্য করবার সাহস আমার নেই, কিন্তু আমি জানি এ অর্থে আমার কোনো হক নেই।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তোমার নিশ্চিত থাকা উচিত, আমি কখনো অন্যায় হুকুম দেবো না।'

৫

সেদিন প্রায় বেলা এগারোটায় তিনি উপর তলার বারান্দায় একা বসে রয়েছেন, অমনি দেখলেন ময়লা জীর্ণ চাদরে দেহ ঢেকে একটি মহিলা হাবেলীর আঙিনায় প্রবেশ করলেন। নওকর আঙিনায় বাঁধা ঘোড়াগুলোকে পানি দিচ্ছিলো। মহিলাটি যখন ঘোড়ার কাছ দিয়ে যাচ্ছেন অমনি, ঘোড়াটা আচানক লাফিয়ে উঠে সামনের পা উপরে তুললো। মহিলাটি ঘাবড়ে গিয়ে সরে গেলেন একদিকে। তাকে ভয় পেতে দেখে এক নওকর হেসে উঠলো হো হো করে। মহিলাটি দ্রুত পায়ে হাবেলীর কোণের দিকে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন।

মোয়াযযম আলী ছুটে নিচে নেমে নওকরের মুখের উপর এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ তোমার শরম লাগে না একটি গরিব অসহায় মহিলার দিকে চেয়ে হাসতে? ঘোড়া এখানে বেঁধেছে কে? ওকে সরাও এখান থেকে। রাস্তা থেকে সব ঘোড়াগুলোকে একদিকে বেঁধে দাও। এ সব খুঁটো এখান থেকে তুলে নাও।'

কিছুক্ষণ পর দীলাওয়ার খান বালাখানায় নিজস্ব কামরায় উপবিষ্ট মোয়াযযম আলীর সামনে খানা এনে হাজির করলো। মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার ভূখ লাগেনি। তুমি এ খানা ঐ গরিব মেয়েদের দিয়ে এসো, আর আমার তরফ থেকে বলে দাও, এখন থেকে তাদের দুবেলার খানাই আমার এখান থেকে যাবে।'

সন্ধ্যাবেলায় বস্তির ছোট মসজিদ থেকে যখন মোয়াযযম আলী নামাজ পড়ে ফিরে আসছেন, তখন হাবেলীর মধ্যে নওকরদের কোলাহল শোনা গেলো। মোয়াযযম আলী জলদি এসে জানলেন তার এক দুরন্ত ঘোড়া লাফ মেরে এক নওকরকে গুরুতর জখম করে দিয়েছে। মোয়াযযম আলী নিজ হাতে নওকরের পায়ে পট্টি বেঁধে দিয়ে বললেন ঃ এ ঘোড়া ভারী দূরন্ত হয়ে উঠেছে। কাল ভোরে আমি ওর উপর সওয়ারী করবো।'

পরদিন ভোরে মোয়াযযম আলী ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। যখন ফিরে এলেন তখন সারা দেহ ঘামে তর হয়ে গেছে আর তার দূরন্তপানাও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু মোয়াযযম আলী দেউড়ির কাছে পৌছলে ঘোড়া আবার লাফাতে শুরু করলো। আচানক চাদর ঢাকা একটি মেয়ে দেউড়ির পথে বেরিয়ে এলেন এবং বেখেয়াল হয়ে ঘোড়ার সামনে পড়ে গেলেন। মোয়াযযম আলী জলদি করে ঘোড়ার বাগ ফেরালেন, কিন্তু ভীতু মেয়েটি থামবার বা পিছু হটে যাবার পরিবর্তে অপরদিকে যাবার চেষ্টা করে ঘোড়ার সাথে এক টক্কর খেলেন এবং উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। তার হাতের মাটির পেয়ালাটি চুরমার হয়ে গেলো পড়ে। মোয়াযযম আলী পূর্ণ শক্তিতে বাগ খিঁচে ঘোড়া থামালেন এবং একলাফে নেমে ছুটে গেলেন মেয়েটার দিকে। মেয়েটি তখন বেহুঁশ তার মুখ তখন চাদরের আবরণমুক্ত হয়ে গেছে। আচানক জিন্দেগির সকল হাসি-আনন্দ যেনো কেন্দ্রীভূত হয়ে এলো মোয়াযযম আলীর চোখে। তিনি চিৎকার করতে চাইলেন কিন্তু তার আওয়াজ বসে গেছে গলার ভিতরে। অস্তিত্বের সেতারের ছিন্ন তার বুঝি আবার জোড়া লেগে গেছে এবং জিন্দেগির বিষণ্ন বেদনাভারাতুর আকাশ-বাতাস আবার পূর্ণ হয়ে উঠছে মুহাব্বতের সঙ্গীতসুরে। আঁধার রাতের মুসাফিরের পথের প্রতিটি পাথর হয়ে গেছে এক একটি আলোকবর্তিকা। তিনি বলে উঠলেন ঃ ফরহাত! ফরহাত!!' এবং দুহাতে নিঃসাড় দেহটি তুলে দিয়ে গেলেন হাবেলীর মধ্যে। তার পা তখন জমিনের উপর, কিন্তু মন বিচরণ করছে আনন্দের সপ্তম আসমানে।

নিচুতলার এক কামরায় ঢুকে তিনি ফরহাতকে শুইয়ে দিলেন এক চারপায়ীর উপরে। যে সব নওকার সেখানে এসে জমা হয়েছে, তারা তার হাতের ইশারায় এদিক-ওদিক সরে গেলো। মোয়াযযম আলীর খুশি এবার রূপান্তরিত হলো পেরেশানি ও আশঙ্কায়। তিনি সাবেরকে আওয়াজ দিয়ে পানি চাইলেন। পানি নিয়ে এলে মোয়াযযম আলী ফরহাতের মুখে দিতে লাগলেন পানির ঝাপটা।

ফরহাত চোখ খুললেন। মোয়াযযম আলীর চোখে সারা সৃষ্টি যেনো পূর্ণ হয়ে গোলো হাসি-আনন্দে। তিনি মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। মোয়াযযম আলী বলে উঠলেন ঃ ফরহাত, ফরহাত, আমি মোয়াযযম আলী।'

ফরহাতের মুখে মৃদু হাসি। তার চোখে জমা হয়ে আসছে অশ্রু। অবশেষে অশান্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো দুচোখ বেয়ে। তিনি কাঁপা আওয়াজে বললেন ঃ আমি আগেও এমনি স্বপ্ন দেখেছি।'

ঃ আমরা দুজনই এমনি স্বপ্ন দেখেছি ফরহাত তোমার খুব চোট লাগেনি তো?'
ঃ না। পড়ে যাবার পর আমার কি হয়েছিলো জানি না। আমি কখন থেকে এখানে?

আমার আম্মাজানের কাছে যেতে হবে। তিনি অসুস্থ। তার জন্য আমি দুধ আনতে যাচ্ছিলাম।' বলতে বলতে ফরহাত উঠে বসলেন।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ না তুমি অমনি থাকো। আমি তোমার আম্মাজানকেও নিয়ে আসছি।'

ঃ না, না, আপনি ওখানে যাবেন না। ও কুঠরি আপনার পা রাখবার মতো নয়।' মোয়াযযম আলী বললেন ঃ হায় ফরহাত! আমি যদি জানতাম তোমরা এখানে! দিল্লি হতে শুরু করে হায়দারাবাদ পর্যন্ত আমি তোমাদের সন্ধান করে বেরিয়েছি।

ফরহাত বললেন ঃ আমার ধারণা ছিলো, এখন আর দুনিয়ার কেউ আমাদের সন্ধান নেবে না। কখনো বা আমি অনুভব করেছি, আপনি আমাদেরকে চিনতেই পারবেন না। আমি হামেশা ভেবেছি, আপনি কোনো দিন ফিরে আসবেন। হাবেলীর মালিক যখন আপনার তরফ থেকে টাকা নিয়ে এলো, তখন আমি তার কাছে আপনার নাম জানতে চেয়েছিলাম। পরদিন দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে আমি আপনাকে দূর থেকে দেখেছিলাম।'

ঃ তা সত্ত্বেও তুমি আমায় তোমাদের পাত্তা দেবার প্রয়োজন বোধকরোনি?'

ঃ আমায় ভয় ছিলো, এ অবস্থায় দেখে আপনি হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবেন আমাদের দিক থেকে। আমি ভাবছিলাম, যদি ফরহাত বলে আমি আমার পরিচয় দেই, আপনি শুনে হাসবেন এবং নওকরদের দিয়ে এ পাগলীকে হাবেলী থেকে বের করে দেবেন। তোমার চোখে যে কোমলতা সেকই মোয়াযযম আলী। আমি যে হুঁশে আছি এবং আপনি যে আমার এত কাছে, তাও যেনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' ফরহাতের কান্না এবার বাঁধ ভাঙলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ফরহাত আমি তোমার আম্মাজনের কাছে যাবো।' ফরহাত গায়ে চাদর জড়িয়ে মোয়াযযম আলীর সাথে বেরিয়ে গেলেন কামরার বাইরে। নওকররা আঙিনায় একত্র হয়ে পেরেশান হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিলো। মোয়াযযম আলীর উপস্থিতি ছাড়া ফরহাতের আর কোন অনুভূতি নেই। তিনি যেনো খুশির সমুদ্রে ভাসমান। তার পা কাঁপছে ঠক ঠক করে। হাবেলীর কোণে মানুষের মাথা পর্যন্ত উঁচু দেয়ালের একটা ছোট দরজা পার হয়ে তারা ঢুকলেন এক সঙ্কীর্ণ আঙিনায়। সামনে কুঠরির দরজা খোলা। ফরহাত ধীরে বললেন ঃ আপনি এখানে দাঁড়ান।'

কুঠরির ভেতর থেকে দুর্বল কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো? ঃ ফরহাত তুমি এত দেরি করলে কোথায়?'

ফরহাত কুঠরির ভিতরে ঢুকলেন। তার মা একটা ময়লা জীর্ণ শয্যায় শায়িতা।

ফরহাত এগিয়ে গিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের মাথাটা রাখলেন মায়ের সিনার উপর।

ঃ ফরহাত! ফরহাত! কি হয়েছে বেটি?' মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বেদনাতুর কণ্ঠে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, বলো কেউ তোমায় কিছু বলেনি তো?'

ফরহাত বললেন ঃ আম্মাজান ওকে পেয়েছি। উনি আমায় চিনেছেন। উনি আমায় দেখে পাগল বলেননি।'

ঃ কাকে পাওয়া গেছে? কি বলছো তুমি?'

ঃ আম্মাজান, ইউসুফ আলীর ভাই আপনাকে দেখতে এসেছেন।' মাথা উঁচু করে মায়ের দিকে তাকিয়ে ফরহাত বললেন।

মোয়াযযম আলী কুঠরির ভিতরে ঢুললেন। মীর্যা হোসেন বেগের বিবির নিঃসম্বল অবস্থা দেখে চোখে তার বাঁধ ভাঙা অশ্রুর জোয়ার এলো। তিনি বললেন ঃ চাচিজান আমি মোয়াযযম আলী।'

আবেদা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। ফরহাত জলদি করে চারপায়ী থেকে জীর্ণ ময়লা বিছানাটা জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন! ঃ আপনি বসুন।'

মোয়াযযম আলী এগিয়ে আবেদার নাড়ির উপর হাত রেখে বললেন ঃ

চাচিজান, আপনার জ্বর খুব বেশি। এখুনি আমি হাকিম ডাকছি। বলে দ্রুত বাইরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি আবেদার কাছের অপর চারপায়ীটার উপর বসলেন। আবেদা তখন ফুলে ফুলে কাঁদছেন। মোয়াযযম আলী ফরহাতকে প্রশ্ন করলেন ঃ চাচিজান কবে থেকে অসুস্থ?'

ফরহাত জওয়াব দিলেন ঃ আব্বাজানের ওফাতের পর থেকে ওর স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ থাকছে। গত মাসে অবস্থা অনেকটা ভালো ছিলো। কিন্তু প্রায় দুহফতা ধরে এখন আবার জ্বর লেগেছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচিজান, এ কুঠরি আপনাদের থাকার মতো নয়। আপনি চলতে পারবেন, না আমার নওকররা এসে চারপায়ীসহ তুলে নিয়ে যাবে?'

আবেদা বললেন ঃ বেটা আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?'

ঃ আমি আপনাকে আর এক কামরায় নিয়ে যাবো। আপনার চাই মুক্ত হাওয়া আর আলো।'

আবেদা বললেন ঃ বেটা কেন তুমি তকলিফ করবে? আমায় এখানেই পড়ে থাকতে দাও।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ 'চাচিজান আমি আপনাকে এক লহহার জন্যও এখানে থাকতে দেবো না। আপনারা কিছুক্ষণ বালাখানায় থাকবেন। তারপর সন্ধ্যার আগেই আমি শহরে আপনাদের জন্য বেশ ভালো বাড়ির বন্দোবস্ত করে দেবো।' শহরের শ্রেষ্ঠ হাকিমের কাছে আমি লোক পাঠিয়েছি। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এসে পৌঁছবেন। হাকিম আসবার আগেই আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাই অপর কামরায়। আমি লোক ডেকে আনছি। মোয়াযযম আলী উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আবেদা বললেন ঃ লোক ডাকতে হবে না। আমি চলতে পারবো। কিন্তু তুমি কেন এতটা তকলিফ করছো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনারা এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কুঠরিতে পড়ে রয়েছেন, এর চাইতে বড়ো তকলিফ আর কি হতে পারে আমার কাছে? ফরহাত ওঠ; তোমার আম্মাজানকে ধরে বালাখানায় নিয়ে চলো।'

আবেদা বললেন ঃ বহুত আচ্ছা বেটা! কিন্তু আমরা শহরে যাবো না।'

ফরহাত বললেন ঃ আমরা বালাখানায় থাকলে আপনার দোস্ত ও মেহমানদের তকলিফ হবে বলেই যদি আমাদের শহরে পাঠাতে চান তাহলে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ শুধু তোমাদের তকলিফের কথাই আমি ভাবছিলাম, কিন্তু যদি বালাখানায় থাকা তোমাদের ভালো লাগে, তাহলে আমার কোনো দোস্ত বা মেহমান তোমাদের এজাযত ছাড়া এ হাবেলীতে প্রবেশ করবেন না।'

কিছুক্ষণ পর আবেদা বালাখানার এক প্রশস্ত কামরায় শায়িতা। ফরহাত তার চারপায়ীর উপর পায়ের কাছে এবং মোয়াযযম আলী তার কাছে একটি কুরসির উপর উপবিষ্ট। আবেদার প্রশ্নের জওয়াবে মোয়াযযম আলী তাকে শোনালেন তার কয়েদি জীবন মুক্তি ও সফরের কাহিনী এবং আবেদার কাছে শুনতে চাইলেন তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

আবেদা জওয়াবে বলতে শুরু করলেন তার মুসীবতের কাহিনী ঃ বেটা, তোমার গ্রেফতারির পর আমাদের দীলে আশঙ্কা পয়দা হলো যে, মীর মীরণ কোনো না কোনো বাহানায় আমাদের ইজ্জতের উপর হামলার চেষ্টা করবে। মহল্লার লোকেরাও আমাদেরকে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ থেকে হিজরত করবার পরামর্শ দিলো। পরদিনই এক কাফেলার সাথে আমরা হিজরত করলাম মুর্শিদাবাদ থেকে। শহরের দরজায় মীর জাফরের সিপাহীরা আমাদের তালাশি নিয়ে যা কিছু ছিলো ছিনিয়ে নিলো। পথে ফরহাতের আব্বাজান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন অসুস্থ শরীরেই তিনি কাফেলার সাথে চললেন, কিন্তু শেষে তার অবস্থা আরো খারাপ হলো। আমাদের সাথে ছিলেন আগ্রার এক নেকদীল ব্যবসায়ী। তিনি আমাদের দিকে খুবই খেয়াল রাখতেন। নিরুপায় হয়ে যখন আমাদেরকে এক বস্তিতে থামতে হলো, তখন তিনি কিছু টাকা ফরহাতের আব্বার হাতে দিয়ে বললেন ঃ আপনার লাখনৌ পৌছবার জন্য এর প্রয়োজন হবে, তাই এই সামান্য অর্থ আপনি রেখে দিন।' তার অনুরোধে ফরহাতের আব্বা সে অর্থ গ্রহণ করলেন। বিদায় নেবার সময় বস্তির জমিদারকে তিনি বিশেষভাবে বলে গেলেন। জমিদারও নেক লোক। তিনি আমাদের দেখাশোনা করতেন। ফরহাতের আব্বাজানের ওফাতের পর আর একটি কাফেলা আসছিলো সেই বস্তির উপর দিয়ে। আমরা এবার তাদের সাথে শামিল হলাম। দুটি নওকর তখনো আমাদের সাথে ছিলো। রাত্রি বেলা আমাদের কাফেলা এসে পৌছলো লাখনৌয়ের কাছে। বহুলোক শহরে না গিয়ে এলো এক সরাইখানায়। আমরাও থাকলাম এখানে। এখানে রাত কাটিয়ে আমরা শহরে গিয়ে খোঁজ করলাম আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের। শুনলাম তারা চলে গেছেন হায়দারাবাদে। সারাদিন আমরা শহরে ঘুরে কাটালাম কিন্তু কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো না। সন্ধ্যায় আবার আমরা ফিরে এলাম এই সরাইখানায়।

'পরদিন আমি এক নওকরের হাতে চিঠি দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলাম

হায়দারাবাদে আমাদের আত্মীয়দের কাছে। সে জিন্দাহ আছে না মরে গেছে তার কোনো খোঁজ নেই আজো পর্যন্ত।

'আমাদের বিশ্বাস ছিলো হায়দারাবাদে খবর গেলে আমাদের কোনো না কোনো আত্মীয় আসবেন আমাদের সাহায্যের জন্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমিতো তাদের পথ চেয়ে রয়েছি। একমাস পর যখন আমাদের পুঁজি ফুরিয়ে এলো, তখন অপর নওকরটিও পালিয়ে গেলো। একদিন সরাইর মালিক জানালেন কয়েকজন লোক হায়দারাবাদ যাচ্ছেন। আমরা আত্মীয়দের কাছে চিঠি দিলে তারা পৌঁছে দেবেন। তাদের হাতে আমি চিঠি দিয়ে দিলাম, কিন্তু আজও পাইনি তার কোনো জওয়াব। তারপর আমার মনে হতে লাগলো ঃ জামানার নকশা বদলে গেছে। আমাদের আত্মীয়েরা জেনে শুনেই আমাদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না। এরপরও তাদের কাছে এই অবস্থায় যেতে বাধলো আমার আত্মসম্মানে।'

'তারপর একদিন আবার আমার মনে হলো, হয়তো আমার কোনো খবরই তাদের কাছে যায়নি। তাই আমি হায়দারাবাদে যাবার জন্য তৈরি হলাম। কিন্তু লাখনৌ থেকে কাফেলা রওয়ানা হবার দুদিন আগে আমার জ্বর হলো। তাই সফরের ইরাদা মুলতবি রাখতে হলো আমায়। তারপর আবার আমার খেয়াল হলো ঃ যদি আমার আত্মীয়রা আমার তরফ থেকে কোনো খবর না-ই পেয়ে থাকেন, তথাপি তাদের কর্তব্য ছিলো মুর্শিদাবাদে গিয়ে আমাদের সন্ধান করা। তাহলে তারা অবশ্যি জানতে পারতেন যে, আমরা লাখনৌ চলে এসেছি। তখন আমি ফয়সালা করলাম যে, খোদা ছাড়া আর কারুরই সাহায্যের সন্ধান করবো না। সরাইর মালিক আমাদের অবস্থা দেখে আমাদের প্রতি ছিলেন খুবই মেহেরবান। তার বিবিও ছিলেন বহুত রহমদিল। তিনি এই বস্তি থেকে, আবার কখনো শহর থেকে মেয়েদের সেলাইয়ের কাজ এনে দিতেন আমাদের। তিনি সরাই বিক্রি করে দিলে আমার খুব দুঃখ হলো, কিন্তু নয়া মালিকও আমাদের খুব খেয়াল রাখতেন। কয়েক মাস ধরে সরাই বিলকুল বিরান হয়ে গেলো এবং এখানে আমাদের ভয় লাগতো, কিন্তু এ বস্তির লোক খুবই শরীফ। তাদের আচরণের জন্যই আমরা শহরে কোনো জায়গা খুঁজবার প্রয়োজনবোধ করিনি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ চাচিজান, আমার একটিমাত্র অভিযোগ ফরহাত জেনেশুনে আমায় খোঁজখবর দেয়নি। ফরহাত জানতো যে, আমি এখানে এসেছি।'

আবিদা জওয়াব দিলেন ঃ বেটা তুমি এখানে তা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। ফরহাতের মনে ভয় ছিলো, এই অবস্থায় আমাদেরকে দেখে তুমি মনে কষ্ট পাবে, আর হয়তো তুমি চিনতেই পারবে না আমাদের।'

এর মধ্যে সাবের দরজার কাছে এসে আওয়াজ দিলো ঃ জনাব, হাকিম সাহেব তশরিফ এনেছেন।'

ঃ তাকে উপরে নিয়ে এসো।' মোয়াযযম আলী বললেন। ফরহাত জলদি করে উঠে পাশের কামরায় চলে গেলেন।

এক বৃদ্ধ হাকিম এসে কামরায় প্রবেশ করলেন। নিজে উঠে মোয়াযযম আলী হাকীম সাহেবকে কুরসি এগিয়ে দিলেন। হাকিম আবেদার নাড়ী পরীক্ষা করে কয়েকটি প্রশ্ন করার পর মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ আমি এখখুনি গিয়ে দাওয়াই পাঠাচ্ছি। আশা করি কালই জ্বর ছেড়ে যাবে। আর কোনো পরিবর্তন না হলে কাল এসে আমি আবার দেখবো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ইনি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আপনি রোজ দুবার একেক দেখবার জন্য তাশরিফ আনাবেন। আমি দুবেলাই আপনার জন্য ঘোড়া পাঠিয়ে দেবো।

হাকিম সাহেব উঠে বললেন ঃ বহুত আচ্ছা, আমি সন্ধ্যার দিকে আবার আসবো।'

মোয়াযযম আলী তার সাথে কামরা থেকে বেরিয়ে দরজায় দণ্ডায়মান সাবেরকে বললেন ঃ সাবের, দীলাওয়ার খানকে বলো ও হাকিম সাহেবের সাথে গিয়ে দাওয়াই নিয়ে আসতে। তারপর তিনি জিব থেকে কয়েকটি মুদ্রা বের করে হাকিমের সামনে ধরে বললেন ঃ কবুল করুন।'

হাকিম জওয়াব দিলেন ঃ না, রোগিনী সুস্থ হবার আগে আমি কোনো পারশ্রমিক নেবো না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ হাকিম সাহেব, এ আপনার চিকিৎসার পারিশ্রমিক নয়। শহর থেকে এখানে আসতে গিয়ে যে তকলিফ করেছেন আপনি, তারই জন্য এ তোহফা। রোগিনী ভালো হয়ে গেলে আমি প্রাণখুলে খেদমত করবো আপনার।'

মোয়াযযম আলীর অনুরোধে হাকিম কয়েকটি মুদ্রা তার হাত থেকে তুলে নিয়ে না দেখেই জিবের মধ্যে ফেললেন, কিন্তু হাবেলীর বাইরে গিয়ে সোনাচাঁদির মুদ্রাগুলো বের করে দেখে দীলাওয়ার খানকে তিনি বললেন ঃ তোমার মনিবকে বহুত আমীর লোক বলে মনে হচ্ছে।'

দীলাওয়ার খান গর্বের সাথে জওয়াব দিলো ঃ জনাব, আমার মালিক বাদশাহ।'

ঃ কিন্তু মহিলাটিকে তো খুব গরিব মনে হচ্ছিল?'

দীলাওয়ার খান জওয়াব দিলো ঃ জনাব আবার যখন আপনি তশরিফ আনবেন,

তখন আর ওকে আপনার গরিব মালুম হবে না। খান সাহেব বালাখানার কামরা ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে নেমে এসেছেন নিচে।'

দীলাওয়ার খানের অনুমান ঠিকই হলো। সন্ধ্যাবেলায় যখন হাকিম আবেদাকে দেখতে এলেন তখন তার কামরা দামী সাজসরঞ্জামে ভরে উঠেছে। রোগিনীর গায়ে জীর্ণ পোশাকের পরিবর্তে উঠেছে দামী লেবাস। তিনি একটি খুবসুরত পালঙ্কে শুয়ে আছেন। হাকিম, নাড়ি ধরে দেখলেন-জ্বর অনেকটা কম। তিনি বললেন ঃ আমার প্রত্যাশার চাইতে আগেই ইনি সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে।'

পরদিন আবেদার জ্বর ছেড়ে গেলো এবং তার মানসিক প্রফুল্লতা ফিরে না। তৃতীয় দিন আবার জ্বর হলো, কিন্তু তেমন তীব্র নয়। পঞ্চম দিনে হাকিম ঘোষণা করলেন যে, ইনশাআল্লাহ্ তার জ্বর হবার সম্ভাবনা নেই।

বালাখানার সবগুলো কামরা ফরহাত ও তার মা'র জন্য ছেড়ে দিয়ে মোয়াযযম আলী নেমে এলেন নিচুতলার এক কামরায়। যতো দিন আবেদা অসুস্থ ছিলেন, তিনি হররোজ অসংখ্যবার তার কামরায় হাজিরা দিতেন। কিন্তু আবেদা সুস্থ হবার পর তার কাজকর্মে এলো পরিবর্তন। কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া বালাখানায় যেতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন। ফরহাতের মা কখনো ডাকলে যেতেন এবং ভিতরে ঢুকবার আগে আওয়াজ দিতেন দরজায় দাঁড়িয়ে। এতদিন যে ফরহাত মায়ের সামনে তার সাথে কথা বলেছেন অবাধে, এখন তার আওয়াজ শুনলেই তিনি চলে যান অপর কামরায়। মোয়াযযম আলীর নওকরদের মধ্যে সাবের ছাড়া আর কারুরই উপরে যাওয়া আসার এজাযত নেই।

এক সন্ধ্যায় সাবের খানা এনে দিলে মোয়াযযম আলীর মুখে তা রোজকার চাইতে সুস্বাদু লাগলো। তিনি বললেন ঃ আজকের সালনে তুমি কি দিয়েছো?'

সাবের ভীত হয়ে জওয়াব দিলো ঃ জী আমি বেকসুর। আমি কিছুই দেইনি। আজকের সালন পাকিয়েছেন ছোট বিবি। আমি তা চেখেও দেখিনি। ভোরবেলা যখন উপরে খানা নিয়ে গেলাম তিনি রেগে বললেন ঃ আজ সন্ধ্যায় আমি খানা পাকাবো। সব জিনিসপত্র উপরে নিয়ে এসো। আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, আপনি আমার ছাড়া আর কারুর হাতের তৈরি খানা পছন্দ করেন না, কিন্তু তিনি বললেন........... তিনি বললেন..............

'কি বললেন তিনি?'

ঃ কিছু না। তিনি বলছিলেন, আমি নাকি গোশতকে ডালের চাইতেও খারাপ করে ফেলি।'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ সাবের, উনি বিলকুল ঠিকই বলেছেন।' কয়েকদিন পর আমি আজ পেট পুরে খাচ্ছি। কিন্তু ওকে তকলিফ দেওয়া ঠিক নয়।

ঃ জী, আমি বলেছিলাম যে, আপনি রাগ করবেন, কিন্তু তিনি আমায় হাসালেন। উপরে বাবুর্চিখানা নেই। উনি জিদ ধরেছেন, যেনো আপনি নিচে বাবুর্চিখানার সামনে পর্দার জন্য দেয়াল তুলে দেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ওকে বলবে, আমি খুব শিগগির দেয়াল বানিয়ে দেবো। ওর নিচে আসতে কোনো তকলিফ হবে না। কিন্তু তিনি আমাদের খানা পাকাবেন, এটা আমি চাই না। তবে ইচ্ছা করলে বাবুর্চিখানায় এসে তিনি তোমার জন্য দেখাশোনা করতে পারেন।'

ঃ আমার দেখাশোনা?' পেরেশান হয়ে সাবের প্রশ্ন করলো।

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার কথা হচ্ছে, খানা পাকাতে গিয়ে তুমি তার নির্দেশ নিতে পারবে, আর হয়তো তোকেও কিছু শিখিয়ে দেবে। কেমন?'

খানা পাকানোর ব্যাপারে কারো সমালোচনা বা হস্তক্ষেপ সাবের পছন্দ করতো না। এ হস্তক্ষেপ ফরহাত ছাড়া আর কারুর তরফ থেকে হলে অবশ্যি একটা কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। তখনি সে বললো ঃ জনাব এ খানা সত্যি খুব সুস্বাদু হয়েছে, না আপনি আমায় বেওকুফ বানাচ্ছেন?'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ সাবের তুমি বড়োই সাদা দীল।'

সাবের বললো ঃ জনাব উনিও তাই বলেছিলেন।

ঃ কে?

ঃ ছোট বিবিজী। তিনি আরো বলছিলেন, আমার মাথাটা নাকি বিলকুল খালি।'

কয়েকদিন পর নিচতলার কামরাগুলোর ও বাবুর্চিখানার সামনে পর্দার জন্য দেয়াল তৈরি হয়ে গেলো এবং মেহমানদের জন্য হাবেলীর ভিতরে সদর দরজার কাছে খোদাই করা হলো তিনটি নতুন কামরার বুনিয়াদ।

৪

ঘোড়ারতজারত শুরু করবার আগে মোয়াযযম আলী অনুভব করলেন যে, তার একাকি ও নির্বান্ধব অবস্থার অনুভূতি দূর করবার জন্য কোনো একটা কাজে ব্যস্ত কার প্রয়োজন, কিন্তু ফরহাতকে খুঁজে পাওয়ার পর তিনি গড়ে তুলেছেন উৎহ-উদ্দীপনা ও আশা আকাঙক্ষার এক নতুন দুনিয়া। সফল ব্যবসায়ী হিসাবে তিচেষ্টা করছেন নিজের ব্যক্তিত্বকে অপরের জন্য যতোদূর-সম্ভব কল্যাণকর র তুলতে।

এক সায় তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন, কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আহাবেলীর মধ্যে।

ঃ এ তার কি ব্যাপার?' ঘোড়া থেকে নেমে তিনি এক নওকরকে প্রশ্ন করলেন।

নওকরওয়াব দিলো ঃ জনাব, শের আলী খান ফিরে এসেছেন।'

ঃ আমিনতে চাচ্ছি, এ গাড়িগুলো কোথেকে এলো আর শের আলীই বা কোথায়?'

শের অ এক গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। এগিয়ে গিয়ে মোয়াযযম আলীর সাথেমোসাফেহা করে বললেন ঃ এ গাড়িগুলো আপনারই। বেনারস থেকে ঘোড় দাম উসুল করে আমি কাপড় খরিদ করে এনেছি। লাখনৌয়ে বেনারসী কাড়ের খুব চাহিদা। ইনশাআল্লাহ্ এতে আমাদের যথেষ্ট ফায়দা হবে।'

মোয়ায আলী বললেন ঃ বেনারসে ঘোড়ার পর আপনি আমায় কাপড়ের তেজারতেওাগাবেন?'

শের আ জওয়াব দিলেন ঃ বেনারসে ঘোড়া পাওয়া গেলে আমি কাপড় আনতাম না

ঃ আর পড় না পেলে কি আনতেন?'

ঃ কাপকেন বিকবে না? আপনি দেখে দিন না!

মোয়ায আলী বললেন ঃ আমি মহীশূর থেকে হাতী আনার চিন্তা করছিলাম, আর আপনি বেনারস থেকে আনলেন কাপড়।'

শের আ নিশ্চিত মনে বললেন ঃ কাপড় কেন খরিদ করলাম তা আপনাকে বলবো।

ঃ আমিচ জানি?'

ঃ আমার ভয় ছিলো, আপনি আবার কারবার চালু রাখার ইরাদা বদলে না দেন। এ কাপড় নিয়ে আপনার পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ্ দুচার দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাবে আর তাতে আমাদের মুনাফা হবে যথেষ্ট।

ঃ কিন্তু এখানে ওসব কিনবে কে?'

ঃ আপনি দেখতে থাকুন। আমার বিশ্বাস, এ হাবেলী লাখনৌর এক গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হবে।

মোয়াযযম আলী আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ মীর্যা সাহেবের বিবি ও সাহেবজাদিকে পাওয়া গেছে।'

ঃ মোবারক হোক। কোথায় পেলেন?

ঃ আপনার বিশ্বাস হবে না। ওরা এই হাবেলীরই এক কুঠরিতে থাকতেন।'

ঃ এখন তারা কোথায়?'

ঃ আমি বালাখানা তাদের ছেড়ে দিয়েছি।'

পরদিন হাবেলীর মধ্যে শহরের কাপড় বিক্রেতাদের ভিড় জমলো এবং এক দালাল কাপড়ের থান নিলাম করতে লাগলো।

মোয়াযযম আলী খুব সুন্দর রঙের রেশমি কাপড়ের দুটি থান বের করে সাবেরকে বললেন ঃ সাবের এগুলো উপরে দিয়ে এসো।' তারপর আরো কয়েকটা থান বের করে দীলাওয়ার খানকে বললেন ঃ এগুলো বস্তির চৌধুরীর বাড়িতে পৌছে দিয়ে বলবে ঃ এগুলো যেনো তিনি ভাগ করে দেন বস্তির গরিব-মিসকীনকে।'

তিনদিনের মধ্যে মোয়াযযম আলীর সমুদয় মাল বিক্রি হয়ে গেলো। শের আলী খান তাকে হিসাব দেখিয়ে বললেন ঃ কেমন হলো আমাদের এ তেজারত? যদি আমরা ধীর সুস্থ হয়ে এগুলো বিক্রি করতাম তাহলে মুনাফা হতো দ্বিগুণ। এখনো শতকরা দশগুণ মুনাফা মামুলি ব্যাপার নয়। এবার আপনার ইরাদা কি?

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি ফখরুদ্দিনকে লিখে দিয়েছি তিনি দুশো ঘোড়া খরিদ করে এখানে রওয়ানা করে দেবেন। তারপর আমার ইরাদা, আমরা মহীশুর থেকে কিনে আনবো হাতীর দাঁত, চন্দন আর গরম মসলা। আমার ধারণা ছিলো, আকবর খান এলে তাকে আপনার সাথে হায়দারাবাদ পাঠাবো। তারপর চিন্তা করলাম, তাতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।'

শের আলী বললেন ঃ আপনি এজাযত দিলে হায়দারাবাদ থেকে ঘোড়া আসবার আগেই আমি একবার বেনারস ঘুরে আসতে পারি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার বিশ্বাস, এ কাপড়ের ব্যাপারে

আমাদের খুবই পেরেশান করবে। তার চাইতে আপনি কিছুদিন আরাম করুন, তাই কি ভালো নয়? এ বয়সে কাজ করা আপনার পক্ষে ঠিক হবে না।"

শের আলী জওয়াব দিলেন : কর্মব্যস্ততাই আমার সবচাইতে বড়ো আরাম। শুধু বেকার বসে কাটানোতেই আমি ক্লান্তি অনুভব করি।'

ঔ

মোয়াযযম আলীর তেজারতী কারবার দিনের পর দিন প্রসার লাভ করতে লাগলো। সরাদিন তিনি থাকেন কারবারের দেখাশোনায় ব্যস্ত, পড়াশুনার ঝোঁকও তার রয়েছে। জাফরের কাগজপত্র ছাড়া কিতাবপত্রও এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে তার কামরায়। কোনো নওকর এক জায়গার কাগজপত্র বা কিতাব সরিয়ে রাখতে পারে না অন্য জায়গায়। কখনো কখনো তিনি নিজে হাজির থেকে কামরা সাফ করান নওকরকে হুকুম দিয়ে। কয়েকদিন পর আবার সেই একই অবস্থা।

সারাদিনের কাজের শেষে এক রাত্রে মোয়াযযম আলী কামরায় ফিরে দেখেন প্রত্যেকটি জিনিস অপ্রত্যাশিত রূপে সাজানো গোছানো। কিতাবগুলো আলমারীতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কাগজপত্র মেঝের উপর কেতাদুরস্ত করে গোছানো। বিছানার চাদর ও বালিশের গেলাফ বদলে গেছে; আর অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো গায়েব হয়ে গেছে কামরা থেকে। সাবেরকে আওয়াজ দিয়ে মোয়াযযম আলী কাগজপত্র ও কিতাবের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালেন তার মুখের দিকে। সাবের ভীতির স্বরে বললো : জনাব আমার কোনো কসুর নেই। ছোট বিবিকে আমি মানা করেছিলাম কিন্তু তিনি বললেন, আমি নাকি একটা আস্ত জানোয়ার। আমার বড়োই বেইজ্জতি করলেন তিনি। ছোট বিবি বললেন, আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই আর আমি নাকি আস্তাবলে থেকে মানুষ হয়েছি। আমি বললাম, সরকার রাগ করবেন। কিন্তু তিনি বললেন : যাও এখান থেকে। আমি নিজে সব সাফ করবো। তোমার সরকারকে আমার মোটেই ভয় নেই। তখন আমি আর কি করতে পারি, জনাব!'

মোয়াযযম আলী কষ্টে হাসি চেপে বললেন : আচ্ছা যাও, আমার খানা নিয়ে এসো।'

কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে যখন খানা নিয়ে এলো, তখন মোয়াযযম আলী দুষ্ট হাসি হেসে বললেন : আচ্ছা সাবের, ছোট বিবি তোমায় কি বলেছিলেন?'

: জী তিনি বলেছিলেন, তুমি বিলকুল জানোয়ার। কোনো আস্তাবলে থেকে

তুমি বড়ো হয়েছো।' আমি যেন একটা ঘোড়া। তাছাড়া জনাব, তিনি আপনার কথাও অনেক কিছু বলেছেন।'

ঃ কি বলেছেন?'

ঃ তা বলবো না আপনি রাগ করবেন।'

ঃ না না বলো।'

ঃ জী উনি বলছিলেন ঃ এটা কি থাকার কামরা না ভাঙাচোরা জিনিসের দোকান?'

পরদিন ভোরে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে মোয়াযযম আলীর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেললো। তিনি কয়েকটা কিতাব আলমারী থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেললেন বিছানার উপর। তারপর মেঝের উপর থেকে কতকগুলো কাগজ ছড়িয়ে রাখলেন এদিক ওদিক। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন সবই তেমনি সাজানো।

এমনি করে হররোজ তিনি অনুভব করেন যে তার অনুপস্থিতিতে ফরহাত তার কামরায় তদন্ত করে যান। কিন্তু একদিন দিল্লীর শহরের এক ব্যবসায়ীর সাথে এক চুক্তি করে ঘরে ফিরে দেখলেন কাগজের টুকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে, বিছানার চাদর এলোমেলো, রাতের বেলা যে কিতাবখানা তিনি পড়েছেন তা তেমনি পড়ে রয়েছে বালিশের পাশে। সাবের এসে বললো ঃ জনাব খানা নিয়ে আসি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ না আগে বলো, ছোট বিবি আজ বাবুর্চিখানায় এসেছিলেন?'

ঃ না জনাব। আজ তিনি সারাদিন নিচে নামেননি। ভোরে যখন খানা নিয়ে গেছি তখন তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। বড়ো বিবি বললেন তার জ্বর।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ যাও দীলাওয়ার খানকে এখখুনি গিয়ে হাকিম ডেকে আনতে বলো। না, দাঁড়াও আমি নিজেই যাচ্ছি।'

প্রায় এক ঘন্টা পর মোয়াযযম আলী বালাখানার এক কামরার কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলেন ঃ আম্মাজান হাকিম সাহেব এসেছেন।'

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো ঃ 'হাকিম সাহেব? আচ্ছা নিয়ে এসো।'

মোয়াযযম আলীর ইশারায় হাকিম কামরায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার বাইরে।

আম্মাজান আওয়াজ দিলেন ঃ মোয়াযযম আলী! বেটা! ভিতরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

মোয়াযযম আলী কামরায় প্রবেশ করলেন। ফরহাত চাদরে মুখ ঢেকে শয্যার

উপর শায়িতা। মোয়াযযম আলী এক কুরসি টেনে ফরহাতের চারপায়ীর পাশে রেখে হাকিম সাহেবকে বসতে বললেন।

হাকিম ফরহাতের নারি দেখে মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই মামুলি জ্বর। ইনশাআল্লাহ্ শিগগির ভালো হয়ে উঠবেন।

তারপর তিনি জিব থেকে একটি চাঁদির ডিবা বের করে তা থেকে চারটি বড়ি মোয়াযযম আলীর হাতে দিয়ে বললেন ঃ এর দুটো বড়ি এখ্খুনি খাইয়ে দিন আর দুটো খাওয়াবেন দুপুর রাতে। ভোর পর্যন্ত জ্বর ছেড়ে না গেলে নওকরকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে।'

কিছুক্ষণ পর হাকিমকে বিদায় দিতে গিয়ে হাবেলীর দরজায় দাঁড়িয়ে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ হাকিম সাহেব রোগীনীকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই তো? আমি কিন্তু খুবই পেরেশান হয়ে পড়েছি।'

হাকিম জওয়াব দিলেন ঃ উদ্বেগের কোনোই কারণ নেই। আমার বিশ্বাস উনি খুব শিগগির সুস্থ হবেন।'

অনেক রাত মোয়াযযম আলীর চোখে ঘুম এলো না। ভোরে নামাজ পড়ে তিনি উপরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। ফরহাতের মা দরজায় এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে?'

ঃ আমি চাচিজান ফরহাতের তবিয়ত কেমন?'

আবেদা দরজা খুলে হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বেটা ফরহাত এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তুমি রাতের বেলা খামাখা তকলিফ করেছো।

চাচিজান'..........! মোয়াযযম আলী গর্দান নিচু করে বললেন।

ঃ হ্যাঁ বেটা!'

ঃ আমি..........!'

ঃ হ্যাঁ বেটা, বলো।'

ঃ কিছু না চাচিজান আমি বড়োই পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। বলে মোয়াযযম আলী নিচে নেমে গেলেন। কামরায় ঢুকে মেঝের সামনে বসে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। কয়েক পংক্তি লিখে তিনি কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে।

আবার একটা কাগজ নিয়ে তিনি লিখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর লেখা কাগজটা ভাঁজ করে রেশমি সুতা দিয়ে বেঁধে তিনি ডাকলেন সাবেরকে। সাবের ছুটে এলে মোয়াযযম আলী তাকে কাগজটা দিয়ে বললেন ঃ এটা উপরের চাচিজানের কাছে দিয়ো এসো। ছোট বিবির কাছে দিও না যেনো,

তাহলে তোমার ভালাই হচ্ছে না। তিনি গাল দেবেন তোমায়।'

ঃ জী না, আমি অতটা বেওকুফ নই।'

ঃ আর দেখো জওয়াবের জন্য দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ইন্তেজার করবে।'

ঃ তাই যদি হয় তাহলে তো আমায় সাদা কাগজ আর দোয়াত-কলম নিয়ে যেতে হয়।'

ঃ না, না তুমি যাও।'

সাবের কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এসে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বললো ঃ জনাব উঠুন। বড়ো বিবি আপনাকে উপরে ডাকছেন। আমি বলছিলাম, আপনাকে তকলিফ দিয়ে কাজ নেই আর আপনি নাশতা করেননি, আমি জওয়াব এনে দেবো আপনাকে। কিন্তু তিনি তা না শুনে উলটো হাসতে লাগলেন আর ছোট বিবি বললেন, আমি নাকি একটা আস্ত জানোয়ার।'

ঃ তুমি ছোট বিবিকে তো চিঠিটা দেওনি?'

ঃ জী না। এবার আপনিও আমায় জানোয়ার বানালেন। আমি নিজের তরফ থেকেই খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছি। বড়ো বিবি চিঠি পড়ে দেখালেন তাকে। আমি বহুত বলেছি যেন চিঠিটা ছোট বিবিকে না দেখান। কিন্তু তিনিও আজ আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।'

মোয়াযযম আলী কামরা থেকে বেরিয়ে বালাখানায় গেলে ফরহাতের মা প্রতীক্ষা করছিলেন দরজায় দাঁড়িয়ে। শরমে মোয়াযযম আলীর গাল ও কান লাল হয়ে উঠেছে।

আবেদা বললেন ঃ এসো বেটা ভিতরে এসো।'

মোয়াযযম আলী দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে কামরায় প্রবেশ করলেন।

আবেদা বললেন ঃ ফরহাত পাশের কামরায় রয়েছে। তুমি বসো।' তিনি কুরসির উপরে বসলে আবেদা দুহাত তার মাথার উপর রেখে অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ বেটা ফরহাত তোমারই। সে হামেশা তোমারই ছিলো। আমার জন্য এর চাইতে বড়ো খুশি আর কি হতে পারে? আমি কয়েকদিন ধরে ইন্তেজার করেছি তোমার পয়গামের।

কখনো কখনো আমার খেয়াল এসেছে জামানা আমাদের জীবনে এনেছে বিপর্যয়। আমি ভেবেছি, তুমিতো ইচ্ছা করলেই সম্পর্ক পাতাতে পারো লাখনৌয়ের সবচাইতে বড়ো খান্দানের সাথে।'

ঃ চাচিজান! মোয়াযযম আলী অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ আমার মনে ছিলো

শুধু ভয়, আমি তাড়াহুড়া করলে আপনি হয়তো ভাববেন, আমি আপনাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফায়দা উঠাতে চাচ্ছি। আজো চিঠি লিখতে গিয়ে আমার হাত কাঁপছিলো।'

ঠ

অষ্টম দিনে লাখনৌ শহরের বড়ো বড়ো পরিবারে আলোচনা হতে লাগলো যে, যে অসহায় যুবতী তার মাকে নিয়ে শহরের বাইরে এক বস্তির সরাইখানায় অন্তহীন অভাব ও দুস্থতার ভিতর দিয়ে দিন গুজরান করছিলেন, এক লক্ষপতি নওজোয়ান তাকে শাদি করেছেন।

ফরহাত দুলহানের লেবাস পরে বস্তির মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বসে আছেন বালাখানার এক কামরায়। মোয়াযযম আলী নিচে দাওয়াতে ওলিমায় সমাগত মেহমানদের অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত। বস্তির মেয়েরা সবাই ঘরে চলে গেলে ফরহাত কুরসি টেনে বসলেন বাইরের দিকে খোলা জানালার সামনে। আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ফরহাত ধীরে উঠে মাঝখানের দরজাটা খুলে পাশের কামরায় উঁকি মারলেন। আবেদার ঘরের চেরাগ কখন নিভে গেছে। ঃ আম্মাজান!' তিনি আস্তে আওয়াজ দিলেন। মায়ের কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি ফিরে কুরসির উপর বসলেন। চাঁদ লুকিয়েছে এক টুকরা কালো মেঘের আড়ালে। খানিকক্ষণ পরেই মেঘের টুকরাটা ভেসে গেলো এবং চাঁদের মুগ্ধকর স্নিগ্ধ কিরণধারা আর একবার আলোর প্লাবন বইয়ে দিলো তামাম দুনিয়ায়। দরজার দিকে পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। ফরহাত ফিরে তাকালেন। মোয়াযযম তার স্বপ্নের শাহজাদা মোয়াযযম- তার সামনে দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি অবনত হলো।

মোয়াযযম আলী আর একটি কুরসি টেনে তার পাশে বসতে বসতে বললেন ঃ ফরহাত! কল্পনায় আমি দেখেছি তোমার হাজারো তসবির, কিন্তু তুমি তার চাইতে কতো সুন্দর।'

ফরহাত নিজের মুখ দুহাতে লুকালেন।

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ তোমার হাতও সুন্দর খুব সুরত।'

ফরহাত জলদি করে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলেন এবং হাত লুকালেন উড়নীর নিচে।

মোয়াযযম আলী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন ঃ ফরহাত দেখো চাঁদের উপর এসেছে মেঘের আবরণ কিন্তু তাতে স্নিগ্ধতা ও আকর্ষণের কোনো

তফাত হয়নি। মীর হাবীবের কয়েদখানায় থেকে কখনো কুঠরির দরজা দিয়ে আমি দেখেছি চাঁদের ঝলক তখন ভেবেছি হয়তো তুমিও তাকিয়ে আজ চাঁদের দিকে মহলের কোনো জানালায় দাঁড়িয়ে। তারপর কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে যখন আমি জানলাম, আমাদের জিন্দেগির পথ আলাদা হয়ে গেছে পরস্পরের থেকে, তখন আর চাঁদ ও সিতারার দিকে আমি আর তাকাইনি, কিন্তু তুমি আমার দৃষ্টির আড়ালে যাওনি কোনোদিন। মোয়াযযম আলী তার মুখের নেকাব খুলে ফেললেন। ফরহাতের মুখে হাসি। কিন্তু খুবসুরত চোখ দুটি তার লজ্জাভারে আনত।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ফরহাত তোমার মনে পড়ে সেদিন তোমাদের কুতুবখানায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আর তুমি আমায় দেখে ভয় পেয়ে গেলে, আবার যেদিন মারাঠা তোমাদের মহলে হামলা করলো আর আমি তোমার ভর্ৎসনা করলাম। কিন্তু তখন তুমি ছিলে খুব ছোট।'

ফরহাত জওয়াব দিলেন ঃ এসব স্মৃতিই তো আমার জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো পুঁজি।'

মোয়াযযম আলীর মুখ আচানক বিষণ্ণ হয় গেলো। তিনি নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। ফরহাত কয়েকবার আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন

ঃ কি ভাবছেন আপনি?'

ঃ কিছু না' মোয়াযযম আলী হাসবার চেষ্টা করে জওয়াব দিলেন।

ঃ আপনি পেরেশান হচ্ছে।' ফরহাত বললেন।

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ পেরেশানি আমাদের উত্তরাধিকার। ফরহাত যে দিন আমি বাংলার ফউজের চাকরিতে শামিল হলাম, সেদিন থেকে আমার বেতনের বেশিরভাগ আমি ব্যয় করেছি নিস্ব ও গৃহহারা মানুষের জন্য। একদিন এক দোস্ত আমায় বললো ঃ যদি তুমি নিজের কামাই এমনি করে লুটিয়ে দিতে থাক তাহলে তোমার বিবির মোহর দেবে কোথেকে? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আমার জীবন-সঙ্গিনীর মোহর হবে এমন এক মুলুক যা হবে ভিতর ও বাইরের বিপদ থেকে আজাদ। ফরহাত, যে তলোয়ার আমি একদিন ধরেছিলাম আমার দেশের সরহদ হেফাজত করবার জন্য, তা আজ ভেঙে গেছে। আজ এ মুলুকের এমন কোনো কোণ নেই যেখানকার বাসিন্দা তাদের ভাবী বংশধরদের পয়গাম দিতে পারবে, তাদের ইজ্জত ও আজাদি সংরক্ষিত। অন্ধকার রাতের মুসাফিরি আমরা, শুধু খোদা জানেন আমাদের শেষ মনজিল কোথায়। এই মুহূর্তে আমার এ ধরনের কথা বলা উচিত নয় কিন্তু হায়! আমি যদি তোমায় দিতে পারতাম ভবিষ্যতের কোনো উৎসাহব্যঞ্জক পয়গাম। ফর্‌হাত! ধরো, আমি যদি তোমায়

বলি, এই মুহূর্তে অথবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি যাচ্ছি মারাঠার বিরুদ্ধে এক ভীষণ যুদ্ধে হিস্সা নিতে, তুমি কি মনে করবে?'

ফরহাত জওয়াব দিলেন ঃ আমি?- আমি বলবো, আমি মীর্যা হোসেন বেগের বেটি, আসাফ ও আফযলের বোন। আমার স্বামীর কি করে ধারণা হতে পারে যে, কওমের দুশমনের বিরুদ্ধে লাড়াইয়ের হিস্সা নিতে আমি তাকে বাধা দেবো?

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ফরহাত তোমায় নিয়ে আমি গর্বিত।

ফরহাত হাসছেন। তার হাসির প্রতিটি মুহূর্তে যেনো মোয়াযযম আলীর কাছে অতীতের বহু মাস, বহু বর্ষের চাইতেও ভারী মনে হচ্ছে। তিনি ভুলে গেছেন যুদ্ধের ময়দানের দুঃখ-ক্লেশ আর কয়েদখানার বন্দী-জীবনের নিঃসীম যন্ত্রণা। তার সামনে প্রসারিত শুধু বর্তমান। তার চোখে সারা দুনিয়া যেনো সীমিত হয়ে গেছে তার কামরার চার দেয়ালের ভিতরে। তার প্রতিটি কোণ আজ ফরহাতের মুখে মুগ্ধকর হাসিতে উজ্জ্বল। কামরার বাইরের দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে অতীতে ও ভবিষ্যতের সকল অন্ধকার।

ফরহাত বললেন ঃ আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

ঃ বলো।'

ঃ না, বলবো না। আপনি কিছু মনে করবেন।'

ঃ আল্লাহ্‌র কসম, বলো, নইলে আমার খুবই পেরেশানির কারণ হবে।'

ঃ আচ্ছা বলুন, সেই মেয়েটির নাম কি?

ঃ কোন্ মেয়েটি?'

ঃ যার সাথে হায়দারাবাদের পথে আপনার দেখা হয়েছিলে।'

ঃ শেখ ফখরুদ্দিনের ভাগ্নী? তার নাম বিল্‌কিস্।

ফরহাত তাঁর মুখে দুষ্টুমি ভরা হাসি টেনে এনে বললেন ঃ না জনাব, আমি বড়ো সাহেবজাদির কথা বলছি।

ঃ তার নাম অযরা, কিন্তু এ মুহূর্তে তার খেয়াল তোমার মনে কি করে এলো?'

ঃ ব্যাস, এমনি। আচ্ছা, বলুন তো, তিনি সত্যি সত্যি ভারী খুবসুরত।

ঃ তিনি খুবসুরত, এ কথা আমি কবে বলছি? আমি তো ভালো করে দেখিও নি তাকে।

ঃ আপনি তো বলেছিলেন, ছোট মেয়েটির রূপ খুবই প্রিয়দর্শন। তিনিও তো তারই বোন।'

ঃ হাঁ, হতে পারেন তিনিও খুবসুরত, কিন্তু আমি তোমার মতলব বুঝতে

পারছি না।'

ফরহাতের চোখে এক দুষ্টুমী-ভরা হাসি খেলে গেলো। তিনি বললেন ঃ আমি ভাবছিলাম, আতিয়ার জায়গায় আমি হবে কিহতো। হায়দারাবাদ থেকে ফিরে এসে আপনি কখনো তার কথা ভাবেননি?

মোয়াযযম আলী হেসে জওয়াব দিলেন ঃ ফরহাত, আমার দীলে ও মগজে যদি ভাবনা-চিন্তার কোনো স্থান থাকে, তা' ভরপুর হয়েছিলো' তোমারই কল্পনায়।

ফরহাত বললেন ঃ কী আজব কথা! আমি যেদিন সেই মেয়েটির কথা শুনেছি, সেদিন থেকে আমার দীলের মধ্যে বারবার ধারণা জাগছে কোনো দিন হায়দারাবাদে গিয়ে দেখে আসবো ওকে। জানি না, কেন আমি তার জন্য এক ভগ্নীর স্নেহ অনুভব করছি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ হয়তো একদিন আমাদের হায়দারাবাদ যেতে হবে।'

তেরো

মোয়াযযম আলীর তেজারতী কারবারের পরিধি দিনের পর দিন বেড়ে চললো। তার দৌলত ও মহত্বের কথা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। তার দরজা গরিব ও গৃহহারাদের জন্য সদা উন্মুক্ত। লখ্নৌয়ের উমরাহ্ ও ফউজী অফিসাররা তার প্রতি শ্রদ্ধাবান। হাবেলীর ভিতর এক শানদার বসতবাড়ি এবং মেহমান ও নওকরদের জন্য নতুন নতুন কামরা তৈরি হয়ে গেছে। ঘোড়ার আস্তাবল ও গুদাম পাশের এক বাড়িতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোয়াযযম আলীর ঘরে হয়েছে জিন্দেগির সকল আয়েশ-আরামের ব্যবস্থা। মিটে গেছে তার পুরনো জখম। জিন্দেগির এক ভয়ানক শূন্যতা পূরণ হয়ে গেছে ফরহাতের সাহচর্যে। তবু তিনি তীব্রভাবে অনুভব করছেন যেনো অতীতের অন্ধকার আজও ছুটে আসছে তার পিছু পিছু। ফরহাতের সাহচর্য তাকে দেয় যে বিপুল আনন্দ, কখনো কখনো তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এই অনুভূতির তীব্রতা। তিনি ফরহাতের মুখের উপর দেখেন হাসির লহর এবং দীলের মধ্যে বলতে থাকেন ঃ আমার জিন্দেগি! দুনিয়া তৈরি হয়েছে, তোমার হাসির জন্য, কিন্তু হায়! এ হাসির রোশনি যদি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতো বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝখানকার অন্ধকার কাল পর্দা।' অতীতের কাহিনী তিনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু বর্তমান ভবিষ্যতের দিক থেকে

চোখ ফিরিয়ে রাখা তার ক্ষমতার বাইরে। যে ঘূর্ণিবার্তা ও তুফানের সাথে লড়াই করে তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন তার যৌবনের সুন্দরতম দিনগুলো, আবার তা প্রকাশ পাচ্ছে ভবিষ্যতের আসমানে নতুনভাবে ভয়াবহতা নিয়ে। মুর্শিদাবাদের কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর তার পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো ফরহাতের সন্ধানে। কওমের অবস্থা ও ভবিষ্যতের সমস্যা পরিণত হয়েছিলো গৌণ ব্যাপারে। কিন্তু ফরহাতকে খুঁজে পাবার পর সেই ঘূর্ণিবার্তা ও তুফানের রূপ তার চোখে দেখা দিলো আগের তুলনায় আরো ভয়ানক হয়ে। এক বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে বসে তিনি হেফাজত করতে চান গোটা বাগিচা। বাংলার মতো কর্ণাটক, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের বিশাল ভূখণ্ডকে যারা তাদের শিকারভূমিতে পরিণত করেছে; সেই নেকড়ে স্বভাব মানুষের কবল থেকে তিনি বাঁচাতে চান অযোধ্যাকে। ছয় মাস আগে আকবর খান তার শেষ চিঠিতে জানিয়েছেন যে, তিনি তার এলাকার মুজাহিদ দল নিয়ে নজীবুদ্দৌলার ফউজে শামিল হয়েছেন এবং তখন তারা দুশমনের বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছেন। দাতাজী সিন্ধিয়া তাদের উপর চূড়ান্ত হামলার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু নজীবুদ্দৌলার বিশ্বাস, আহমদ শাহ্ আবদালী অবিলম্বে এগিয়ে আসবেন তাদের সাহায্যের জন্য।

কয়েক হফ্তা পর আহমদ শাহ্ আবদালীর আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়লো দেশের আনাচে-কানাচে। লাখনৌয়ের উজিরের মহলে, প্রতিদিন মোয়াযযম আলী শুনতে লাগলেন এই ধরনের নতুন খবর। আজ আহমদ শাহ্ আবদালী সিন্ধু নদ পার হয়েছেন লাহোরের মারাঠা গভর্নর পালিয়ে গেছেন দিল্লিতে আহমদ শাহ্ এখন এগিয়ে যাচ্ছেন লাহোর থেকে দিল্লির পথে-পথে অমুক অমুক রোহিলা সরদার অমুক অমুক জায়গায় শামিল হয়েছেন আফগান লশকরের সাথে এবং এখন তারা মারাঠাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দিল্লির দিকে দিল্লির গাদ্দার উজির ইমাদুল মুলক গাজীউদ্দিন মারাঠাদের খুশি করবার জন্য দিল্লির শাহনশাহ দ্বিতীয় আলমগীর ও উজীরে আযম ইনতেযামুদ্দৌলাকে কতল করে শাহী তখতে বসিয়েছেন দ্বিতীয় শাহজাহান নাম দিয়ে আর এক শাহ্জাদাকে দাতাজী সিন্ধিয়া নজীবুদ্দৌলার পিছু ছেড়ে আহমদ শাহ্ আবদালীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য রওয়ানা হয়ে গেছে আবদালী তিরৌরীর সন্নিকটে মারাঠাদের প্রথম সৈন্যদলকে পরাজিত করেছেন- যমুনা নদী পার হয়ে আফগান লশ্‌কর পৌঁছে গেছে সাহরানপুরের সন্নিকটে আহমদ শাহ্ আবদালী এখন দিল্লির দিকে এগিয়ে আসছেন এবং তার সাথে শামিল হয়েছেন নজীব খান, হাফিজ, রহমত খান, সাঁদুল্লাহ্ খান, মশহুর সরদার ও আরো অনেক রোহিলা নায়ক আবদালী দিল্লির ছয় মাইল

দূরে লোনী নামক এক জায়গায় তাঁবু ফেলেছেন দাতাজীর সেনাবাহিনী ডেরা ফেলেছে আফগান তাঁবু থেকে দশ মাইল দূরে যমুনা নদীর অপর কিনারে- আবদালী আচানক দরিয়া পার হয়ে মারাঠা লশকরের ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছেন দাতাজী মারা গেছে এবং তার ভাতিজা জানকুজী জখমি হয়ে বাকি সৈন্য নিয়ে কোটপুতলী পৌঁছে গেছে রাজপুতনা থেকে মলহার রাও হলোকারের সৈন্যদল জানকুজীর সাথে শামিল হয়েছে মারাঠা লশকর রোহিলা এলাকায় ধ্বংসতাণ্ডবের অভিনয় করেছে মারাঠা বাহাদুর গড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে- আহমদ শাহ্ আবদালীর মশহুর সিপাহসালার জাহান খান চৌদ্দ ঘণ্টায় একশ মাইল অতিক্রম করে সিকান্দারাবাদের সন্নিকটে মারাঠা বাহিনীকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করেছেন এবং এই শানদার বিজয়ের পর আহমদ শাহ্ বর্ষার মওসুম কাটানোর জন্য আলীগড়ের কাছে ডেরা ফেলেছেন।'

এসব উৎসাহব্যঞ্জক খবরে মোয়াযযম আলী তার সিনার মধ্যে অনুভব করতে লাগলেন জীবনের নতুন স্পন্দন। কিন্তু এসব খবর যতোটা উৎসাহ-উদ্দীপক, দাক্ষিণাত্যের অবস্থা ততো বেশি উদ্বেগজনক হয়ে উঠতে লাগলো। ফরাসী জেনারেল বুশের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হায়দারাবাদের তোপখানার মশহুর অধিনায়ক ইব্রাহীম গারদী নিজামের সাথে গাদ্দারী করে মিলিত হয়েছেন মারাঠা ফউজের সাথে। গারদীর সহযোগিতা পেয়েই বালাজী দাক্ষিণাত্যের উপর হামলা করেছে এবং আহমদনগরের মশহুর কেল্লার মুহাফিজের গাদ্দারীর সুযোগ নিয়ে বিনা বাধায় দখল করে নিয়েছে কেল্লাটি। আহমদনগর কেল্লাটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় নিযামের ফউজ হারিয়ে ফেলেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। বেতন আদায় না হওয়ায় নিজামের নিজস্ব সিপাহীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে বিদ্রোহের সম্ভাবনা। তথাপি মোকাবিলা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ান্তর নেই। সদাশিব রাওর নেতৃত্বে পেশোয়া চল্লিশ হাজার সিপাহী পাঠিয়েছেন। তা'ছাড়া ইব্রাহীম গারদীকে পাঠিয়েছেন তার মশহুর তোপখানা ও পাঁচ হাজার সুশিক্ষিত সিপাহী নিয়ে। ১৭৬০ ঈসায়ী সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পুনা থেকে দু'শো মাইল দূরে উদয়গীরে হলো লড়াই। মোগলরা বাহাদুরীর সাথে লড়লো, কিন্তু গারদীর তোপখানার জন্য তারা হল গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন। আহমদ শাহ্ আবদালীর বিজয়ের পর দাক্ষিণাত্য থেকে খবর পাওয়া গেলো যে, নিজাম অত্যন্ত লজ্জাজনক শর্তে সদাশিব রাওর সাথে সন্ধি করেছেন এবং বিজাপুর, বিদর ও আওরঙ্গাবাদের সংলগ্ন এলাকা এবং দৌলতাবাদ, আসিরগড়, আহমদনগর ও বোরহানপুর কেল্লার উপর তাদের দখল স্বীকার করে নিয়েছেন।

৪

পুনায় যখন উদয়গীরের বিজয়ে খুশির উৎসব সমারোহ চলছে, তখন দাতাজীর মৃত্যু এবং জানকুজী ও মলহার রাও হলোকারের পরাজয়ের খবর এলো পেশোয়ার কাছে। সাধারণভাবে হয়তো দাতাজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুকে মারাঠা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় মনে করা হয়। কিন্তু মারাঠা একদিকে দাক্ষিণাত্যে নিজামের শক্তি খর্ব করে দিয়েছে। অপরদিকে তাদের বিজয়ের সয়লাব ধাক্কা দিয়েছে পেশোয়ারের দরজায়। অতীত সাফল্য মারাঠাদের ভিতর যে আত্মম্ভরিতা ও আত্মবিশ্বাসের মনোভাব পয়দা করে দিয়েছে, তারই দরুণ এ পরাজয় হয়ে উঠলো পুরো মারাঠা কওমের ইজ্জত ও আত্মসম্মমের প্রশ্ন। মহারাষ্ট্র থেকে যে ফউজী শক্তির উদ্ভব হলো তার সমতুল্য ঘটনা গোটা ভারতের ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। ছোট বড়ো মারাঠা সরদার নিজ নিজ সেনাদল নিয়ে পেশোয়ার ঝাণ্ডাতলে জমা হতে লাগলো জাতীয় অবমাননার প্রতিশোধ নেবার জন্যে। তাদের সাথে এসে শামিল হলো ইব্রাহীম গারদীর মশহুর তোপখানা ও নয় হাজার সুশিক্ষিত সিপাহী। উদয়গীরের যুদ্ধজয়ী সিপাহসালার সদাশিব রাওর উপর ন্যস্ত করা হলো এই বিশাল সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার। তার সাথে পেশোয়া তার নওজোয়ান যুবরাজ বিশ্বাস রাওকে রওয়ানা করা দিলেন। ঈসায়ী ১৭৬০ সালের ১০ মার্চ পাটদোড় থেকে রওয়ানা হয়ে আওরঙ্গাবাদ, বোরহানপুর ও গোয়ালিয়র সফর করার পর ৪ জুন তারা পৌঁছলো চম্বল নদীর কিনারে। ফউজ যতোই উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, ততোই সৈন্যসংখ্যা বাড়তে লাগলো। মলহার রাও হলোকার, জানকুজী সিন্ধিয়া, রামজী, যশোবন্ত রাও প্রভৃতি মারাঠা সরদার ছাড়া আরো বহু বর্গী ও পিণ্ডারী দল প্রত্যেক মনজিলে শামিল হলো ফউজের সাথে। দেখতে দেখতে তাদের সৈন্যসংখ্যা উঠলো তিন লক্ষের উপরে। একে শুধু একটি ফউজই বলা যায় না, বরং এ ছিলো একটা গোটা কওমের কর্মক্ষম মানুষের সমাবেশ। তাদের সবারই লক্ষ্য আফগান শক্তিকে হিন্দুস্থানের সরজমিন থেকে বিতাড়িত না করে তারা নিরস্ত হবে না।

দিল্লীর দিকে মারাঠা লশকরের গতি ছিলো মন্থর। এর আগে তাদের সাফল্যের কারণ ছিলো তাদের আন্তরিকতা ও দ্রুত অগ্রগতি। শিবাজীর জামানায় মারাঠা তাঁবুতে কোনো নারীকে নিয়ে আসা ছিলো অভাবনীয়। কোনো ভারী সাজসরঞ্জামও তাদের সাথে থাকতো না । ঘোড়া, হাতিয়ার ও ঘোড়ার দানাভরা থলের খোরাক

তারা লুট করে নিতো পথ থেকে। কিন্তু সদাশিব রাও ভাওজীর শান-শওকত ছিলো এমন যে, তার সাথে থাকতো রসদসামগ্রীর বেশুমার গাড়ি আর হাজার হাজার খিমা-বরদার। রেশমী খিমা আসতো হাতির পিঠে। মারাঠা সরদার জরির লেবাস পরে বেড়াতেন। চম্বল নদীর কিনারে ভরতপুরের শাসক রাজা সুরযমল জাঠ তার লোক– লশ্‌কর নিয়ে শামিল হলেন মারাঠা ফউজে। কিন্তু ভাওজীর অত্যম্ভরিতার দরুন, পথেই মারাঠাদের সাথে তার মতনৈক্য পয়দা হলো। জুলাই মাসের শেষ দিকে মারাঠা শক্তি দিল্লির দ্বারে আঘাত হানলো। ২০আগস্ট তারা একরকম বিনা বাধায় কেল্লা দখল করে নিলো। সৈন্যবাহিনীর বেতন দেবার জন্য ভাওজী লাল কেল্লা লুট করলেন এবং দেওয়ানে আমের ছাদ ও প্রাচীরগাত্রে লাগানো রূপোর পাত তুলে নিলেন। লাল কেল্লার বাইরে বোযর্গানে দ্বীনের মাজারসমূহ পর্যন্ত তাদের লুটতরাজ থেকে রেহাই পেলো না। সূরযমল জাঠ মারাঠাদের কার্যকলাপে রাগ করে চলে গেলেন ফিরে।

বর্ষার মওসুমে মারাঠারা দিল্লির বাইরে তাঁবু ফেলে শহর ও আশপাশের এলাকায় চালিয়ে যেতে লাগলো লুটতরাজ। ইতিমধ্যে আবদালী বুলন্দ শহর জেলায় এসে ডেরা ফেলেছেন। উভয়পক্ষ তখন নওয়াব শুজাউদ্দৌলাকে দলে ভিড়াবার জন্য ছুটোছুটি শুরু করলো।

৩

ভোরে নামাজের পর মোয়াযযম আলী নিয়মিত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়ান। একদিন সওয়ারীর পর হাবেলীতে ফিরে তিনি দেখলেন, এক ফউজী অফিসার আঙিনায় দাঁড়িয়ে আলাপ করছেন শের আলীর সাথে, আর তার এক নওকর ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক কদম দূরে। মোয়াযম আলীকে দেখে ফউজী অফিসারকে বললেন ঃ ওই যে উনি এলেন।' শের আলী মোয়াযযম আলীকে দেখে ফউজী অফিসারকে বললেন ঃ ওই যে উনি এলেন।' মোয়াযযম আলী ঘোড়া থেকে নেমে জোয়ান অফিসারটির সাথে মোসাফেহা করলেন। অফিসার কোনো ভূমিকা না করেই বললেন ঃ মহলের দারোগা আমায় পাঠালেন আপনার কাছে। এখখুনি আপনাকে মহলে তলব করা হয়েছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ওখানে আমায় তলব করার কারণটা আমি জানতে পারি কি?'

ঃ 'জনাব আমি কিছুই জানি না। আপনাকে সাথে নিয়ে যাবার জন্য দারগা

আমায় তাকিদ করলেন।'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ আর যদি দারোগার হুকুম তামিল না করি?'

জোয়ান অফিসার জওয়াব দিলেন ঃ দারোগা আপনারে কাছে আবেদন করেছেন, হুকুম পাঠাননি।'

চলুন ঃ মোয়াযযম আলী তার ঘোড়ার বাগ ধরে বললেন।

খানিকক্ষণ পর মোয়াযযম আলী ফউজী অফিসারের সাথে এসে প্রবেশ করলেন মহলের দরজার একটি কামরায়। ফউজী অফিসার বললেন ঃ আপনি এখানে তশরিফ রাখুন। আমি দারোগাকে খবর দিচ্ছি।'

মোয়াযযম আলী এক কুরসির উপর বসলে ফউজী অফিসার চলে গেলেন বাইরে। প্রায় পাঁচ মিনিট পর মহলের দারোগা এসে ঢুকলেন কামরায়। তিনি পরম আগ্রহে মোয়াযযম আলীর সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ আসুন। আপনার জন্য ইন্তেজার করা হচ্ছে।

মোয়াযযম আলী দারোগার সাথে কামরার বাইরে যেতে যেতে বললেন ঃ 'মহলের রীতি ও আদবের খেলাফ না হলে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার জন্য ইন্তেজার করছেন কে?

দারোগা জওয়াব দিলেন ঃ নজীবুদ্দৌলা আপনার সাথে মোলাকাত করতে চাচ্ছেন।'

ঃ নজীবুদ্দৌলা এখানে?'

ঃ জী, হ্যাঁ, তিনি কাল এখানে এসেছেন। কিন্তু এখনো তার আগমন সংবাদ গোপন রাখা হয়েছে। আপনার কাছেও আমি প্রত্যাশা করি, এ মহলের বাইরে কারুর কাছে আপনি এ কথা প্রকাশ করবেন না।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন কিন্তু আমি হয়রান হচ্ছি, আমার সাথে তার কি আকর্ষণ থাকতে পারে।'

দারোগা জওয়াব দিলেন ঃ আমার মনে হয়, তিনি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। আপনি যে শহরের বাইরে থাকেন, তাও তিনি জানেন। এখানে পৌছেই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনার কথা।'

মোয়াযযম আলী মনের মধ্যে নজীব খানের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিচিত্র কল্পনা নিয়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন এক প্রশস্ত কামরায়। প্রখর বুদ্ধিদীপ্তি ও বীরত্বের প্রতীক সুগঠিত দেহের অধিকারী এক ব্যক্তি তাকে দেখেই কুরসি ছেড়ে উঠে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ আপনাকে এখানে আসার তকলিফ কেন দেওয়া হলো, ভেবে আপনি হয়তো পেরেশান হচ্ছেন। আমার অন্য কোনো অসুবিধা না থাকলে আমি সোজা আপনার ওখানে

চলে যেতাম।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আপনার খেদমতে হাজির হওয়া আমি সৌভাগ্য মনে করি।'

ঃ তশরিফ রাখুন। আকবর খান আমায় আপনার সন্ধান দিয়েছেন।'

আকবর খানের নাম শুনে মোয়াযযম আলীর চোখ আনন্দ-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নজীবুদ্দৌলার সামনে কুরসির উপর বসতে বসতে তিনি বললেন ঃ তিনি এখন কোথায়? কয়েক মাস আমি তার কোনো খবর পাইনি। তার জন্য আমি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে রয়েছি।'

তিনি এখন আহমদ শাহ্ আবদালীর সাথে। গত কয়েক মাস মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অত্যধিক ব্যস্ত। তার তরফ থেকে আমি মাফ চাইছি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ ওর তরফ থেকে আপনার মাফ চাইবার প্রয়োজন নেই। ওকে আমি জানি এবং ওঁর চাইতে বেশি আর কাউকে আমি জানি না। তিনি সহীহ্ সালামতে রয়েছেন, এইটুকু জানাই আমার জন্য যথেষ্ট।'

নজীবদৌলা বললেন ঃ তার বাপ ছিলেন আমার দোস্ত। আমার কাছে নিজের বেটার মতোই তিনি। মারাঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি শৌর্য ও হিম্মতের পরিচয় দিয়েছেন এবং যখনই আমি সাবাস জানিয়েছি, তিনি বলেছেন এর সব কিছু আপনার কাছ থেকে শেখা। আপনার সাথে আমার মোলাকাতের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সিপাহী জীবন থেকে আপনার বিদায় নেবার কারণ আকবর খান আমায় জানিয়েছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাই আহমদ শাহ্ আবদালী যে যুদ্ধের দায়িত্ব নিয়েছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে এদেশে মুসলমানদের সামগ্রিক সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা। মারাঠা চিরদিনের জন্য এ দেশের কিস্মতের ফয়সালা করবার জন্য পূর্ণশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে দিল্লির দিকে। আপনার মতো চেতনাসম্পন্ন লোককে একথা বলবার প্রয়োজন নেই যে, এই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটলে উত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। মারাঠা শক্তি ইতিমধ্যেই একতাবদ্ধ হয়েছে এবং আমাদেরও প্রয়োজন সংহত হওয়ায়। আমি নওয়াব শুজাউদ্দৌলার কাছে এসেছি আহমদ শাহ্ আবদালীর দূত হিসাবে। আমার আশা রয়েছে যে, তিনি আমাদের সাথে মিলিত হতে রাজি হবেন। রোহিলাখণ্ডের তামাম সরদার আহমদ শাহ্ আবদালীর সাথে মিলিত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের সিপাহীদের শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ অফিসারের।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি কোনো জিম্মাদারীর বোঝা বহন করতে পারি বলে যদি আপনি মনে করেন, তা'হলে রেজাকার হিসাবে আমি যে কোনো খেদমতের জন্য তৈরি। না ডাকতেই যে আমি আকবর খানের মতো আপনাদের খেদমতে হাজির হইনি, তার জন্য আমি লজ্জাবোধ করছি।'

মহলের দারোগা কামরায় প্রবেশ করে আদব সহকারে সালাম করে বললেন ঃ আলীজাহ্ হুজুর নওয়াব সাহেব আপনার সাথে মোলাকাত করতে চান।'

নজীবুদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ আমি এখ্খুনি হাজির হচ্ছি।'

ঃজী না, আলীজাহ্ খোদ তশরিফ আনছেন।' বলে দারোগা বেরিয়ে গেলেন। মোয়াযম আলী উঠে বললেন ঃ তা হলে আমায় এজাযত দিন্ আমি ওয়াদা করছি, এক হফ্তার মধ্যে আমি আহমদ শাহ্ আবদালীর খেদমতে হাজির হবো।'

ঃ না, আপনি বসুন।'

ঃ কিন্তু নওয়াব সাহেব তশরিফ আনছেন।'

নজীবুদ্দৌলা বললেন ঃ বসুন। নওয়াব সাহেবের সাথে আপনার পরিচয়ের প্রয়োজন আছে।'

অযোধ্যার নওয়াব শাহানা লেবাসে কামরায় প্রবেশ করলেন। নজীবুদ্দৌলা ও মোয়াযম আলী তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মেহমানের সাথে একটি অপরিচিত লোক দেখে শুজাউদ্দৌলা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে। নজীবুদ্দৌলা বললেন ঃ জনাব, ইনি হচ্ছেন মোয়াযম আলী খান। লাখনৌয়ে আশ্রয় নেবার আগে ইনি ছিলেন বাংলার ফউজের একজন অফিসার। এর একজন সুযোগ্য খাবরেদ আহমেদ শাহ্ আবদালীর উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছেন এখন। আমি এর কাছে এসেছিলাম, আমাদের সিপাহীদের শিক্ষার জন্য এর খেদমতের প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশত ইনি আমার আবেদন মঞ্জুর করেছেন।'

শুজাউদ্দৌলা বললেন ঃ তশরিফ রাখুন। ভালো সিপাহীদের জন্য আমার ফউজেও জায়গা ছিলো। লাখনৌয়ে আপনি কি নিয়ে আছেন এখন?'

ঃ আমি তেজারত করছি।'

শুজাউদ্দৌলা নজীব খানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আপনি একে জানেন কবে থেকে?'

ঃ রোহিলাখণ্ডের এক নওজোয়ান সরদার তাঁর জীবনের একটা অংশ এর সাথে কাটিয়েছেন। তার বদৌলতে আমি এর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি দূর থেকে।'

শুজাউদ্দৌলা কয়েক মুহূর্ত খামোশ্ থাকলেন। মোয়াযম আলী এ বৈঠকে তার উপস্থিতি অবাঞ্ছিত মনে করে উঠে বললেন ঃ এবার আমায় এজাযত দিন।'

ঃ বহুত আচ্ছা। যদি আমার সময় হয়, যাবার আগে আপনার সাথে আমি আর একবার মোলাকাত করবার চেষ্টা করবো। কিন্তু সম্ভব না হলে, ইনশাআল্লাহ্ আমাদের আবার মোলাকাত হবে আহমদ শাহ্ আবদালীর শিবিরে।'

নজীবুদ্দৌলা উঠে মোয়াযম আলীর সাথে মোসাফেহা করলেন, কিন্তু শুজাউদ্দৌলা কুরসির উপর বসেই হাত বাড়ালেন। মোয়াযম আলী দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন,

কিন্তু কি যেনো চিন্তা করে ফিরে শুজাউদদৌলাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ জনাব, গোস্তাখি না হলে আমি কিছু আরজ করবো।'

ঃ বলুন।'

ঃ নজীবুদ্দৌলা তার অভিযানে কতোটা কামিয়াব হবেন, তা' আমি জানি না। আহমদ শাহ্ আবদালীর সাথে মিলিত হবার ব্যাপারে আপনার আখেরী ফয়সালা কি হবে, তাও আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি, হিন্দুস্থানের কোনো মুসলমান নেহায়েত আত্মহত্যার ইরাদা না করে থাকলে এ যুদ্ধে অংশ না নিয়ে থাকতে পারবেন না। খোদা না-খাস্তা, যদি এদেশের মুসলমানদের চেতনাহীন অবস্থার দরুন আহমদ শাহ্ আবদালীর পারাজয় ঘটে, তা' হলে উত্তর ভারতে আমাদের শেষ দুর্গ ভেঙে পড়বে। মারাঠারা কেবল দিল্লি দখল করেই নিরস্ত হয়নি বরং তারা পেশাওয়ার থেকে কাবুল গজনী পর্যন্ত তাদের বিজয়-ঝাণ্ডা উড়াবার সংকল্প নিয়ে নেমে এসেছে ময়দানে। কোনো ময়দানে যদি মারাঠাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত না করা যায়, তাহলে এমন দিন সুদূর নয়, সে দিন দিল্লির মতো তাদের ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা যাবে লাখনৌয়ের গলিতে আর বাজারে। লাখনৌয়ে আজ এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, মারাঠা আপনাকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য দিল্লির তাবেদার শাসকের ওজারতের প্রস্তাব আপনার কাছে পেশ করেছে। আর আপনি....?

শুজাউদদৌলা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বললেন ঃ একথা মিথ্যা। মারাঠা আমায় বেঅকুফ বানাতে পারে না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমায় মাফ করবেন। কিন্তু আওয়ামের বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য এ ধরনের গুজব খণ্ডন করবার বিশেষ প্রয়োজন এবং তার শ্রেষ্ঠপন্থা হচ্ছে আপনার সেনাবাহিনীকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুতির হুকুম দেওয়া।'

শুজাউদদৌলা জওয়াব দিলেন ঃ আমার ফয়সালার জন্য আপনার পরামর্শের প্রয়োজন হবে না।'

ঃ জনাব, আমি জানি আপনাকে পরামর্শ দেবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু যে কওমের শাহরগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে দুশমনের তলোয়ার, যারা ন্যায় ইনসাফ ও মানবতার মতো মহৎ বাক্যগুলোর সাথে অপরিচিত হয়ে গেছে, তাদের ফরিয়াদ আপনার কানে পৌঁছে দিতে চেয়েছি আমি। আমার কথাগুলো নিঃসন্দেহে তিক্ত, কিন্তু আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা আপনার ঠিক হবে না।'

এই কথা বলে মোয়াযযম আলী বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

মোয়াযযম আলী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ফিরে চলেছেন আপন ঘরে। শহরের কোলাহলময় আড়ম্বরপূর্ণ বাজার আর গলি পার হয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি, কিন্তু আশেপাশে সম্মুখে-পশ্চাতে কোনোদিকে খেয়াল নেই তার। তার কল্পনা চলে গেছে বহুদূরে এক ময়দানে, যেখানে হিন্দুস্তানের ভবিষ্যতের ফয়সালা করবার জন্য সমবেত সেনাবাহিনীর তাঁবু মাইলের পর মাইল প্রসারিত। তার কানে আসছে যোদ্ধাদের উচ্চধ্বনি, জখমিদের চিৎকার, তোপের দ্রুম দ্রুম আওয়াজ, বন্দুকের ফটাফট আর তলোয়ারে ঝঙ্কার। তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে লাশের স্তূপ। তারপর সেই আগুন আর খুনের তুফান পার হয়ে তিনি ফিরে আসেন আপন ঘরে, যেখানে জিন্দেগির আকর্ষণ ও আয়েশ-আরাম তাকে জানায় অভ্যর্থনা। ফরহাত এসে দাঁড়ান তার সামনে আর তিনি বলতে থাকেন ঃ জিন্দেগি আমার! আমি ফিরে এসেছি। খোদা আমাদেরকে দিয়েছেন বিজয়। যে হিংস্র জানোয়াররা এদেশে মনবতার নিকৃষ্টতম দুশ্মন হয়ে এসেছিলো, আমরা তাদের দাঁত ভেঙে দিয়েছি। আমার পিছনে আসছে সেই ফউজ, যার পায়ের তলায় পিষে দিয়েছে মারাঠা শক্তির ঝাণ্ডা। যে ফিরিঙ্গি বণিক বাংলায় আমাদের ইজ্জত ও আজাদি ছিনিয়ে নিয়েছে, এবার এ মুজাহিদরা তাদেরই জুলুম থেকে আমাদেরকে দিবে নাজাত। এদেশে আবার নতুন করে জন্ম নেবে মানবতা। এবার আমাদের মন্জিল মুর্শিদাবাদে। যে জন্মভূমির মাটিতে পড়েছিলো আমাদের শহীদানের খুন, সেখানকার মাটি আবার আমরা মাখাবো চোখে।'

কিছুক্ষণ পর মোয়াযযম আলী যখন বাড়িতে ঢুকলেন, তখন ফরহাত ও তার মায়ের সাথে আরো দুজন অপরিচিতা নারী বসে রয়েছেন এক কামরায়। মোয়াযযম আলী দ্রুত মুখ ফিরিয়ে আর এক কামরায় গিয়ে বসলেন। পনেরো বিশ মিনিট পর ফরহাত এসে ঢুকলেন তার কামরায়।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ফরহাত, ওখানে যে তোমার সখীরা বসে আছেন, তা' আমি জানতাম না। ওরা কিছু মনে করেননি তো?'

ফরহাত এসে বললেন ঃ আমার কোনো সখী ছিলেন না ওখানে। আম্মাজান ওদেরকে ডেকেছিলেন, আর যাবার সময় ওরা আপনাকে দিয়ে গেলেন এক খোশখবর।"

ঃ সে আবার কি?'

ঃ তা হচ্ছে আমাদের ঘরে এক নতুন মেহমান তশরিফ আনবেন।'

ঃ মোয়াযযম আলী বললেন ওঃ, এ খোশ্ খবরতো আমি গত হফ্তায়ই শুনেছি।'

ফরহাত হেসে বললেন ঃ আম্মাজানের খেয়াল, তিনি শহরের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞ নারীকে এনে আমায় দেখাচ্ছেন। কাল এক পড়শি মেয়ে এদের কথা বলে গেছে। আম্মাজান আজও ভোরে নামাজ শেষ করেই সাবেরকে পাঠালেন এদের সন্ধানে।'

মোয়াযযম আলীর দৃষ্টি ফর্হাতের দিকে, কিন্তু তার মন চলে গেছে দূরে বহুদূরে। ফর্হাত বললেন ঃ আপনাকে আজ পেরেশান দেখা যাচ্ছে। খবর সব ভালো তো ? দীলাওয়ার খান বলছিলো, আপনাকে নাকি শুজাউদ্দৌলা ডেকেছিলেন।'

ঃ না আমায় ডেকেছিলো নজীবুদ্দৌলা। কাল থেকে তিনি লাখ্নৌয়ে। ফর্হাত, আমি তোমার কাছে ওয়াদা করেছিলাম, আমাদের ছোট্ট মেহমানের সুরত না দেখে আমি বাড়ি থেকে যাবো না কোথাও।'

মোয়াযযম আলী ইতস্তত করে বললেন ঃ ফর্হাত! যে যুদ্ধে আমাদের কওমের ভবিষ্যতের ফয়সালা হয়ে যাবে, তা' থেকে আজো আমি দূরে, এ কথা ভেবে আমার লজ্জা হচ্ছে। তুমি শুনেছো, মারাঠা সয়লাব আজ দিল্লিতে পৌঁছে গেছে। আহমদ শাহ্ আবদালী আমাদেরকে নাজাত দেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এ দেশের মুসলমানদের কথা চিন্তা করবার মতো চেতনা এবং জাতীয় সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য তলোয়ার ধরবার মতো হিম্মৎ যাদের রয়েছে, এমনি প্রত্যেকটি মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন আজ অনুভূত হচ্ছে তীব্রভাবে।'

ফর্হাত বললেন ঃ কয়েকদিন ধরে আমি অনুভব করছি, আপনি এক গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা করতে যাচ্ছেন। গত হফ্তায় যখন আপনি আমায় বললেন কয়েক মাসের মধ্যে আপনি লাখ্নৌয়ের বাইরে যাবেন না, তখনো আমি অনুভব করছিলাম যে, আপনার দিলে চলছে এক তীব্র মানসিক সংঘাত। আমি শুধু এইটুকু চাই, যদি আমার খাতিরে আপনি আত্মার আওয়াজ থেকে কান ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমি বুঝবো, আমি আপনার জীবনসঙ্গিনী হবার যোগ্য নই।'

আট দিন পর। মোয়াযযম আলী এক সিপাহীর লেবাস পরিধান করে ফর্হাতের সামনে দণ্ডায়মান। ফর্হাতের মুখে বিষণ্ন হাসি। মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার জিন্দেগিতে পরিণামের দিক দিয়ে অর্থহীন যুদ্ধে গিয়ে আমি লড়েছি, কিন্তু এবার আমি এমন যুদ্ধে হিস্সা নিতে চলেছি, যার ফলাফল হবে

সুদূরপ্রসারী। আমার বিশ্বাস, উত্তর-পশ্চিম এলাকাই হবে গোটা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সর্বশেষ দুর্গ। যদি আমরা মারাঠাদের পরাজিত করতে না পারি তা'হলে একদিন এ সয়লাব গিয়ে পৌছবে পেশাওয়ার ও গজনী পর্যন্ত এবং এ দেশে মুসলমানদের অবস্থা হবে শুদ্রের চাইতেও নিকৃষ্টতর। ফরহাত! নাম ও যশের জন্য নয়, কওমের সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনার জন্য আমি এ যুদ্ধে হিস্সা নিচ্ছি। এই যুদ্ধই হবে এ দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার সিপাহীর লাশ দুশ্‌মনের ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে যাবে। আমি ফিরে না এলে মনে করো, আমার মকসাদ ছিলো আমার অস্তিত্বের চাইতে বড়ো এবং যে বাচ্চা আমার ঘরে আসবে, তাকে একদিন তুমি বলতে পারবে যে, তার বাপ ছিলো সেই নাম-না-জানা সিপাহীদের একজন যারা কওমের ভাবী বংশধরদের ইজ্জত ও আজাদির মূল্য আদায় করে গেছে নিজের জান কোরবান করে।'

ফরহাতের চোখে অশ্রু ঝক্‌ঝক্ করে উঠেছে। তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে। এক লহমার জন্য মোয়াযযম আলী তাকালেন তার মুখের দিকে এবং বেদনাভারাতুর কণ্ঠে খোদা হাফিজ' বলে বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে।

কিছুক্ষণ পর তিনি যখন ঘোড়ার উপর সওয়ার হচ্ছেন, তখন ফরহাত ও তার মা উপর তলার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন নিচের দিকে। মোয়াযযম আলী তার সাথীরা যখন হাবেলীর বাইরে চ'লে গেলেন, তখন ফরহাত বে-এখ্‌তিয়ার আবেদার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঃ আম্মাজান'। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি বললেন ঃ দোআ করুন, যেনো খোদা ওকে বিজয় দান করেন।

৬

বর্ষার মওসুম শেষ হয়ে গেছে। ভাওজী নাড়ুশংকরকে সাত হাজার সিপাহীসহ দিল্লির হেফাজতের জন্য রেখে এগিয়ে চললেন এবং দিল্লি থেকে আশি মাইল উত্তরে যমুনার কিনারে মশহুর আফগান কেল্লা কুঞ্জপুরার উপর হামলা করলেন। নজাবত খান দশ হাজার রোহিলা যোদ্ধা সাথে নিয়ে কেল্লার হেফাজতে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু মারাঠা সায়লাবের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। তারা গারদীর তোপখানার অগ্নিবৃষ্টির পর মারাঠা এগিয়ে গিয়ে কেল্লা দখল করলো। নজাবত খান ও সিরহিন্দের সাবেক গভর্ণর আবদুস সামাদ খানসহ হাজার হাজার সিপাহী দুশমনের তেগের তলায় জান দিলেন। এই কেল্লা থেকে মারাঠারা দখল করে নিলো আহমদ শাহ আবদালীর ফউজের জন্য জমা করা অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ আর রসদের ভাণ্ডার।

৬

বন্যার দরুন যমুনা নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো। আহমদ শাহ আবদালীর নদীর অপর কিনারে থেকে অন্তহীন দুঃখ-বেদনা সহকারে মারাঠাদের হাতে তার শ্রেষ্ঠ সাথীদের কতলে আমের খবর শুনলেন এবং মারাঠারা যখন কুঞ্জপুরার কেল্লায় সংগৃহীত ভাণ্ডার লুট করে নিয়ে দশহরার উৎসব পালন করেছে, তখন তিনি দিল্লি থেকে বিশ মাইল উত্তরে বাগপতের নিকটে পৌঁছলেন। সেখানেও বিপদ রয়েছে কিশতি ছাড়া যমুনা অতিক্রম করার। ফউজী অফিসার ও সিপাহীরা যমুনার ভয়ঙ্কর মউজের রূপ দেখে পেরেশান, কিন্তু আমীরে লশ্করের হুকুম অমান্য করার সাহস নেই কারুর। আহমদ শাহ আবদালীর হুকুমে তোপ চাপানো হলো হাতীর পিঠে, সওয়ারের দল কাতার বেঁধে দাঁড়ালেন দরিয়ার কিনারে। তারপর আমীরে লশ্কর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করে ঘোড়া শুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরিয়ার বুকে। তার সাথে সাথে নজীবুদ্দৌলা, শুজাউদ্দৌল্লা, নাসীর খান বেলুচ, মুরাদ খান দুররানী, বরখোরদার খান, শাহওয়ালী খান, জাহান খান ও অন্যান্য আফগান, দুররানী, বেলুচ ও রোহিলা সরদার ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপ দিলেন দরিয়ায়। তারপর দেখতে দেখতে পুরা ফউজ খেলা শুরু করলো দরিয়ার মউজের সাথে। খানিকক্ষণ পর যখন লশ্কর দরিয়ার অপর কিনারে পৌঁছে গেলো, তখন

গাছপালা ও ঝড়ের পেছনে থেকে শোনা গেলো ঘোড়ার পদধ্বনি। আবদালীর ফউজের কয়েকটি দল অপ্রত্যাশিত হামলার আশঙ্কায় সামনে এগিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেলো বিশ-সওয়ারের একটি দল। সামনের সারি থেকে একজন বুলন্দ আওয়াজে বললো ঃ এরা আমাদের সাথী। 'এরা আমাদের সাথী। এদের আসতে দাও।' সওয়ারদের সবার আগে মোয়াযযম আলী ও আকবর খান। তারা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ঢুকে গেলেন সিপাহীদের সারির মধ্যে। তারপর তারা কথা বলতে লাগলেন নজীবুদ্দৌলা, হাফিজ রহমত খান ও রোহিলাখণ্ডের অন্যান্য সরদারের সাথে। মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এখান থেকে মাত্র ছয় ক্রোশ দূরে মারাঠাদের এক চৌকি। এই চৌকিটি সাফ করে দিতে পারলে এ এলাকায় আমরা নিরাপদ। ওখানকার সিপাহীর সংখ্যা পাঁচশ থেকে বেশি হবে না। মারাঠারা এখন দশ হরার জশনে মত্ত। আমাদের সাথে কয়েকটি দ্রুতগামী দল পাঠাতে পারলে দুপুরের আগেই আমি চৌকিটি সাফ করে চলে আসবো।'

হাফিজ রহমত খান বললেন ঃ আমাদের সময় নষ্ট করা চলবে না। চলুন আপনি আমাদের পথ দেখাবেন।'

ঃ আমাদের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।' বলে মোয়াযযম আলী এক নওজোয়ানের ঘোড়ার বাগ ধরলেন।

নওজোয়ান বললেন ঃ কিন্তু আমি তো আপনার সাথে যেতে চাই।'

মোয়াযযম আলী তার বাযু ধরে টেনে নামিয়ে বললেন ঃ তুমি শুনেছো, নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের নেই।'

আকবর খান তার অনুসরণ করলেন এবং তার গোষ্ঠীর এক সিপাহীর ঘোড়া নিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর প্রায় চারশ' সওয়ার লশ্‌করের সারি থেকে বেরিয়ে ধূলির মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। নজীবুদ্দৌলা আহমদ শাহ আবদালীকে বললেন ঃ আলীজাহ! এরই নাম মোয়াযযম আলী। দু'দিন আগে ইনি দরিয়া পার হয়ে এসেছেন এই এলাকার দুশমনদের গতিবিধি জানবার জন্য এবং এখন এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে দুশমনের এক চৌকি সাফ করে দেবার জন্য চলে যাচ্ছেন। এরপর এ এলাকা আমাদের জন্য বিলকুল্ নিরাপদ হবে এবং আমরা আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারবো।'

মারাঠাদের যে কয়েজন সিপাহী রোহিলা যোদ্ধাদের হামলা থেকে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে গেছে, পরের রাত্রে তার ভাওজীকে জানালেন যে, আবদালীর

লশকর আচানক দরিয়া পার হয়ে তাদের চৌকিটি সাফ করে দিয়েছে।

ভাওজী মারাঠা সরদারের সাথে পরামর্শ করে তার ফউজ সরিয়ে নিয়ে গেলেন পানিপথের দিকে। তিনি তাঁবু ফেললেন শহরের কাছে। আহমদ শাহ্ আবদালী এগিয়ে চললেন পানিপথের দিকে এবং তাঁবু ফেললেন মারাঠা তাঁবুর আট মাইল দূরে। ইব্রাহীম গারদীর পরামর্শে মারাঠারা শহর ও তাদের শিবিরের পাশে ষাট ফুট চওড়া আর বারো ফুট গভীর খন্দক খোদাই করলো এবং খন্দকের পিছনে মাটির উঁচু বাঁধের উপর বসালো তোপ। পিণ্ডারা ফউজ আহমদ শাহ্ আবদালীর রসদ ও অস্ত্র চালাবার পথে হামলা করে তাদেরকেও হামলা করতে বাধ্য করবে, এই ছিলো ভাওজীর আশা। কিন্তু মারাঠা সালারের তুলনায় আবদালী ছিলেন অনেকটা বেশি অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী। দুশমনের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি তার ফউজকে তাদের তোপের মুখে পাঠাতে রাজি হলেন না। তিনি আশে-পাশের বন থেকে বেশুমার গাছ কাটিয়ে এনে কাঠের খাম্বা পুঁতে পাঁচিল খাড়া করলেন। আবদালীর এই নতুন পদক্ষেপ মারাঠাদের এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন করে দিলো। তারা তাদের তোপ খানাকে মনে করতো চূড়ান্ত শক্তি, কিন্তু ভারী সাজ-সরঞ্জামের দরুন পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী যুদ্ধের নকশা তৈরি করার সামর্থ্য তাদের ছিলো না। তারা দিন রাত খেটে খন্দক খোদাই করিয়েছে এই জন্য যে, আহমদ শাহ্ আবদালী পতঙ্গের মতো এগিয়ে আসবেন এবং তাদের তোপ খন্দকের আশে-পাশে আফগান সিপাহীদের লাশের স্তূপ বানিয়ে দেবে, কিন্তু এত সব প্রস্তুতি সত্ত্বেও দুশমন কি চিন্তা করেছে, তা' জানা ছিলো না তাদের। আফগান লশ্‌কর খোলা ময়দানে বেরিয়ে এসে হামলা করলে মারাঠা আবদালীর প্রত্যেকটি সওয়ারের মোকাবিলা করতে পাঠাতে পারতো কম-সে-কম পাঁচ সওয়ার । তাদের শিবিরে মারাঠা সরদারের সাথে বিবিরা না থাকলে পিছিয়ে গিয়ে যুদ্ধের সুবিধাজনক জায়গা দেখে নেয়া হতো অপেক্ষাকৃত সহজ। এখন শিবিরের বাইরে প্রত্যেকটি জায়গাই তাদের জন্য অরক্ষিত। তাছাড়া অপরদিকে আহমদ শাহ্ আবদালীর ফউজ প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী গতিবিধি পরিবর্তন করতে পারতো। আবদালীর সিপাহী ভারী তোপের চাইতে ভরসা রাখতো নেযা, তলোয়ার, বন্দুক ও ঘোড়ার উপর ।

উভয়পক্ষের শিবিরের মাঝখানকার প্রায় আট মাইলব্যাপী মুক্ত প্রান্তরে রোজই দেখা যেতো ব্যক্তিগত শৌর্যের কোনো-না-কোনো ঘটনা। কখনো কোনো তিলকধারী মারাঠা শিবির থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া থামাতো মুসলমানদের শিবিরের সামনে, তারপর কোনো আফগান, ইরানী অথবা বেলুচকে দাওয়াত

দিতো মোকাবিলার জন্য। তেমনি আফগান ফউজের জোয়ান সিপাহী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়ে মারাঠা শিবিরের ধারে খন্দকের পুলের কাছে দাঁড়িয়ে জানায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান। আবদালীর শিবিরের এক নওজোয়ানের শৌর্য-সাহসের কাহিনী সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। হররোজ তিনি শিবির থেকে বেরিয়ে যান এক এক নতুন বেশে এবং দুশমন দলের দু'চারজন বীর সিপাহীর অহঙ্কার মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন শিবিরে। আবদালীর যোদ্ধারা তাকে কখনো দেখে আফগান বেশে, কখনো বেলুচ বেশে, কখনো মোগল বেশে আর কখনো বা রোহিলা সিপাহীর লেবাসে। মুসলিম শিবির মুখর হয়ে উঠে তার তারিফে। কয়েকবার উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষের পর তিনি ইনাম হাসিল করেছেন নাসীর খান বেলুচের কাছ থেকে কোমরবন্দ, মালিক জাহান খানের কাছ থেকে তলোয়ার, শুজাউদ্দৌলার দেওয়া ঘোড়া আর নজীবুদ্দৌলার দেওয়া বন্দুক।

এ নওজোয়ান আকবর খান। একদিন আহমদ শাহ্ আবদালী তাকে খিমায় ডেকে বললেন ঃ বেটা আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আমার তরফ থেকে তুমি শ্রেষ্ঠ ইনামের দাবিদার প্রমাণিত হয়েছো। তোমার কি আকাঙ্ক্ষা আমি পূরণ করতে পারি?

আকবর খান এই শক্তি ও শৌর্যের প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের মনোভাব সহকারে গর্দান নিচু করলেন।

আহমদ শাহ্ আবদালী বললেন ঃ বেটা! তুমি আমার প্রশ্নের জওয়াব দেওনি।'

আকবর খান গর্দান তুললেন। তার উজ্জ্বল চোখ দুটি অশ্রুভারে আনত। তিনি ধরাগলায় জওয়াব দিলেন ঃ আলীজাহ্! আমার দীলে রয়েছে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা আর তা' আপনিই পূরণ করতে পারেন।'

ঃ বলো।'

ঃ আলীজাহ্! আমার জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো আকাঙ্ক্ষা, যেনো মারাঠা আর কোনো দিন এ দেশের সরজমিনে পা রাখতে না পারে।' কথাটি বলবার সাথে সাথে তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা।

আহমদ শাহ আবদালী বললেন ঃ বেটা ! খোদা আমায় হিম্মৎ দিন। তোমার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। আজ আমি এক হুকুম দিচ্ছি। আজ থেকে দুশমনের মোকাবিলা করবার জন্য তোমায় একা যাবার এজাযত দেওয়া হবে না। মারাঠাদের হিসাব-নিকাশের দিন আসন্ন। সেই দিনের জন্য তোমায় বেঁচে থাকতে হবে। আহা! তোমার মতো নওজোয়ান যদি এ দেশে আরো জন্মাতো।'

আকবর খান বললেন ঃ আলীজাহ্ !আমি এমন একটি লোককে জানি, যার

শৈশব আমার শৈশবের চাইতে এবং যৌবন আমার যৌবনের চাইতে কৃতিত্বময় ছিলো। তিনি এখানো আমার শ্রদ্ধার পাত্র।'

ঃ কে তিনি।'

ঃ তিনি রোহিলা সেনাদলের সালার। আমি সব কিছুই তার কাছ থেকে শিখেছি।'

১৯ নভেম্বর গারদী তার পদাতিক সেনাদল নিয়ে হামলা করলেন, কিন্তু কঠিন ক্ষতি স্বীকার করে পিছু ফিরে যেতে হলো তাকে। তিনদিন পর সিন্ধিয়া পর পর দু'বার হামলা করলো, কিন্তু পরিণাম হলো একই। ৭ ডিসেম্বর রোহিলা যোদ্ধার জওয়াবী হামলা করলো এবং তাদের সংঘর্ষ হলো বলবন্ত রাওয়ের সৈন্যদলের সাথে। তুমুল লড়াইয়ের পর বলবন্ত রাও নিহত হলেন এবং তার ফউজ পালিয়ে বাঁচলো। রোহিলা সিপাহীরা পরাজিত সৈন্যদলের পিছু ধাওয়া করে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করলো এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্বংসলীলা চালিয়ে ফিরে এলো।

প্রায় আড়াই মাস ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে এই ধরনের সংঘর্ষ চললো । উভয় ফউজের সিপাহীদের রসদ ও ঘোড়ার দানা সংগ্রহ করা হলো কঠিন সমস্যা। মারাঠা ফউজের বেশিরভাগ রসদ আসতো দিল্লির কেল্লা থেকে। নজীব খান আমীরে লশ্‌করের সাথে পরামর্শ করে গোলাম কাযম আলীর নেতৃত্বে তার ফউজের একটি দলকে পাঠালেন মারাঠাদের রসদ ও অস্ত্র চলাচলের পথে আড়ি পেতে থাকতে। কয়েকদিনের মধ্যে এ সৈন্যদল দিল্লি ও পানিপথের মাঝখানে আমদানি রফতানির পথ বন্ধ করে বসলো। মারাঠা ফউজকে করতে হলো কাহাতের মোকাবিলা।

আফগান ফউজের বেশিরভাগ রসদ আসতো রোহিলাখণ্ড এলাকা থেকে। ভাওজী বুন্দেলখণ্ডে গোবিন্দপন্থকে সব পরিস্থিতি জানালেন এবং তিনি বারো হাজার দ্রুতগামী সওয়ার নিয়ে এগিয়ে গেলেন রোহিলাখণ্ডের দিকে। কয়েকদিনের মধ্যে তারা রোহিলাখণ্ডের কতকগুলো এলাকা ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়ে মীরাট পর্যন্ত পৌছে গেলো। আফগান ফউজের খোরাক সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে গেলো। মারাঠা শিবিরের মতো আফগান শিবিরেও দেখা দিলো কাহাতের লক্ষণ। আহমদ শাহ্ আবদালীর সালাররা তাকে পরমর্শ দিতে লাগলেন যে, তাদের পিছু হটে যাওয়া উচিত। নইলে কয়েকদিনের মধ্যেই কঠিন কাহাতের মোকাবিলা করতে হবে তাদেরকে। আহমদ শাহ্ আবদালীর একমাত্র জওয়াব ঃ তোমরা বুঝতে পারছো না। ইন্তেজার করে দেখো। আমাদের ভাগ্যলিপি বিজয় পলায়ন নয়।'

আহমদ শাহ্ আবদালী জওয়াবী ব্যবস্থা হিসেবে মারাঠা শিবিরের সন্নিকটে তাদের বেষ্টনী সঙ্কীর্ণ করে আনলেন এবং নিজস্ব শিবির ও দুশমন শিবিরের মাঝখানে হাজার সিপাহীর আর একটি চৌকি কায়েম করলেন। সেখানে তিনি তৈরি করালেন নিজের জন্য একটি ছোট লাল রঙের খিমা। এই ছোট লাল খিমাটি ছিলো তলোয়ারের শক্তিতে হিন্দুস্তানের নয়া ইতিহাস রচনাকারী বিশাল ফউজের সদর দফতর। আহমদ শাহ্ আবদালী দিনভর ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে বাইরের চৌকিগুলো দেখাশুনা করে বেড়াতেন। কখনো কখনো তিনি একই দিনে পঞ্চাশ-ষাট মাইল সওয়ারী করতেন। রাতেরবেলায় তার অগ্রবর্তী চৌকির সিপাহীরা দুশমনের শিবির পর্যন্ত পৌঁছে যেতো এবং বাকি ফউজের কোনো কোনো দল মারাঠাদের রসদ ও অস্ত্র চলাচলের পথে হামলা চালাতো।

১৭ ডিসেম্বর আহমদ শাহ্ আবদালীর অন্যতম সিপাহসালার আতা খানের নেতৃত্বে সওয়ারদের একটি ফউজ একদিনে পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গেলো। গোবিন্দ পন্থের বারো হাজার মারাঠা লশ্‌কর রসদ ও অস্ত্র চলাচলের রাস্তায় হামলা করে আফগানদের ক্রমাগত পেরেশান করছিলো। আতা খানের সওয়াররা তাদের উপর হামলা করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো তেগের মুখে। কয়েকদিন পর মারাঠা শিবিরের যেসব দলে ঘোড়ার দানা খুঁজতে বেরিয়েছিলো, মোয়াযযম আলী ও আকবর খান তাদেরকে পাঠালেন মৃত্যুর দেশে।

ঈসায়ী ১৭৬১ সালের ৬ জানুয়ারি দিল্লি থেকে মারাঠা ফউজের রসদ ও বেতন নিয়ে আসছিলো যে কাফেলা, তারা এসে পেলো আফগান হানাদার দলের নাগালের ভিতরে। আফগান সওয়াররা কাফেলার খুব কম লোককেই ফিরতে দিলো জান নিয়ে। মারাঠা শিবিরে অসহায়তা ও ভীতির মনোভাব ছেয়ে গেলো। প্রায় চার লাখ মানুষ এমন করে এক শিবিরের মধ্যে শোচনীয়ভাবে দুশমনের আবেষ্টনীর মধ্যে অবরুদ্ধ হলো যে, তদের সাফাইর কাজও অসম্ভব হয়ে পড়লো। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মরতে লাগলো ক্ষুধার তাড়নায়। আরো অসংখ্যলোক আবর্জনা ও মলমূত্র নিষ্কাশনের অব্যবস্থাজনিত ব্যাধির শিকার হতে লাগলো। যে ফউজ তাদের সংখ্যা ও অস্ত্রবলের নেশায় গজনী পর্যন্ত পৌঁছবার সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলো, তারাই এখন ভয়ে শিবির থেকে বাইরে বেরুতে পারে না। মারাঠা সিপাহীরা সারাদিন তাকিয়ে দেখে তাদের শিবিরের চারদিকে আফগান শাহ্ সওয়ারের দ্রুতগামী অশ্বের পদক্ষেপে উড়ন্ত ধূলির মেঘ। শীতের দীর্ঘ বিষণ্ন রাত্রির শেষে ভোরবেলায় জেগে উঠে তাদের খিমার গায়ে দেখতে পায় দুশমনের গুলির নিশানা। ক্ষুধার জ্বালায় মৃত মানুষ, ঘোড়া ও বলদের লাশের পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মাইলের পর মাইল। দিনভর মুক্ত আসমানে উড়ে বেড়ায় চিল-শকুনের ঝাঁক।

এক

একদিন আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর খিমায় ফউজের বড়ো বড়ো সরদার উপবিষ্ট। মারাঠাদের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। শুজাউদ্দৌলার মধ্যস্থতায় মারাঠারা পেশ করেছিল শান্তি প্রস্তাব। তাই তিনি আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীকে বলছেন ঃ আলীজাহ্‌! মারাঠারা খাদ্যভাবে বিপন্ন হয়ে আমাদের যে কোনো শর্তে শান্তি স্থাপন করতে ইচ্ছুক। তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে বাধ্য হয়ে তাদেরকে নামতে হবে ময়দানে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়ও তাদের ফউজের শক্তি এমন নয় যে, খুব সহজে তাদেরকে পরাজিত করা যাবে। তারা দিল্লি খালি করে ফিরে যেতেও রাজি। তাদের কাছ থেকে এ ওয়াদাও নেওয়া যেতে পারে যে, তারা আর কখনো উত্তর দিকে আসবে না। আমরা যদি বিনা যুদ্ধে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতেপারি, তা'হলে কেন নজীবুদ্দৌলা হাজার হাজার মানুষের জান বিনষ্ট করার জন্য জিদ ধরেন, তা' আমি বুঝে উঠতে পারি না।'

নজীবুদ্দৌলা বললেন ঃ আলীজাহ্‌! আমাদের মক্‌সাদ মারাঠাদের পানিপথ থেকে ভাগানো নয়, বরং যে শক্তি এ মুলুকে মুসলমানদের ইজ্জত ও সৌভাগ্যের পথে সব চাইতে বড়ো বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে, তাকে খতম করে দেওয়া। লড়াইয়ে তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত বলেই তারা আজ যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে চাচ্ছে, কিন্তু তারা যে আরো বেশি করে তৈরি হয়ে ফিরে আসবে না, তার জামানত কোথায়?'

শুজাউদ্দৌলা বললেন ঃ তাদের কাছে শর্ত পেশ করা যেতে পারে যে, তারা তাদের কয়েকজন সরদারকে জামানত হিসাবে রেখে যাবে আমাদের কাছে।'

নজীবুদ্দৌলা বললেন ঃ 'তাদের ব্যাপারে কয়েকজন সরদারের সাথে নয়, গোটা মারাঠা কওমের সাথে, যারা পুরো হিন্দুস্তানের উপর তাদের আধিপত্য কায়েম করবার সংকল্প করেছে। কয়েকজন সরদারের প্রাণের ভয় যদি তাদের সংকল্পের পথে বাধা হয়, তাহলে নতুন সরদার খুঁজে নিতে তাদের বেশি দেরি হবে না। যেসব বড়ো বড়ো লোক এই ধরনের দুশমনের সাথে সওদাবাজি করে জিন্দাহ্‌ থাকতে চান, তাদের বুদ্ধি দেখে আমি তাজ্জব বনে যাই। যাদের পুরো ইতিহাস হচ্ছে প্রিয়াকারী, চুক্তিভঙ্গ, চক্রান্ত ও প্রতারণায় ভয়পুর, তাদের সাথে সওদাবাজি? যাদের হাত আমার কওমের বাচ্চা, বুড়ো ও জোয়ানের খুনে রাঙা হয়ে উঠেছে, তাদের সাথে মোসাফেহা করবার পরামর্শ আমি আপনাকে দেবো না। আমাদের সংঘাত এমন এক দুশমনের সাথে, যারা অবস্থা বিবেচনায় নিজস্ব কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারে; শক্তিমানের সামনে যারা মেঘ এবং দুর্বলের কাছে সিংহ। মারাঠাদের সাথে সন্ধি আলোচনা করবার আগে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে আমি অনুরোধ করবো, আমাদের সাথে বিতর্কের আগে তিনি তার ফউজের

কোনো মামুলি সিপাহীর সাথে পরামর্শ করুন। যদি তারা বলে যে, মারাঠাদের এখান থেকে জিন্দাহ্ ও নিরাপদ অবস্থায় ফিরে যেতে দিলে দু'তিন বছর পর লাখনৌয়ের অলিগলি তাদের লুটতরাজ, হত্যা ও ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপদ থাকবে, তা'হলে আমরা আমাদের সংকল্প পরিবর্তন করতে রাজি হবো। মারাঠাদের মনজিলে মকসুদ পানিপথ নয়। তাদের দৃষ্টি রয়েছে কাবুল, কান্দাহার ও গজনীর উপর। এখন তারা হয়তো মনে করেছে যে, তাদের এখানে আসা এক নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে। তাদের একথা মনে করাও নির্বুদ্ধিতা হয়েছে যে, আমরা অনায়াসে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যাবো তাদের তোপের মুখে। এখন তাদের ভুলের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে এখানে থেকে জান নিয়ে কোনোমতে ফিরে যাওয়া এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা তুলে নিয়ে আগামী বছর বা তার পরের বছর আরো ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে আসা। যদি আজ আমরা তাদেরকে সহীহ্ সালামতে ফিরে যেতে দেই, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার চাইতে এখনই বোঝাপড়া করে নেওয়া আমি ভাল মনে করি। সুজাউজ্জানের পরিচয় দিলে আমার দোস্তও একই ফয়সালা করবেন। মারাঠা 'জিন্দাহ্ থাকতে দাও' নীতির সমর্থক নয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে জান নিয়ে পালাবার জন্য যদি তারা আমাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে পারে, তাহলে তারা যে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত পথের বস্তিগুলোকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে যাবে না, তার জামানত কে দেবে? কি আছে এই জামানত যে, তার যে তলোয়ার আমাদের সিপাহীদের সামনে কোষমুক্ত করতে দ্বিধা করেছে, তা পথের নিঃস্ব অসহায় মানুষের কতলে আম থেকে বিরত থাকবে?

'আলীজাহ্! আমার কণ্ঠে চিৎকার ছাড়া আর কিছু নেই। আমি নিজের চোখে তাদেরই হাতে আমার কওমের যিল্লত ও অবমাননার মর্মবিদারক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি। আমি তাদেরকে দেখেছি রোহিলাখণ্ডের বস্তিতে ও দিল্লির বাজারে মানবতার মুখে কালিমা লেপন করতে। তাদের কথায়, তাদের ওয়াদায় আস্থা রাখতে আমি পারি না। নওয়াব শুজাউদ্দৌলাকেও আমি বলবো, কোনো ভুল ধারণার শিকার যেনো না হন তিনি। রোহিলাখণ্ডের মতো অযোধ্যার সীমান্তেও আমি দেখতে পাচ্ছি না মারাঠাদের আঘাত প্রতিরোধ করবার মতো কোনো প্রাচীর। আমার তো এরূপ ব্যাপারও অসম্ভব মনে হয় না যে, তারা একবার নওয়াব শুজাউদ্দৌলার চেষ্টার ফলে এখান থেকে বেঁচে যেতে পারলে ফেরার পথে লাখনৌয়ে রেখে যাবে তাদের পশুত্ব ও বর্বরতার এমন স্মৃতিচিহ্ন, যা কেউ কখনো ভুলতে পারবে না।'

নওয়াব শুজাউদ্দৌলা বললেন ঃ আমার সম্পর্কে নজীবুদ্দৌলার মনে জন্মেছে ভুল ধারণা। মারাঠাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই যদি হয় আপনাদের রায়, তাহলে আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমার ফৌজ কারুর পিছনে থাকবে না।'

ঈসায়ী ১৭৬১ সালের ১৩ জানুয়ারির সূর্য দেখতে পাচ্ছিলো হিন্দুস্তানের ইতিহাসের এক ভয়াবহতম সংঘর্ষ। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মারাঠা ফউজের দলের পর দল দীর্ঘ সারিতে বেরিয়ে এলো তাদের শিবির থেকে। বাম দিকে গারদীর সুশিক্ষিত সৈন্যদল এবং তাদের সাথেই গায়কোয়ারের ফউজ। ডান দিকে মলহর রাও হোলকার ও জানকুজী সিন্ধিয়া। মধ্যস্থলে এক জঙ্গি হাতীর পিঠে ভাওজী ও বিশ্বাস রাও উপবিষ্ট। মুসলিম লশকরের মধ্যস্থলে আহমদ শাহ্ আবদালীর উজিরে আজম শাহ্ ওয়ালী খান। তার পরিচালনায় ময়দানে এলো এমন একদল দুররানী যোদ্ধা, যারা বহু ময়দানে তাদের শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে। মুসলিম বাহিনীর বাম দিকে শাহ পছন্দ খান ও নজীবুদ্দৌলা। মধ্যস্থল ও বাম দিকের মাঝখানে রয়েছে শুজাউদ্দৌলার সেনাবাহিনী। ডানদিকের সিপাহী পরিচালনা করছেন বরখোরদার খান। তার সাথে রয়েছে রোহিলা, মোগল ও বেলুচ সিপাহীদের কয়েকটি দল।

আহমদ শাহ্ আবদালী সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়াইয়ের ময়দানের নকশা দেখছেন শ্যেণদৃষ্টিতে। বিদ্যুৎগতি সওয়ারের দল একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জেনারেল ও সালারদের পৌঁছে দিচ্ছে তার নির্দেশ। মারাঠা তোপের আতশবর্ষণ দিয়ে শুরু হলো লড়াই। তারপর গারদীর সুশিক্ষিত সৈন্যদল সঙ্গিন নিয়ে হামলা করলো আফগান ফউজের ডান দিকে রোহিলা সৈন্যদের উপর। রোহিলার পিছে হটে যাওয়া মাত্র ভাওজী তার সওয়ার দলকে দিলেন আম হামলার হুকুম। তারা আফগান ফউজের সামনে তিন সারিকে এলোমেলো করে দিলো। পানিপথের যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়ে গেলো। ধুলোর মেঘের ভেতর দিয়ে ঘোড়ার পদধ্বনি; তোপের তীব্র গর্জন, বন্দুকের আওয়াজ তলোয়ারের ঝঙ্কার ও জখমিদের ডাক-চিৎকার ছাপিয়ে একদিকে আল্লাহু আকবর ও অপরদিকে থেকে হর হর মহাদেব' ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। শাহ্ ওয়ালী খান আফগানদের পিছু হটতে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পূর্ণশক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন ঃ আমার সাথীরা! কোথায় যাচ্ছো তোমরা? আমাদের ওয়াতন এখান থেকে বহুদূর।' কিন্তু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর কোলাহলের মধ্যে তার আওয়াজ গুম্ হয়ে গেলো। যুদ্ধের গোড়ার দিকে মারাঠাদের বিজয়ের লক্ষণ দেখা গেলো। আফগানদের বামদিকে ও মধ্যস্থলে লশকরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো, কিন্তু ডান দিকের সৈন্যদল তখনো বেশ সংহত হয়ে চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই। নজীবুদ্দৌলা জওয়াবী হামলা করলেন এবং

তার সাথে সাথে হাফিজ রহমত খান ও আর সব রোহিলা সরদারের ফউজ পূর্ণশক্তিতে হামলা চালালেন মারাঠাদের উপর। নজীবুদ্দৌলার পদাতিক দল দুশমনদের সারির উপর হাওয়াই ও গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো এবং দুশমন যখন পিছু হটতে লাগলো, তখন নেযাবাজ সিপাহীরা আক্রমণ চালালো তাদের উপর। মোয়াযযম আলী পরিচালনা করছিলেন এক হাজার রোহিলা সওয়ার এবং তাদের বেশিরভাগ ছিলো আকবর খানের গোষ্ঠীর লোক। তারা মারাঠা লশ্‌করের ডান দিকের উপর হামলা করে কয়েক মিনিটের মধ্যে জানকুজী সিন্ধিয়ার ফউজের অনেকগুলো সারিকে বিপর্যস্ত করে দিলো। তারপর অন্যান্য রোহিলা সরদার ও নজীবুদ্দৌলার কয়েকটি দল গিয়ে মিলিত হলো তাদের সাথে এবং তারা মিলিতভাবে উপর্যুপরি হামলা করে পিছু হটাতে শুরু করলো দুশমনদেরকে।

দুপুর হয়ে এলো । কিন্তু যোদ্ধার ধুলোর মেঘের ভিতর দিয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছে তার অস্পষ্ট আবাস। যুদ্ধ এখন এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, প্রতি মুহূর্তে কোনো এক পক্ষের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এই রোজ হাশরের কোলাহলের মধ্যে কোনো উদ্বেগ, চাঞ্চল্য বা পেরেশানির কোনো চিহ্ন নেই, এমন একটিই ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন আহমদ শাহ আবদালী। তাঁর পেশানিতে যেনো লেখা রয়েছে তার সিপাহীদের জন্য বিজয়ের সুসংবাদ। মারাঠা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে, কিন্তু আহমদ শাহ আবদালীর দিক থেকে সর্বশেষ আঘাত তখনো বাকি। তিনি তার মাহফুজ ফউজের চৌদ্দ হাজার সিপাহীকে ময়দানে আসার হুকুম দিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার আগে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো ময়দান থেকে। তাদের সাথে সাথে সবদিক থেকে দুশমনের উপর চূড়ান্ত হামলা চালাবার হুকুম দিলেন তিনি। সিপাহীদের পদক্ষেপ উড়ন্ত ধুলোর ভিতরে আসমান-জমিন এক হয়ে গেছে। আবদালীর মাহফুয ফউজ লশ্‌করের পিছন দিক থেকে ঝড়ের মতো এসে হাজির হলো ময়দানে এবং দুশমনের ডান বায়ের সৈন্যদের সারি ভেদ করে পৌছে গেলো তাদের পশ্চাতে। নতুন উদ্যম নিয়ে তাজাদম সৈনিকরা ময়দানে এলে মুসলিম ফউজের উৎসাহ বেড়ে গেলো। তারা সবদিক থেকে দুশমনের সারি বিধ্বস্ত করে কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলো। প্রায় সোয়া দুটার দিকে বিশ্বাস রাও গুলি লেগে জখমি হয়ে গেছে। ভাওজী মরিয়া হয়ে শেষবারের মতো হামলা করলেন এবং বাহাদুরের মতো লড়াই করতে করতে প্রাণ দিলেন। সিপাহসালারের মৃত্যুতে মারাঠা ফউজের উৎসাহ দমে গেলো এবং বিকাল প্রায় চারটার সময়ে তাদের পুরো ফউজ ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো। বিজয়ী ফউজ তাদের পিছু ধাওয়া করলো এবং মারাঠা ফউজের খন্দক লাশে ভরে গেলো। সেদিনকার অস্তসূর্য দেখে গেলো ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত মারাঠা ফউজের ধ্বংসরূপ। আবদালীর লশ্‌কর চাঁদনী

রাতে ভোর পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করলো মারাঠাদের। শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলো যারা, পরদিন ভোরে তাদের উপরেও চললো হামলা। বিশ্বাস রাও জখমি হবার কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেলো। পলাতক মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করলো যারা, তারা শুধু আফগান, রোহিলা, বেলুচ আর মোগলই নয়, বরং আশেপাশের গাঁয়ের যেসব লোকের উপর মারাঠা কিছুদিন চালিয়েছে অকথ্য জুলুম, তারাও তলোয়ার বর্ষা ও লাঠি নিয়ে এখানে-সেখানে তাদেরকে পাঠাচ্ছে মৃত্যুর দেশে। আওয়ামের ভিতরে মারাঠা বিদ্বেষ ছিলো এমন তীব্র যে, গাঁয়ের মেয়েরা পর্যন্ত তাড়া করতে লাগল তাদেরকে। মারাঠা শিবিরে গণিমাতের মাল কোনো বড়ো সালতানাতের ধনভাণ্ডারের চাইতে কম ছিল না। জওয়াহেরাত, সোনা-চাঁদি ছাড়া হাজার হাজার বলদের গাড়ি, প্রায় দু' লাখ গো-মহিষ, হাজার হাজার ঘোড়া ও উট এবং পাঁচশ হাতী আফগানদের হাতে চলে গেলো।

মারাঠা ফউজের বেশিরভাগ সরদার মারা গেলো যুদ্ধের ময়দানে। পরদিন মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করে ফিরে এসে ফউজী অফিসাররা আহমদ শাহ আবদালীর কাছে একে একে সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন তাদের কার্যকলাপ। দুপুরের মধ্যে প্রায় তামাম ফউজ এসে জমা হলো শিবিরে। কিন্তু মোয়াযযম আলী ও তার সিপাহীদের কয়েকটি দলের তখনো খোঁজ নেই। আকবর খান ও তার সাথীরা তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে দেখেছেন হলোকারের পলাতক সিপাহীদের পিছু ধাওয়া করতে। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে আকবর খান যখন তার খোঁজ করে শিবিরের মধ্যে কয়েকবার ঘুরে এলেন এবং নজীবুদ্দৌলা, হাফিজ রহমত খান ও অন্যান্য রোহিলা সরদার তাকে শান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, এক রোহিলা সিপাহী তখন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইশারা করে বুলন্দ আওয়াজে বলল ঃ সম্ভবত উনি আসছেন।'

আকবর খান ভালো করে তাকিয়ে দূরে দৃষ্টিসীমায় কয়েকজন উষ্ট্রারোহীকে দেখে উদ্বিগ্নচিত্তে বললেন ঃ কিন্তু উনি ছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার। এ অপর কোনো দল।'

নজীব খান সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ বেটা! হতাশ হয়ো না।

মোয়াযযম আলী অবশ্যি আসবেন।' আকবর খানের দীল বলে উঠলো ঃ তাকে অবশ্যি আসতে হবে। আমাদের এই গৌরবময় বিজয় তো তারই জন্য। আমাদের সাফল্যে খুশি হবার অধিকার তার চাইতে বেশি আর কারুর নেই।' তারপর সাথীদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ তোমরা তৈরি হও। আমরা তার সন্ধানে যাবো। আমার বিশ্বাস, তিনি কোথাও দুশমনের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেছেন।'

নজীবুদ্দৌলা বললেন ঃ দুশমনের আর লড়াই করবার মতো হিম্মৎ নেই, আর ঘোড়ারও তাকৎ নেই সওয়ারের বোঝা বইবার।'

ঃ আমরা পায়দল যাবো।' আকবর খান বললেন।'

নজীব খান জওয়াব দিলেন ঃ সাথীদের খানিকক্ষণ আরাম করতে দাও। সন্ধ্যার মধ্যে মোয়াযযম আলী না এলে আমরা কয়েকটি দল পাঠাবো তার সন্ধানে।'

ক্লান্তিতে আকবর খানের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভেঙে এসেছে। কোনো কথা না বলে তিনি শুয়ে পড়লেন জমিনের উপর ।

কিছুক্ষণ পর উষ্ট্রারোহী দলটি শিবিরে প্রবেশ করলো। এক নওজোয়ান ছুটে এসে বুলন্দ আওয়াজে বললো ঃ আকবর, মোয়াযযম আলী এসে গেছেন।'

ঃ কোথায় তিনি?' আকবর খান জলদি উঠে প্রশ্ন করলেন।

জওয়াবে নওজোয়ান উষ্ট্রারোহী দলের দিকে ইশারা করলো। আকবর খান ছুটে গিয়ে দেখলেন, মোয়াযযম আলী এক উটে সওয়ার হয়ে আছেন। তার মুখ ধূলিধূসর। তার দেহাবরণ রক্তে রঙিন। তার গর্দান ঝুঁকে পড়েছে। চোখ দু'টি বন্ধ। ঢিলা হাতে তিনি ধরে রয়েছেন উটের রশি।

ঃ ভাইজান! ভাইজান!' আকবর খান তার হাত থেকে উটের রশি ধরলেন ঃ আপনি সুস্থ আছেন তো? আপনি জখমি হননি তো?'

মোয়াযযম আলী আধা-বেহুঁশ অবস্থায় চোখ খুলে ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন ঃ আমি বেশ সুস্থ আছি।'

আকবর খান রশি টেনে উটটিকে বসিয়ে দিলেন। মোয়াযযম আলী নেমে পড়লেন। আকবর খান তার আস্তিনে দেখলেন তাজা খুনের দাগ। তিনি ভাঙা গলায় বললেন ঃ ভাইজান, আপনি জখমি।'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ ও কিছু নয়; মামুলি আঘাত।'

ঃ মোয়াযযম আলী! মোয়াযযম! তুমি কোথায় ছিলে?' নজীবুদ্দৌলা এগিয়ে এসে বললেন।

আমি বহুদূর চলে গিয়েছিলাম।' বলে মোয়াযযম আলী কাঁপতে কাঁপতে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন তার দিকে। কিন্তু তখন তার তাকৎ শেষ হয়ে গেছে। তিনি জমিনের উপর পড়ে গেলেন। আকবর খান, নজীবুদ্দৌলা ও হাফিজ রহমত খান এক সঙ্গে তাকে ধরে উঠবার চেষ্টা করলেন। এক সিপাহী পানি এনে ধরলো তার মুখে। মোয়াযযম আলী পানি পান করে বললেন ঃ আমার জন্য আপনাদের পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। আমি এখখুনি ঠিক হয়ে যাবো। আমার কিছুক্ষণ আরাম করবার প্রয়োজন।

হাফিজ রহমত খান তার আস্তিন ছিঁড়ে জখম দেখে বললেন ঃ জখম মামুলি। পেরেশানির কারণ নেই।

এক সিপাহী তার কোমরবন্দ ছিঁড়ে তার বাহুতে পট্টিবেঁধে দিলো। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন জমিনের উপর।

নজীব খান বললেন ঃ ওকে তুলে আমার খিমায় নিয়ে যাও।'

মোয়াযযম আলী ক্ষীণ আওয়াজে বললেন ঃ না, কিছুক্ষণ আমায় এখানেই থাকতে দিন।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মোয়াযযম আলী গভীর ঘুমে ঝিমিয়ে পড়লেন। তার সাথীরাও ইতিমধ্যে এসে জমা হয়েছে তার পাশে। এক নওজোয়ান নজীবুদ্দৌলাকে বললো ঃ আমরা চল্লিশ মাইল দুশমনের পিছু ধাওয়া করেছি। আমাদের ঘোড়াগুলো মরে গেলে আমরা পায়দল তাদের পিছনে চলেছি। উটগুলো আমরা ছিনিয়ে এনেছি মারাঠাদের কাছ থেকে। আমাদের আরো পঞ্চাশজন সাথী পায়দল আসছে।'

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন জেনারেলের সাথে আহমদ শাহ্ আবদালী শিবিরে টহল দিয়ে সেখানে এলেন। তিনি মোয়াযযম আলীর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন ঃ ইনি কে?'

নজীবুদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ আলীজাহ্! ইনি মোয়াযযম আলী খান। এখখনি ইনি মারাঠাদের পিছু ধাওয়া করে ফিরে এলেন।'

ঃ এর জখম খুব বিপজ্জনক নয় তো?'

ঃ না, আলীজাহ্! ইনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'

শাহ্ ওয়ালী খান বললেন ঃ ময়দানে আমি ওঁকে কয়েকবার দেখেছি আর কখনো যদি উনি দুশমনের পিছনে ছুটে থাকেন, তা'হলে ওঁর জিন্দাহ্ থাকাই এক মোজেজা।'

আবদালী বললেন ঃ এখানে ঠাণ্ডা। ওঁকে খিমার ভিতরে নিয়ে চলো।

আকবর খান মোয়াযযম আলীর বাহু ধরলেন। তিনি চোখ খুললেন। আবদালীকে সামনে দেখে তিনি উঠে আদবের সাথে দাঁড়ালেন।

আবদালী তার রক্তাক্ত লেবাসের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ লড়াই খতম হয়ে গেছে। এখন তোমার ভালো পোশাক প্রয়োজন। তারপর তিনি এক অফিসারকে বললেন ঃ যাও, আমার লেবাস এনে ওকে দাও।

কয়েকদিন পর আহমদ শাহ্ আবদালীর সেনাবাহিনী দিল্লির পথ ধরলো। পানিপথের পরাজয় মারাঠা ইতিহাসের চূড়ান্ত পরাজয়। হলোকার, গায়কোয়ার, নাড়ুশঙ্কর, মহাদেওজী, সিন্ধিয়া ও নানা ফার্নাবিস ছাড়া সব বড়ো বড়ো মারাঠা নেতা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। মুসলমানদের নিকৃষ্টতম গাদ্দার ইব্রাহীম গারদীকে কতল করা হয়েছে। শমশের বাহাদুর ও অন্তজী মুঙ্গোশ্বর জখমি হয়ে পালিয়ে গিয়ে মারা গেছে পথের মধ্যে। বিশাল মারাঠা ফউজের মাত্র এক-চতুর্থাংশ কোনো মতে পালিয়ে গেছে দেশে। এই মহান উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য আহমদ শাহ্ আবদালীকে দিতে হয়েছে কঠিন মূল্য, তবু তার মকসুদ পূর্ণ হয়েছে। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মারাঠাদের সকল সংকল্প ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে চিরকালের জন্য।

চৌদ্দ

কয়েকদিন পর আফগান সেনাবাহিনী দিল্লির বাইরে তাঁবু ফেললো এবং শহরে চললো পানিপথের বিজয় উপলক্ষে খুশির উৎসব। উৎসব দিনে জামে মসজিদে হলো ঈদের দিনের মতো সমারোহ। শহরের বাসিন্দা ছাড়া ফউজী অফিসার ও সিপাহীরা জমা হলো মসজিদের ভিতরে ও বাইরের খোলা ময়দানে। আবদালীর ইজ্জত, সৌভাগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করে দোআ করা হলো। দোআর শেষে নামাজিরা উঠতে শুরু করলে খতিব বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ হাজেরীন আপনারা একটু দেরি করুন। পানিপথের এক মুজাহিদ আপনাদের কাছে কিছু বলতে চান।' নামাজিরা এগিয়ে এসে তাকাতে লাগলেন মিম্বরের দিকে। মোয়াযযম আলী উঠে মিম্বরের কাছে এসে বললেন ঃ

'বন্ধু ও বোযর্গান! পানিপথের বিজয় নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবময় কৃতিত্ব। আমাদের ভাবী বংশধররা নিশ্চিতরূপে আহমদ শাহ্ আবদালীকে মনে করবে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী। আমরা যখন ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন তিনি হয়েছেন আমাদের সহায়। যে দুশমন আমাদেরকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলো নিকৃষ্টতম গোলামীর জিঞ্জিরে, তাদের হাত থেকে তিনি আমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন। তিনি যে কল্যাণ আমাদেরকে দিয়েছেন, তার প্রতিদান আমরা দিতে পারবো না, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের দোআর দাবিদার পানিপথের সেই বীর শহীদান, যাঁরা আমাদের ইজ্জত, আমাদের আজদি ও আমাদের সৌভাগ্যের জন্য দিয়েছেন তাদের বুকের খুন। আজ সেই নাম- না-জানা শহীদানের রুহ আমাদের কাছে পানিপথে তাদের কবরের উপর চেরাগ জ্বালাবার দাবি জানাচ্ছেন না, বরং দাবি জানাচ্ছেন তাদের সেই মকসাদ থেকে বিচ্যুত না হবার, যার জন্য তাঁরা কোরবান করে গেছেন তাদের জান। পানিপথের শহীদান আমাদের আর একবার দিয়ে গেছেন এ দেশে ইজ্জত ও আজাদির জিন্দেগি যাপনের মওকা। যদি আমরা মওকার সদ্ব্যবহার না করি, তা'হলে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ কোনো পতনমুখী কওমকে বারংবার উত্থানের সুযোগ দেন না।'

আমাদের দরজায় যখন বসে গেছে মৃত্যুর পাহারা, তখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী আহমদ শাহ্ আবদালী আমাদেরকে দিয়েছেন জিন্দেগির পয়গাম। তিনি এক বিচ্ছিন্ন, ভাগ্যহীন ও নৈরাশ্যে ভেঙে-পড়া কাফেলাকে তুলে দিয়েছেন

জিন্দেগির রাজপথে। আমাদের পরবর্তী মনজিল কি হবে, সে চিন্তা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ঃ আমাদের অতীত দিনের কোন ত্রুটির জন্য মারাঠা বর্বরতা ও জুলুমের তুফান আটক পর্যন্ত এসে পৌছেছিলো এবং আমাদের কাছে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের দাবিই বা কি?

আহমদ শাহ্ আবদালী তার কর্তব্য করে গেলেন, কিন্তু আমাদের কর্তব্য এখনো বাকি। পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের কোমর ভেঙে গেছে, কিন্তু আর কোনো বিপদ নেই, মনে করার মতো আত্মতুষ্টিতে যেনো আমরা মত্ত না হই। আমাদের কমজোরীর প্রতিকার যদি আমরা না করি, তাহলে সম্ভবত কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে মারাঠার চাইতেও অধিকতর বিপজ্জনক দুশমনের। বাংলায় আমাদের আজাদির ঝাণ্ডা হয়েছে ধূলায় লুণ্ঠিত। কর্ণাটক হয়ে গেছে ফিরিঙ্গিদের শিকারভূমি এবং তাদের ষড়যন্ত্র জাল ছড়িয়ে পড়েছে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত। যদি আমরা সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবার চেষ্টা না করি, তাহলে যে দেশে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হুকুমাত চালিয়েছি, সেখানকার জমিনে আমাদের স্থান হবে না।'

'আহমদ শাহ্ আবদালী আমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন এক অতি বড়ো বিপদ থেকে, কিন্তু যেখানকার বাসিন্দারা চোর-ডাকাতকে তাদের মুহাফিজ মনে করে, তাদের ঘর হিফাজত করার জিম্মা তিনি নিতে পারবেন না চিরকালের জন্য। আমাদের অসহায় ও মজলুম হবার কারণ নেই স্বার্থশিকারী উমরাহ্, যারা কওমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে দিল্লির বিশাল সালতানাতকে খণ্ডিত করেছেন ছোট ছোট অংশে। আমাদের হতাশা ও সংশয়ের জন্য দায়ী নৈতিক চরিত্রবর্জিত ছোট ছোট রাজ্যের শাসকরা। বাংলার মুষ্টিমেয় ইংরেজির হাতে আমাদের পরাজয়ের জন্য দায়ী সেইসব দেশদ্রোহী, যারা কওমের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ ইংরেজের সাথে এক করে নিয়েছে। যদি আপনারা বাংলার ঘটনা-প্রবাহ থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করেন এবং তেমনি করে অনৈক্য ও কেন্দ্রচ্যুতির অভিশাপ মাথায় তুলে নেন, তাহলে এ দেশের প্রতিটি অংশে বাংলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। জাতিদ্রোহীরা যদি কোন কওমের ইজ্জত ও আজাদির আমানতদার হয়ে বসে এবং ক্ষমতার মসনদে আসীন হয় লোভী স্বার্থ শিকারীর দল, তার চাইতে বড়ো আজাব কওমের পক্ষে আর কি হতো পারে? বিগত অর্ধশতাব্দীর ঘটনাবলী আমাদের কাছে এ বাস্তব সত্য বেশ ভালো করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ দুনিয়ায় কোনো কমজোর কওমের ইজ্জত ও আজাদি নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। যে দেশ বিভেদ ও কেন্দ্রচ্যুতির শিকারে

পরিণত হয়, সে দেশ নিশ্চিতরূপে পরিণত হয় নেকড়ে-স্বভাব মানুষের শিকারভূমিতে।'

আজ এ মসজিদে এমন সব লোক মওজুদ রয়েছেন, যাদের বাস্তববাদী মনোভাব আমাদের বাঁচাতে পারে ভবিষ্যতের বিপদ সম্ভাবনা থেকে। আজ সময় এসেছে দেশের ক্ষমতালোভীদের বিরুদ্ধে আওয়ামের সংঘশক্তি সংগঠন করবার জন্য সচেতন জনগণকে তৎপর হয়ে উঠতে হবে। এই ক্ষমতাশিকারীদের গোপন হস্ত আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে এমন কমজোর করে দিয়েছে যে, আমরা আজ হীনতম দুশমনেরও মোকাবিলা করতে পারছি না। আমাদের শাসকরা মারাঠাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাদের মসনদে ঘুমিয়ে কাটাবেন অথবা তারা আরো কিছুকাল আয়েশ-আরাম ও হাসি-আনন্দে মাহফিল গরম করবার মওকা পাবেন, সেজন্য আমরা পানিপথের লড়াই করিনি। এদেশের মুসলমানেরা আর একবার ইজ্জত ও আজাদির জিন্দেগি যাপন করবার মওকা পেতে পারে, তারই জন্য আমরা পানিপথের লড়াই করছি। আমি এদেশের হুকুমাতের কর্মবিদারদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন এবং যে সব ভুলের জন্য বাংলায় আমাদেরকে লজ্জাজনক ধ্বংসের মোকাবিলা করতে হয়েছে, তারা যেনো তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে খবরদার থাকেন এবং বাইরের কোনো হামলাদারের হুমকি এলে ময়দানে নামবার আগে নিশ্চিত হয়ে নেন যে, তাদের সেনাদলে কোনো মীর জাফরের অস্তিত্ব নেই।'

বন্ধুগণ! বক্তৃতা করবার শখ আমার ছিলো না। আমি একজন সিপাহী মাত্র। বাংলার আজাদির জন্য আমি জানবাজি রেখেছিলাম। আমার বাপ, আমার ভাই, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ দোস্তরা বাংলার মাটিতে জান কোরবান করেছেন, কিন্তু তাদের নিঃস্বার্থ কোরবানী নিষ্ফল হবার কারণ, বাংলার আওয়াম দেশপ্রেমিক ও দেশদ্রোহীর মধ্যে পার্থক্য করবার মতো চেতনা সম্পন্ন ছিলো না। সুনাম ও সুখ্যাতির জন্য আমি পানিপথের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি, বরং বাংলার মুসলমানদের উপর অন্ধকার ঘনঘটা নেমে এসেছে, আপনাদের ঘর থেকে সেই ভয়ানক অন্ধকার দূর করে দেওয়াই ছিলো আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। আজ আমি আপনাদের সামনে জবান খুলবার সাহস করছি শুধু এই জন্য যে, যারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে থাকতে চান, তাদের সম্পর্কে খবরদার থাকবার প্রয়োজন রয়েছে আপনাদের।

'পরিশেষে আমি দোআ করছি ঃ পানিপথের বিজয় থেকে আপনাদের ও ভাবী বংশধরদের জন্য কল্যাণকর ফল বহন করে আনবার জুরাত, হিম্মৎ ও

তাকৎ খোদা আপনাদেরকে দিন। খোদা আমাদের উমরাহ্ ও শাসকদের তওফিক দিন, যেনো তারা কওমের খেদমতের জন্য জিন্দাহ্ থাকতে পারেন।'

মোয়াযযম আলী বক্তৃতা শেষ করলেন। লোক মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলে এক আফগান অফিসার তাকে বললেন ঃ হুজুর বাদ্শাহ্ সালামাত আপনাকে ডেকেছেন।'

আহমদ শাহ্ আবদালী মিম্বর থেকে খানিকটা দূরে দিল্লির বিশিষ্ট লোকদের ও আফগান সরদারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোয়াযযম আলী তার কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আমি এই দেশের কোনো লোকের মুখ থেকে এই ধরনের কথা শুনবার ইন্তেজার করেছিলাম। যদি হিন্দুস্তানের প্রত্যেক এলাকায় তোমার মতো সঠিক ধারণাসম্পন্ন লোক জেগে উঠতো, তা'হলে তোমার বিশ্বাস, এদেশ ধ্বংসের কবল থেকে বেঁচে যেতো।' তারপর তিনি মুহূর্তের জন্য শুজাউদ্দৌলার দিকে তাকিয়ে আবার মোয়াযযম আলীর দিকে ফিরে বললেন ঃ কিন্তু যদি কোনো অবস্থায় তোমার মনে হয়, এ দেশ তোমার খেদমত চায় না, তা'হলে তুমি সোজা আমার কাছে চলে এসো। স্পষ্ট সত্যভাষণের কদর করবার মতো লোক ওখানে রয়েছে।'

৪

পরদিন মোয়াযযম আলী যোহরের নামাজ আদায় করে জামে মসজিদ থেকে বেরুচ্ছেন, অমনি নজীবুদ্দৌলার ফউজের এক সিপাহী তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঃ আমীরুল উমরাহ্ আপনাকে স্মরণ করেছেন।' সিপাহী এগিয়ে এসে তাকে সালাম করে বললো।

ঃ তিনি এখন কোথায়?

ঃ এখন তিনি ফউজী শিবিরে রয়েছেন। চলুন।'

কিছুক্ষণ পর মোয়াযযম আলী শিবিরের এক আলীশান খিমার মধ্যে নজীবুদ্দৌলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নজীবুদ্দৌলা কোনো ভূমিকা না করে বললেন ঃ কাল মসজিদে তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে আমারই দীলের আওয়াজ। কিন্তু তোমার কথা শুনে শুজাউদ্দৌলা খুড়াই পেরেশান হয়েছেন। ভোরে তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। তার ধারণা, তারই সম্পর্কে তুমি সব কথাগুলো বলেছো। তিনি তোমার সম্পর্কে খুব খুশি ছিলেন না। কিন্তু কাল তোমার বক্তৃতা

শুনে খুব বেশি পেরেশান হয়েছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার ধারণা, আমি কোন ভুল কথা বলিনি।'

ঃ তোমার সত্যভাষিতার সাথে আমি পরিচিত। কিন্তু আমার ভয় হয়, শুজাউদ্দৌলাকে নারাজ করে তোমার লাখনৌয়ে থাকাই মুশকিল।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ লাখনৌ আমার সফরের আখেরী মনজিল নয়। যখন আমি বুঝবো ওখানে থেকে আমার জবান আত্মার নির্দেশে চলতে পারবে না; তখন আমি আর কোনো জায়গা খুঁজে নিতে তকলিফ বোধ করবো না।'

নজীবুদ্দৌলা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন ঃ আমি শুজাউদ্দৌলাকে বুঝিয়ে বলেছি এবং আশা করছি যে, তিনি তোমায় পেরেশান করবেন না। যদি কখনো লাখনৌর আবহাওয়া তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে, তাহলে তোমার জন্য দিল্লির দরজা খোলা রইলো প্রতি মুহূর্তের জন্য। তোমার পছন্দ হলে ফউজের কোনো উচ্চপদ তোমায় দিতে আমি তৈরি থাকবো।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার দিলে চাকরির শখ পয়দা হবে, দিল্লির অবস্থা এখনো তেমন নয়। যেদিন আমার বিশ্বাস হবে যে, এখানে এসে আমি কোনো কল্যাণকর কাজ করতে পারবো, সেদিন আমায় এক রেজাকার হিসাবে আপনি এখানে পাবেন। আহমদ শাহ্ আবদালী ফিরে যাবার পর দিল্লির অবস্থা কেমন হবে জানি না। আপনার জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু যতোদিন দিল্লির তখতে কোনো উদ্যমশীল শাসক না বসছেন, ততোদিন দিল্লি ও লাখনৌয়ে কোনো পার্থক্য নেই আমার কাছে। আমাদের দুভাগ্য, এমনি আজিমুশ্শান বিজয়ের পরেও এদেশের বিশিষ্ট লোকেরা কওমের ভবিষ্যৎ তেমন কোনো শাসকের হাতে সঁপে দিতে পারছেন না, যার চরিত্র ও কার্যকলাপ দেশবাসীর আজাদি ও সৌভাগ্যের জামানত দিতে পারে। যোগ্যতা ছাড়া কেউ তার মাথায় শাসকের তাজ তুলে নেবার পয়দায়েশী হক পেতে পারেন, একথা মেনে নিতে আমি রাজি নই। বিগত আধা শতাব্দীতে আমরা নামেমাত্র শাসকের অযোগ্যতার দরুন অনেক কিছুই হারিয়েছি। আল্লাহ্ আমাদেরকে জিন্দাহ থাকবার আর এক মওকা দিয়েছেন, কিন্তু হায়! যিনি আমাদের মারাঠা জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন, তিনি যদি আমাদের এ খোশ-খবরও শোনাতে পারতেন যে, দিল্লির তখতের জন্য তেমনি একটি মানুষের প্রয়োজন এবং এদেশের উমরাহর ফরজ হচ্ছে তাদের ভিতর যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে শাসনক্ষমতা সমপর্ণ করা। খোদা করুন, যেনো দিল্লির হুকুমাতের নয়া দাবিদারের কাছে আপনার প্রত্যাশা

সঠিক প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমার এখনো জানা নেই, তিনি সত্যিকার শাসকের যোগ্যতার পরিচয় দেবেন, না এখকার বাদশাহ্ গোষ্ঠীর হাতের খেলনা মাত্র হবেন।'

ঃ তুমি জানো, এ ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একমত। কিন্তু মোগল উমরাহ্‌র দাবি ছিল যে, দিল্লির তখতে কোনো বিধিসঙ্গত ওয়ারিসকে বসানো হোক।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার কাছে বিধিসঙ্গত শুধু তাই যা নির্ভুল। শাহে আলম সম্পর্কে আমি এর বেশি কিছু জানি না যে, তিনি ষড়যন্ত্রের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে নির্বাসনে জিন্দেগি যাপন করছেন এবং যেসব উমরাহ্ তাকে তখতে বসবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তাদের খুশির একমাত্র কারণ তিনি তার নিহত পিতার চাইতেও কমজোর। আপনি দিল্লিতে আহমদ শাহ্ আবদালীর প্রতিনিধি হিসাবে থাকলেই কেবল আমি নিশ্চিত হতে পারি। আমি দোআ করি যেনো নয়া শাহান শাহ্ আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এই ধরনের উমরাহ্ হাতের খেলনায় পরিণত না হোন।

ঃ তুমি বিশ্বাস কর যে, শাহে আলম শাসক হিসাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হবেন?'

ঃ তিনি এক কমজোর ব্যক্তি এবং তার বাদশাহী হামেশা অপরের রহম ও করমের উপর নির্ভশীল হবে, এর বেশি আমি কিছু জানি না তার সম্পর্কে। নির্বাসিত অবস্থায় তার অসাহায়তার অনুভূতি আমার রয়েছে কিন্তু আমার এ আশঙ্কাও রয়েছে যে, সম্ভবত তখতে আসীন হয়ে তিনি হবেন আরো বেশি অসহায়।'

নজীবুদ্দৌলা আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ তুমি কবে ফিরে যাচ্ছো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি শুধু এই আশা করেই এখানে রয়েছি, হয়তো আহমদ শাহ্ আবদালী ফিরে চলে যাবার খেয়াল ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাবেন। আমি তাকে দেখতে চাচ্ছিলাম মহারাষ্ট্রের ময়দানে। কিন্তু এখন দু'তিন দিনের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

নজীবুদ্দৌলা বললেন ঃ আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি ফিরে চলে যাচ্ছেন। আফগান সরদার বিরোধিতা না করলে আমাদের ঘোড়া ইতিমধ্যে নর্দমার কিনারে পৌঁছে যেতো। কিন্তু আমি তোমায় আর একবার পরামর্শ দিচ্ছি, লাখনৌয়ে গিয়ে সতর্ক থেকো। শুজাউদ্দৌলা প্রতিহিংসা পরায়ন লোক। যদি তার মাথায় একবার ঢোকে যে, তুমি তাকে পছন্দ করো না, তাহলে তিনি তোমার হাত থেকে নাজাত পাবার হাজারো বাহানা খুঁজে বেড়াবেন। আমার ইচ্ছা তুমি ওকে দুশমন না বানিয়ে চেষ্টা করো ওকে তোমার সাথে একমত বানাতে। হতে পারে, তিনি তোমার ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কওমের কল্যাণের জন্য কিছু করবেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ কওমের কল্যাণের জন্য আমি এক নগণ্যতম মানুষের পায়ে মাথা রাখতেও কুণ্ঠিত হবো না।'

ঃ তা ছাড়া শাহে আলম সম্পর্কেও তোমার ধারণা প্রকাশের ব্যাপারে সতর্ক

থাকতে হবে। নওয়াব শুজাউদ্দৌলা ও তার সাথে একমত উমরাহ্ তার প্রতি বড়ো সমর্থক।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি জানি তারা ওকে কাজে লাগাবার মতো খেলনা মনে করেন।'

মোয়াযযম আলী নজীবুদ্দৌলার সাথে মোলাকাত করে শিবিরে তার খিমার কাছে পৌছে দেখলেন, আকবর খান রৌদ্রে বসে আলাপ করছেন এক নওজোয়ানের সাথে। মোয়াযযম আলীকে দেখেই আকবর খান উঠে বললেন ঃ ভাইজান ইনি আপনার সাথে মোলাকাত করতে এসেছেন।'

মোয়াযযম আলী আগন্তুকের সাথে মোসাফেহা করে চাটাইয়ের উপর বসে পড়লেন।

আগন্তুক বললেন ঃ আমার নাম আসাদ খান। আমি মহীশূর থেকে হায়দার আলীর এক খাস পয়গাম নিয়ে এসেছিলাম আহমদ শাহ আবদালীর কাছে। কাল মসজিদে আপনার বক্তৃতা শুনে আমার আগ্রহ হলো আপনার সাথে পরিচিত হবার।'

ঃ আপনি আহমদ শাহ আব্দালীর সাথে মোলাকাৎ করেছেন?'

ঃ জী হ্যাঁ। দু'তিন দিনের মধ্যে আমি আবার ফিরে যাচ্ছি। কাল আপনার বক্তৃতা শোনার পর আপনার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জেনে নিয়েছি এক সিপাহীর কাছ থেকে। আপনাকে একবার মহীশূরে যাবার জন্য দাওয়াত দেওয়া আমি জরুরি মনে করলাম। হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সম্পর্কে আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন ইনশাআল্লাহ তা পূর্ণ হবে মহীশূরে। হায়দার আলী এ যুগের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তিনি দক্ষিণ ভারতকে একদিকে মারাঠাদের জবরদস্তি থেকে, অপরদিকে বিদেশী ইংরেজের সাম্রাজ্য লিপ্সার কবল থেকে নাজাত দেবার চেষ্টা করছেন এবং মহীশূরের দরজা প্রত্যেক নির্ভুল পথানুসারী মুসলমানদের জন্য রয়েছে উন্মুক্ত। সেদিন সুদূর নয়, যখন আপনি শুনতে পাবেন যে, দক্ষিণ ভারতের মুসলমান তাকে তাদের পরিত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমি চাকরি করতাম কর্ণাটকের ফউজে। মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহর ফউজী অফিসারদের যে দলটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ঘৃণা করতেন তাদের নিকৃষ্টতম দুশমন, আমি ছিলাম তাদের একজন। ইংরেজ যখন নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার সাথে লাড়াই শুরু করলো তখন মাদ্রাজের গভর্নরের ইচ্ছা অনুযায়ী মোহাম্মদ আলী সৈন্যদের কয়েকটি দল কলকাতায় পাঠাবার ওয়াদা করলেন। আমায় তিনি সেই সৈন্যদলের অধিনায়ক মনোনীত করলে, আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। আমার বিদ্রোহের অভিযোগে পাঁচ বছর কয়েদে থাকবার সাজা দেওয়া হলো, কিন্তু ছয়মাস কয়েদখানায় থাকার পর ফেরার হওয়ার মওকা পেয়েই আমি সোজা চলে গেলাম সেরিঙ্গাপটমে। হায়দার আলীর সুপারিশে আমার চাকরি জুটে গেলো মহীশূরের ফউজে। তখনো আমি ভাবা করিনি যে, মহীশূরের রাজার ফউজের নির্ভীক সিপাহীই একদিন হবেন দক্ষিণ ভারতের আজাদির সবচেয়ে বড়ো মুহাফিজ। যদি আপনি এমন

এক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেতে চান, যিনি হিন্দুস্তানের অসহায় হতাশ মুসলমানদের দিতে পারেন সঠিক পথের নির্দেশ, তাহলে আপনি একদিন অবশ্যি আসবেন সেরিঙ্গাপটমে। আমার বিশ্বাস আপনি হতাশ হবেন না। আপনি কে, সে পরিচয় আপনাকে দিতে হবে না তার কাছে। তার সূক্ষ্মদর্শী চোখের দৃষ্টিই আপনার দীলের অবস্থা জেনে নেবে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ হায়দার আলী সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি কিন্তু এখখুনি আমি সেরিঙ্গাপটমে যাবার ওয়াদা করতে পারছি না। সম্ভবত কিছুদিনের মধ্যে আমায় একবার হায়দারাবাদে যেতে হবে। মওকা পেলে হয়তো একবার যাবো মহীশূরে। আপনার সাথে মিলবার সুযোগ পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি।

৪

একদিন দুপুর বেলা ফরহাত তার দু'মাসের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসেছেন এবং আবেদা তার কাছেই নামাজের মসল্লার উপর বসে তসবিহ পড়ছেন। সাবের হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে তাদের কামরায় উঁকি মেরে বললো ঃ বিবিজী! বিবিজী! খান সাহেব এসে গেছেন।'

ফরহাতের মুখ খুশির দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠলো এবং আবেদা আলহামদুলিল্লাহ বলে সিজদাহ করলেন।

খানিকক্ষণ পরেই সিঁড়িতে শোনা গেলো পায়ের শব্দ। ফরহাত বাচ্চাকে বিছানার উপরে শুইয়ে দিলেন। মোয়াযযম আলী সালাম করে কামরায় প্রবেশ করলেন এবং ফরহাত অন্তহীন শুভেচ্ছার দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন তার দিকে। তার সে শুভেচ্ছা অশ্রুবিন্দু হয়ে দেখা দিলো তার চোখের কোণে। তিনি বললেন ঃ আপনার জীবনে এ বিজয় মোবারক হোক।'

আবেদা সিজদাহ থেকে মাথা তুলে লক্ষ্য করলেন মোয়াযযম আলীর দিকে এবং তিনি তাকে সালাম করে গিয়ে বসলেন বাচ্চার বিছানার কাছে এক কুরসির উপর। আবেদা দোয়া করতে করতে উঠে এসে বাচ্চাকে বিছানা থেকে তুলে দিলেন মোয়াযযম আলীর কোলের উপর। তিনি বললেন ঃ তোমার সবার আগে মনোযোগ দেওয়া উচিত এর দিকে।'

মোয়াযযম আলী শরম-সংকোচে বললেন ঃ চাচিজান, এর নাম কি রেখেছেন?'

ঃ বেটা, আমরা হররোজ ওকে একটা নতুন নামে ডাকি। শের আলী জিদ ধরেছেন নাম হবে সিদ্দীক আলী, কিন্তু ফরহাত চেয়েছেন তোমার ইন্তেজার করতে।'

ঃ সিদ্দীক আলী তো খুব ভালো নাম, চাচিজান। আচ্ছা ফরহাত তোমার কি ধারণা?'

ফরহাতের মন উড়ে বেড়াচ্ছে খুশির সপ্তম আসমানে। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ ওর যে কোনো নামই ভালো লাগে আমার কাছে।'

আবেদা বললেন ঃ বেটা! আমি তোমার জন্য খানা নিয়ে আসি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ না চাচিজান, খানা আমি পথেই খেয়ে নিয়েছি। আপনি তশরিফ রাখুন। ফরহাত তুমিও বসো।'

মা ও বেটি চারপায়ীর উপর বসে পড়লেন।

আবেদা বললেনঃ বেটা, আকবর খানের সাথে তোমার দেখা হয়েছিলো?'

ঃ চাচিজান, আকবর খান আমার সাথেই ছিলেন। যুদ্ধে তার বাহাদুরীর কিসসা দূরদারায় এলাকায় মশহুর হয়ে গেছে।

ফরহাত বললেন ঃ গত মাসে শেখ ফকরুদ্দিনের এক চিঠি এসেছিলো হায়দারাবাদ থেকে। তিনি আকবর খানকে সাথে নিয়ে আপনাকে অবশ্যি হায়দারাবাদে যেতে লিখেছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এখন কয়েক মাস আমার ঘরের বাইরে যাবার ইরাদা নেই। সম্ভবত আগামী বছর আমি ওখানে যাবো। তুমি আর চাচিজানও থাকবে আমার সাথে।

আবেদা বললেন ঃ বেটা, পানিপথে তোমাদের বিজয়ের খবর যখন এলো, তখন লাখনৌয়ের ঘরে ঘরে চেরাগ জ্বালানো হলো। সাবের দাবি করলো যে, সবচাইতে বেশি চেরাগ জ্বলবে আমাদের ঘরে। জশনের রাত্রে আমাদের ঘরের আনাচে-কানাচে কোথাও চেরাগ জ্বালাতে বাকি রইলো না। তারপর আরো এক রাত্রে শহরে চেরাগ জ্বালানো হলো ঘরে ঘরে। কিন্তু সাবের আমাদের চেরাগ জ্বালিয়েছে ক্রমাগত সাতরাত। এবার তুমি নিশ্চিত মনে আমাদেরশোনাও যুদ্ধের কাহিনী।'

মোয়াযযম আলী পানিপথের যুদ্ধের কাহিনী বলতে শুরু করলে ফরহাত বললেন ঃ আপনার কথা শুনাবার জন্য আমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি বেকারার সাবের। আপনি একটু উঁচুগলায় কথা বলুন। আমার বিশ্বাস সাবের দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মোয়াযযম আলী হেসে ডাকলেন ঃ সাবের ভিতরে এসো।'

সাবের কামরায় ঢুকে নিচে গালিচার উপর বসে পড়লো। তারপর মোয়াযযম আলী বলতে শুরু করলেন যুদ্ধের কাহিনী এবং তা শুনতে শুনতে সাবেরের বুকের স্পন্দন কখনো দ্রুত, কখনো স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলো। পানিপথের শেষ সংঘাতের কাহিনী সবিস্তারে শুনে সাবের উঠে নিঃশব্দে চলে গেলো কামরার বাইরে এবং ছুটে গিয়ে হাজির হলো তার পাশে আঙিনায়। কিছুক্ষণ পরই বাড়ির নওকর ও মহল্লার লোক এসে জমা হলো তার পাশে এবং সে রঙ ফলিয়ে তাদের কাছে বলতে লাগলো মোয়াযযম আলী ও আকবর খানের বাহাদুরীর কাহিনী।

পানিপথের যুদ্ধের পর হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহরের মতো লাখনৌর মুসলিম আওয়ামের মধ্যে জেগে উঠলো এক নতুন উদ্দীপনা। শহরের অলি-গলিতে আর বাজারে গরিবের ঝুঁপড়ি থেকে শুরু করে উমরাহ মহলে পর্যন্ত সকলের মুখে শোনা যেতে লাগলো সেই বাহাদুর সিপাহীদের বীরত্ব কাহিনী, যারা মারাঠার বিপুল শক্তিকে পয়মাল করে দিয়েছেন। পানিপথের বিজয়ের পর লাখনৌয়ে প্রত্যাগত সিপাহীরা সাথে নিয়ে এসেছে বেশুমার আত্মত্যাগী মুজাহিদের কৃতিত্বের প্রাণসঞ্চারী কাহিনী। যে মোয়াযযম আলীকে লাখনৌয়ের বাসিন্দারা জানতো শুধু ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ী হিসাবে, তিনি এখন তাদের দৃষ্টিতে একা কওমী নায়কের মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি ঘর থেকে বেরুলে আওয়াম তার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ দৃষ্টিতে। তারা খুশি হয় তার সাথে কথা বলে অথবা মোসাফেহা করে। আমীর লোকেরা তাকে দাওয়াত দিয়ে গর্ববোধ করেন। উঁচু তবকার মহিলারা তার বাড়িতে এসে ফরহাতের সাথে ভাব জমানোকে মনে করেন ইজ্জতের কারণ। মোয়াযযম আলী এড়িয়ে থাকতে চান এসব সামাজিক মোলাকাত ও দাওয়াত, কিন্তু লোকেরা উদ্যম ও প্রীতিতে কোনো ঘাটতি দেখা যায় না। প্রত্যেকটি মহফিলে তার কাছে আসে পানিপথের লড়াইয়ের কাহিনী শোনবার দাবি। কখনো কখনো তিনি চেষ্টা করেন তা গুণগ্রাহীদের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দিয়ে বিদায় করতে, কিন্তু কখনো কখনো তিনি এমনি করে আলোচনা করেন যেনো তার শ্রোতাদের চোখে ভেসে ওঠে পনিপথের ময়দানের খুঁটিনাটি সকল ঘটনা।

একদিন অযোধ্যার এক বড় ফউজী অফিসার তাকে দাওয়াত দিলেন বাড়িতে। শহরের বহু গণ্যমান্য লোক আর ফউজী অফিসার শরীক হলেন দাওয়াতে। পানিপথের লড়াই সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে শহরের এক রইস প্রশ্ন করলেন ঃ জনাব আহমদ শাহ্ আবদালী ও তার ফউজের পর আপনার ধারণায় এ যুদ্ধে সবচাইতে বেশি হিস্সা নিয়েছেন কারা?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ যুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকটি সিপাহীকে আমি মনে করি এ বিজয়ের হিস্সাদার।'

অপর একজন প্রশ্ন করলেন ঃ কিন্তু আমি শুনেছি, আপনি নাকি রোহিলাখণ্ডের সিপাহীদের খুব তারিফ করেন?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ রোহিলাখণ্ডের জোয়ানরা পানিপথের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি সিপাহীকে মুগ্ধ করেছে। আহমদ শাহ্ আবদালীকেও আমি

বলতে শুনেছি যে, হিন্দুস্তানের বাকি উমরাহর কাছেও যদি এমনি সিপাহী থাকতো তাহলে তিনি খুশি হতেন।'

এক ফউজী অফিসার বললেন ঃ মাফ করবেন রোহিলাদের সাথে আপনার মুহাব্বতের কারণ তো এই নয় যে, তাদের কয়েকটি দল আপনার পরিচালনায় ছিলো?'

মোয়াযযম আলী খানিকটা উষ্ণতা সহকারে বললেন ঃ আমি অযোধ্যার ফউজের সিপাহীসালার হলেও আপনারা আমার মুখে রোহিলাদের একইরকম তারিফ শুনতে পেতেন, পানিপথের ময়দানে আমি যা দেখেছি এক সিপাহীর নজরেই দেখেছি।'

ফউজী অফিসার আবার বললেন ঃ কিন্তু জনাব, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, সিপাহীর নজরে দেখে আপনি অযোধ্যার সিপাহী সম্পর্কে কি রায় কায়েম করলেন। আপনার ধারণায় কি রোহিলা সিপাহীরা অযোধ্যার সিপাহীদের চাইতে শ্রেয়তর?'

মোয়াযযম আলী বললেনঃ রোহিলা সিপাহীদের তারিফ করার অর্থ যদি হয় আপনাদের কাছে অযোধ্যার সিপাহীদের তাচ্ছিল্য করা, তাহলে আপনাদের সাথে আলোচনা না করাই ভালো অফিসার খামোশ হয়ে গেলেন এবং মোয়াযযম আলী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ আপনারা কিছু মনে না করলে আমি বলবো, রোহিলাখণ্ডের প্রত্যেকটি জোয়ান এ যুদ্ধকে মনে করেছে তাদেরই সৌভাগ্য ও আজাদির যুদ্ধ কিন্তু সেখানে এমন লোকও ছিলো, যারা মনে করেছে এ তাদের উমরাহর যুদ্ধ। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, যেসব উমরাহ শেষ পর্যন্ত মারাঠার সাথে শান্তি স্থাপনের ও বিনা লড়াইয়ে জয়ধ্বনি তুলে ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন, তাদের সম্পর্কে আলোচান করতে আমায় বাধ্য করবেন না।'

এক আমীরজাদা বললেন ঃ কিন্তু এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না যে, পানিপথের বিজয়ের জন্য আমাদেরকে অনেক কোরবানী দিতে হয়েছে এবং আহমদ শাহ আবদালীর হাজার হাজার সৈন্যক্ষয়ের ফল এই হয়েছে যে, আফগান সরদাররা দিল্লি থেকে আগে বাড়তে অস্বীকার করেছেন। নজীবুদ্দৌলা পানিপথের ময়দানে মারাঠার শক্তি পরীক্ষার জন্য জিদ না ধরলে মারাঠার কাছ থেকে ভবিষ্যতে পূর্ণশান্তি রক্ষার ওয়াদা নেওয়া যেতে পারতো এবং আমাদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী একদিকে কলকাতা ও অপরদিকে মাদ্রাজ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ইংরেজের আধিপত্যের লোভ থেকে এদেশকে নাজাত দিতে পারতো।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ এ দেশের দুর্ভাগ্য, কতকলোক তলোয়ার কোষমুক্ত না করেই মনে করে দুশমনের মাথাকাটা হয়ে গেছে। চূড়ান্ত সংঘাতের আগেই মারাঠার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিলো পরাজয়ের। কিন্তু আমরা যদি মনে করতাম যে, লড়াই ছাড়াই আমরা বিজয় হাসিল করেছি তা হলে তা হতো আমাদের

কঠিনতম নির্বুদ্ধিতা এবং তার অনিবার্য পরিণাম হিসাবে তারা কয়েক বছর পর অধিকতর প্রস্তুতি সহকারে এগিয়ে আসতো উত্তর দিকে ও আমাদের তখন লড়তে হতো আরো ভয়াবহ যুদ্ধ। বুদ্ধি ও কৌশল দিয়েই মারাঠা সিপাহীদের হামলা নিজস্ব সরহদ্দ থেকে দূরে রাখা যাবে এই ভুল ধারণার বশবর্তী কতক রাজনীতিকই ছিলেন মারাঠাদের সাথে শান্তি স্থাপনের পক্ষে, কিন্তু নজীবুদ্দৌলা এক বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। তিনি জানতেন, কেবলমাত্র চূড়ান্ত যুদ্ধই মারাঠাদের আনতে পারে সোজা পথে। আপনাদের মধ্যে কারুরই এ ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত হবে না যে,গত কয়েক বছরে যে মারাঠা অসংখ্যশহর ও হাজার হাজার বস্তি বরবাদ-পয়মাল করে দিয়েছে, পানিপথে পৌঁছেই আচানক তাদের মনে যুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ জন্মে গেছে। এরূপ আত্মতুষ্টির ভাবও আপনাদের মনে থাকা উচিত না যে, যদি তাদেরকে এখান থেকে জিন্দাহ ফিরে যাবার মওকা দেওয়া হতো, তাহলে ফিরে যেতে যেতে পথের প্রতিটি বস্তিতে তারা ধ্বংস বরবাদীর পয়গাম দিয়ে যেতো না। তারপর কে-ই বা বলতে পারে, তারা সোজা ঘরে ফিরে না গিয়ে আগ্রা ও লাখ্‌নৌর মতো শহরগুলোর দিকেই এগিয়ে যেতো কিনা। আফসোস, পুণা থেকে পানিপথ পর্যন্ত যে সয়লাব বয়ে গেছে তার সঠিক রূপ আন্দাজ করতে পারেন না আপানাদের অনেকেই। খোদার শোকর করা আমাদের উচিত এই জন্য যে, তিনি এই সয়লাবের পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এক প্রকাণ্ড পাহাড়, নইলে এ দেশের যেসব উমরাহ্ অন্তদৃষ্টি ও বুদ্ধির গর্ব করে থাকেন, তাদের এমন শক্তি ছিলো না, যা দিয়ে তারা মোকাবিলা করতেন সে তুফানের মামুলি ঢেউয়ের। আমরা যখন ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে গেছি ঠিক সেই মুহূর্তে আহমদ শাহ্ আবদালী এগিয়ে এসে হয়েছেন আমাদের সহায়। এখন যদি আমরা মানুষের মতো জিন্দাহ থাকতে শিখি এবং আমাদের উমরাহ্ ব্যক্তিগতভাবে আত্মহত্যার পথ না ধরে সামগ্রিক সৌভাগ্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাহলে আমরা নাজাত দিতে পারি এ দেশকে ইংরেজের সাম্রজ্য লিপ্সার কবল থেকে।

'কওমের জীবন মৃত্যুর প্রশ্নে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাদের অচেতন অবস্থার এর চাইতে বড়ো সাক্ষ্য আর কি হতে পারে যে, ইংরেজ যখন বাংলার আজাদির উপর হস্তক্ষেপ করেছে, তাদের মনে তখনো কোনো অনুভূতি নেই। তখনো তারা ভাবতে পারছে না যে, বাংলার আজাদি পাগল মানুষের টুটি চেপে মেরেছে যে বেবরহম হাত, তা কোনোদিন পৌঁছে যাবে তাদেহ শাহরগ পর্যন্ত। জাঠ বা মারাঠা যখন দিল্লি বা রোহিলাখণ্ডে চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসতাণ্ডব, তখনই অযোধ্যা দাক্ষিণাত্য লাহোর অথবা মূলতানের সুবাদার ভাবছেন, আগুন তখনো তাদের ঘর থেকে বহু দূরে। এমনি করে যখন দাক্ষিণাত্য বা অযোধ্যার উপর আসে কোনো মুসিবত, তখন অপরের কোনো

অনুভূতিই থাকে না তার জন্য। বহু বছরে এই প্রথমবার এ দেশের কয়েকজন উমরাহ্‌ এক সামগ্রিক বিপদে আতঙ্কিত হয়ে সমবেত হয়েছিলেন একই ঝাণ্ডা তলে। সে ঐক্যের গৌরবময় ফল এসেছে হয়ে আমাদের চোখের সামনে। আমাদের সবচাইতে বড়ো বিপদ কেটে গেছে। এখন যদি ফিরিঙ্গি বণিকদের আমরা এ দেশ থেকে বের করে দিতে না পারি, অথবা যদি মারাঠাদের আমরা আর একবার মাথা তুলবার মওকা দেই, তাহলে আমাদের এ ব্যর্থতার কারণ হবে কওমের উঁচু তবকার লোকদের অযোগ্যতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি।'

'আমার প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে বেরুতে থাকবে আহমদ শাহ আবদালীর জন্য আমার অন্তরের দোআ। তিনি আমায় দিয়ে গেছেন ইজ্জত- সম্মানের অধিকারী এক কওমের মানুষ হিসাবে জিন্দাহ থাকবার অধিকার এই বিপুল কল্যাণ লাভের পর আমি তার কাছে দাবি করতে পারি না ঃ আসুন এখন আপনি এসে হিন্দুস্তানের উপকূল এলাকায় পাহারা দিন এবং খেয়াল রাখুন যে মারাঠা পানিপথ থেকে আধ-মরা হয়ে ফিরে গেছে, তারাই যেনো আবার মোকাড়িলা করতে না আসে আমাদের সাথে।' আমি তাকে এ কাথাও বলতে পারি না ঃ আমাদের কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম রাখবার জন্য প্রয়োজন একজন নামেমাত্র শাহানশাহ এবং যে ব্যক্তিকে এখন দিল্লির তখতে বসানো হচেছ, তাকে উমরাহর ষড়যন্ত্র ও দুশমনের হামলা থেকে নিরাপদ রাখবার জন্য প্রয়োজন আপনার পাহারা।' কিন্তু যারা নিজেদের মনে করেন কওমের ভাগ্যতরীর কর্ণধার, তাদেরকে কিছু বলবার হক আমার রয়েছে এবং তাদের কাছে আমি দাবি করবো অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের। যদি তাদের দৃষ্টিবিভ্রম, আয়েশপ্রিয়তা ও বিলাসী জীবযাত্রার দরুন কওমের তরী ডুবে যায়, তাহলে তাদেরকে ডুবতে হবে তারই সাথে।'

'আমি পানিপথের যুদ্ধে হিসসা গ্রহণকারী রোহিলা-যোদ্ধাদের তারিফ করছি, তাতে আপনাদের কোনো পেরেশানির কারণ নেই। রোহিলাখণ্ডের দোস্ত আর অযোধ্যার দুশমন -কোনোটাই আমি নই। মুসলমান হিসাবে আমি তাদের সবাইকে মনে করি এক জাতীয় অস্তিত্বের অংশ। পানিপথের লড়াইয়ের ময়দানে শহীদ হয়েছেন যে সব আফগান, মোগল, বেলুচ ও হিন্দুস্তানী মুসলমান, তারা সবাই আমাদের কল্যাণের জন্য জান দিয়েছেন। আমার ইজ্জত ও আজাদি রক্ষার জন্য আমার মস্তক উন্নত করার জন্য তারা দিয়ে গেছেন বুকের খুন এবং আমার জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো আকাঙক্ষা তাদেরই খুন দিয়ে আমার কওমের উজ্জ্বলতম ইতিহাস রচনা করব আমরা।'

মাহফিল যখন ভাঙলো, তখন লাখনৌয়ের এক বৃদ্ধ মোয়াযযম আলীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মেজবানের ঘর থেকে বেরুলেন। চিন্তিতভাবে তিনি বললেন

ঃ আপনি জানেন, আপনার প্রত্যেকটি কথা শুজাউদ্দৌলার কাছে পৌঁছে যাবে?'

মোয়াযযম আলী নিশ্চিন্তে জওয়াব দিলেন ঃ খোদা সাক্ষী, আমি এর সবগুলো কথাই শুজাউদ্দৌলাকে জানাবার জন্য বলছি। তিনি সেইসব লোকেরই একজন, যাঁদের সঠিক পদক্ষেপ হতে পারে কওমের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কারণ এবং যাদের ত্রুটিবিচ্যুতি খোলাসা করে দিতে পারে ধ্বংস ও বরবাদীর পথ।'

লাখনৌয়ে মোয়াযযম আলীর ইজ্জত ও খ্যাতি যতো বেড়ে চললো, ততোই পরশ্রীকাতর ত্রুটিসন্ধানীরা তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠলো। যেসব উমরাহ গোড়ার দিকে তাঁকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখাতেন, তাদের কার্যকলাপে প্রকাশ পেতে লাগলো যে, মসনদশীন কুর্নিশগ্রহণকারী খাজা ও খাজা সারাদের দুনিয়ায় কোন সত্যভাষী ও নির্ভীক লোকের স্থান নেই। গোড়ার দিকে মোয়াযযম আলী অযোধ্যার হুকুমাতের সমালোচনা থেকে দূরে থাকতেন, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার অনুভূতির তিক্ততা বেড়ে চললো। তেজারতের অবশিষ্ট কাজ কারবার কার্যত শের আলীর উপর সোপর্দ করে দিয়ে বেশিরভাগ সময় তিনি কাটাতে লাগলেন কওমের ভবিষ্যৎ চিন্তায়। দেশের উমরাহশ্রেণী নতুন পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করলে বাংলাকে ইংরেজের বজ্রমুষ্টি থেকে নাজাত দেওয়া যেতে পারে এবং কর্ণাটকে তাদের ষড়যন্ত্রের দ্বার রুদ্ধ হতে পারে, এই ধারণা তার মন ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেললো পুরোপুরিভাবে। তার আরো ধারণা জন্মালো যে, মারাঠাদের আর মাথা তুলবার মওকা দেওয়া যেতে পারে না। ওদিকে পাঞ্জাবে শিখদের উদ্যম মুসলমানদের জন্য হয়ে উঠেছে এক নতুন বিপদের কারণ। মোয়াযযম আলীর ধারণায় সকল উদ্বেগ, সকল পেরেশানির একমাত্র এলাজ হচ্ছে সালতানাতের সকল সুবাদার ও উমরাহর ঐক্যবদ্ধ ও সংহত প্রচেষ্টায় কওমের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধানের জন্য আওয়ামের সামগ্রিক অনুভূতির জাগ্রত করে তোলা। পানিপথের যুদ্ধে তার দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ইতিহাস এক নব যুগ রচনার পূর্বাভাস, কিন্তু উমরাহ শ্রেণীর ওদাসীন্য ক্রমাগত আওয়ামের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ-উদ্দীপনার উপর জয়ী হচ্ছে, এ তিক্ত বাস্তব তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তিনি লাখনৌয়ের উমরাহর সাথে মোলাকাত করে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তারা পরিস্থিতির সুযোগ না দিলে কওম আর একবার নৈরাশ্য ও চেতনাহীনতার আবর্তে পতিত হবে বলে তিনি আশঙ্কা

করেন। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রাজনৈতিক সওদাবাজির ও সঙ্কীর্ণ ষড়যন্ত্রের উপর নির্ভর না করে আওয়ামের দেশরক্ষার উপর নির্ভর করলে তারা কয়েক মাসের মধ্যে মুষ্টিমেয় ইংরেজকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারবেন, বঙ্গোপসাগরের দিকে। মারাঠাদের জন্য এমন পরিস্থিতি পয়দা করে তুলতে পারবেন, যাতে তারা কোনো কালেও মাথা তুলতে না পারে এবং কেবলমাত্র অযোধ্যা ও দাক্ষিণাত্যে কয়েক হফতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হলে দক্ষিণ ভারত চিরকালের জন্য নাজাত পাবে ইংরেজ ও ফরাসীর আধিপত্য থেকে।

মোয়াযযম আলী প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘরে বসে দাক্ষিণাত্য, লাহোর সুলতান ও সিরহিন্দের সুবাদার, দিল্লির উজির ও আমীর এবং রোহিলাখণ্ডের সরদার-সবাইর কাছে এই ধরনের চিঠি লেখেন।

'আমরা সময়ের অপচয় করছি। আহমদ শাহ্ আবদালী বারবার আসবেন না আমাদের সাহায্যের জন্যে। আপনারা ঐক্যবদ্ধ হলে বর্তমানে পরিস্থিতিতেও কোনো শক্তি আপনাদের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারবে না। আপনারা এ দেশের মুসলমানদের ইজ্জত ও আজাদির মুহাফিজ। যদি আপনারা বর্তমান পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার না করেন তাহলে আল্লাহর কাছে কি জওয়াব দেবেন আপনারা? পানিপথের বিজয়ের পর এ দেশের হতাশ ও নিরুদ্যম মুসলমানদের মধ্যে পয়দা হয়েছিলো যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, তা ক্রমাগত স্তিমিত হয়ে আসছে। তাদের বর্তমান সম্পর্কে নিরাশ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে ওরা নিষ্ক্রিয়ভাবে ইন্তেজার করা আপনাদের উচিত হবে না। আমাদের সবচাইতে বড়ো ব্যাধি হচ্ছে কেন্দ্রচ্যুতি। আপনারা সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হলে দিল্লির হারানো সৌভাগ্য পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব, কিন্তু যদি আপনারা মনে করেন যে, দ্বিতীয় শাহ আলম-যিনি এখনো নির্বাসিত জিন্দেগি যাপন করছেন কওমের রাহবর ও মোয়ার হতে পারবেন না, তাহলে আল্লার ওয়াস্তে এমন কোনো লোককে সালতানাতের দায়িত্ব বহন করবার জন্য এগিয়ে আনবার চেষ্টা করুন যার যোগ্যতার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। আমি এ কথা মেনে নিতে পারি না যে, কোনো অযোগ্য শাসকের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কওমের ভবিষ্যৎ কোরবান করে দিতে হবে। আমি এ দেশের কোটি কোটি মুসলমানের ইজ্জত, আজাদি ও সৌভাগ্যের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হউন। আর যদি আপনারা মনে করেন, কওমের আজাদির রক্ষক হিসাবে আপনাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তা আপনারা বহন করতে পারবেন না, তাহলে আমার শেষ আবেদন আপনারা কওমের অগ্রগতির পথ থেকে সরে গিয়ে কওমের বোঝা বহন করবার যোগ্য লোকদের এগিয়ে আসতে দিন।'

৫

মোয়াযযম আলী একদিন তার দফতরে বসে গভীর মনোযোগ সহকারে কিছু লিখছেন, এমন সময়ে আকবর খান এসে তার কামরায় প্রবেশ করলেন এবং নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে এক কুরসিতে বসে পড়লেন তার সামনে। দরজায় দাঁড়িয়ে সাবের হাসি চাপবার চেষ্টা করছে অতি কষ্টে। আকবর খান চুপচাপ বসে দুষ্টু হাসিমুখ নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মোয়াযযম আলীর দিকে। খানিকক্ষণ পর মোয়াযযম আলী লেখা কাগজখানা ভাঁজ করে নিয়ে আর একখানা কাগজ হাতে নিতে গেছেন, অমনি তার নজর পড়লো আকবর খানের উপর।

ঃ ভাইজান! আসসালামু আলাইকুম।' আকবর খান মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন।

মোয়াযযম আলী সালামের জওয়াব দিয়ে উঠে কাছে এসে বললেন ঃ তুমি কখন থেকে এখানে বসে আছ?'

ঃ আমি এখখুনি এসেছি ভাইজান। আপনি নিশ্চিত মনে কাজ শেষ করুন।

ঃ বসো, আমার কাজ শেষ হবে না কখনো।'

তিনি নিজের আসনে বসলেন। আকবর খান খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন ঃ ভাইজান সাবের আমার কাছে অভিযোগ করেছিলো, আপনি নাকি দিন-রাত শুধু লিখতে থাকেন আর শরীরের দিকে খেয়াল রাখেন না। ভাবীজান কেমন আছেন?'

ঃ তিনি বেশ ভালোই আছেন। কদিন ধরে আমি ভাবছি তোমার ওখানে যাবো। এতদিন তুমি ছিলে কোথায়?' কম- সে-কম কুশল সংবাদ তো জানানো উচিত ছিলো তোমার।'

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান, বিশ্বাস করুন আমি হররোজ আপনার খেদমতে হাজির হবার ইরাদা করেছি। দুমাস আগে আমাদের এলাকার একটি লোক লাখ্নৌ আসছিলো। আমি তার হাতে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। গত সপ্তাহে তার সাথে আবার দেখা হলে সে বললো, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর ইরাদা বদল করে সে লাখ্নৌর বদলে আগ্রায় এক আত্মীয়ের কাছে গিয়েছিলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ শেখ ফখরুদ্দিন প্রত্যেক চিঠিতেই জানতে চান তোমার খবর। পরশু দিন তাকে লিখেছি যে, বহুদিন তোমার খবর পাইনি এবং শিগগিরই আমি তোমার বাড়িতে যাবো। শেখ সাহেব তোমায় খুবই স্নেহ করেন, আর তোমায় সাথে নিয়ে হায়দারাবাদে যেতে বলেন।'

ঃ খুব ভালো লোক তিনি। আমিও তাকে সব সময়েই মনে করি। আপনি হায়দারাবাদ গেলে আমিও যাবো আপনার সাথে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার কোথায় কোথায় যেতে হবে তা আমি জানি না। অবশ্যি এ কথা সত্যি যে বেশিদিন আমার লাখনৌয়ে থাকা হবে না। নওয়াব শুজাউদ্দৌলার খোশামুদে জী হুজুর দল আমার উপর ক্ষেপে রয়েছে। গত কয়েক দিনে এক উচ্চ কর্মচারী আমার নিন্দা করে বলেছেন যে, আমি লাখনৌয়ে বিদ্রোহ ছড়াচ্ছি।'

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান নজীবুদ্দৌলার দাওয়াত পেয়ে আমি কয়েক দিনের জন্য দিল্লি গিয়েছিলাম। তিনি আমায় বললেন, আপনার মতো সত্যভাষী লোকের বেশি দিন লাখনৌয়ে থাকা শুজাউদ্দৌলা পছন্দ করবেন না। আপনি কোনো চিঠি লিখেছেন তার কাছে?'

ঃ মীর নিযাম আলীকে আপনি কি লিখছেন?'

মারাঠাদের উপর নতুন বিজয়ের জন্য তাকে মোবারকবাদ জানিয়েছি। তুমি হয়তো জানো, তিনি হায়দারাবাদের হারানো এলাকাগুলো আবার ছিনিয়ে নিয়েছেন মারাঠাদের হাত থেকে। তার সম্পর্কে শেখ কমরুদ্দিনের রায় আগে ভালো ছিলো না। গত চিঠিতে তিনিও তার তারিফ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করার দায়িত্ব নিতে আমি অনুরোধ করেছি নিযামকে। এ চিঠি তুমি দেখতে পারো, বলে মোয়াযযম আলী চিঠিটা তুলে দিলেন আকবর খানের হাতে।

চিঠি পড়ে আকবর খান মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ভাইজান আপনার কারবারের অবস্থা কি, আর চাচা শের আলী কোথায়?

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ পানিপথের লড়াই থেকে ফিরে আসার পর আর আমার তেমন আকর্ষণ নেই তেজারতের দিকে। বেশিরভাগ কাজকর্ম চাচা শের আলীই দেখাশোনা করেন। কয়েকদিন হলো, তিনি ফয়যাবাদে গেছেন। আজ অথবা কাল তিনি ফিরে আসবেন।'

সাবের একটি ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঢুকলেন কামরার ভিতরে এবং তাকে আকবর খানের কোলে তুলে দিয়ে বললো ঃ বলুন তো এ কে?'

আকবর খান মৃদু হাসি সহকারে বাচ্চার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে জওয়াব দিলেন ঃ এ আমার ছোট্ট ভাতিজা। একদিন এ হবে এদেশের সবচাইতে বড়ো ফউজের সিপাহসালার।'

কয়েকদিন পর মোয়াযযম আলী, আকবর খান ও শের আলী এক কামরায় বসে নাশতা করছেন। আচানক বাইরে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেলো এবং

খানিকক্ষণ পরেই অত্যন্ত আতঙ্কিত অবস্থায় দীলাওয়ার খান কামরায় প্রবেশ করে বললো ঃ জনাব শহরের কোতয়াল আপনার সাথে মোলাকাত করতে চান। তার সাথে এসেছে পাঁচজন সশস্ত্র সিপাহী।'

মোয়াযযম আলী নিশ্চিত মনে বললেন ঃ কোতোয়ালকে জিজ্ঞেস করো তিনি নাশতা করতে রাজি হলে এখানে তশরিফ আনতে পারেন, নইলে তাকে মোলাকাতের কামরায় বসতে দাও। আমি এখখুনি আসছি।'

দীলাওয়ার বললো ঃ জনাব আমি তাকে বলছিলাম যে, আপনি নাশতা করছেন, কিন্তু এখখুনি মোলাকাত করতে চান আপনার সাথে।'

মোয়াযযম আলী খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ যাও তাকে গিয়ে বলো, আমি এখখুনি আসছি। আর আমার জন্য একটা ঘোড়ায় জিন লাগাও।'

দীলাওয়ার খান কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আকবর মনে হচ্ছে শুজাউদ্দৌলা আমায় স্মরণ করেছেন। যদি কোনো কারণে আমার দেরি হয়ে যায় তাহলে তোমার ভাবী ও তার মাকে হায়দারাবাদে পৌঁছে দেবে। আমি ইনশাআল্লাহ ওখানে পৌঁছে যাবো। কয়েক হফতা ধরে আমি ইন্তেজার করছি শুজাউদ্দৌলার পয়গামের।'

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকলে আপনার শুজাউদ্দৌলার কাছে গিয়ে কাজ নেই। হায়দারাবাদের চাইতে আমার বাড়ি এখান থেকে আরো কাছে। অবিলম্বে কোতোয়াল ও তার লোকজনকে এক কুঠরিতে বন্ধ করে রেখে চলে যেতে পারি আমরা।'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ আমার বিশ্বাস এ লোক আমায় গ্রেফতার করতে আসেনি আর আমারও কয়েদ হবার ইরাদা নেই।'

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান আমি আপনার সাথে যাবো।'

মোয়াযযম আলী হুকুমের নির্দেশের আওয়াজে বললেন ঃ না তুমি এখানেই থাক। তোমার এ কামরা থেকে বেরুবারও প্রয়োজন হবে না।'

মোয়াযযম আলী উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। শের আলী এতক্ষণ বসেছিলেন অভিভূতের মতো। গলায় আটকে-যাওয়া লোকমা বের করে তিনি নালিশের স্বরে বললেন ঃ উনি কখখনো আমার কথা মানেন না। আমি ওকে হামেশা বলে এসেছি, যারা ওর কাছে কওমের ও দেশের খয়েরখাহ্ হয়ে আসে, তাদের অনেকেই হচ্ছে হুকুমাতের গুপ্তচর। কিন্তু খোদা মালুম, পানিপথের লড়াই থেকে ফিরে ওর যেনো কি হয়েছে। ভরা মাহফিলে উনি হুকুমাতের বড়ো বড়ো কর্মচারীদের সমালোচনা শুরু করে দেন।'

আকবর খান উঠে দরজা থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখে শের আলীর দিকে ফিরে বললেন ঃ চাচিজান, পানিপথের যুদ্ধের পর এ দেশের লাখো লাখো মানুষের মধ্যে জেগেছে জিন্দাহ্ থাকবার আকাঙ্খা এবং ভাইজানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে সেই লাখো মানুষের দিলের চাপা-পড়া আওয়াজ।'

ঃ কিন্তু এখন কি হলো?'

ঃ কিছু না, চাচিজান! আপানি পেরেশান হবেন না। বর্তমান পরিস্থিতে শুজাউদ্দৌলা ওর গায়ে হাত দেবার সাহস করবেন না।'

প্রাঙ্গণে সশস্ত্র সিপাহীরা ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোয়াযযম আলী কোতোয়ালের সাথে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন মোলাকাতের কামরা থেকে।

আকবর খান শের আলীকে বললেন ঃ চাচাজান আমি এখখুনি আসছি।' শের আলী বললেন ঃ খোদার দিকে চেয়ে মোয়াযযম আলীকে বুঝিয়ে দেবেন যে, শুজাউদ্দৌলা এক উগ্র মেজাজের লোক এবং তার সামনে উনি যেনো হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলেন।'

ঃ চাচা, আপনি নিশ্চিত থাকুন।' বলে আকবর এগিয়ে গেলেন। মোয়াযযম আলী তাকে দেখে বললেন ঃ আকবর, অযোধ্যার নওয়াব উজির ডেকেছেন কোনো প্রয়োজনে। আমি জলদি ফিরে আসবো।'

কিছুক্ষণ পরে মোয়াযযম আলীসহ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কোতোয়াল ও তার সাথীরা শহরের দিকে চললেন।

৪

মোয়াযযম আলী শুজাউদ্দৌলার মসনদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আগে ডানে-বাঁয়ে দু'কাতারে কতিপয় উমরাহ্ ও উচ্চ কর্মচারী উপবিষ্ট। শুজাউদ্দৌলা কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ তোমার দু'খানা চিঠি আমার হাতে এসেছে। আমি এ-ও-জানি যে, সালতানাতের ছোট বড়ো কর্মচারীর কাছে চিঠি লেখার শখ তোমার রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি করে তোমার এ ধারণা হলো যে, আমাদের হুকুমাত চালাবার জন্য তোমার সদুপদেশের প্রয়োজন?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আপনার কার্যকলাপের সাথে লাখো লাখো মানুষের কিসমৎ জড়িত রয়েছে, আপনার নির্ভুল পদক্ষেপ কওমের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনতে পারে এবং আপনার মামুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ হতে পারে, এ কথা না জানলে আমি আপনাকে মোটেই বিরক্ত করতাম না।'

ঃ কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার হক তোমায় কে দিয়েছে? আচ্ছা, তুমি যদি শুধু তোমার জায়গীর নিয়ে ব্যস্ত থাকো এবং লোকের কাছে এ কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা না করো যে, কুদরাত তোমারই গর্দানে চাপিয়ে দিয়েছেন সালতানাতের সকল বোঝা, তাই কি ভালো হয় না? বাংলাকে যারা ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছে, তারা এখানে আমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করবে, তা' আমরা বরদাশ্‌ত করবো না।'

মোয়াযযম আলী সত্য প্রকাশের মনোভাব নিয়ে গিয়েছিলেন শুজাউদ্দৌলার দরবারে, কিন্তু তার কথাগুলো যেনো তার দেহে লাগলো চাবুকের মতো। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ মাফ করবেন। যে রাজনীতির পারিণামে এ দেশের উমরাহ্ বিশাল মোগল সালতানাতের খণ্ডিত অংশের উপর আধিপত্যের মসনদ কায়েম করে কখনো মারাঠার, কখনো জাঠের,কখনো ইংরেজের ও কখনো ফরাসীদের সামনে অসহায় হয়ে পড়েন, তার প্রতি আমার কোনা আকর্ষণ নেই। আমি জানি, আমার আওয়াজ আপনার কানে অপরিচিত মনে হবে, কিন্তু আধিপত্যের মসনদ কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কওমের অধিকার দেয় না। বাংলায় আমার একমাত্র অপরাধ আমি সেখানে আমার জিন্দেগির হাজারো খুশি কওমের ইজ্জত ও আজাদির জন্য কোরবান করে দিয়েছি। আমার বাপ, আমার ভাই, আমার প্রিয়জন ও দোস্ত সিরাজুদ্দৌলার ঝাণ্ডার তলে জান কোরবান করে দিয়েছেন। লাখনৌয়ে পৌছার পর আমি অপরাধ করেছি ঃ যখন আমি অনুভব করলাম যে, আমার দেহে এখনও

কয়েক বিন্দু রক্ত অবশিষ্ট রয়েছে, যা আমি কওমের জন্য ঢেলে দিতে পারি, তখনই আমি এক রেজাকার হিসাবে পৌঁছে গেছি পানিপথের ময়দানে।'

শুজাউদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ পানিপথের যুদ্ধে এ দেশের হাজারো মানুষ হিস্‌সা নিয়েছে তা' বলে তাদের কাউকেও হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করবার হক দেওয়া যেতে পারে না। কয়েক মাস ধরে তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রচার করছো। তুমি আমার উপর দোষারোপ করেছো যে, যুদ্ধের সময়ে গোপন চক্রান্ত করেছি মারাঠার সাথে। শাহান্‌শাহর বিরুদ্ধে তুমি করছো অসংখ্য তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি। দিল্লিতে তুমি আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বুঝাবার চেষ্টা করেছো আহমদ শাহ্ আবাদলীকে। লাখনৌয়ের আওয়ামের মধ্যে তুমি এই ধারণা পয়দা করবার চেষ্টা করেছো যে, অযোধ্যার সেনাবাহিনী সেখানে দর্শকের বেশি আর কিছুই ছিলো না। রোহিলাখণ্ডের পক্ষ সমর্থনে আমি তোমায় মানা করতে পারি না, কিন্তু নজীবুদ্দৌলা অথবা হাফিজ রহমত খানের ইশারায় আমার জন্য সংকট সৃষ্টি করবার এজাযত তোমায় দেওয়া যেতে পারে না। লাখনৌয়ে তোমার কার্যকলাপ অসহনীয় হয়ে উঠেছে আমার কাছে। পানিপথের যুদ্ধে তোমার খেদমতের অনুভূতি আমার মনে না থাকলে আমি তোমার এখানে থাকা এক মুহূর্তের জন্য বাঞ্ছনীয় মনে করতাম না।

মোয়াযযম আলী মুহূর্তকাল দরবারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে শুজাউদ্দৌলার চোখের উপর চোখ রেখে জওয়াব দিলেন ঃ আমার বন্ধুরা আপনাকে আমার সম্পর্কে কি ধরনের খবর দিয়েছেন, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ ছড়াবার চেষ্টা করেছি, এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি। আমি স্বীকার করি, এ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি তুষ্ট নই এবং কোনো জাগ্রতচেতন লোক এ অবস্থায় তুষ্ট হয়ে থাকতেও পারে না। যে কওমের প্রত্যেক পদক্ষেপ ধ্বংসের দিকে, তারই এক ব্যক্তি হিসাবে আমি দাঁড়িয়েছি আপনার সামনে। এ দেশের যে কয়েকজন লোক তাকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে পারেন, আপনি তাদেরই একজন। পানিপথের যুদ্ধের পর আল্লাহ্ আমাদেরকে আর একবার ইজ্জত ও আজাদির জিন্দেগি যাপন করবার মওকা দিয়েছেন, কিন্তু যদি আমরা সে মওকার সদ্ব্যবহার না করি, তা'হলে আমাদের সে ত্রুটি হয়তো তার কাছে মার্জনীয় হবে না। আমাদের উমরাহ ও সুবাদাররা যদি ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়ে কেন্দ্রকে মজবুত করে না তোলেন, তাহলে আবার মারাঠদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেরি হবে না হয়তো। আমাদের বড়ো বড়ো লোক যেনো এ কথা ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ না করেন যে, কোনো নতুন তুফান এলেই কুদরত আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠাবেন আর কোনো আহমদ শাহ্ আবদালীকে। আমাদের জন্য

বর্তমানে মারাঠার চাইতে বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে ইংরেজ শক্তি। কিন্তু বাংলার ঘটনাপ্রবাহ থেকে যদি আমাদের উমরাহ্ শিক্ষাগ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে এর চাইতে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? যে বনের চারদিকে লেগেছে আগুন,আমরা বাস করছি তারই মাঝখানে এবং আমার চিৎকারের কারণ, আমি লাখৌর থেকে দেখতে পাচ্ছি সে আগুনের লেলিহান শিখা। বাংলাকে গ্রাস করেছে যে আজদাহা, আমি শুনতে পাচ্ছি তার গর্জনধ্বনি। আর একবার মহারাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এসে ধ্বংসের তাণ্ডবের অভিনয় করতে চাচ্ছে যে হিংস্র নেকড়ের দল, আমি শুনছি তাদের লোলুপ গর্জন। তারপর যখন আমাদের বড়ো বড়ো লোকদের দেখি সামগ্রিক বিপদের মোকাবিলা করার জন্য আওয়ামের প্রতিরক্ষা শক্তি সংহত করবার চেষ্টা না করে রাজনৈতিক চাল ও সওদাবাজি দ্বারা জিন্দাহ্ থাকবার প্রয়াসী, তখন আমি খামোশ থাকতে পারি না। আমি তাদেরকে বলতে চাই, যদি তারা ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের সংকল্প এখই নির্মূল করে দিতে না পারে তাহলে তারা দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে একদিন। মারাঠাদের যদি তারা আর একবার জেগে উঠবার মওকা দেন, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদেরকে দেবে শুধু অভিশাপ। যদি পাঞ্জাবে তারা শিখদের ঔদ্ধত্য দমন করবার জন্য আফগানদের সমর্থন দিতে না দাঁড়ান, তাহলে উত্তর সীমান্ত প্রতিরক্ষা দুর্গ পড়বে ভেঙে। এ ধরনের ধারণা প্রকাশ করলে তাযদি হয় অপরাধ, তাহলে সে অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করতে আমি তৈরি। দিল্লি থেকে আহমদ শাহ আবদালী ফিরে যাবার পর মাত্র একটি উৎসাহব্যঞ্জক খবরই এসেছে আমার কানে। খবরটি হচ্ছে, নিজাম তার হারানো এলাকা আবার ছিনিয়ে নিয়েছেন মারাঠার হাত থেকে। কিন্তু হায়! অযোধ্যা, দিল্লি ও রোহিলাখণ্ডের সেনাবাহিনীকেও যদি আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে দেখতাম তাদের সাথে। যদি সে সেনাবাহিনী পুণা থেকে আর্কট ও মাদ্রাজের দিকে এগিয়ে আমাদের ইজ্জত ও আজাদির সওদা করবার জন্য আগত ফিরিঙ্গি বণিকদলকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতো! তা'হলে হয়তো বাংলাকে আজাদ করবার জন্য আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন হতো না।'

শুজাউদ্দৌলা খানিকটা নরম হয়ে বললেন ঃ আমার সম্পর্কে এ কথা বলতে পারো না যে, আমি কোনো অবস্থায় অন্যান্য উমরাহ্কে সাহায্য করিনি। মারাঠা হামলার বিপদ যখন এলো, তখন আমরা পানিপথের কারুর পিছনে পড়ে থাকিনি। এখনো যদি কোনো সংহত দুশমন শক্তির বিরুদ্ধে এদেশের উমরাহ্ কোনো যুক্তপ্রতিরোধ ব্যবস্থা দাঁড় করান, তাহলে আমরা তাদের সাথে যোগ দিতে দ্বিধা করবো না। কিন্তু কোনো মিত্রের ওফাদারীর উপর আমাদের পুরো ভরসা না থাকলে আমাদের কর্মপদ্ধতি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চালিত হবে না। তুমি আমাদের

নিজামুল মুলকের সাহায্য করবার পরামর্শ দিচ্ছো। কিন্তু আমরা যদি নিজামের সাহায্য করতে এগিয়ে যাই, তাহলে তিনি যে মারাঠাদের সাথে সওদা করবেন না, তার কি জামানত আছে তোমার কাছে?

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি আপনাকে নিজামের জন্য নয়, দাক্ষিণাত্যের মুসলমানের ইজ্জত ও আজাদির জন্য মারাঠাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামবার দাওয়াত দিচ্ছি। আমার মক্‌সাদ শুধু উমরাহ্ ঐক্যই নয় বরং আওয়ামের ভিতরে এমন সামগ্রিক চেতনা ও প্রতিরোধ শক্তি পয়দা করে তোলা, যার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভীতি কোনো পথপ্রদর্শককে বিভ্রান্ত হতে দেবে না।

শুজাউদ্দৌলা খানিকটা কৌতুকের স্বরে বললেন ঃ তাহলে তুমি এখানে সময় নষ্ট না করে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে সেখানকার আওয়ামের আত্মাকে সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করলেই কি ভালো হয় না? । আমি আজই খবর পেলাম, যে মীর নিজাম আলীকে তুমি হয়তো মনে করছো কওমের নাজাতদাতা, তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই নিজের ভাই সালাবৎ জংকে গদি থেকে সরিয়ে আটক করেছেন কয়েদখানায়। এ অবস্থায় আমায় তুমি সালাবৎ জংকে সাহায্য করবার পরামর্শ দাও, না মীর নিজাম আলীকে?'

মোয়াযযম আলী তার পেরেশানি সংযত করার চেষ্টা করে বললেন ঃ এ খেলা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। যতো দিন বিশেষ বিশেষ খান্দান মোগল সালতানাতের ভগ্নাংশকে তাদের শিকারভূমি মনে করবেন, যতোদিন ক্ষমতায় বেহায়া দাবিদারদের মোকাবিলা করবার শক্তি দিল্লি সালতানাতের না হবে, ততোদিন এদেশের বিভিন্ন সুবায় এ ধরনের খেলা চলতেই থাকবে।'

শুজাউদ্দৌলা বললেন ঃ দিল্লির হুকুমাতের তরফ থেকে আমি তোমায় জওয়াব দিতে পারি, যদি আমরা দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যাই, তা'হলে মীর নিজাম আলী মারাঠা বা ইংরেজদের সাথে সওদা করতে অগ্রসর হবেন এবং সালাবাৎ জংয়ের সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। আমরা দাক্ষিণাত্যে ও মারাঠার মধ্যে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে চাই, আমাদের সম্পর্কে তোমার এ অনুমান ভুল। কিন্তু হায়! দাক্ষিণাত্যে যদি এমন কোনো ব্যক্তিত্ব থাকতো, যাকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের মিত্র মনে করতে পারি! মীর নিজাম আলী সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তিনি এক হুঁশিয়ার সিপাহী ও কামিয়াব রাজনীতিক এবং পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয় দাক্ষিণাত্যে তার আধিপত্য স্বীকৃতি লাভ করবে। কিন্তু কওম ও মুলুক সম্পর্কে মীর নিজাম আলীর সংকল্প আজো জানতে পারিনি আমরা। তুমি যদি তোমার কর্মব্যস্ততা কেবল অযোধ্যার হুকুমাতের সামালোচনায় সীমাবদ্ধ রাখতে না চাও, তাহলে দাক্ষিণাত্য গিয়ে মীর নিজাম আলীকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের

বিপদ-সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করা তোমার উচিত বলে আমি মনে করি। তোমার কথায় যদি তিনি প্রভাবিত না হন, তা'হলে দাক্ষিণাত্যকে কি করে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচানো যাবে তা তোমায় জেনে নিতে হবে। তুমি হয়তো তোমার মতো একই ধারণার লোক পাবে দাক্ষিণাত্যের উমরাহর ভিতরে। আমার বিশ্বাস, মীর নিজাম আলী তেমন অদূরদর্শী না হলে এই ধরনের লোকদের সাহায্যে তুমি তাকে দীক্ষিত করতে পারবে নিজের ধারণায়। আমি তোমার কাছে ওয়াদা করছি, মীর নিজাম আলী যখনই আমাদের সকলের সাধারণ দুশমনের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, তখন আমরা তার সমর্থন করবো। যদি এ অভিযানে তুমি ব্যর্থকাম হও, তাহলেও কম-সে-কম এতটুকু ফায়দা অবশ্য হবে যে,প্রত্যেক ব্যাপারেই তুমি আমায় দোষী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করবে না। আমি খুশির সাথে তোমার এজাযত দিচ্ছি, তুমি এদেশের আনাচে-কানাচে তোমার ধারণায় প্রভাবিত লোকদের আমার তরফ থেকে পয়গাম দেবে মুসলমানের ইজ্জত ও আজাদির দুশমনের বিরুদ্ধে যে কোনো সম্মিলিত অভিযানের বিজয় ও সাফল্যের জন্য নিয়োজিত হবে অযোধ্যার সকল শক্তি। কিন্তু তোমরা যদি শুধু বাগাড়ম্বরই দেখাতে চাও তাহলে আমি তোমায় বলবো, অযোধ্যার ভাগ্যকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। নজীবুদ্দৌলা আমায় বলেছেন যে, তুমি কাজের লোক। আমি তোমায় দিতে চাই কওমের খেদমতের মওকা। তুমি হায়দারাবাদ যেতে চাও কিনা, সে প্রশ্ন আমি তোমায় করব না। আমি তোমার কাছে শুধু প্রত্যাশা করবো, যতোক্ষণ তুমি লাখনৌয়ে আছ, এ ধরনের অভিযোগ যেনো আমার কাছে না আসে যে, দেশের যাবতীয় দোষের বোঝা আমারই উপর চাপানো হচেছ। তুমি এখন যেতে পারো।'

মোয়াযযম আলী কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শুজাউদ্দৌলা ও মজলিসে সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে থেকে কামরার বাইরে বেরিয়ে এলেন। যে ব্যক্তির সামনে বিন্দুমাত্র গোস্তাখি মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করার সমর্থক মনে করা হতো, দরবারীরা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন পেরেশানি, বিস্ময় ও দ্বিধার দৃষ্টিতে। মোয়াযযম আলীর সাথে যতোক্ষণ আলোচনা চলছে, তারা প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছেন যে, শুজাউদ্দৌলা তালি বাজাবার সাথে সাথে নাঙ্গা তলোয়ারধারী সিপাহী এসে অপরাধীকে নিয়ে যাবে কোনো সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কুঠরিতে। মোয়াযযম আলী বেরিয়ে যাবার পরও তারা ভাবছেন, শুজাউদ্দৌলা হয়তো পাহারাদারকে আওয়াজ দিয়ে বলে দেবেন, মহলের দরজা পার হতেই অপরাধীকে গ্রেফতার করতে, কিন্তু শুজাউদ্দৌলার মুখে খেলে যাচ্ছে একটা হাসির আভা। দরবারীদের হয়রান ও পেরেশান দেখে তিনি বললেন ঃ তোমাদের অভিযোগ, এই বিপজ্জনক লোকটিকে

কিছুতেই লাখনৌয়েতে থাকতে দেওয়া যেতে পারে না এবং আমার বিশ্বাস, এখন আর উনি লাখনৌয়ে থাকবেন না। এ ধরনের লোক নিজের ছাড়া আর কারুর জন্য বিপজ্জনক হতে পারে না।'

এক দরবারী উঠে বললেন ঃ কিন্তু আলীজাহ্‌ ! উনি তো হুজুরের সামনেই যথেষ্ট গোসতাকির পরিচয় দিয়েছেন। '

শুজাউদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ আমি তাঁর সাথে কেন এত নরম ব্যবহার করেছি, ভেবে তোমরা হয়রান হচ্ছো। শোনো, ইনি নজীবুদ্দৌলা ও হাফিজ রহমত খানের মতো লোকদের দোস্ত। এর উপর কঠোর আচরণ করলে তারা আমার বিরুদ্ধে তুফান সৃষ্টি করবেন। আহমদ শাহ্‌ আবদালী থেকে শুরু করে নাসীর খান বেলুচ পর্যন্ত সবাই একে জানেন এবং আমার ফউজেরই হাজার হাজার জোয়ান পানিপথের ময়দানে পরিচিত হয়েছে এর বাহাদুরীর সাথে। তাছাড়া এর কথা শুনে তোমরা একে বলতে পারো বদজবান ও গোসতাখ, কিন্তু বদ নিয়তের অভিযোগ কেউ করতে পারে না তার বিরুদ্ধে। ইনি আমার জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়েছিলেন, কিন্তু মাথা ব্যথা আমি সরিয়ে দিলাম নিজামের দিকে। নিজাম সম্পর্কে আমি খুবই আশা করছি, তিনি এর সঠিক এলাজ করতে পারবেন। নিজাম একে আমার গুপ্তচর মনে করবেন এবং ইনি হায়দারাবাদে পৌঁছে নিখোঁজ হয়ে যাবেন।'

এক দরবারী প্রশ্ন করলেন ঃ কিন্তু আলীজাহ্‌ ! উনি যদি লাখনৌ থেকে চলে না যান?'

শুজাউদ্দৌলা বললেন ঃ শহরের কোতোয়াল খেয়াল রাখবে, যা'তে অবিলম্বে উনি লাখনৌ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা করেন।'

মোয়াযযম আলী নিজের বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখলেন, দেউড়ির বাইরে আকবর খান তার ইন্তেজার করছেন। এগিয়ে এসে মোয়াযযম আলীর ঘোড়ার বাগ ধরে তিনি বললেন ঃ ভাইজান! আপনার জন্য আমি খুবই পেরেশান ছিলাম। বলুন, ওখানে কি হলো?'

ঃ কিছু না' মোয়াযযম আলী ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললো ঃ শুজাউদ্দৌলার ইচ্ছা, আমি লাখনৌ ছেড়ে হায়দারাবাদে চলে যাই। আমার খোশ্‌ কিসমতি, তিনি আমায় কয়েদখানার কুঠরিতে পাঠাননি।'

আকবর খান বললেন ঃ তিনি আপনাকে লাখ্‌নৌ ছেড়ে যাবার হুকুম দিয়েছেন কি?'

ঃ না, তিনি নিশ্চিত জানেন, আমি এ ধরনের কোনো হুকুম মানবো না। তাতে তাঁর উদ্বেগ আরো বাড়বে। তাই তিনি আমায় পরামর্শ দিলেন লাখ্‌নৌ

থেকে হায়দারাবাদে গিয়ে কওমের সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করতে।

আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান! আপনি লাখনৌ ছেড়ে আমার ওখানে গেলে আমি সৌভাগ্য মনে করবো। অযোধ্যার চাইতে রোহিলাখণ্ডেই আপনার প্রয়োজন বেশি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি এখনো বরাবরের জন্য লাখনৌ ছেড়ে যাওয়ার ইরাদা করিনি। আমার বিশ্বাস, যখন সে সময় আসবে, তোমার বাড়িই হবে আমার শেষ আশ্রয়। কিন্তু এখন আমি হায়দারাবাদে যেতে চাচ্ছি। আমি কয়েকবার ওয়াদা করেছি শেখ ফখরুদ্দিনের কাছে। এত্তার শুজাউদ্দৌলাই সে ওয়াদা পূরণের সুবিধা করে দিলেন। তোমার ভাবীরও শখ হয়েছে হায়দারাবাদ দেখবার।'

আকবর খান প্রশ্ন করলেন ঃ কবে যাচ্ছেন আপনি?

ঃ ইনশাআল্লাহ্‌, এক হফ্‌তার ভিতরেই রওয়ানা হচ্ছি আমরা।'

ঃ ভাইজান, আমিও যাবো আপনার সাথে।

পনেরো

দুপুরবেলা আতিয়া তার কামরার মধ্যে গভীর ঘুমে অচেতন। বিলকিস্‌ ছুটে এসে তার বাযু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো ঃ আপাজান, উনি এসেছেন?'

আতিয়া ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে বললেন ঃ কে এসেছেন?'

ঃ ভাই মোয়াযযম আলী এসেছেন, আপাজান!'

ঃ তার আমি কি করবো? বুকের স্পন্দন সংযত করবার চেষ্টা করে আতিয়া বললেন।

ঃ দাঁড়ান, একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাচ্ছি।'

বিলকিস তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেলো কামরা থেকে। কিছুক্ষণ পর সে আবার এসে ঢুকলো এক খুবসুরত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে।

ঃ আচ্ছা, বলুন তো, আপাজান, এটি কে?' বাচ্চাটিকে সে আতিয়ার কোলে তুলে দিয়ে বললো।

ঃ একে কোত্থেকে নিয়ে এলে?' বাচ্চার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন আতিয়া।

ঃ আপাজান এটি ওর বেটা, ওর বিবি আর শাশুড়ি এসেছেন ওর সাথে। নিচে আম্মাজান আর মামানীজানের সাথে বসে আছেন ওরা। দেখুন না, কী সুন্দর বাচ্চা।'

আতিয়া খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দীলের মধ্যে জেগে উঠলো একটা নতুন ভাবাবেগ। তার মুখে লেগে রয়েছে এক টুকরা হাসি আর খুবসুরত চোখ দু'টিতে ঝলকে উঠেছে অশ্রু।

বিলকিস বললো ঃ চলুন আপাজান! ওরা আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

ঃ তুমি চলো। আমি আসছি।'

বিলকিস বাচ্চাকে তঁর কোল থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

খানিকক্ষণ পর আতিয়া গিয়ে নিচু তলায় একটি কামরায় প্রবেশ করলেন কম্পিত পদে। ফরহাত ও তার মা বসে রয়েছেন ফখরুদ্দিনের খান্দানের কয়েকটি মহিলার মাঝখানে। আতিয়া তাদেরকে সালাম করে এক পাশে বসে পড়লেন। বিলকিস ফরহাতকে লক্ষ্য করে বললো ঃ ভাবীজান, ইনি আতিয়া আপা।'

ফরহাত হাসিমুখে আতিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখে বিলকিসকে বললেন ঃ তোমায় দেখার পর তোমার বোনকে চিনে নিতে মুশকিল হচ্ছে না আমার। তোমাদের আকৃতিতে অনেক মিল।

আতিয়া বয়স্কা মহিলাদের ও মামাতো বোনদের মজলিসে ফরহাতের সাথে আলাপ করতে পারলেন না মন খুলে। কিন্তু সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে যখন ফরহাত উপর তলার এক কামরায় বসে আছেন এবং বিলকিস বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, আতিয়া এসে দ্বিধাগ্রস্তের মতো প্রবেশ করলেন সেখানে। ফরহাত কুরসি থেকে উঠে বললেন ঃ এসো, বোন! আমি লাখনৌয়ে তোমায় বহুত স্মরণ করেছি। তোমার ভাইজানও তোমাদেরকে মনে করেছেন সব সময়ে।'

ভাবীজান! আতিয়া এগিয়ে এসে বে-এখতিয়ার ফরহাতকে বুকে চেপে ধরে বললেন ঃ প্রত্যেক নামাজের পর আমি দোআ করেছি, যেনো ভাইজান আপনাকে খুঁজে পান। তারপর তিনি যখন মামুজানকে চিঠি লিখে আপনাকে খুঁজে পাবার খবর দিলেন, তখন দোআ করেছি, যেনো আপনি একবার আসেন আমাদের মাঝে।'

ফরহাত সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ আতিয়া, তুমি ফেরেশতা, আর তোমার দোআর প্রয়োজন আমার হামেশাই থাকবে। বসো।'

আতিয়া খান তার পাশে কুসি টেনে নিয়ে বসলেন। তিনি খুব ভালো করে

ফরহাতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ভাবীজান, একটা কথা বলবো।'

ঃ বলো।'

ঃ আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

ঃ কখখনো না।'

আতিয়া তার চোখে দুষ্ট হাসির আভা টেনে বললেন ঃ ভাবীজান আপনি এত খুবসুরত!'

শুনেই ফরহাত জওয়াব দিলেন ঃ আতিয়া, কথা হচ্ছে, আমার মুখে তুমি দেখছো তোমারই চোখের সৌন্দর্য।

বাহির বাড়িতে ফখরুদ্দিন সাদর অভ্যর্থনা জানালেন মোয়াযযম আলী ও আকবর খানকে। তাদের নওকর ও ঘোড়াগুলোকে আর এক হাবেলীতে রাখার ইন্তেজাম করে দিয়ে তিনি মোয়াযযম আলী ও আকবর খানকে নিয়ে প্রবেশ করলেন দেয়ানখানার এক প্রশস্ত কামরায়। পাশাপাশি কুরসির উপর বসে তিনি মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ বলুন, পথে আপনাদের কোনো তকলিফ তো হয়নি?'

ঃ জী না, পথে আমাদের তেমন কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি। তবে হায়দারাবাদ থেকে প্রায় আট মনজিল দূরে এসে জানলাম, ডাকাতরা চারদিন আগে লুট করেছে একটি ছোট কাফেলা।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ খোদার শোকর, আপনারা নিরাপদে পৌছে গেলেন। আগে আপনাদেরর আসার খবর পেলে আমি হায়দারাবাদের সরহদ থেকে এ পর্যন্ত আপনাদের হেফাজতের ইন্তেজাম করতে পারতাম। আকবর খানকে সাথে নিয়ে এসেছেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এটা অবশ্যি একটা আকস্মিক ব্যাপার। আমি যখন সফরের ইরাদা করেছি, তখন উনি আমার ওখানে এসে পড়লেন।'

ঃ লাখনৌয়ে আপনার কারবারের অবস্থা কেমন?'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ পানিপথের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তেজারতের দিকে তেমন আকর্ষণ নেই আমার । ওখানে আমার মামুলি কারবার রয়েছে, তবে আমি তা শের আলী খানের উপর ছেড়ে দিয়েছি। কিছুকাল আমি এখন কাটাতে চাচ্ছি দেশ বিদেশ ঘুরে।'

ফখরুদ্দিন খানিকটা হেসে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন ঃ যে মোয়াযযম

আলীকে আমি জানি, তিনি কেবল দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য পয়দা হননি। আপনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, নিজের ইচ্ছায় আপনি আসেননি এখানে।'

মোয়াযযম আলী হাসবার চেষ্টা করে জওয়াব দিলেন ঃ আমার আকাঙ্ক্ষা যে কি, তাও আমার জানা নেই আজ।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ মেহমানের কাছে এ ধরনের প্রশ্ন করা লোকে আদবের খেলাফ মনে করে থাকে, কিন্তু আমি মনে করি, আপনার প্রত্যেক পেরেশানিতে হিসসা নেবার হক আমার রয়েছে । আশা করি, আপনি আমার এ হক অস্বীকার করবেন না।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার পেরেশানি আমার নিজেরই সৃষ্টি। আহা! দুনিয়ায় আমার সঠিক স্থান কোথায়, তা যদি আমি জানতে পারতাম। লাখনৌ থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ে আমি মনে করেছি, দেশের কোনো জায়গার আবহাওয়ার সাথেই খাপ খাবে না আমার।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, অযোধ্যার হুকুমাতের সাথে আপনার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনি হয়তো একে মনে করবেন বুয্দীলী, কিন্তু এবার আর কয়েদখানায় বন্দী হওয়া পছন্দ করিনি আমি। আগেকার দিনের শাসকরা কোনো গোস্তাখ কর্মচারী বা মর্যাদাদাতার উপর হাত দিতে ভয় পেলে তাকে বলতেন হজ করে আসতে। শুজাউদ্দৌলা ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন যে, আমি এক গোস্তাখ লোক। তাই তিনি আমায় কয়েদখানার দারোগার হাতে ন্যস্ত না করে পরামর্শ দিলেন, যেনো আমি মীর নিজাম আলীর খেদমতে হাজির হয়ে কওমের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যার ঐক্যসম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হই। আমার ধারণা, আজ পর্যন্ত এ ধরনের আচরণ তিনি আর কারুর সাথে করেননি।'

ফখরুদ্দিনের অনুরোধে মোয়াযযম আলী তার কাছে লাখনৌয়ে তার কার্যকলাপ এবং শুজাউদ্দৌলার সাথে তার মোলাকাতের পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করলেন। তারপর ফখরুদ্দিন বললেন ঃ যখন আপনি আমায় পানিপথের যুদ্ধের ঘটনা লিখেছিলেন, তখন কেন আপনি আবার লাখনৌয়ে ফিরে গেলেন, ভেবে আমি উদ্বেগবোধ করেছি। আমার ধারণা ছিলো, এক সিপাহী হিসাবে নিজের সঠিক স্থান দেখে নেবার পর আপনার আর আকর্ষণ থাকবে না তেজারতের দিকে। আহমদ শাহ্ আবদালীর ফিরে যাবার পর দিল্লিতে নজীবুদ্দৌলার সাথে থেকেও আপনি করতে পারতেন অনেক কিছু।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আহমদ শাহ্ আবদালীর ফিরে যাবার

পর দিল্লি আর লাখনৌর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই আমার চোখে। যে নিষ্প্রাণ বাদশার মধ্যে কালের চাহিদা সম্পর্কে কোনো চেতনা নেই, তিনি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র হতে পারেন না। হায়! আহমদ শাহ্ আবাদালী যদি এ যুগের তুফানের সাথে লড়াই করবার শক্তি ও হিম্মৎসম্পন্ন কোনো লোককে বসিয়ে যেতে পারতেন দিল্লির তখতে! নজীবুদ্দৌলা তার বুদ্ধিবৃত্তি, যোগ্যতা, শক্তি-সাহস ও প্রতিভা সত্ত্বেও তৃণগুচ্ছ দিয়ে তৈরি করতে পারবেন না কওমের প্রতিরক্ষা দুর্গ। দিল্লির উমরাহ্ আর দিল্লির বাইরে সালতানাতের কর্মচারীরা কওমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্বিকার। কেন্দ্রে তার এমন কোনো নেতৃত্বের কল্পনাও করেন না, যার ইশারা ছোট বড়ো সবারই কাছে গণ্য হবে হুকুম বলে। তাদের প্রয়োজন একটি কাঠের পুতুল এবং তা তারা পেয়েছেন। এখন তার তক্তা রয়েছে শুজাউদ্দৌলার হাতে, কিন্তু কালের আবর্তনে সে কাঠের পুতুল কার কাঠ-খড়ের খেলনায় পরিণত হবে, কেউ জানে না। আমি ভেবেছিলাম, এরা অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, দিল্লি বারবার যে নেকড়ে বাঘের কবলে পড়ে নির্যাতিত-লুণ্ঠিত হয়েছে, আর একবার তাদেরই শিকারভূমিতে পরিণত হবে।

শেখ সাহেব! আমি এক সিপাহী এবং আমি এখন জিন্দেগির এমন এক মনজিলের দিকে এগিয়ে চলেছি, যখন দেহ শিথিল হয়ে আসে ও হিম্মৎ সংকল্পের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। তথাপি আমার উদ্যম আজো স্তিমিত হয়ে আসেনি। হায়! আমি যদি এমন কোন ব্যক্তির সাথী হতো পারতাম, যার দৃষ্টি আমার কওমের ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনায় প্রদীপ্ত! আমি জানি, পানিপথের যুদ্ধের পর এ দেশের যে কোনো সুবাদারের ফৌজে সর্বোচ্চ পদ হাসিল করতে আমার মুশকিল হতো না, কিন্তু আমার দৃষ্টির সামনে এসেছেন এমন সব লোক, যাদের জিন্দেগির মকসাদ কওমের হেফাজত নয়, কওমের উপর হুকুমাত চলানো। যদি কেবল ব্যক্তিগত আনন্দ ও নিরাপত্তাই আমার কাম্য হতো, তাহলে আহমদ শাহ্ আবদালীর সাথে আমি চলে যেতে পারতাম, কিন্তু এ দেশের মাটি থেকে আজো আসছে আমার কাছে পূর্ব পুরুষের খুন ও পসিনার ঘ্রাণ। আমার ফসলের নিবে-যাওয়া ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে আমি খুঁজে বের করতে চাই জিন্দেগির স্ফুলিঙ্গ। এ যুগের মহত্তর মানুষের সন্ধানী আমি। দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যার মধ্যে ঐক্যবিধান করতে পারলে একটা বড়ো কাজ হবে, এই ধারণা নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম লাখনৌ থেকে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সীমানার ভিতরে এসেই আমি অনুভব করতে পেরেছি যে লাখনৌর তুলনায় এখানকার পরিবেশ কম বিষাক্ত নয়। মীর নিজাম আলী সম্পর্কে আমি যতোটা জানতে পেরেছি, তাতে তার ব্যক্তিত্বের কাছে দেশ ও কওমের জন্য কোনো কল্যাণের প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। তথাপি আমি

চেষ্টা করবো তার মোলাকাত করতে।

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ মীর নিজাম আলী সম্প্রতি বিদরে চলে গেছেন। হয়তো কয়েক হফ্‌তায় তিনি ফিরে আসবেন না। তিনি ফিরে এলে আপনার মোলাকাতের ইন্তেজাম হয়ে যাবে, কিন্তু তাতে কোনো বিশেষ সুফলের প্রত্যাশা নেই আমার। আমার ইচ্ছা, আপনি একবার সেরিঙ্গাপটম দেখে আসুন। হয়তো একদিন সেই শহরটাই হবে আপনার সফরের শেষ মনজিল। হায়দার আলীর চেহারায় আমি দেখতে পেয়েছি কওমের আশা-আকাঙ্ক্ষার দীপ্তি।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনি আগেও হায়দার আলীর তারিফ করেছেন। ঘটনাক্রমে পানিপথের যুদ্ধের পর দিল্লিতে এক নওজোয়ানের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো এবং তিনিও আমায় দিয়ে গেছেন সেরিঙ্গাপটম সফরের দাওয়াত।'

ফখরুদ্দীন বললেন ঃ তখন আমি আপনাকে যে হায়দার আলীর কথা বলেছিলাম, তিনি এতটা মশহুর ছিলেন না। তখনকার দিনের মহীশূর রিয়াসত ছিলো একটি বড়ো জায়গির মাত্র, আর আজ মহীশূর হয়েছে এক সালতানাত। মোগল সালতানাতের খণ্ডিত অংশগুলোর উপর আধিপত্যের মহল গড়ে তুলেছেন যে সব ভাগ্যান্বেষী, তারা আজ তাদের উজির ও মন্ত্রণাদাতাদের কাছে প্রশ্ন করেন ঃ হায়দার আলী কে? কোন খান্দান থেকে এসেছেন? তার বাপ-দাদা কি করতেন?' ...... আজ ইংরেজ, মারাঠা আর নিজাম-যারা দাক্ষিণাত্যকে মনে করেছেন তাদের উত্তরাধিকার অনুভব করছেন যে, কুদরত তাদের পথে খাড়া করে দিয়েছেন এক অনতিক্রমণীয় পাহাড় তার খ্যাতি হায়দরাবাদ, দিল্লি লাখনৌ, মাদ্রাজ ও কলকাতা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে সুদূর লণ্ডন ও প্যারিসে। আহমদ শাহ্ আবদালীর মতো মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হবার পর হায়দার আলীর ব্যক্তিত্ব আপনাকে কতোটা প্রভাবিত করবে জানি না, কিন্তু এ দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি যে ধারণা পোষণ করেন, তার ধারণাও তার অনুরূপ।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ লাখনৌতেও আমি তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। আমি অবিশ্যি যাবো সেখানে। তিনি যদি এ অন্ধকার যুগে কওমের মশাল-বরদার হতে পারেন, তাহলে আমি তার পিছনে চলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো। আপাতত আমি আপনার কাছে একটা আবেদন পেশ করবো। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি আপনাকে দু'দিনের বেশি তকলিফ দেবো না। অন্তত আমায় কিছুকাল থেকে যেতে হবে এখানে। তাই আমি নিজের জন্য একটা আলাদা বাড়ির বন্দোবস্ত করতে চাচ্ছি।

ফখরুদ্দিন জওয়াব দিলেন ঃ দেখুন, আপনি যদি এ বাড়িতে নিজকে আগন্তুক মনে করেন, তাহলে একে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলাই আমি ভালো মনে

করবো। হায়দারাবাদে এসে যদি আপনি অপর কোথাও থাকতে চান, তাহলে এখান থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট থাকতে পারে আমার জন্য?'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ শেখ সাহেব, আপনি রেগে গেছেন। আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার কথা।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ আপনি তেমনি কথাই বলেছেন।'

ফখরুদ্দিনের বসতবাড়িটি ছিলো অতি প্রশস্ত। তিনি উপরতলার একটি অংশ মোয়াযযম আলীকে ছেড়ে দিলেন এবং আকবর খানকে রাখলেন মেহমানখানার একটি কামরায়।

ঔ

কয়েকদিন হায়দারাবাদে থাকার পর এই তিক্ত বাস্তব অনুভূতি মোয়াযযম আলীর কাছে তীব্রতর হয়ে উঠলো যে, মারাঠাদের বিরুদ্ধে মীর নিজাম আলী বিজয়ের খবর শুনে দক্ষিণাত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে প্রত্যাশা পোষণ করছিলেন, তা স্বপ্নমাত্র। দিল্লির যাবতীয় আড়ম্বর হায়দারাবাদে এসে গেছে। দাক্ষিণাত্যের উমরাহ্ পতনযুগের মোগল শাহ্জাদাদেরই মতো জিন্দেগি যাপন করতে চান আয়েশ-আরামে বিলাস-প্রাচুর্যের মাঝখানে। দাক্ষিণাত্যের বেশিরভাগ ফউজ সদাপরিবর্তনশীল আনুগত্যসম্পন্ন উমরাহ্ ও জায়গিরদারদের ইঙ্গিতে চালিত হচ্ছে। পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠাদের কমজোরী ও অনৈক্যের সুযোগে মীর নিজাম আলী হায়দারাবাদের হারানো এলাকাগুলো উদ্ধার করেছেন বটে, তথাপি ফউজের সাহায্যে সালাবৎ জংকে গদি থেকে সরিয়ে দেবার পর অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে তিনি বাধ্য হয়ে সওদাবাজি শুরু করেছেন বাইরের দুশমনের সাথে। সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থলোভী উমরাহ্ বেশিরভাগ সালাবৎ জংকে ছেড়ে হুকুমাতের নয়া দাবিদারের সমর্থক হয়ে পড়েছেন। যেসব উমরাহ্র আনুগত্যের প্রতি সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের জায়গায় পয়দা করা হচ্ছে নতুন নতুন জায়গিরদার। মীর নিজাম আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উমরাহ্ ও ফউজী অফিসাররা আশ্রয় নিয়েছেন হায়দারাবাদের বাইরে। তার অপর ভাই বাসালৎ জং দাক্ষিণাত্যে প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এবং তিনি যে কোনো মুহূর্তে বিপদের কারণ হতে পারেন। নিজাম আলী তাকে খুশি রাখবার জন্য তার উপর ন্যস্ত করেছেন আধুনিক হুকুমাত এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণের কয়েকটি জেলা ছেড়ে দিয়েছেন তাকে। বাসালৎ জং বাইরে আধুনীর একাধিপত্যসম্পন্ন শাসক, কিন্তু বস্তুত তার সালতানাত হায়দারাবাদের একটি বড়ো জায়গিরেরই মতো।

মোয়াযযম আলী বেকার বসে দিন কাটাতে অভ্যস্ত নন। তিনি কখনো ফখরুদ্দিনের কাজ-কারবারে সাহায্য করবার চেষ্টা করেন, কখনো বা ঘোড়ায় সওয়ার

হয়ে আকবর খানের সাথে বেরিয়ে যান শহরের বাইরে। দু'বেলা ফখরুদ্দিনের দস্ত রখানে এসে হিস্সা নেন কিছুসংখ্যক উমরাহ্ ব্যবসায়ী ও উলামা। এমনি এক মজলিসে এক রইসের সাথে মোয়াযযম আলীর মোলাকাত হলো। তার সম্পর্কে তিনি জানলেন যে, তার আয়ের বেশিরভাগ তিনি ব্যয় করেন কিতাবপত্র সংগ্রহ করতে। তিনি তার কুতুবখানায় কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য কিতাবের নাম করলে মোয়াযযম আলী তার সাথে চলে গেলেন কুতুবখানা দেখতে। এরপর থেকে কুতুবখানাই হলো মোয়াযযম আলীর মনোযোগের কেন্দ্রস্থল।

একদিন কুতুবখানায় কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে মোয়াযযম আলী ঘরে ফিরে আসছেন, অমনি বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তি তার বাযু ধরে থামালেন। মোয়াযযম আলী চমকে উঠে তাকালেন আগন্তুকের মুখের দিকে। আগন্তুক বললেন ঃ এ গোসতাখির জন্য আমি মাফ চাচ্ছি। আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে আমি আপনাকে দিল্লিতে দেখেছিলাম।'

মোয়াযযম আলী কয়েক মুহূর্তে তার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আচানক তার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ ওহ্ আপনি আসাদ খান।'

ঃ আল্লাহর শোকর, আপনি আমায় চিনতে পারছেন। আপনি হায়দারাবাদে এলেন কি করে আর এখানে কোথায়ই বা থাকছেন? আমি বারবার আপনাকে স্মরণ করেছি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি আট দশ দিন এখানে আছি। শেখ ফখরুদ্দিনের ওখানে আমি উঠেছি। তিনি এখানকার এক বড়ো ব্যবসায়ী।'

আসাদ খান বললেন ঃ আমি জানি তাকে।'

ঃ আপনি এখানে কবে তশরিফ আনলেন মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন।

ঃ আমি এখানে এসেছি প্রায় বিশ দিন আগে। কিন্তু কয়েকদিন থাকার পর আমি বিদর গিয়েছিলাম নিজামুল মুলকের সাথে মোলাকাত করতে। পরশু আমি এখানে ফিরে এসেছি। ইনশাআল্লাহ্, কাল আমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো সেরিঙ্গাপটমে। আমি এখানে শাহী মেহমানখানায় রয়েছি। চলুন, ওখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করা যাবে।'

মোয়াযযম আলী চললেন তার সাথে সাথে। পথে তিনি তার অতীত কাহিনী মোটামুটি জানালেন আসাদ খানকে এবং তার কাছে জানতে চাইলেন বিদর যাবার কারণ। আসাদ খান বললেন ঃ আমি হায়দার আলীর তরফ থেকে দোস্তির পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলাম নিজামের কাছে।'

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার মোলাকাতের ফল কি হলো?'

ঃ আমার মোলাকাতের ফল শুধু এইটুকু হয়েছে, এখন নিজামুল মুলকের সাথে

ভবিষ্যতে মোলাকাতের পথ খোলাসা হলো, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে, মীর নিজাম আলীর মতো লোকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মোলাকাতে কোনো লাভ হবে না। তিনি দীলের কথা বলেন না কারুর কাছে। তার কাছে যাওয়া বরং সব সময়েই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু মহীশূরের স্বার্থের খাতিরে নিরুপায় হয়ে নিজামকে খুশি রাখবার চেষ্টা করতে হচ্ছে আমাদেরকে, যাতে আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বা মারাঠার সাথে তার যোগ দেবার মতো কোনো পরিস্থিতি উদ্ভব না হয়।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আপনার মনে আছে, দিল্লিতে মোলাকাতের সময়ে আপনি আমায় সেরিঙ্গাপটমে দাওয়াতে দিয়েছিলেন?'

ঃ হ্যাঁ, তা আমার মনে আছে এবং এখনো আমি আপনাকে সেরিঙ্গাপটম যাবার দাওয়াত দিচ্ছি। যদি কালই আমি আপনাকে সাথে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার এ সফর কামিয়াব হয়েছে, মনে করবো। আমার বিশ্বাস-মহীশূরের অবস্থা দেখে আপনি মনে করবেন, আপনার ভবিষ্যতের কল্যাণ অভিসারী স্বপ্ন ওখানেই পূর্ণ হচ্ছে। আজ যখন আতুর, খঞ্জ, অন্ধ, বধির ও বিকলাঙ্গের দল কওমের নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে উঠছে, তখন মহীশূরের প্রতিভাদীপ্ত শাসক তার তলোয়ারের মুখ দিয়ে এ দেশের মানচিত্রে এঁকে চলেছেন নতুন নতুন রেখা। দিল্লির জামে মসজিদে যেদিন আমি আপনার বক্তৃতা শুনলাম, সেদিনই আমি অনুভব করেছি, আমরা পরস্পরের সাথী হবার জন্যই পয়দা হয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনি একবার হায়দার আলীকে দেখে আসুন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার সাথে আকবর খানও এসেছেন। দিল্লিতে তার সাথেও আপনার দেখা হয়েছিলো। যদি আপনি দুএকদিন দেরি করতে পারেন, তাহলে সম্ভবত আমরা দুজনই আপনার সাথে যাবার জন্য তৈরি হতে পারবো।'

আসাদ খান জওয়াব দিলেন ঃ দু' একদিন কেন, দু' এক হপ্তাও আমি আপনার জন্য দেরি করতে পারবো।'

সরকারি মেহমানখানায় পৌঁছে মোয়াযযম আলী আসাদ খানের সাথে বহুক্ষণ আলাপ করলেন। বিশেষ করে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো হায়দার আলীর ব্যক্তিত্ব। প্রায় দু'ঘণ্টা পর মোয়াযযম আলী উঠে বললেন ঃ এবার আমায় এজাযত দিন।'

আসাদ খান মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ তা হলে ফয়সালা হয়ে গেলো যে, আপনি আমার সাথে যাচ্ছেন?

ঃ জী হাঁ। মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ খোদার মেহেরবানী হলে আমরা ইনশাআল্লাহ পরশু ভোরে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

৯

আকবর খান তার কামারার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মোয়াযযম আলীকে দেখেই এগিয়ে এসে তিনি বললেন ঃ আপনি বহুত দেরি করেছেন। আপনার জন্য আমি খুবই পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম।

মোয়ায্যম আলী জওয়াব দিলেন ঃ কতুবখানা থেকে বেরিয়ে পথে আমার দেখা হয়েছিলো আসাদ খানের সাথে। সেই আসাদ খান- যিনি দিল্লীতে আমাদের সাথে মোলাকাত করেছিলেন। আমরা পরশু তার সাথে যাচ্ছি সেরিঙ্গাপটমে।

তুমি তৈরি তো?'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ আমি তৈরি। কিন্তু খুব জলদি ফিরে আসতে হবে আমাদেরকে। আমি বহুত দিন ঘরছাড়া হয়ে আছি।'

মোয়ায্যম আলী বললেন ঃ শিগগিরই আমরা ফিরে আসবো।'

আকবর খান প্রশ্ন করলেন ঃ ভাবীজানকে সাথে নিতে চান আপনি?'

ঃ না, তিনি এখানেই থাকবেন। শেখ ফখরুদ্দিন কোথায়?'

ঃ তিনি তার দফতরে বসে রয়েছেন।'

ঃ আমি এখ্খুনি তার সাথে দেখা করে আসছি।' মোয়াযযম দ্রুত পদক্ষেপে গিয়ে প্রবেশ করলেন শেখ ফখরুদ্দিনের দফতরে। শেখ সাহেব তার মুনশিকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাচ্ছেন। মোয়ায্যম আলীকে তিনি বসালেন তার পাশে এবং মুন্শিকে বললেন ঃ একটু পরেই আমি তোমায় ডাকবো। এখন আমি এর সাথে কয়েকটা জরুরি কথা বলবো।'

মুন্শি কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে শেখ ফখরুদ্দিন মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ সারাদিন আপনি থাকেন কোথায়?'

জওয়াবে মোয়ায্যম আলী তাকে শোনালেন আসাদ খানের সাথে তার মোলাকাতের বিস্তৃত বিবরণ। অবশেষে তিনি সেরিঙ্গাপটম যাবার ইরাদা প্রকাশ করলে ফখরুদ্দিন বললেন ঃ সেখানে অবশ্যি আপনার যাওয়া উচিত, কিন্তু তার জরুরি শর্ত হচ্ছে, হয় আগামী মাসে আপনি সেখানে যাবেন, নইলে এ মাস শেষ হবার আগেই ফিরে আসবেন। আগামী মাসের তিন তারিখে আতিয়ার বরাত আসবার কথা এবং আমার ইচ্ছা আপনি ও আকবার খান এখানে থাকবেন।'

ঃ আমি অবশ্যি এসে পৌছবো। কিন্তু তার শাদি স্থির হয়েছে কোথায়?

ঃ আধুনির এক জায়গিরদারের ছেলের সাথে। ওরা বাসালৎ জং এর আত্মীয়।

ছেলেটির নাম তাহের বেগ। আধুনির ফউজের এক কর্মচারী তিনি। আরো একটা কারণে আতিয়ার শাদিতে আপনার হাজির থাকা প্রয়োজন। বিলকিসও তো বড়ো হয়ে উঠলো। আমি একই দিনে দু' বোনের শাদির সম্ভাবনা চিন্তা করছি।'

ঃ বিলকিসের সমন্ধের কথা হয়েছে কোথায়?' মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন।

ফখরুদ্দিন হেসে জওয়াব দিলেন ঃ বিলকিসের জন্য আমি যে নওজোয়ানকে মনোনীত করেছি, তাঁকে আপনার চাইতে বেশি আর কেউ জানেন না।'

মোয়াযযম আলী ফখরুদ্দিনের দিকে ভালো করে তাকালেন এবং খানিকটা ইতস্তত করে বললেন ঃ আমি যে নওজোয়ানকে জানি তার নাম আকবর খান। আপনি যদি তাকেই পছন্দ করে থাকেন, তা'হলে আপনার নির্বাচনের তারিফ না করে পারছি না। বিলকিস আমার সহোদরা হলেও আমি এর চাইতে বেশী খুশী হতে পারতাম না।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ বিলকিস ও আতিয়া দু'জনই আপনাকে সহোদরের চাইতে বেশি আপনার মনে করে।'

ঃ আমি অনুভব করছি যে, আমি ভাইয়ের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করছি। আমি এখখুনি এর ফয়সালা করছি আকবর খানের সাথে।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ আকবর খানের সাথে আগেই ফয়সালা হয়ে গেছে। তার ভাইজানের সম্মতিই এখন আমাদের প্রয়োজন। আজ ভোরে আপনি বাইরে গেলে আমার ঘরে এ প্রশ্ন উঠলো। তারপর আমি যখন আকবর খানকে বললাম, তার মুখ-কান পর্যন্ত লাল হয়ে গেলো। ভাইয়ের কর্তব্য পালনে আপনি ত্রুটি করছেন, এ কথা আপনি ভুল বলছেন। আপনি অকারণে তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, এ কথা আমি মানতে রাজি নই।'

মোয়াযযম আলী হেসে বললেন ঃ কথা হচ্ছে গোড়া থেকেই এ জোড়াটি আমার ভালো লেগেছে। বারবার আপনার কাছে চিঠি লিখবার খেয়াল এসেছে আমার মনে, কিন্তু সাহস করিনি। এবার ধারণা ছিলো, সেরিঙ্গাপটম থেকে ফিরে এসেই প্রশ্ন পেশ করবো আপনার সামনে এবং পেশ করবার আগেই ঘোড়ার জিন বেঁধে রাখবো, যেনো আপনি অবিলম্বে আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইলে আমাদের পেরেশানি না হয়।'

ফখরুদ্দিন বললেন ঃ দোস্ত পাথর আর হীরার মধ্যে পার্থক্য করতে আমি জানি। খানিকক্ষণ পর মোয়াযযম আলী আকবর খানের কামরায় এসে ঢুকলেন। আকবর খান তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আকবর তুমি ঘর ছেড়ে এসেছ বহুদিন হয়ে গেল। আমার মনে হয় আমরা সেরিঙ্গাপটম না গিয়ে আজই লাখনৌ চলে যাই। তুমি নওকরদের ঘোড়া সাজাতে বলে দাও। সন্ধ্যার আগে আগেই আমাদেরকে এক মনজিল পার হয়ে যেতে হবে।'

আকবর খানের মুখের উপর আচানক ঘনিয়ে এলো হতাশা মেঘ।

মোয়াযযম আলী আবার বললেন ঃ যাও আকবর, দেরি করো না। আমি শেখ ফখরুদ্দিনের এজাযত নিয়ে এসেছি।

ঃ কিন্তু ভাইজান............।'

ঃ ব্যাপার কি, আকবর?'

ঃ কিছু না, ভাইজান।' তিনি বিষণ্ন মুখে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

ঃ আরে দাঁড়াও না। ব্যাপার কি? তুমি ঘরে ফিরতে চাও না?'

আকবর খান পিছন দিকে ফিরে তাকালেন। অমনি মোয়াযযম আলী অট্টহাস্য করে এগিয়ে গিয়ে তাকে গলা ধরে টেনে নিলেন।

ঃ নালায়েক, বহুত খোশ-কিছমত তুমি। বলো এবার বলো শেখ সাহেবের সাথে তোমার কি কথাবার্তা হলো?'

আকবর খানের দীলের মধ্যে তখন চলছে দ্রুত কম্পন, আর তার মুখের উপর ছেয়ে আসছে লজ্জা-লালিমা।

তৃতীয় দিন মোয়াযযম আলী ও আকবর খান আসাদ খানের সাথে ধরলেন সেরিঙ্গাপটমের পথ।

৪

একদিন দুপুরবেলা মোয়াযযম আলী তার সাথীদের নিয়ে প্রবেশ করলেন সেরিঙ্গাপটমে। আসাদ খান তাদেরকে নিজের বাড়িতে রেখে চলে গেলেন হায়দার আলীর কাছে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে তিনি মোয়াযযম আলীকে খবর দিলেন, পরদিন ভোরে নওয়াব হায়দার আলী মোলাকাত করবেন তার সাথে।

পরদিন ভোরে নামাজের কিছুক্ষণ পর মোয়াযযম আলী ও আকবর খান তাদের মেজবানের সাথে চললেন শাহীমহলের দিকে। তারা শাহীনবাগে প্রবেশ করলে আসাদ খান বেগের মাঝখানে এক সামিয়ানার কাছে গিয়ে বললেন ঃ আপনারা এখানে তশরীফ রাখুন। এ সময়ে তিনি সাধারণত এখানে এসে মোলাকাত করেন।'

তারা সামিয়ানার নিচে কুরসিতে বসলেন। কিছুক্ষণ পর দুটি নওকর ও একটি ছোট্ট বালককে তারা দেখলেন ছুটে আসতে। তাদের আগে আগে ছুটছে এক সিংহশিশু। বালকটি নওকরদের কাছ থেকে কয়েক কদম পিছনে। কিছুদূর গিয়ে নওকররা সিংহশিশুকে ঘিরে ফেললো। এক নওকর তার গলার শিকল ধরবার জন্য ঝুঁকছে, অমনি সিংহশিশু সামনের পা দুটি তুলে দুপায়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং নওকর ভয় পেয়ে পিছু হটে গেলো। অপর নওকরটি তার জায়গা থেকে নড়বারও প্রয়োজনবোধ করলো না। বালকটি হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে নিশ্চিন্ত মনে সিংহশিশুর গায়ে হাত বুলিয়ে তার শিকলটা ধরলো।

ঃ এবার ওকে নিয়ে যাও। বলে বালক নওকরের দিকে শিকল এগিয়ে দিলো।

ঃ ও কামড়ে দেয়, হুজুর।'

ঃ এতেই তুমি ভয় পেলে? আচ্ছা দেখো।' বালক তার নিজের একটা হাত এগিয়ে দিলো সিংহশিশুর মুখের কাছে।

সিংহশিশু যখন বালকের হাত চাটতে চাটতে শুয়ে পড়লো তার পায়ের উপর, বিজয়দীপ্ত দৃষ্টিতে নওকরদের দিকে তাকিয়ে সে বললো ঃ ভয় করলেই ও খামাখা কামড়ে দেয়।

এক নওকর বললো ঃ না হুজুর, আমার ভয় না করলেও কামড়ে দেয়।'

ঃ এ কে? ঃ মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন আসাদ খানের কাছে।

ঃ ইনি শাহজাদা ফতেহ আলী টিপু। ওর সিংহের বড়ো শখ।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এক শাহজাদার কাছে সিংহের চাইতে ভালো খেলনা আর কি হতে পারে? ওকে ডাকুন না এদিকে।'

আসাদ খান উঠে আওয়াজ দিলেন ঃ শাহজাদা সাহেব। এদিকে তশরিফ আনুন।'

টিপু সিংহশিশুকে এক নওকরের হাতে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে সামিয়ানার দিকে এগিয়ে এলেন। মোয়াযযম আলী ও আকবর খান উঠে দাঁড়ালেন। টিপু আসসালামু আলাইকুম বলে একে একে তাদের সাথে মোসাফাহা করে বসলেন মোয়াযযম আলী ও আকবর খানের মাঝখানে এক কুরসিতে।

আসাদ খান বললেন ঃ শাহজাদা সাহেব। ইনি মোয়াযযম আলী খান। ইনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা এবং পলাশীর যুদ্ধের আগে ইনি ছিলেন সিরাজুদ্দৌলার ফৌজের এক উচ্চ কর্মচারী। আর ইনি রোহিলাখণ্ডের সরদার আকবর খান। আপনি পানিপথের যুদ্ধের কথা অনেক কিছু জানতে চান। এরা দুজনই হিসসা নিয়েছেন সে যুদ্ধে।'

শাহজাদা টিপু বললেন ঃ আপনাদের সাথে মোলাকাত করে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি বড়ো হলে পানিপথের যুদ্ধে অবশ্যি হিসসা নিতাম। এখনো মওকা পেলেই আমায় যুদ্ধের একটা নকশা বানিয়ে দেবেন। তারপর আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করবো কয়েকটি কথা।'

টিপুর বয়স এগারো বছরের বেশি নয়, কিন্তু বয়সের তুলনায় তার মুখের ভাব খুব গম্ভীর। তার বড়ো উজ্জ্বল চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রখর। তথাপি মোয়াযযম আলীর কাছে তিনি একটি ক্ষুদ্র বালক মাত্র।

তিনি বললেন ঃ বহুত আচ্ছা, আমি আপনাকে নকশা বানিয়ে দেবো।'

টিপু বললেন ঃ আপনার ফুরসত থাকলে এখনই আমি কাগজ-কলম আনাচ্ছি।'

হায়দার আলী মহলের দিক থেকে বেরিয়ে এলেন। আসাদ খান জলদি করে উঠে বললেন ঃ উনি এসেছেন।'

শাহজাদা টিপু বললেন ঃ আব্বাজানের সাথে মোলাকাত করে আপনারা গায়েব হয়ে যাবেন না যেনো।'

আসাদ খান বললেন ঃ শাহজাদা সাহেব! আপনি নিশ্চিত থাকুন। এরা আমার মেহমান। নকশা তৈরি হওয়া পর্যন্ত আমি এদেরকে গায়েব হতে দেবো না।'

কিছুক্ষণ পর হায়দার আলী এসে সামিয়ানায় প্রবেশ করেন। আসাদ খানও

তার সাথীদের সাথে মোসাফেহা করে সহজভাবে বসে পড়লেন এক কুরসির উপর।

ঃ আপনি মোয়াযযম আলী?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

ঃ জী হাঁ।'

ঃ আর আপনি আকবর খান?'

ঃ জী হাঁ।' আকবর খান জওয়াব দিলেন।

মোয়াযযম আলী ও আকবর খানের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে প্রতিভা ও শৌর্যের প্রতিমূর্তি হায়দার আলীর মুখের দিকে। হায়দার আলীর দীপ্ত চক্ষু ও মুখের ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করছে যেনো তিনি হুকুম জারি করবার জন্যই পয়দা হয়েছেন।

হায়দার আলী বললেন ঃ আসাদ খান তোমার মেহমানী আজ খতম হলো। এরা এখন আমার মেহমান।'

তারপর মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ আপনাদের অতীত কাহিনী আমি শুনেছি আসাদ খানের মুখে। আপনারা তকলিফ করে এখানে এসেছেন, সে আমার সৌভাগ্য। আপনারা শিগগিরই ফিরে যেতে চান, তাও আমায় বলেছেন আসাদ খান, কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি আপনারা এ দেশের মুসলমানের জন্য কোনো মজবুত কেল্লার সন্ধান করেন, তাহলে আবার ফিরে আসবেন এখানে। যে প্রেরণা একদিন আপনাদেরকে টেনে নিয়েছিলো পানিপথের ময়দানে আর যে উদ্যম-উৎসাহ আপনাদেরকে নিয়ে এসেছে হায়দারাবাদে তা-ই একদিন আপনাদেরকে বাধ্য করবে এখানে আসতে। কাবেরীর পানি ছাড়া আপনাদের তৃষ্ণা মিটবে না। ভালো সিপাহী হলে মহীশূর ফউজে আপনাদের স্থান হামেশা থাকবে। যদি আপনারা বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতিক হন তাহলে আপনারা উপলব্ধি করবেন যে, এদেশে আপনাদের প্রয়োজন রয়েছে। তেজারতের শখ থাকলে এখানে খোলা রয়েছে আপনাদের তরক্কীর পথ। আর উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আলেম হলেও মহীশূরে রয়েছে আপনাদের গুণগ্রাহী লোক। আসাদ খানের কাছে শুনেছি আপনাদের সফরের উদ্দেশ্য। এ দেশের শাসকদের ঐক্যবিধান ও সাহায্য ব্যবস্থার সম্ভাবনা অবগত হওয়া। আমার তরফ থেকে আপনি তাদেরকে পয়গাম দিতে পারেন যে, কোনো সামগ্রিক বিপদ প্রতিরোধ করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হলে তারা আমায় সবার আগের কাতারে দেখতে পাবেন।'

আমার দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানের ভবিষ্যতের জন্য সবচাইতে বড়ো বিপদ হচ্ছে ইংরেজ এবং যতোক্ষণ হিন্দুস্তানে তাদের জন্য ঝাণ্ডা ধূলিলুণ্ঠিত না হয়, ততোক্ষণ আমি স্থির হয়ে থাকতে পারবো না। দক্ষিণ ভারতকে ইংরেজের রাজ্য লোভের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য আমি নিজামের বন্ধুত্বপ্রার্থী এবং মারাঠা শক্তি

নির্বিবাদে থাকলে আমি তাদের সাথেও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবো না।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ খোদা আপনার ইরাদায় বরকত দিন, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে নিজাম ইংরেজের খেলাফ আপনাকে সাহায্য না দিয়ে বরং তাদেরই সাহায্য নিয়ে মহীশূরের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করবেন এবং মারাঠা শক্তিও আপনার পিঠে ছুরি মারবার মওকা হাতছাড়া করবে না। পানিপথের পরাজয়ের পর দক্ষিণ হিন্দুস্তানে কোনো শক্তিমান মুসলিম শাসক্তির জাগরণ তারা বরদাশত করবে না। আপনাকে একই সঙ্গে লড়তে হবে এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে। অযোধ্যা ও দিল্লির নিষ্ক্রিয় অসহায় উমরাহ যে আপনার কোনো সাহায্যে আসবেন, তেমন বিশ্বাসও নেই আমার। আমার উদ্দেশ্য আপনাকে নিরুৎসাহ করা নায়, কিন্তু বাংলার ঘটনাবলী আমায় করে দিয়েছে বস্তুবাদী।'

হায়দার আলী হেসে বললেন ঃ বাস্তববাদী মানুষের আলোচনা আমায় নিরুৎসাহী করতে অথবা আমার মনঃপীড়ার কারণ হতে পারে না। আমি জানি, একদিন এসব নেকড়ে ও শিয়ালের পালের বিরুদ্ধে আমায় দাঁড়াতে হবে বুক ফুলিয়ে, কিন্তু আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহরই সাহায্যের উপর। কাজ করবো অবকাশ যদি আমি পাই, তাহলে মহীশূরের সরজমিনকে আমি পরিণত করবো এক অপরাজেয় কেল্লায়। এমন ফউজ আমি তেরি করে তুলবো, যারা প্রত্যেক ময়দানে লোভী স্বার্থান্বেষীদের দাঁত ভেঙে দিতে পারবে। ভাড়াটে সিপাহী থাকবে না আমার ঝাণ্ডার তলে বরং থাকবে এমন সব লোক যাদের কাছে এই ওয়াতনের মাটি জানের চাইতেও প্রিয়তর। যতক্ষণ তলোয়ার ধরবার শক্তি থাকবে আমার হাতে, আমি লড়াই করতে থাকবো এবং আপনার মতো লোকেরা হায়দারাবাদ, দিল্লি ও অযোধ্যার মুসলমানদের বলতে পারবেন, মহীশূরের যুদ্ধ তাদেরই সৌভাগ্য এবং তাদেরই ইজ্জত আমাদের যুদ্ধ।

হায়দার আলীর কথা শুনে মোয়াযযম আলী অনুভব করতে লাগলেন যেনো বছরের পর বছর দানাপানিহীন সাহারায় ঘুরে ঘুরে তিনি পৌঁছে গেছেন এক স্বপ্নের উপত্যকায়। তার দীল হায়দার আলীর প্রতি নির্ভরতা ও প্রীতির মনোভাবে ভরপুর হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ আমার বিশ্বাস এখানে আসার ফয়সালা করতে আমার দেরি হবে না। এখন থেকেই আমি অনুভব করছি কাবেরীর পানির স্বাদ।

হায়দার আলী মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমি আপনার ইনতেজার করতে থাকবো কিন্তু যতোদিন আপনি এখানে আছেন ততোদিন আপনার উপস্থিতির পুরো ফায়দা নেবার ইচ্ছা আমার। ইনশাআল্লাহ

সন্ধ্যাবেলায় আবার মোলাকাত হবে।'

সামিয়ানা থেকে কিছুটা দূরে মহলের দরজার সামনে ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন সিপাহী ও অফিসার। হায়দার আলী মোয়াযযম আলীর সাথে মোসাফেহার পর হাত মিলালেন আকবর খানের সাথে। তারপর শাহজাদা টিপুর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এসো ফতেহ আলী।'

টিপু বললেন ঃ আব্বাজান ওর কাছে একটা কাজ আছে আমার। একটু পরেই আমি চলে আসছি।'

হায়দার আলী কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন আসাদ খানের দিকে। আসাদ খান বললেন ঃ আলীজাহ! শাহজাদা টিপু ওকে দিয়ে পানিপথের ময়দানের একটা নকশা বানিয়ে নিতে চাচ্ছেন।'

হায়দার আলী মৃদু হাসি সহকারে মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ দেখলেন তো, আমি আগেই বলিনি যে এখানে আপনার প্রয়োজন আছে?'

খানিকক্ষণ পর হায়দার আলী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সিপাহীদের সাথে বেরিয়ে গেলেন। মোয়াযযম আলী, আকবর খান ও আসাদ খান শাহজাদা ফতেহ আলী টিপুর সাথে গিয়ে প্রবেশ করলেন শাহী মেহমানখানায়। শাহজাদা টিপুর হুকুমে এক সিপাহী কাগজ-কলম নিয়ে এলো। এক গালিচার উপর বসে মোয়াযযম আলী নকশা আঁকার কাজে লেগে গেলেন। মোয়াযযম আলী ভেবেছিলেন অতটুকু বাচ্চাকে খুশি করতে বেশি সময় লাগবে না, কিন্তু একের পর এক প্রশ্ন করে শাহজাদা টিপু তাঁকে বাধ্য করলেন ময়দানের বিস্তারিত আলোচনা করতে। প্রায় দেড়ঘণ্টা পর বেশুমার নেশানা ও রেখায় ফুটে উঠলো যুদ্ধে উভয়পক্ষের তাঁবু রসদ ও অস্ত্র চলাচলের পথ, সেনাবাহিনীর সারি, তাদের তোপখানা এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের সংঘাতের পূর্ণচিত্র।

নকশা শেষ করে মোয়াযযম আলীর মনে হলো যেনো তিনি পানিপথের পুরো ইতিহাস বর্ণনা করে উঠলেন। বাচ্চা শাহজাদা নকশা নিয়ে তাকে শোকরিয়া জানিয়ে চলে গেলে তিনি সাথীদের বললেন ঃ খোদা এই বালককে বদ নজর থেকে বাঁচান। ওর প্রশ্ন শুনে একবার মনে হয়েছে যেনো আমি আমার সিপাহসালারের সাথে আলোচনা করছি। শাহজাদার বয়স কতো?'

আসাদ খান জওয়াব দিলেন ঃ ওর বয়স বারো বছরেরও কম কিন্তু হায়দার আলীর বেটার মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা আজব মনে করা উচিত হবে না। কুদরত ওকে দিয়েছেন এক অসাধারণ প্রতিভা। কাল যদি আপনি ওকে পরীক্ষা করে

দেখেন, তাহলে এ নকশা ওর নিজের হাতে আঁকা রেখার মতো মনে পড়বে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ একবার মনে করেছিলাম বাচ্চাকে ভুলাবার জন্য কয়েকটি সোজা-বাঁকা রেখা টেনে দিলেই চলবে, কিন্তু খোদার শোকর, সে ভুল আমি করিনি। এ বালকের সাথে কথা বলবার সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, একদিন আমার মতো হাজার হাজার মানুষ এর সাথী হয়ে বাঁচা-মরাকে মনে করবে পরম সৌভাগ্য। আসাদ খান আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আমায় খুব শিগগিরই ফিরে আসতে হবে এখানে। সম্ভবত হায়দারাবাদ থেকে লখনৌ যাবার খেয়ালই ছেড়ে দিতে হবে আমায়।'

পরদিন ভোরে আসাদ খান মোয়াযযম আলী ও আকবর খানকে নিয়ে গেলেন শহরে অস্ত্র তৈরির কারখানায়। সেখানে তৈরি হয় তলোয়ার, বন্দুক আর তোপ। বন্দুক বানানো দেখাশোনার ভার এক ফরাসী কারিগরের উপর ন্যস্ত। কারখানার পরিচালক কয়েকটি বন্দুক মোয়াযযম আলীকে দেখিয়ে বললেন ঃ এসব বন্দুক শ্রেষ্ঠ বিলাতী বন্দুকের মোকাবিলা করতে পারে। আমরা আশা করছি, আগামী বছর আমরা তোপ বানানোর কাজও শুরু কর দোবো।'

অস্ত্র-কারখানা দেখবার পর আসাদ খান মেহমানদের নিয়ে গেলেন সেনাবাসে। হাজার হাজার সিপাহী সেখানে কুচকাওয়াজ করছে ও তৈরি করছে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। বিশাল ময়দানের কোথাও নেযাবাজি চলছে আবার কোথাও হচ্ছে চাঁদমারী। হায়দার আলী ও শাহজাদা টিপু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন ফউজী খেলাধুলায় হিস্যা গ্রহণকারী কার্যকলাপ।

আসাদ খান বললেন ঃ মহীশূর ঘুরে দেখলে আপনি এখানকার প্রত্যেকটি শহরে দেখতে পাবেন এমনি জোশ ও উদ্যম। হায়দার আলী দেশের প্রত্যেকটি বাসিন্দাকে সিপাহী বানাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ শাহজাদা টিপুর শিক্ষার কি ব্যবস্থা করেছেন তিনি?'

আসাদ খান জওয়াব দিলেন ঃ হায়দার আলীর কাছে সবচাইতে বড়ো-সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে টিপুর শিক্ষা। টিপুর ওসতাদ এ যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ আলেম। নওয়াব হায়দার আলী বলেন ঃ কুদরত আমার হাতে দিয়েছেন শুধু তলোয়ার কিন্তু আমার বেটার হাতে কলমও থাকবে।" টিপুর মেধাশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, তাকে একই সবক দুবার পড়তে হয় না।'

ফরহাতের মা বেড়াতে গেছেন আত্মীয়দের বাড়িতে। ফরহাত তার কামরায় বসে আলাপ করছেন আতিয়ার সাথে। শিশু সিদ্দীক আলী শুয়ে আছে এক দোলনায়। বিলকিস ছুটতে ছুটতে কামরায় ঢুকে বললো ঃ ভাবীজান! ভাবীজান! ভাইজান এসেছেন।'

ফরহাতের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আতিয়া মুখের উপর দুষ্ট হাসি টেনে এনে বিলকিসকে বললো ঃ বিলকিস! তুমি এতটা ভয় পেলে কেন?' ভাইজানের সাথে তোমার দুলহা মিঞা এসেছেন না?'

বিলকিস কি বলবে, স্থির করতে না পেরে পেরেশান হয়ে পড়লো। ফরহাত হেসে বললেন ঃ আতিয়া দেখো, আমার বোনের সাথে ঠাট্টা করো না। এসো বিলকিস বসো।'

বিলকিস এসে ফরহাতের পাশে বসে পড়লো। আতিয়া আবার ঠাট্টার মতলবে বললেন ঃ সত্যি বলছি ভাবীজান, বিলকিস ক'দিন ধরে ভারী পেরেশান। আজ ভোর থেকে ও রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে।'

বিলকিস উঠে দাঁড়ালো এবং লজ্জিত হয়ে বললো ঃ ভাবীজান! আপা আমায় বিরক্ত করছেন।'

ঃ না আতিয়া, আমা ছোট্ট বোনটিকে বিরক্ত করো না।'

আতিয়া বললেন ঃ ভাবীজান! এটা ওর রাগের ভান। আমার উপর খামাখা ওরা তো চলে গেলেন মামুজানের দফতরে।'

ফরহাত বললেন ঃ হাঁ, ভাই, তুমি ঠিকই বলেছো। ও সত্যি সত্যি হাসছে।'

বিলকিস দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো, কিন্তু দরজার বাইরে গিয়েই আচানক থেকে গিয়ে ফিরে কামরার দিকে উঁকি মেরে বললো ঃ ভাবীজান! ভাবীজান! উনি আসছেন।'

আতিয়া ত্রস্ত হয়ে উঠে দরজার দিকে গেলেন।

তিনি বারান্দা পার হয়ে নিজের কামরার দিকে যেতে লাগলে পিছন থেকে বিলকিস অট্টহাস্য করে বললো ঃ দাড়ান আপাজান! আপনি ছুটছেন কেন? ওরা তো চলে গেলেন মামুজানের দফতরে।'

ঃ ভারী পাজী হয়েছো তুমি।' আতিয়া ফিরে বললেন।

কয়েকদিন পর। বাড়ির নিচুতলার এক কামরায় আতিয়া ও বিলকিস বসে

রয়েছেন, দুলহিন বেশে দামী গহনাপত্র পড়ে। আতিয়ার বরাত দুদিন শেখ ফখরুদ্দিনের বাড়িতে থেকে ফিরে যাবার আয়োজনে ব্রিত। ফরহাত দুলহিনদের কাছে সমবেত মহিলাদের এপাশে-ওপাশে সরিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনে। তারপর একে একে আতিয়া ও বিলকিসের গলায় মোতির হার পরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এ তোমাদের ভাইজানের তোহফা।'

আতিয়ার বরাত এসেছে খুব ধূমধাম করে। মেয়েরা এতিম, শেখ ফখরুদ্দিন বোনকে তা অনুভব করতে দেননি। তিনি দুটি মেয়েকেই বহু দামী গহনাপত্র ছাড়া আরো দিলেন দুটো করে হাতী আর ত্রিশটা করে ঘোড়া।

আতিয়ার স্বামী এক সুদর্শন নওজোয়ান। পহেলা মোলাকাতেই মোয়াযযম আলী তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। বিদায় বেলায় তিনি মোয়াযযম আলীকে বিশেষ করে দাওয়াত দিলেন আধুনি যাবার জন্য। আতিয়ার সওয়ারী বিদায়ের পর মোয়াযযম আলী গেলেন মেহমানখানার এক কামরায়। আকবর খান সেখানে বসে আছেন শাদির লেবাসে সজ্জিত হয়ে।

ঃ কি ভাবছো ভাই?' তিনি বললেন।

ঃ কিছু না ভাইজান।' আকবর খান জওয়াব দিলেন বারবার আমার মনে হচ্ছে আমার জন্য শেখ ফখরুদ্দিনকে লজ্জা পেতে হচ্ছে। হায়দারাবাদের উমরাহ হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি রুসুমাতের সমর্থক নই, তবু শেখ ফখরুদ্দিনের খাতিরে আমার আসা উচিত ছিলো রোহিলাখণ্ড থেকে বরাত নিয়ে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আরে ভাই আমিতো মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি পানিপথের যুদ্ধের ভাবনা ভাবছো। শেখ ফখরুদ্দিন তোমার চাইতে বেশি সমজদার। লোক দেখানোর প্রয়োজনবোধ করলে তিনি এই শহর থেকে দশ হাজার লোক এনে জমা করতে পারতেন তোমার বরাতে। তুমি বহুত খোশকিসমত আকবর! যেদিন হায়দারাবাদের পথে এদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিলো, সেদিনই আমি এ বালিকাকে মনোনীত করেছিলাম তোমার জন্য। শেখ ফখরুদ্দিন কম সে কম আরো তিনদিন এখানে তোমাদেরকে রাখতে চান। একটা দিন আমায়ও থাকতে হবে এখানে। তারপর তোমার মনজিল হবে রোহিলাখণ্ড, আর আমি ধরবো সেরিঙ্গাপটমের পথ। লাখনৌ ফিরে যাবার ধারণা আমি ত্যাগ করেছি। আমার ওখানকার সম্পত্তির সমান হিস্সাদার হবে তুমি আর শের আলী। আমি তাকে লিখে দিয়েছি যে, এরপর আমার হিস্সার মুনাফা তিনি পাঠাতে থাকবেন তার কাছে। তোমার দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর দিন খতম হয়ে গেলো। শাদী হবার পর ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার ভিতরে জাগবে নতুন নতুন জিম্মাদারীর অনুভূতি।'

আকবর খান অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ ভাইজান আমি কল্পনাও করিনি যে, আমাদের পথ এমনি করে জুদা হয়ে যাবে। আপনার সম্পত্তিতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার সাহচর্য হারাবার চিন্তা আমি বরদাশত করতে পারছি না। সেরিঙ্গাপটম যাওয়া যদি আপনি নিতান্তই প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমায়ও নিয়ে চলুন আপনার সাথে? নইলে রোহিলাখণ্ডে আমার দরজা হামেশা খোলা থাকবে আপনার জন্য। সেখানে কেন আপনি যাবেন না?' আপনি ওখানে আগন্তুক এ অনুভূতি আপনার মনে কখনো জাগতে দেবো না আমি।'

মোয়াযযম আলী সস্নেহে তার গর্দানে হাত রেখে বললেন ঃ আকবর আমি খুঁজে পেয়েছি আমার মনজিল। কোনো আশ্রয়ের সন্ধানী আমি নই, কর্তব্যের অনুভূতি আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেরিঙ্গাপটমে।'

ঃ তাহলে আমিও যাবো আপনার সাথে।'

ঃ না আকবর তোমার কর্তব্য তোমায় আহবান করছে রোহিলাখণ্ডে। আমার মতো নিঃসঙ্গ তুমি নও। তুমি এক গোষ্ঠীর সরদার, তাদের দাবি রয়েছে তোমার উপর। আমার সাথে থেকে যে অভিজ্ঞতা তুমি হাসিল করেছো তাই তোমায় দেবে পথের দিশা। আমি তোমায় দেখতে চাই রোহিলাখণ্ডের শ্রেষ্ঠ সরদার। আমার আকাঙ্ক্ষা আমি যখন আবার ফিরে যাবো রোহিলাখণ্ডে সেদিন যেনো তোমার গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মানুষের মুখে দেখতে পাই আনন্দের হাসি। আমার সবচাইতে বড়ো আরজু, তুমি যেনো হতে পারো রোহিলাখণ্ডের মুসলমানদের আযাদির শ্রেষ্ঠ রক্ষক। তোমার পর তোমার বংশধর যেনো বুলন্দ রাখতে পারে তাদের দেশের আজাদির ঝাণ্ডা।

ঃ আগামী হফতায় এক কাফেলা এখান থেকে যাচ্ছে লাখনৌয়ের পথে। তোমরা সেই কাফেলার সাথে যাবে, এই হচ্ছে শেখ ফখরুদ্দিনের ইচ্ছা। গোড়ার দিকে তিনি তোমায় এখানে রাখবার জন্য জিদ ধরেছিলেন, কিন্তু আমার সাথে কথা কাটাকাটির পর তিনি বুঝেছেন যে, তোমার ঘরে ফিরে যাইয়াই উচিত।'

শাদির দশদিন পর আকবর খান হায়দারাবাদ থেকে লাখনৌয়ের পথে রওয়ানা হচ্ছেন। বিলকিস দুটি পরিচারিকাসহ এক গাড়ির উপর সওয়ার হয়েছেন। শাদির সময়ে মামুর দেওয়া হাতী, ঘোড়া ও অন্যান্য মাল-পত্রের হেফাজতের জন্য কাফেলাকে যথেষ্ট মনে না করে শেখ ফখরুদ্দিন তাদের সাথে দিলেন পঞ্চাশজন সশস্ত্র নওকর। আকবর খান শহরের বাইরে গিয়েই মোয়াযযম আলীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন, কিন্তু মোয়াযযম আলী তার সাথে যেতে চাইলেন আরো

কিছুদূর। শহর থেকে এক ক্রোশ দূরে এলে আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান! আপনি বহুত দূর এসে গেছেন।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ না আকবর, আমি আরো কিছুদূর তোমার সাথে যাবো।'

কিছুদূর পথ অতিক্রম করবার পর একবার চেষ্টা করলেন বিদায় নিতে কিন্তু মোয়াযযম আলী তার সাথ ছাড়লেন না। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। কাফেলা এক বস্তির বাইরে তাঁবু ফেললো। নওকররা বিলকিসের জন্য তৈরি করলো এক আলাদা খিমা। এশার নামাজের পর বিলকিস তার খিমার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুদূর খোলা হাওয়ায় এক চাটাইর উপর বসে মোয়াযযম আলী ও আকবর খান গভীর রাত পর্যন্ত থাকলেন আলাপে মশগুল।

পরদিন ভোরে নামাজের পর কাফেলা যখন আবার রওয়ানা হবার জন্য তৈরি হয়েছে, তখন আকবর খান বললেন ঃ ভাইজান আপনি বহুত তকলিফ করেছেন। এবার আপনি আর সামনে যেতে পারবেন না; যদি যান, তাহলে আমাদের সাথে আপনাকে যেতে হবে রোহিলাখণ্ড পর্যন্ত।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ না আকবর আমি আর আগে যাচ্ছি না। এবার তুমি ঘোড়ায় সোয়ার হও। দেখো তোমার চোখে আমি যেনো এক ফোঁটা পানিও না দেখি। খোদা হাফিজ। মোয়াযযম আলী মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আকবর খান মোসাফেহার পরিবর্তে বে-এখতিয়ার তার সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন এবং কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ ভাইজান আজ আপনার চোখেও আমি দেখছি পানি।'

ঃ যাও নালায়েক।' মোয়াযযম আলীর আওয়াজ হঠাৎ যেনো বসে গেলো।

আকবর খানের সহনশক্তি শেষ হয়ে গেছে। তিনি জলদি করে পিছু হটে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। কাফেলা খানিকটা দূরে এগিয়ে গেছে। ঘোড়া হাকাবার আগে আকবর খান মুহূর্তের জন্য তাকালেন পিছন দিকে। তার মুখে হাসি কিন্তু চোখে টলমল করছে অশ্রু। তিনি মনে মনে বললেন ঃ খোদা হাফিজ! ভাই আমার, দোস্ত আমার, আমার বাপ, খোদা হাফেজ।

মোয়াযযম আলী কিছুক্ষণ ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে চললন। কিছুক্ষণ পর এক টিলার উপর ঘোড়া থামিয়ে তাকিয়ে দেখলেন দূরে গাছপালার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কাফেলার শেষ ঝলক।

দ্বিতীয় দিন মোয়াযযম আলী আর একটি ছোট কাফেলার সাথে ধরলেন মহীশূরের পথ।

ষোলো

সেরিঙ্গাপটমে হায়দার আলীর সাহচর্যের দিনগুলি হলো মোয়াযযম আলীর কাছে কুদরতের শ্রেষ্ঠ ইনাম। মহীশূরের সরজমিন যেনো তার স্বপ্নের জান্নাত। জিন্দেগির এমন কোনো খুশি নেই যা তার নাগালের মধ্যে আসেনি। যে কাফেলার মুসাফিরদের দীল বিশ্বাসের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, তার শামিল হয়ে তিনি কদম রেখেছেন যিন্দেগির রাজপথে। তিনি তার মনজিলে মকসুদের সন্ধান পেয়েছেন এবং পথের চড়াই-উতরাইয়ের জন্য তার নেই কোনো পেরেশানি। জিন্দাহ থাকবার জন্য তার প্রয়োজন ছিলো একটা লক্ষ্যের এবং সেরিঙ্গাপটমে আবাদ হওয়ার পর তিনি অনুভব করছেন যেনো তার প্রতিটি শ্বাস একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত। সেরিঙ্গাপটমে তিনি নয়া জিন্দেগি শুরু করলেন হায়দার আলীর ফউজের পাঁচশ সওয়ারের অধিনায়ক হিসাবে এবং পাঁচ বছরে মেহনত, যোগ্যতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার বদৌলত তিনি হলেন সেরিঙ্গাপটমের মাহফুজ ফউজের তিন হাজার জোয়ানের সালারে আলা। শৃঙ্খলা, সংযম ও প্রস্তুতির দিক দিয়ে তার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত সিপাহীদের হায়দার আলীর ফউজে ছিলো বিশেষ মর্যাদা। সেরিঙ্গাপটমে পৌছবার প্রথম ও তৃতীয় বছরে তার ঘরে এসেছে আরো দুটি ছেলে। তাদের মধ্যে একটির নাম মনসুর আলী, অপরটির নাম আনওয়ার আলী। আকবর খানের সাথে কিছুকাল তার চিঠিপত্র চলেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে লিপি-বিনিময় গেছে বন্ধ হয়ে।

এতসব ক্লান্তি ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও ফরহাতের সাহচার্য তার যিন্দেগির মাস ও বছরকে মনে হয় যেনো একটা স্বপ্ন পরিক্রমা। তার বাসগৃহে সেরিঙ্গাপটমের সবচাইতে ভালো বাড়িগুলোর শামিল। মহীশূর ফউজে বড়ো বড়ো অভিজ্ঞ জেনারেল ও অফিসার তাকে মনে করেন তাদের দোস্ত ও সাথী। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপারে হায়দার আলী তার পরামর্শ নেন। বালক শাহজাদা টিপু- যার দীপ্তিমান পেশানিতে লেখা রয়েছে কওমের তকদির-অবসর সময় কাটান তারই সহচার্যে। মোয়াযযম আলী তার জীবনসংগিনীকে বারবার বলেন ঃ ফরহাত কুদরতের কাছে আমার একমাত্র অভিযোগ, যখন আমার ভিতরে ছিলো দুর্গম পথ চলবার হিম্মৎ, তখন আমার সামনে ছিলো অন্ধকার, আর এখন আমি ভোরের রোশনিতে দেখতে পাচ্ছি আমার মনজিল, কিন্তু আজ আমি অনুভব করছি আমার পা বুঝি আর বোঝা

বইতে পারবে না বেশি দিন। আহা! যে অতীতের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো জীবনের স্পন্দনে সজীব, সেই অতীতকে যদি আমি আবার ফিরিয়া আনতে পারতাম! সিদ্দীক মাসউদ ও আনোয়ার খোশনসীব। ওরা যখন বড় হবে তখন ওদের কাফেলা-সালার হবেন ফতেহ আলী খান টিপু।'

খোদাদাদ সালতানাতে যখন উৎসাহ-উদ্দীপনার এক নতুন দুনিয়া গড়ে উঠেছে, হিন্দুস্থানের বাকি অংশে তখন চলছে আগামী দিনের নব নব বিপ্লবের সূচনা।

বাংলার নামেমাত্র শাসক মীর কাসিম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুগ্রহে শাসকের গদিতে আসীন হয়ে ঈসায়ী ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত প্রজাদের রক্তের বিনিময়ে তার ইংরেজ মুরুব্বীদের খুশি করলেন। বাংলার আওয়াম যখন হয়েছে অন্নের কাঙাল, তখনো ইংরেজদের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলছে। মীর কাসিম তার অর্থ ভাণ্ডার খালি করে, বেগমদের গহনাপত্র বিক্রি করে দিয়ে দেশের ব্যবসায়ী ও জমিদারদের অর্থ-সম্পদ লুট করে এই তিক্ত সত্য উপলব্ধি করলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার কেনো উপায় নেই তার কাছে।

ইংরেজরা তার কাছ থেকে বালার হুকুমাতের গদি ছিনিয়ে নিয়ে আবার তা ন্যস্ত করলো মীর জাফরের হাতে। মীর কাসিম বাংলা থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার নওয়াব উজির মোগল শাহানশাহ শাহে আলম তখন অসহায় জীবনযাপন করছেন এলাহাবাদে। তারা মীর কাসিমকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। ঈসায়ী ১৭৬৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বক্সারের যুদ্ধে হলো তাদের পরাজয়। মীর কাসিম ফেরার হয়ে জান বাঁচালেন এবং শাহনশাহ যিনি তখনো দিল্লির তখতে বসবার সৌভাগ্য লাভ করেননি গিয়ে মিলিত হলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে। ইংরেজ ফউজ লাখনৌর দিকে এগিয়ে গেলো এবং অযোধ্যার নওয়াব উজির শুজাউদ্দৌলা বাধ্য হয়ে শান্তি স্থাপন করলেন ইংরেজের সাথে। ইংরেজ অযোধ্যার নওয়াব উজিরের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নিলো পঞ্চাশ লাখ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোরা জেলা ছিনিয়ে নিয়ে সঁপে দিলো শাহে আলমের হাতে। এলাহাবাদের কেল্লাও তারা খালি করিয়ে নিলো তার জন্য। কেল্লার হেফাজতের জন্য তারা মোতায়েন করলো একদল ইংরেজ সিপাহী। অন্যকথায় দিল্লির নামেমাত্র শাহানশাহ হলেন এলাহাবাদে ইংরেজের ক্রীড়নক ও বৃত্তিভোগী এবং অযোধ্যায় খোলাসা হলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চক্রান্তের পথ।

ঈসায়ী ১৭৬৫ সালে মীর জাফর মারা গেলে ইংরেজরা তার পনেরো বছরের বেটা নজমুদ্দৌলাকে বিশ লাখ টাকা নজরানা ও বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা খেরাজ আদায়ের শর্তে বাংলার গদিতে বসিয়ে দিলো। এরপর শুরু হলো বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লুটতরাজের এক নতুন যুগ।

উত্তরে আহমদ শাহ আবদালী ও তার গভর্নরদের তৎপরতা বিশেষ করে সীমাবদ্ধ ছিলো শিখ বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টায় এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য শহর ছাড়া চাহারমহল, লাহোর, জলন্ধর দোয়াব, সিরহিন্দ ও সুলতান বারংবার শিখদের ধ্বংসতাণ্ডবে হলো বিপর্যস্ত। আহমদ শাহ আবদালী, নাসির খান বেলুচ ও নজীব খানের সেনাবাহিনী কয়েকবার শিখদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের গৌরবময় বিজয় সত্ত্বেও পাঞ্জাবে শিখদের চিরদিনের মতো কোনো বৃহৎ স্থানীয় ফউজ কায়েম রাখা সম্ভব হয়নি। আহমদ শাহ আবদালীর লশকর এগিয়ে এলে শিখেরা পালিয়ে যায় ময়দান থেকে। কিন্তু তারা ফিরে গেলেই তারা গোপন আড্ডা থকে বেরিয়ে এসে শুরু করে দেয় আরো তীব্রতা সহকার নরহত্যা ও ধ্বংসলীলা।

দক্ষিণে তখন মারাঠা শক্তি আবার মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। পানিপথের যুদ্ধে তারা কঠিন আঘাত খেয়েছিলো তা তখন মিলিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের মনোযোগ তখন উত্তরের পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতের দিকে নিবদ্ধ। নিজাম ও ইংরেজ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তিন শক্তিই এখন পরস্পরের দিকে নজর না দিয়ে হায়দার আলীর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। মহীশূরের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এবং তথাকার শাসকের ব্যক্তিত্ব হয়েছে তাদের চক্ষুশূল। হায়দার আলীর শক্তি ধ্বংস করে দেবার জন্য ঈসায়ী ১৭৬৬ সালে শকুন, নেকড়ে ও শৃগালের মধ্যে হলো এক সমঝোতা। মীর নিজাম আলী তার ইংরেজ ও মারাঠা মিত্রদের সাথে হামলার বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থির করে এগিয়ে এলেন বাংগালোরের দিকে এবং সেখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে চীনাপট্টন নামক স্থানে ডেরা ফেললেন।

৫

একদিন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। মীর নিজাম আলীর প্রশস্ত খিমায় বসেছে নৃত্য গীতের মজলিস। উজির, আমীর ও বড়ো বড়ো অফিসার তার ডানে-বাঁয়ে উপবিষ্ট। এক ফউজী অফিসার খিমায় প্রবেশ করে কুর্ণিশ করে বললো ঃ হুজুর ইংরেজ ফউজের এক ক্যাপ্টেন এখখুনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবার এজাযতপ্রার্থী।

নিজাম জওয়াব না দিয়ে ক্রোধোদীপ্ত দৃষ্টিতে তাকালেন সিপাহসালার তাহওয়ার জং-এর দিকে। সিপাহসালার একটুখানি ইতস্তত করে উঠে বেরিয়ে গেলেন খিমার বাইরে।

নিজাম আলী মুশীরুল মুলকের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের স্বরে বললেন ঃ এ লোকগুলো এমনি বৃষ্টির ভিতরে আরাম করতে চায় না। আমি বারবার তাদেরকে

বলেছি, এ মওসুমে যুদ্ধ চলতে পারে না।

মুশীরুল মুলক জওয়াব দিলেন ঃ কিন্তু হুজুর, মাদ্রাজের গভর্নরের ধারণা, বর্ষার মওসুম শুরু হবার আগে আমাদের সেরিঙ্গাপটম অবরোধ করা প্রয়োজন। মারাঠাদের তরফ থেকে দেরি না হলে এতদিনে যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে যেতো।

নিজাম জওয়াব দিলেন ঃ মারাঠা আমাদের তুলনায় বেশি হুঁশিয়ার। অর্ধেক যুদ্ধ খতম হওয়া পর্যন্ত তারা ময়দানেই আসবে না।

নিজামের মুহাফিজ বাহিনীর সালারে আলা শামসুল উমরাহ বললেন ঃ হুজুর এও তো হতে পার যে, তারা বেশি হুঁশিয়ারীর পরিচয় দেবে এবং যুদ্ধে মোটেই শরীক হবে না।

মুশীরুল মুলক খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ হুজুর নিজামের মিত্রদের সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা আপনার উচিত নয়।'

সামসুল উমরাহ জওয়াব দিলেন ঃ মাফ করবেন। হুজুর নিজামের ওফাদারীতে কেউ আমার আগে থাকবে, তা আমি মেনে নিতে রাজি নই। কিন্তু মারাঠা যখন পর্যন্ত ময়দানে না আসছে ততোক্ষণ তাদের নেক নিয়ত সম্পর্কে আমি আত্মতৃপ্ত হতে প্রস্তুত নই।'

মুশীরুল মুলকের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে নিজাম শামসুল উমরাহকে সমর্থন করে বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছো। মারাঠাদের সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এগিয়ে এসে আমরা ভুল করেছি।'

শামসুল উমরাহ বিজয়ের হাসি হেসে মুশীরুল মুলকের দিকে তাকিয়ে দেখে নিজামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হুজুর গোড়া থেকেই আমি এ অগ্রগতির বিরোধিতা করেছি। মারাঠাদের প্রকৃত সাহায্য পাওয়ার আশায় যদি আমরা বাঙ্গালোরের উপর হামলা করে বসতাম, তাহলে এখন আমাদের কি দশা হতো, খোদা-ই-মালুম।'

তাহওয়ার জং পুনরায় খিমায় প্রবেশ করে নিজামের কাছে গিয়ে নিচু গলায় বললেন ঃ দূত মাদ্রাজের গভর্ণরের তরফ থেকে কোনো জরুরি পয়গাম নিয়ে এসেছেন এবং এখনই হুজুরের কদমবুচি করবার এজাযত চাচ্ছেন।'

ঃ বহুত আচ্ছা। মাহফিল খতম হয়ে যাচ্ছে। ডাকো তাকে।'

নিজামের ইশারায় নর্তকী ও গায়িকার দল খিমার পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাশের খিমায় চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর এক ইংরেজ অফিসার এসে ঢুকলেন খিমার মধ্যে। তিনি ফউজী কায়দায় সালাম করে কোমরে লটকানো থলে খুলে একটা চিঠি বের করে দিলেন নিজামের হাতে। চিঠি পড়ে নিজাম তা তুলে দিলেন মুশীরুল মুলকের হাতে।

ইংরেজ অফিসার বললেন ঃ ইওর হাইনেস! কর্নেল স্মিথ আমায় হুকুম

দিয়েছেন আবলেশে এ চিঠির জওয়াব নিয়ে ফিরে যেতে।'

নিজাম জওয়াব দিলেন ঃ কর্নেল স্মিথকে আমি লিখে দিয়েছি যে, মারাঠার তরফ থেকে নিশ্চিন্ত না হয়ে কোন ফয়সালা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইংরেজ অফিসার বললেন ঃ হিজ একসেলেনসী মাদ্রাজের গভর্নর এ চিঠিতে আপনাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সেরিঙ্গাপটমের দিকে আপনাদের অগ্রগতির খবর পাওয়া মাত্র মারাঠা ময়দানে এসে যাবে। তাদের ফউজের এক হিসসা আপনাদের সাথে শামিল হবে এবং অপর হিসসা মালাবার থেকে আমাদের সাহায্য করবে।'

নিজাম বললেন ঃ কিন্তু বর্ষার অবস্থা এমনি থাকলে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এ মওসুম কেবল হায়দার আলীর পিণ্ডারা ফউজের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। এ যাবত আমরা অস্ত্রশস্ত্র বারুদ ও রসদ সামগ্রী যা এখানে জমা করবার চেষ্টা করেছি, তার অর্ধেকটা ইতিমধ্যে দুশমনের হাতে চলে গেছে। এখন যে ফউজ এ তাঁবুতে রয়েছে তার প্রায় সমসংখ্যক ফউজ পাহারায় রয়েছে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র চলাচলের পথে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের রসদ ও অস্ত্রবাহী কোনো দল সহীহ সালামতে পৌঁছেনি এখানে। মারাঠা চুক্তি মোতাবেক আমাদেরকে সমর্থন করলে আমাদের এতটা পেরেশানির মোকাবিলা করতে হতো না। এখন পানি-কাদার মধ্য দিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যেতে থাকি, তা হলে আমাদের একদিনের সফরে লাগবে এক হফতা। আমাদের ডানে-বাঁয়ে আগে পিছে সব দিকেই থাকবে দুশমনের নৈশ আক্রমণকারী বাহিনী।'

ইংরেজ অফিসার বললেন ঃ মাফ করবেন। দুশমনের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণাই আপনাদেরকে পেরেশান করে তুলেছে। আমাদের ফউজ মালাবারের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং সেখানেও বর্ষা হচ্ছে। কিন্তু আমরা বুঝি আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের ও দুশমনের সমান অসুবিধাই হবে।'

নিজাম জওয়াব দিলেন ঃ মালাবারের উপকূল এলাকায় আপনাদের সহায় সমুদ্রপ্রাচীর কিন্তু আমার এখানে গরুর গাড়ি দিয়ে কাজ চালাতে হবে।'

ঃ তাহলে আপনার তরফ থেকে কি জওয়াব নিয়ে আমি যাবো?'

ঃ মাদ্রাজের গভর্নরের জন্য আমার আগের জওয়াবই যথেষ্ট।'

ঃ কিন্তু এ চিঠিতে গভর্ণর লিখেছেন যে, আপনি কর্নেল স্মিথকে আপনার ইচ্ছা জানিয়ে দেবেন।'

ঃ কর্নেল স্মিথ এক হফতার মধ্যে আমার জওয়াব পেয়ে যাবেন।'

ইংরেজ অফিসার বললেন ঃ আমার বিশ্বাস, তার আগেই আমাদের তরফ থেকে আপনার কাছে এমন একদল প্রতিনিধি আসবেন, যারা আপনার রায় বদল করাতে পারবেন।'

ঃ মারাঠাদেরকে নেক নিয়ত সম্পর্কে যদি কোন প্রতিনিধি দল আমার মনে আস্থা জন্মাতে পারেন, তাহলে আমি খুশি হয়ে আমার রায় বদল করবো। সবচাইতে ভাল হয়, যদি প্রতিনিধি দল আমার কাছে আসার তকলিফ করবার আগে মারাঠাদের সাথে কথাবার্তা বলেন।'

ইংরেজ অফিসার বললেন ঃ এও তো হতে পারে যে, আপনি মালাবার এলাকায় আমাদের কামিয়াবীর খবর পেয়ে আর মারাঠাদের সম্পর্কে কোনো চিন্তারই প্রয়োজনবোধ করবেন না।'

নিজাম মৃদু হাস্য সহকারে কুরসি থেকে উঠে মোসাফেহা করবার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেনঃ হ্যাঁ তাই হতে পারে।'

ইংরেজ অফিসার সালাম করে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগীতের আসর আবার জমে উঠলো। আনন্দের মজলিস যখন বেশ গুলজার হয়ে উঠছে, তখন এক নর্তকী নিজামের পিয়ালায় ঢেলে দিচ্ছিল লাল শারাব। অমনি খিমার বাইরে শোনা গেল সিপাহীদের কোলাহল। মজলিসে হাজির লোকেরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। নিজাম হাতের ইশারা করলে অমনি তবলা ও সারেংগীর আওয়াজ খামোশ হয়ে গেল। নর্তকীরা হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এক ফৌজী অফিসার খিমায় প্রবেশ করে নিজামকে কুর্ণিশ করে বললেন ঃ আলীজাহ, একটি লোক এখখুনি আপনার কদমবুচির এজাযতপ্রার্থী।'

ঃ কে সে লোকটি?' নিজাম বিরক্তির স্বরে বললেন।

ঃ আলীজাহ, লোকটি বলেছেন, তিনি নাকি হায়দার আলীর দূত।'

মুশীরুল মুলক বললেন ঃ হুজুর বাইরে কেন তোমরা তার পথরোধ করলে না। ?' সে কি করে পৌছল এখানে?

ঃ জনাব, তিনি পূর্ণ গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছিলেন। পাহারাদারদের চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ঘোড়া থামালেন না।'

মুশীরুল মুলক বললেন ঃ যাও তাকে কয়েদ করে রাখো।'

অফিসার বললেন ঃ কিন্তু হুজুর তিনি ধমক দিয়েছেন।'

ঃ কি বলে ধমক দিল সে?

ঃ হুজুরের হুকুম হলে আমরা তার জিভ টেনে বের করতে পারি।'

নিজাম রাগত স্বরে বললেন ঃ বে-অকুফ! সে কি বললো, তাই বলো না আগে।'

ঃ আলীজাহ তিনি বলেছিলেন, যদি এখখুনি হুজুরের সাথে তিনি কথা বলতে না পারেন, তাহলে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এ তাঁবুর নাম-নিশানা সাফ করে দেওয়া হবে।'

সিপাহীসালার তাহওয়ার উঠে তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে বললেন ঃ হয়তো

কোনো পাগল হবে। আচ্ছা আমি দেখছি।'

নিজাম বললেন ঃ না, দাঁড়াও। ডাকো তাকে ভিতরে।'

অফিসার বাইরে বেরিয়ে গেলে কয়েক মূহূর্ত পর মোয়াযযম আলী কর্দমাক্ত পোশাকে এসে প্রবেশ করলেন নিজামের খিমায়। তিনি আসসালামু আলাইকুম বলে মজলিসের সব দিক এক নজরে দেখে নিয়ে নিজামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'এই অসময়ে আপনাদের শান্তির ব্যাঘাত করার জন্য আমায় মাফ করবেন। কিন্তু আমার পক্ষে আপনার খেদমতে হাজির হওয়া খুবই জরুরি ছিলো।'

মশীরুল মুলক বললেন ঃ হায়দার আলী তাঁর দূতকে মাফ চাওয়ার যে তরিকা শিখিয়েছেন, আমাদের কাছে তা বিলকুল নতুন। তুমি কি বলতে চাও?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ হায়দার আলীর দূতের আপনাদের কাছ থেকে আদব শিখবার প্রয়োজন হবে না। তার তরফ থেকে আমি আপনাদেরকে পয়গাম দিতে এসেছি যে, যদি আপনারা মারাঠার সাহায্য পাবার ভরসায় এখানে এসে থাকেন, তাহলে তারা এ যুদ্ধে হিসসা নেবে না। তারা ইতেমধ্যেই হায়দার আলীর সাথে সন্ধি করেছে।'

মশীরুল মুলক বললেন ঃ হায়দর আলীর হুমকিতে আমরা ভয় পাবো না। মারাঠাদের আলাদা হয়ে যাবার খবর ঠিক হলেও আমাদের কোনো উদ্বেগের কারণ নেই।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ এই মূহূর্তে আপনারা আমাদের অবরোধ বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছেন, এ খবরটি আপনাদেরকে অবশ্যি উদ্বিগ্ন করবে। কাল পর্যন্ত আপনাদের এ তাঁবু চারদিক থেকে আমাদের তোপের নাগালের মধ্যে আসবে। হায়দার আলী আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য আমায় পাঠায়নি, বরং আমি তার তরফ থেকে এসেছি দোস্তির হাত বাড়াতে। আপনারা যেনো হায়দার আলীর এ পদক্ষেপকে কমজোরী বা বুযদীলী বলে ব্যাখ্যা না করেন। এ দেশের ভবিষ্যৎ আমাদের অতি প্রিয়, তাই আমি এসেছি আপনাদের কাছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদেরই ভুলের ক্ষতিপূরণ করতে থাকবে, এ আমরা চাই না। আপনাদের ফউজী শক্তি আমরা জানি, কিন্তু হায়! আপনারা যদি এ শক্তি হিন্দুস্তানের ইজ্জত ও আজাদির দুশমনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারতেন। যদি আপনারা কওমের পথের দিশারী হতে চান, তাহলে হায়দার আলী আপনাদের নেতৃত্বে দেশের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গর্ববোধ করবেন। আমি আপনাদেরকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার দাওয়াত দিতে এসেছি, আর যদি আপনারা ইংরেজের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পান, তা'হলে মারাঠাদের মতো নিরপেক্ষ থাকুন এবং আমাদেরকে তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে দিন।'

নিজাম বললেন ঃ আর যদি আমরা ইংরেজের সঙ্গ ত্যাগ করতে না চাই, তা'হলে?"

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তাহলে আমাদের আফসোসের কারণ হবে। - আফসোস হবে এই জন্য যে, অন্তহীন চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের ভাইদের আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারলাম না। আপনাদের যে লশকর এখন আমাদের অবরোধ বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে, তাদের ধ্বংসের জন্য আমাদের আফসোস হবে। মারাঠা ময়দান থেকে সরে গেছে, মালাবার এলাকা ছেড়ে ইংরেজ আপনাদের সাহায্যের জন্য আসতে পারবে না। কতোক্ষণ আপনারা আমাদের লশকরের মোকাবিলা করতে পারবেন এবং ময়দান ছেড়ে পিছিয়ে যেতে গেলে কতোটা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবেন আপনারা, তা ভেবে দেখা আপনাদের কাজ। হায়দার আলীও আফসোস করবেন এ ধ্বংসতাণ্ডবের জন্য, কিন্তু ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা তাকে দোষী করবেন না।'

নিজাম বললেন ঃ এ কথা মনে করা তোমার ঠিক হবে না যে, হায়দার আলীর হুমকিতেই আমরা ঘাবড়ে যাবো।'

ঃ এ হুমকি নয়, আপনার প্রশ্নের সহজ-সরল জওয়াব। কিন্তু আপনি যদি একে হুমকি মনে করেন, তা'হলে কোনো সমজদার অফিসারকে আমার সাথে যাবার এজাযত দিন। আমি তাকে প্রত্যেকে ফ্রন্ট ঘুরিয়ে দেখাতে তৈরি। তারপর আপনার ফউজের বেঁচে যাবার সম্ভাবনা কতোখানি, তা তিনিই আপনাদেরকে বুঝাতে পারবেন। হায়দার আলী তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী শাহ্‌জাদা ফতেহ্ আলী খান টিপুকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন, তার নেক নিয়তের প্রমাণ এর বেশি আর কি হতে পারে?'

মীর নিজাম আলী খান হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ শাহজাদা ফতেহ আলী টিপু কোথায়?'

ঃ তিনি এখান থেকে আট ক্রোশ দূরে আমার ফিরে যাবার ইন্তেজার করছেন। আপনারা যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হন, তা'হলে কাল ভোরেই তিনি আপনার খেদমতে হাযির হবেন, কিন্তু আমার আবেদন যদি আপনাদের গ্রহণযোগ্য না হয়, তা'হলে তিনি কাল এখানে অবশ্যি পৌছবেন। এই মুহূর্তেই আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি যে, দাক্ষিণাত্য থেকে আপনাদের রসদ ও অস্ত্র চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আপনাদের রসদ সামগ্রীর যে পঞ্চাশটি গাড়ি আসছিলো, তা এখন আমাদেরই দখলে। যে সিপাহীদল তার সাথে ছিলো তারা রয়েছে আমাদের কয়েদখানায়। সে দলটির অফিসারের নাম সওলাৎ খান।'

কিছুক্ষণের জন্য সারা মজলিসের উপর স্তব্ধতা ছেয়ে গেলো। নিযাম একে একে সকল উজির ও অফিসারের দিকে তাকালেন। তারপর মোয়াযযম আলীকে

বললেন ঃ আমরা শাহজাদা টিপুর সাথে শান্তি আলোচনা করতে তৈরি, কিন্তু আমরা এখান থেকে ফিরে গেলে যে মহীশূর ফউজ আমাদের পিছু ধাওয়া করবে না, তার জামানত কি রয়েছে?

ঃ মহীশূরের শাহজাদা টিপুর কথার চাইতে বড়ো জামানত আর কি দেওয়া যেতে পারে? যদি আপনাদের লোকসান ঘটানোই আমাদের মতলব হতো, তাহলে এই হতো আমাদের সবচাইতে বড়ো মওকা।'

মীর নিজাম আলী বললেন ঃ আমার তরফ থেকে তুমি শাহজাদা টিপুকে পয়গাম দিতে পার যে, আমরা শান্তি আলোচনার জন্য তৈরি।'

শামসুল উমরাহ বললেন ঃ আলীজাহ, এজাযত হলে আমরা এর সাথে যেতে চাই।'

ঃ হ্যা, আপনার এজাযত রইলো।'

কিছুক্ষণ পর মোযাযযম আলী ও শামসুল উমরাহ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চললেন শাহজাদা টিপুর কাছে।

পর দিন নিজামের তাঁবুতে চললো শাহজাদা টিপুর অভ্যর্থনার আয়োজন। তৃতীয় দিন সেরিঙ্গাপটমে চললো খুশির উৎসব। সেখানে খবর পৌঁছে গেছে যে, হায়দার আলীর সুযোগ্য পুত্র তার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক অভিযানে শানদার কামিয়াবী হাসিল করেছেন এবং নিজামের ফউজ চীনাপট্টন থেকে ফিরে চলেছে হায়দারাবাদ অভিমুখে।

মারাঠা ও নিজামের দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে হায়দার আলীর সেনাবাহিনী ঘূর্ণিঝড়ের মত হামলা চালালো ইংরেজ বাহিনীর উপর। ১৭৬৯ সালের মধ্যে হায়দার আলী মালাবারের উপকূল এলাকা দখল করলেন এবং ইংরেজ প্রত্যেক ফ্রন্ট থেকে পশ্চাদপসরণ করে আশ্রয় নিতে লাগল মাদ্রাজে। হায়দার আলী বিজয় পতাকা উড্ডীন করে এগিয়ে গেলেন মাদ্রাজের দিকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মহলে ইতিমধ্যেই ভূমিকম্পের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে গেছে। ইংরেজ এবার শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করলো।

মহীশূরের ব্যাঘ্র জওয়াব দিলেন ঃ শান্তি-আলোচনা এবার মাদ্রাজেই হবে।'

মাদ্রাজ থেকে পাঁচ মাইল দূরে হায়দার আলী শান্তিচুক্তির শর্ত পেশ করলেন এবং ইংরেজ তা শিরোধার্য করে নিলো।

ইংরেজরা হায়দার আলীর রহম ও করমের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলো। ইচ্ছা করলে মাদ্রাজে কেল্লা দখল করা ছিল হায়দার আলীর কয়েক ঘন্টার কাজ। মাদ্রাজে সন্ধিচুক্তির আসল তাৎপর্য কি ছিল, ঐতিহাসিক সে প্রশ্নের নির্ভুল জওয়াব দিতে পারেন না। হতে পারে, বিজয়ী বীরের মহৎপ্রাণ ও উচ্চ দৃষ্টিতে পতিত দুশমনের উপর হাত তোলা লজ্জাজনক মনে হয়েছে, অথবা পিছন থেকে নিজাম

ও মারাঠার হামলার আশঙ্কা হায়দার আলীর ছিলো। যা-ই হোক, এ সন্ধির বাস্তব পরিণাম যখন আমরা দেখতে পাই, তখন মনে হয়, এ এক বিরাট মানুষের বিরাট ভুল। যখন এ সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করা হয় মাদ্রাজের গভর্নর তাতে স্বাক্ষর করেন, তখনো ইংরেজদের কোনো সাধুসংকল্প ছিলো না।

আটমাস পর মারাঠা দেড়লাখ ফউজ নিয়ে তুংগভদ্রা নদী পার হয়ে হামলা করলো মহীশূরের উপর। মাদ্রাজের সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী হায়দার আলীর সাহায্য করা ছিলো ইংরেজের কর্তব্য, কিন্তু তারা মারাঠার বিরুদ্ধে হায়দার আলীকে সমর্থন করতে অস্বীকার করলো এবং তাদের অস্বীকৃতির বড়ো কারণ মারাঠার বিজয়ের আশায় মহীশূরের বন্দরের উপর ইংরেজ তাদের দখল কায়েম করতে চেষ্টা করেছিলো।

হায়দার আলী প্রায় আড়াই বছর বিভিন্ন ফ্রন্টে মারাঠাদের পংগপালের মতো বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেন। ইতিমধ্যে তার সীমান্ত এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। মারাঠা কঠিন ক্ষতি স্বীকার করেও ময়দানে হাজির করতে লাগলো নিত্যনতুন সেনাদল। ১৭৭২ সালের জুলাই মাসে হায়দার আলী মারাঠাদের উত্থাপিত চুক্তি মেনে নিয়ে সন্ধি করলেন। কিন্তু ইংরেজের চুক্তি ভঙ্গ ও মারাঠাদের জবরদস্তি তাকে এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে বাধ্য করলো যে, মহীশূরের আজাদির দুশমনরা তারা বেশিদিন শান্তিতে থাকতে দেবে না।

৫

যুদ্ধ থেকে অবসর মিলতেই মোয়াযযম আলী আকবর খানের খবর জানবার প্রয়োজনবোধ করলেন। হায়দার আলীর ফউজে রোহিলাখণ্ডের কয়েকজন নওজোয়ান শামিল ছিলো এবং যুদ্ধের পর তাদের কোনো কোনো সিপাহী চলে যাচ্ছিলো ছুটিতে। মোয়াযযম আলী এক দীর্ঘ চিঠি লিখে এক নওজোয়ানের হাতে দিয়ে দিলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন

'প্রিয় ভাই!

তোমার শেষ চিঠির জওয়াব সম্ভবত এখনো আমার জিম্মায় রয়েছে। গত কয়েক বছর আমি ছিলাম সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যে। তথাপি আমি অনুভব করছি যে, তোমাদের প্রতি কর্তব্যে আমার ত্রুটি হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে ভুলে গেছি মনে করা উচিত হবে না তোমার। গত দশ বছরে জিন্দেগির এমন একটি মুহূর্তও কাটেনি, যখন আমি তোমাদের স্মরণ থেকে বিরত থেকেছি।

'তুমি শুনে খুশি হবে যে, ইংরেজের ও তারপর মারাঠার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের একটি পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। যে অন্ধকার ঘনঘটা ছেয়ে ফেলেছিল মহীশূরের আসমান, তা কেটে গেছে। কিন্তু মহীশূরে আমার হিসসার কাজ আজো শেষ হয়নি। আজ আমি অনুভব করছি যে, আমাদের গন্তব্য পথের কোনো কোনো পর্যায় এখনো বাকি রয়েছে। মহীশূরের আজাদি ও সৌভাগ্য কায়েম রাখার জন্য এবং মহীশূর ছাড়া তামাম হিন্দুস্তানকে ইংরেজের জবরদস্তিমূলক সংকল্পের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদেরকে করতে হবে আরো অনেক কিছু। সুলতান হায়দার আলীর মতো সচেতন মস্তিষ্ক মানুষের নেতৃত্বে এবং শাহজাদা ফতেহ আলী টিপুর মতো মহিমান্বিত মুজাহিদের সাহচর্যে লড়াই করা ছিলো আমার অতি বড়ো সৌভাগ্য। যে ছোট্ট বাচ্চাকে কয়েক বছর আগে তুমি দেখেছিলে সিংহশাবক নিয়ে খেলতে, তিনিই আজ মহীশূর ফউজের এক শ্রেষ্ঠ জেনারেল। আমার এ জিন্দেগিতে আমি তার চাইতে বেশি আর কোনো নওজোয়ানের বুদ্ধিবৃত্তি, সংকল্প ও দৃঢ়তায় মুগ্ধ হইনি। শাহজাদা টিপুর সিপাহীসুলভ শৌর্য, তার জ্ঞানগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং তার মানসিক পবিত্রতা ও সংযম আমাদের অধঃপতিত কওমের সবচাইতে বড়ো পুঁজি। আমি অনুভব করছি যে, শাহজাদা টিপুর সাহচর্যে আমার জিন্দেগির প্রতিটি শ্বাস হচ্ছে এবাদত।'

সুলতান হায়দার আলী যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমায় সেরিঙ্গপটমের ফউজী শিক্ষাকেন্দ্রের নাজিমে আলা নিযুক্ত করেছেন এবং আমার পক্ষে এর চাইতে বড়ো সান্ত্বনা আর কি হতে পারে যে, যার লক্ষ্য শুধু হিন্দুস্তানের নয়, বরং গোটা দুনিয়ার মুসলমানের ঐক্য কায়েম করা, মহীশূরের সেই মহামানুষের নেতৃত্বে একদিন শৌর্য সাহসের পরিচয় দেবে আমার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত নওজোয়ান দল।'

'প্রায় চার বছর আগে মুরাদ আলী আমায় জানিয়েছিলেন হজে যাবার সংকল্প। তারপরে আর কোনো খবর পাইনি তার কাছ থেকে। আজ আমি তাঁকেও চিঠি লিখছি। তোমার বড়ো ভাতিজা সিদ্দীক আলী খানের শখ রয়েছে মহীশূরের বৃহত্তর জঙ্গি জাহাজের ক্যাপ্টেন হবার। এখন থেকেই আমি তার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছি একজন ফরাসী শিক্ষক।'

'মাসউদ ও আনওয়ার প্রায়ই বলে যে, তারা বড়ো হয়ে তাদের চাচা আকবর খানের কাছে গিয়ে বাঘ শিকার করবে। তোমার সবচাইতে ছোট ভাতিজাটির নাম মুরাদ আলী এবং আগামী মাসে তার বয়স হবে দু'বছর। ফরহাতের আম্মা গত বছর মারা গেছেন। সাবের ও দীলাওয়ার খান এখনো রয়েছে আমার সাথে। তারা তোমায় খুবই স্মরণ করে। সময় পেলে কয়েক দিনের জন্য সেরিঙ্গাপটম

এসো। তোমায় দেখবার জন্য আমার মন খুবই আগ্রহান্বিত। তোমার ভাবী বিলকিসকে খুবই স্মরণ করেন। বাচ্চাদের কাছে যখন মহীশূরের ফউজের কোনো জোয়ান বাহদুরীর কথা বলে, তখন তারা গর্বের সাথে বলে, তোমরা আমাদের চাচা আকবর খানকে দেখোনি কখনো।' খোদা মালুম, সাবের তোমার সম্পর্কে ওদেরকে কতো কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়েছে। তারা তোমায় এ যুগের সবচাইতে শক্তিশালী ও বাহাদুর লোক মনে করে। সম্ভব হলে অবশ্যি আসবার চেষ্টা করো।

তোমারই ভাই
মোয়াযযম আলী।

তিন মাস পর মোয়াযযম আলী আকবর খানের যে জওয়াব পেলেন, তাতে লেখা রয়েছে ঃ

ভাইজান,

আমার ধারণা ছিলো, আপনি আমায় ভুলে গেছেন। কয়েকবার আমি সেরিঙ্গাপটম আসার ইরাদা করেছি, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির দরুন আমার ঘর ছেড়ে আসা সম্ভব হয়নি। কয়েক বছর ধরে মারাঠা আমাদের সীমান্ত এলাকায় ঝড়ের মতো হামলা করছে। আমার এলাকায় হামলা হয়েছে তিনবার। গত বছর তারা আমাদের দু'খানা গাঁ জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। তারপর আমি আশপাশের সরদারদের সাহায্যে তাদের পিছু ধাওয়া করে সীমান্তের কাছে তিনশ' বর্গীকে সাফ করে দিয়েছি। তারপর আমাদের এলাকায় কোনো হামলা হয়নি, কিন্তু রোহিলাখণ্ডে হামেশাই লেগে রয়েছে মারাঠা অগ্রগতির আশঙ্কা। হাফিজ রহমত খানের নেতৃত্বে রোহিলা যথেষ্ট সংঘবদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি সীমাবদ্ধ এবং অপরের সাহায্য ব্যতীত কোনো বাইরের শক্তির সাথে আমরা সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারি না। দিল্লির অবস্থায় আমরা হতাশ হয়ে গেছি। সম্প্রতি হাফিজ রহমত খান অযোধ্যার নওয়াব উজিরের সাথে এক চুক্তি করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী মারাঠা হামলার সময় অযোধ্যার সেনাবাহিনী আমাদের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু হায়! আমরা যদি অযোধ্যার নওয়াব উজিরের উপর নির্ভর করতে না পারতাম! মহীশূর সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে বারবার আমার দীলে ধারণা জাগে, আহা! হায়দার আলী ও শাহজাদা টিপুর মতো পথের দিশারী নেতা যদি উত্তর ভারতেও পয়দা হতেন।'

আনোয়ার আলী হজের পর মদীনা শরীফে আবাদ হয়েছেন। তার এক সাথীর মারফতে তিনি আমায় পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, তিনি আর দেশে ফিরে আসবেন

না। হজে যাবার আগেই তিনি খতম করে গেছেন তার তেজারতী কারবার। বাড়ি বিক্রির পর তার কাছে যে অর্থ ছিলো, তা' দিয়ে বাকি জিন্দেগি তিনি গুজরান করতে পারতেন আরামে।'

'গত বছর বিলকিসের আম্মা হায়দারাবাদ থেকে আতিয়ার কাছে চলে গিয়েছিলেন। কয়েক মাস পর শেখ ফখরুদ্দিনের চিঠিতে জানলাম, তিনি সেখানেই ওফাত পেয়েছেন। বিলকিস কয়েকদিনের জন্য বোনের কাছে যাবার জিদ ধরেছে। পরিস্থিতি ঘর ছেড়ে যাবার অনুকূলে হলে আধুনী হয়ে আমি আপনার কাছে চলে আসবো।

'ভাইজান! প্রতি মুহূর্তে আমি আপনাকে স্মরণ করি এবং প্রত্যেক নামাজের পর সবার আগে দোআ করি আপনার জন্য। আমার বড় ছেলে দাউদ খান নয় বছর বয়সে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছে। তার ছোট ভাই শাহবাজ খান চার বছরের ছেলে। গত বছর খোদা আমাদেরকে একটি মেয়ে দিয়েছেন। বিলকিস তার নাম রেখেছে তানবীর। বিলকিস আপনাকে ও ভাবীজানকে সালাম জানাচ্ছে।

আপনার ভাই-
আকবর

মোয়াযযম আলী সেরিঙ্গাপটমের ফৌজী শিক্ষাকেন্দ্রে নাজিমে আলার পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হলে পুনরায় মারাঠা পেশোয়া মাধুরাওয়ের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারের দাবিদারদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের খবর পাওয়া গেলো। মারাঠার আঘাত তখনো হায়দার আলীর দীলে সজীব হয়ে রয়েছে। তিনি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এগিয়ে গেলেন মহীশূরের ছিনিয়ে নেওয়া এলাকা পুনরুদ্ধার করতে। শাহজাদা টিপু অভিজ্ঞ অফিসার ও সিপাহীদের ফউজ নিয়ে অগ্রসর হলেন সেরা অভিমুখে। তিন মাসের মধ্যে তিনি সেরার তামাম এলাকা দখল করলেন। তারপর মারাঠা শক্তি আঘাত সামলে উঠবার আগেই তিনি মধাগড়ী ও গুমকাণ্ডার দিকে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে হায়দার আলী হাওসকোট অবরোধ করলেন।

একদিন মোয়াযযম আলী দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে হাওসকোটের বাইরে মহীশূরে ফউজের তাঁবুতে এসে প্রবেশ করলেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে সোজা এগিয়ে গেলেন হায়দার আলীর খিমার দিকে। মুহাফিজ বাহিনীর সালার তাঁকে দেখে সালাম করে বললেন ঃ ভোর থেকে আপনার ইন্তেজার করা হচ্ছে। আমি এখখুনি খবর দিচ্ছি।' অফিসার খিমার মধ্যে প্রবশ করে কয়েক মুহূর্ত পর বাইরে

এসে বললেন ঃ তশরিফ আনুন।'

মোয়াযযম আলী ভিতরে প্রবেশ করলেন। নওয়াব হায়দার আলী, শাহজাদা টিপু ও পিন্ডারা ফউজের সিপাহ্‌সালার গাজী খান চাটাইর উপর বসে একটি নকশা দেখছেন। হায়দার আলী মোয়াযযম আলীর দিকে তাকিয়ে জওয়াব না করেই বললেন ঃ মোয়াযযম আলী, তুমি সফরের জন্য তৈরি হয়ে এসেছো-না?'

ঃ জী হ্যা, আমি তৈরি।'

ঃ বসো। কয়েকদিন থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য আমি একজন যোগ্য লোকের সন্ধান করছি। ফতেহ্ আলীর মত, এ অভিযানের জন্য তোমার চাইতে যোগ্যতর আর কেউ হতে পারে না। 'আমি তোমায় অযোধ্যার নওয়াব উজিরের কাছে পাঠাতে চাই। মারাঠা জুলুমের বদলা নেবার সময় এসে গেছে। এক হফতার মধ্যে, ইনশাআল্লাহ আমরা হাউসকোট জয় করবো। তারপর কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত আমি তাদের পিছু ধাওয়া করতে মনস্থ করেছি। এখন নওয়াব শুজাউদ্দৌলাকে বুঝানো দরকার যে, মারাঠাদের উপর তীব্র আঘাত হানবার এর চাইতে উপযুক্ত সময় আর আসবে না। তিনি যদি অযোধ্যা থেকে এগিয়ে আসেন এবং আমরা এদিক থেকে অগ্রসর হই, তাহলে এ দেশ চিরকালের জন্য মারাঠাদের জবরদস্তি থেকে নাজাত পেতে পারে। দিল্লি দরবারে মারাঠাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন এ দেশের মুসলিম শাসকদের জন্য পয়দা হয়েছে এক বিপদ। আমার বিশ্বাস, শুজাউদ্দৌলা বেঅকুফ না হলে তোমার কথা অবশ্যি মেনে নেবেন। তারপর তুমি যাবে রোহিলাখণ্ডে হাফিজ রহমত খানের কাছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হওয়ার পর দিল্লির অসহায় উমরাহ্‌ও জেগে উঠবেন এবং নিজামও অনুভব করবেন যে, নিরপেক্ষতা তার জন্য লাভজনক হবে না। মারাঠাদের সাথে বোঝাপড়া হয়ে যাবার পর কয়েক হফতার মধ্যেই আমরা ইংরেজদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো সমুদ্রের দিকে। তুমি অযোধ্যার নওয়াবকে বুঝিয়ে দেবে যে, বর্তমান মুহূর্তে অযোধ্যাও উত্তর ভারতের আজাদি যুদ্ধ চলছে মহীশূরের ময়দানে। সেরিঙ্গাপটমেও তোমার খেদমতের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এ কাজ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এ কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি আমার আছে এবং আপনার এজাযত হলে আমি আজই রওয়ানা হয়ে যাবো।

ঃ না, তুমি কাল ভোরে রওয়ানা হয়ে যাবে এখান থেকে। আজ সন্ধ্যার ভিতরে আমি নওয়াব শুজাউদ্দৌলা ও হাফিজ রহমত খানের কাছে চিঠি লিখিয়ে তোমার হাতে দেবো। কিন্তু তোমায় খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। যতোক্ষণ আমাদের মধ্যে কোনো সাহায্য চুক্তি সম্পাদিত না হচ্ছে, ততোক্ষণ যেনো কেউ

না জানতে পারে আমাদের ইরাদার খবর। শাহজাদা টিপু তোমার লাখনৌ পর্যন্ত পৌঁছবার বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

পরদিন ভোরে মোয়াযযম আলী পাঁচজন সওয়ার সাথে নিয়ে চললেন লাখনৌয়ের পথে।

৪

অযোধ্যার নওয়াব উজির তার মহলের এক কামরায় উপবিষ্ট। তার বেটা আসফুদ্দৌলা কামরায় প্রবেশ করে বললেন ঃ আব্বাজান, এ সেই মোয়াযযম আলী যিনি দশ বারো বছর আগে লাখনৌয়ে তেজারত করতেন এবং পানিপথের যুদ্ধে বাহাদুরীর জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। আমি তাকে বললাম যে, এ সময়ে আপনি মোলাকাত করতে পারবেন না, কিন্তু তিনি খুব পীড়াপীড়ি করে বললেন যে, তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছেন মহীশূরের হায়দার আলীর কাছ থেকে এবং তার মোলাকাতের সাথে অযোধ্যার ভবিষ্যতেরও রয়েছে গভীর সংযোগ। আপনি এজাযত দিলে আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। কোনো জরুরি ব্যাপার রয়েছে মনে হয়। সিপাহী তাকে মোলাকাতের কামরায় প্রবেশের এজাযত দেবার আগেই দেখে নিয়েছে যে, তিনি সশস্ত্র নন।'

নওয়াব শুজাউদ্দৌলা বললেন ঃ সেই মোয়াযযম আলী হলে আমি তাকে অবশ্যি দেখা দেবো। তাকে নিয়ে এসো।'

আসফুদ্দৌলা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন মোয়াযযম আলীকে সাথে নিয়ে। মোয়াযযম আলীর সালামের জওয়াবে শুজাউদ্দৌলা কুরসিতে বসে বসে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়ালেন তার দিকে, কিন্তু মোয়াযযম আলী ভ্রূক্ষেপই দিলেন না সে দিকে। আসফুদ্দৌলা বাপের পাশে বসতে বসতে মসনদের সামনে খালি কুরসিতে বসতে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ তশরিফ রাখুন।' কিন্তু মোয়াযযম আলী বলে উঠলেন ঃ আমি আপনাদের সময় নষ্ট করবো না।' আমার আফসোস, অসময়ে আমি আপনাদের তকলিফ দিয়েছি। আমার কথা বলতে সেরেফ কয়েক মিনিট সময় লাগবে। লাখনৌ পৌঁছেই আমি জানতে পেলাম একটা ভয়াবহ খবর। আপনি কি সত্যি সত্যি ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে রোহিলাখণ্ডের উপর হামলা করেছেন?'

শুজাউদ্দৌলা পুত্রের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মোয়াযযম আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ প্রশ্নের জওয়াব মালুম করবার জন্য তোমার এখানে আসার

প্রয়োজন ছিলো না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ এ প্রশ্নের জওয়াবের জন্য আমি ওয়ারেন হেস্টিংসের দরবারে যেতে পারি না। আপনি অযোধ্যার ভবিষ্যতের আমানতদার, তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। মুসলমান হিসেবে অযোধ্যার জনগণের ও হুকুমাতের প্রতি আমার আকর্ষণ রয়েছে।'

শুজাউদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ অযোধ্যার ভবিষৎ সম্পর্কে তোমার পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি শুনবে যে, আমার এক বিস্তীর্ণ এলাকা অযোধ্যার শামিল করে ফেলেছি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ বিস্তীর্ণ এলাকা বলতে যদি আপনি রোহিলাখন্ড বুঝাতে চান, তা'হলে সেদিন সুদূর নয়, যেদিন অযোধ্যার বাচ্চা-বুড়ো সবাই আপনার এ ফয়সালার নিন্দা করবে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে রোহিলাখণ্ড আপনার রাজ্যের অংশ না হয়ে সেই নেকরেদের শিকারভূমিতে পরিণত হবে, যাদের হাত পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের শহীদানের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। আল্লাহর দিকে চেয়ে রোহিলাখণ্ডকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচান, নইলে শরাফত ও ইনসানিয়াতের দুশমনরা একদিন বিচরণ করবে দিল্লি ও অযোধ্যার বুকের উপর দিয়ে।

শুজাউদ্দৌলা তার ক্রোধ-সম্বরণ করে বললেন ঃ তুমি জানো, হাফিজ রহমত খান আমাদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করেছেন। তিনি আমাদের সাথে চুক্তি করেছিলেন যে, মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করলে তার বিনিময়ে তারা আমাদেরকে দেবেন চল্লিশ লাখ টাকা। গত বছর যখন মারাঠা হামলা করলো রোহিলাখন্ডের উপর, তখন চুক্তি মোতাবেক আমরা তাদের সাহায্যের জন্য ফউজ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মারাঠার হাত থেকে নাজাত হাসিল করার পর তারা আমাদেরকে চল্লিশ লাখ টাকা না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ কিন্তু আমি শুনেছি, হাফিজ রহমত খান যুদ্ধ হলে এ অর্থ দেবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু মারাঠারা যুদ্ধ না করেই চলে গেছে। তথাপি যদি আপনি রোহিলাদের কাছে অর্থ দাবি করেন, তার জন্য রোহিলাখণ্ডের উপর হামলা করা কোনো মতেই উচিত হবে না। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে বিরত করুন এবং রোহিলাদের ইংরেজের সাথে বোঝাপড়া করতে দিন। রোহিলাদের কাছ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা আপনাকে আদায় করার জিম্মা আমি নিচ্ছি। আমি হাফিজ রহমত খানের কাছে যেতে প্রস্তুত। আমার বিশ্বাস, চল্লিশ লাখ টাকার বিনিময়ে তিনি আপনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া পছন্দ করবেন না। যদি ওখান থেকে আমি বিফল হয়ে ফিরে আসি,

তথাপি আমি ওয়াদা করছি, আপনার প্রাপ্য প্রতিটি কড়ি আদায় করে দেওয়া হবে। আমি হায়দার আলীর কাছে যাবো এবং বারো বছরের সাহচার্যর পর যদি আমি তাঁকে ভুল না বুঝে থাকি, তা'হলে দুই মুসলিম শক্তির মধ্যে বিরোধ দূর করবার জন্য তিনি চল্লিশ লাখ টাকা কোরবান করতে কুণ্ঠিত হবেন না।'

শুজাউদ্দৌলা বললেন ঃ তুমি বহুত দেরিতে এসেছো। ইংরেজদের আমরা চল্লিশ লাখ টাকা আদায় করে দিয়েছি। আমাদের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই রোহিলাখণ্ডে প্রবেশ করেছে এবং দু'তিন দিনের মধ্যে মীরণপুর কাটরায় উড্ডীন হবে আমাদের বিজয় পতাকা। এখন আমার কিছু করবার উপায় নেই। তীর-ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে এবং যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব হাফিজ রহমত খানের।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি জানি না, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক কার উপর এ যুদ্ধের দায়িত্ব আরোপ করবেন, কিন্তু এ কথা যদি সত্যি হয় যে, আজ ইংরেজ চল্লিশ লাখ টাকার বিনিময়ে রোহিলাখন্ড আপনার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে, তাহলে কাল কানাকড়ির বিনিময়ে তারা লাখনৌয়ের আজাদি বিক্রি করবে অপরের কাছে। এদেশের বিরুদ্ধে ইংরেজের সংকল্প সম্পর্কে যদি আপনার কোন ভুল ধারণা থাকে, তা'হলে পলাশী ও বক্সারের ঘটনাপ্রবাহের পর তা দূর হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিলো। রোহিলাখণ্ডের উপর বিজয় আপনাদের উপর নয়, সে বিজয় হবে বিদেশি সম্রাজ্যবাদী শক্তির, যারা তাদের পথ খোলাসা করতে চাইছে দিল্লি পর্যন্ত।

আসফুদ্দৌলা রাগে কাঁপতে লাগলেন এবং নওয়াব শুজাউদ্দৌলার সহনশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো। তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা মনে করেছিলাম, তুমি এসেছো নওয়াব হায়দার আলীর কোন জরুরি পয়গাম নিয়ে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ এখন হায়দার আলীর তরফ থেকে কোন পয়গাম প্রয়োজন নেই আপনার। এদেশে কে আপনার দোস্ত আর কে আপনার দুশমন, তা' আপনাকে বুঝাবার সাধ্য হায়দার আলীর নেই। যা হিংস্র বর্বরতার আগুন হায়দার আলী সাত সমুদ্রের ওপারে রাখতে চেয়েছিলেন, তা' আজ লাখনৌয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে পৌছে গেছে।'

আসফুদ্দৌলা বললেন ঃ তুমি এখন কি চাও?'

ঃ কিছু না।' মোয়াযযম আলী বেদনাভারাক্রান্ত আওয়াজে বললেন ঃ এখন আমি শুধু এই দোআই করছি, খোদা যেনো এ কওমকে তা বড়ো বড়ো লোকদের ত্রুটি ও বিভ্রান্তির শাস্তি না দেন। এবার আমায় এজাযত দিন। বলে মোয়াযযম আলী কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আসফুদ্দৌলা পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আব্বাজান, এ'র সম্পর্কে আপনার কি হুকুম? এজাযত হলে ওকে গ্রেফতার করা যেতে পারে।'

শুজাউদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ না, ওকে গ্রেফতার করবার আগে আমি জানতে চাই, হায়দার আলী কি মকসাদ নিয়ে ওকে পাঠিয়েছিলেন এবং লাখনৌতে তার সাথী আর কে কে রয়েছে। আমরা রোহিলাখণ্ডে ফউজ পাঠাতে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে তা গোপন রেখেছি, কিন্তু শহরের লোককে কে এ খবর জানালো, ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি। তুমি এ নওজোয়ানের উপর কড়া নজর রেখো।'

মোয়াযযম আলী মহল থেকে বেরিয়ে গেলেন সরাইখানায়। সেখানে তার সাথীরা রয়েছেন। সরাইখানার দরজায় এক সাথী তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ বলুন কোনো কামিয়াবীর খবর আছে কি?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমাদের কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

মোয়াযযম আলীর বিষণ্ন মুখভার লক্ষ্য করে সাথীদের আর কোনো প্রশ্ন করবার সাহস হলো না। খানিকক্ষণ পর তারা সবাই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চললেন রোহিলাখণ্ডের পথে।

এক ঘন্টা পর আসফুদ্দৌলা দ্রুতপদে পিতার কাছে হাজির হয়ে বললেন ঃ আব্বাজান, আমার গুপ্তচর ফিরে এসেছে। মোয়াযযম আলী ও তার পাঁচজন সাথী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং তারা চলেছেন রোহিলাখণ্ডের দিকে। আপনার হুকুম হলে তাদের পেছনে সিপাহীদের একটি দল পাঠানো যেতে পারে।'

শুজাউদ্দৌলা জওয়াব দিলেন ঃ না, এখন রোহিলাখণ্ডে পৌঁছে ওরা আমাদের কোনো পেরেশানির কারণ হতে পারবে না। যুদ্ধ খতম হয়ে যাবে দু'একদিনের মধ্যেই। আমি কেবল লাখনৌয়ে ওদের কার্যকলাপের খবর জানতে চেয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে এলে আমি অবশ্যি ওদেরকে গ্রেফতার করতাম। এখন ওদের পথরোধ করার প্রয়োজন নেই আমাদের।'

এক সন্ধ্যায় মোয়াযযম আলী ও তার সাথীরা ঘন বনের পথ পাড়ি দিয়ে গিয়ে হাজির হলেন আকবর খানদের বস্তির ধারের উপত্যকায়। আকবর খানের গাঁয়ের দিককার পায়ে-চলা পথ গেছে এক টিলার উপর দিয়ে। মোয়াযযম আলী টিলায় তার সামনে আচানক এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেয়ে ঘোড়া থামালেন। সন্ধ্যার ম্লানিমা ছিন্ন করে আকবর খানের গাঁ থেকে উঠে আসছে এক দুরুস্পর্শ অগ্নিশিখা। মুহূর্তের জন্য মোয়াযযম আলীর শিরায় রক্তপ্রবাহ যেনো নিশ্চল হয়ে গেলো। আকবর খানের বস্তির আগে আরো দু'টি বস্তিতে জ্বলছে আগুন। এক লহমার ভিতরে হিংস্রতা, বর্বরতা ও জুলুমের এক বীভৎস দৃশ্য-পরিক্রমা ভেসে উঠলো মোয়াযযম আলীর চোখের সামনে। তার সাথীরা অন্তহীন পেরেশানি নিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। ভাঙ্গা আওয়াজে তিনি বললেন ঃ ওই যে আকবর খানের গাঁ। এখন ওখানে সম্ভবত দুশমন ছাড়া আর কেউ নেই। তোমরা এখানেই থাকো। আমি আসছি এখখুনি।

মোয়াযযম আলীর এক সাথী নজফ খান বললো ঃ আপনি কম-সে-কম একজনকে অবশ্যি সাথে নিয়ে যান।'

ঃ বহুত আচ্ছা। তুমিই আমার সাথে এসো।'

নজফ খানের সাথে টিলা থেকে নেমে প্রায় এক ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম করে মোয়াযযম আলী বললেন ঃ ঘোড়া আর আগে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি এখানে থেকে আমার অপেক্ষা করো। আমার কোনো বিপদ ঘটলে বন্দুকের আওয়াজ দিয়ে আমি তোমায় খবরদার করবো। ভোর পর্যন্ত আমি ফিরে না এলে তুমি বাকি সাথীদের নিয়ে ফিরে চলে যেয়ো। আমার ধারণা, বস্তির বাইরে অযোধ্যার অথবা ইংরেজ ফউজের কোনো দল তাঁবু ফেলেছে, নইলে আকবর খানের ঘরে আগুন জ্বলছে, অথচ সে এলাকার লোক পাগলের মতো ছুটছে না এদিকে, এটা এক অসম্ভব ব্যাপার।'

মোয়াযযম আলী তার ঘোড়াটি নজফ খানের কাছে সোপর্দ করে দিয়ে ছুটে চললেন গাঁয়ের দিকে। কিছুদূর চলবার পর তিনি শুনতে পেলেন গাঁয়ের অপরদিকে লোকের আওয়াজ। গাঁয়ের মাঝখানে আগুনের শিখা উঠছে ক্রমাগত আসমানের দিকে। আকবর খানের হাবেলী আগুনে পুড়ছে তা' বুঝতে মুশকিল হলো না তার। গাঁয়ের বাইরে কয়েকটা জায়গায় খাদ্যশস্যের স্তূপ আগুনে জ্বলছে, আবার কোথাও

কোথাও তখনো ক্ষেতে দাঁড়িয়ে আছে ফসল। মোয়াযযম আলী আলো এড়িয়ে গমের ক্ষেতে নিচু হয়ে চলতে চলতে গেলেন গাঁয়ের অপরদিকে।

খানিকক্ষণ এই বিস্তীর্ণ ময়দানে তিনি দেখতে পেলেন ফউজের তাঁবু। গাঁ থেকে আগুনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে বহু দূরে দূরে। শিবিরের মাঝখানে কয়েকটি খিমা এবং একটা টিলার উপরে বাঁধা রয়েছে ঘোড়া। এক জায়গায় ফউজের জন্য তৈরি হচ্ছে খানা। কতক সিপাহী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গল্প করছে জমিনের উপর বসে। বাকি সিপাহীরা গাঁয়ের দিকে জমা হয়ে দেখছে আগুনের দৃশ্য। এরা অযোধ্যার ফউজ।

মোয়াযযম আলী গমের এক ক্ষেতের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছলেন সিপাহীদের একটি দলের কাছে। অযোধ্যার সিপাহীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন ইংরেজ সিপাহী। আগুনের রোশনিতে তাদের মুখ লাল হয়ে উঠছে। মোয়াযযম আলী তাদের কথা শুনবার জন্য কাছে যেতে চান, কিন্তু গমের ক্ষেতের আগে কোনো লুকোবার জায়গা নেই। সিপাহী দলের কাছেই তাঁর নযরে পড়লো দুটো তোপ।

পাহারাদারদের একটি দল টহল দিয়ে ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। মোয়াযযম আলী ক্ষেতের কিনার থেকে সরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এক সিপাহী তার সাথীদের বললো ঃ এখন এ এলাকার লোক আর স্বপ্নেও কোনো ইংরেজের গায়ে গুলি করবে না।'

দ্বিতীয় আর একজন বললো ঃ তুমি জানো না তাদেরকে। এরা মরবার সময় পর্যন্ত কোনো দুশমনকে মাফ করে না। ওদের সরদারকে দেখনি? বাঁধা অবস্থায়ও সে ইংরেজ অফিসারকে গাল দিচ্ছিলো।

তৃতীয় সিপাহী বললো ঃ সে তো অযোধ্যার নওয়াবকেও গাল দিচ্ছিলো। তার খান্দানের লোকদের ভাগ্য, ওরা হামলার আগেই সরে পড়েছিলো, নইলে কারুর আর জিন্দাহ বাঁচতে হতো না।

চতুর্থ বললো ঃ কিন্তু আমার এখনো বিশ্বাস, যারা ইংরেজদের গুলি করেছিলো, তারা ভোর পর্যন্ত তাদের সরদারের জান বাঁচাবার জন্য আপনি এসে ধরা দেবে।'

ঃ কিন্তু যদি তারা ধরা না দেয়?'

ঃ তাহলে কাল ভোরে ফাঁসি দেওয়া হবে। তারপর ওদের প্রতিটি বস্তিরই এক অবস্থা হবে।'

ঃ কিন্তু এ জুলুম।'

ঃ জুলুম আবার কি? এদের ধ্বংসের দায়িত্ব এদেরই।'

পাহারাদার দূরে চলে গেলো মোয়াযযম আলী তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চললেন। খানিকক্ষণ পর তিনি ক্ষেতের বাইরে গিয়ে ছুটে চললেন দ্রুতগতিতে।

৪

মোয়াযযম আলী পায়ে চলা পথের উপর এসে এদিকে-ওদিক তাকাতে লাগলেন, কিন্তু নজফ খানকে দেখতে পেলেন না কোথাও। নজফ খানের নাম ধরে তিনি চাপা আওয়াজে ডাকলেন। তারপর কোনো দিক থেকে সাড়া না পেয়ে ভাবলেন, বুঝি অন্ধকারে, পথ ভুলে আর কোথাও এসে পড়েছেন। পেরেশানি, উদ্বেগ ও কুণ্ঠায় অভিভূত হয়ে তিনি দাঁড়ালেন পথের উপর। অচানক কার যেনো আওয়াজ এলো তার কানে ঃ হাতিয়ার ছুঁড়ে ফেলো। তুমি এখন আমাদের বন্দুকের নাগালের ভিতরে।

মোয়াযযম আলী স্বস্তি পেয়ে জওয়াব দিলো ঃ তোমরা ইংরেজ বা অযোধ্যার ফউজের সিপাহী না হলে আমায় তোমাদের বন্ধু মনে করতে পারো।'

ঃ আগে তোমার হাতিয়ার ছুঁড়ে ফেলো। কাউকেও বিশ্বাস করতে পারি না আমরা।'

মোয়াযযম আলী বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে বললো ঃ যদি তোমরা আকবর খানের সাথী হয়ে থাক, তাহলে তোমরা সময়ের অপচয় করছো।'

পাঁচজন লোক বন্দুক সোজা করে ক্ষেতের আলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মোয়াযযম আলীকে ঘিরে ফেললো। একজন এগিয়ে এসে তার বন্দুকটা তুলে নিলো।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি আকবর খানের দোস্ত। আমার সাথীরা কোথায় তাই আমি জানতে চাই।'

একটি লোক বললো ঃ আকবর খানের কোনো দোস্ত এমনি সশস্ত্র হয়ে এ এলাকায় আসে না। তোমার সাথীরা এখানে থাকলে এখন তারা আমাদের হাতে বন্দী আর যদি বনের ধারে টিলার উপর তোমার চারজন সাথীকে রেখে এসে থাক, তাহলে তারাও আমাদের হাতে বন্দী।

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার নাম মোয়াযযম আলী এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আকবরের গাঁয়ের লোক থাকে, তাহলে আমি প্রমাণ দিতে পারি যে, আমি তার দোস্ত।'

ঃ রোহিলখণ্ডের লোক ছাড়া আর কাউকেও আমরা আকবর খানের দোস্ত মনে করি না। তুমি চলো আমাদের সাথে।'

ঃ তোমাদের সাথে যেতে আমি রাজি, কিন্তু তার আগে আমি আকবর খানের খান্দানের লোকদের অবস্থা জানতে চাই। এখন তার মা বিবি বাচ্চারা কোথায়?'

একটি লোক বস্তির দিকে ইশারা করে বললো ঃ আকবর খানের মা ও তার খান্দানের কয়েকজনের লাশ ওই বাড়ির ভিতরে জ্বলছে। কিন্তু তুমি আকবর খানের কথা জিজ্ঞেস করলে না তো?'

ঃ আকবর খানের সম্পর্কে আমি জানি যে, তিনি এখন দুশমনের কয়েদখানায় বন্দী। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি তার বিবি-বাচ্চাদের কথা বলো।'

ঃ তার বিবি-বাচ্চারা সালামত রয়েছেন, কিন্তু তোমার সাথীরা তো বললো যে, তোমরা মহীশূর থেকে লাখনৌয়ের পথে এসেছো। তাহলে আকবর খান বন্দী হয়েছেন তা জানলে কি করে?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেনঃ আমি এইমাত্র দুশমন ফউজের তাঁবু দেখে এলাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পারছি না। খোদার ওয়াস্তে আমায় আকবর খানের বিবির কাছে নিয়ে চলো। তিনি আমায় চেনেন।'

ঃ চলো।'

ক্ষেতের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে প্রায় দুমাইল বনের পথ চলবার পর লোকগুলো এক জায়গায় থেমে পড়লো। বনের পাহারাদারদের একজন গাছপালার ভিতর থেকে বললো ঃ কে ওখানে?'

মোয়াযযম আলীর এক সাথী জওয়াব দিলো ঃ আমি নিয়ামত খান। আমার যে কয়েকজন কয়েদি পাঠিয়েছিলাম, তারা পৌঁছে গেছে তো?'

পাহারাদাররা বললো ঃ তারা পৌঁছে গেছে কিন্তু আপনাদের একটা বড়ো ভুল হয়ে গেছে। ওরা কয়েদি নয় আর তাদের এক সাথী পিছনে রয়ে গেছেন। তিনি কোথায়?'

ঃ আমাদের সাথে।'

ঃ তাকে আগে নিয়ে যান।'

অন্ধকারে ঘন বনের পথে আরো কিছুদূর চলবার পর মোয়াযযম আলী এক জায়গায় দেখলেন রোশনী। একটি লোক মশাল উঁচু করে ঘন গাছপালার ঝোপ থেকে বেরিয়ে মোয়াযযম আলীর কাছে গিয়ে বললো ঃ আপনি মোয়াযযম আলী?'

ঃ জী, হ্যাঁ, তিনি জওয়াব দিলেন।'

ঃ মাফ করবেন। আমাদের লোকগুলোর বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আপনার সাথীরা তাদের কর্তব্য করেছেন। আকবর খানের বিবি-বাচ্চারা কোথায়?'

কাছের এক জায়গা থেকে হাহাকার, চাপা কান্না ও চিৎকার ধ্বনির ভিতর দিয়ে আওয়াজ এলো। ঃ ভাইজান আমি এখানে।'

আর এক মুহূর্ত পরে বিলকিস অন্ধকার থেকে বেরিয়ে মোয়াযযম আলীর

সামনে এসে দাঁড়ালেন। মোয়াযযম আলী তার কম্পিত হাত তার মাথায় রেখে বললেন ঃ বিলকিস এখন কথা বলবার সময় নয়। ভাইরা, এ বনের মধ্যে হাতিয়ার ধরবার মতো কতো লোক রয়েছে?

এক ব্যক্তি জওয়াব দিলো ঃ আশপাশের তামাম আবাদি জমা হয়েছে এ বনের মধ্যে, কিন্তু লড়নেওয়ালা যারা ছিলো তাদের কতক প্রাণ দিয়েছে মীরণপুর কাটরার যুদ্ধে, আর কতক শহীদ হয়েছে বস্তি হেফাজত করতে গিয়ে। ভোর পর্যন্ত ইংরেজ ও অযোধ্যার সিপাহীরা আমাদেরকে ঘিরে ঘিরে পাঠাবে মওতের দেশে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ যদি এই মুহূর্তে তিন চারশ লোক আপনার জান নিয়ে খেলবার জন্য তৈরি হয়ে যেতে পারে, তাহলে তেমন ভোর কখনো আসবে না। আমার অনুমান দুশমনের তাঁবুতে চার পাঁচশ লোকের বেশি নেই।'

একটি লোক সামনে এগিয়ে এসে মোয়াযযম আলীর বুকে বুক মিলিয়ে বললেন ঃ এই পরাজিত লোকদের প্রয়োজন ছিলো এক পথের দিশারী নেতার। আল্লাহ আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন আপনাকে। এখানে কম-সে-কম একশ লোক এমন রয়েছে যারা পানিপথের ময়দানে আপনার সাথে ছিল। আপনি যদি আমাদেরকে নেতৃত্ব দেন, তাহলে এক হাজার লোক আপনার সাথে জান বাজি রেখে লড়তে তৈরি। আকবর খানকে দুশমনের হাতে রেখে যেতে পারি না কোথাও।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তোমরা এখুনি সব লোক জমা করো। আমরা দুপুর রাতে এখান থেকে রওয়ানা হবো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে বনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত মশহুর হলো পানিপথের বাহাদুর সিপাহীর আগমনবার্তা। বুড়ো-জোয়ান ও ছোট ছোট বাচ্চারা এসে জমা হতে লাগলো মোয়াযযম আলীর পাশে। এমন অনেক লোক এলো যারা তেরো বছর আগে পানিপথের ময়দানে শৌর্য দেখিয়েছে মোয়াযযম আলীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মোয়াযযম আলী তাদেরকে জরুরি নির্দেশ দেবার পর এক গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসে শুনতে লাগলেন রোহিলাখণ্ডের যুদ্ধ এবং বস্তির উপর হামলার বিস্তারিত বিবরণ।'

আকবর খানের গাঁয়ের একটি লোক তাকে বললো ঃ অযোধ্যা ও ইংরেজ ফউজের সিপাহীরা বিভিন্ন স্থান থেকে রোহিলাখণ্ডের সীমানার মধ্যে ঢুকে এগিয়ে এসেছে মীরণপুর কাটরার দিকে। আকবর খান নিজ নিজ এলাকার এক হাজার জোয়ান সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন হাফিজ রহমত খানের সাহায্যের জন্য। তাদের রওয়ানা হবার দুদিন পর অযোধ্যা থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কয়েকটি সেনাদল এসে প্রবেশ করলো এ এলাকায়।

বস্তি হেফাজত করবার মতো যথেষ্ট লোক ছিলো না আমাদের। তাই আমরা ফয়সালা করলাম দুশমন আমাদের বস্তিতে প্রবেশ না করলে আমরা তাদেরকে কোনো বাধা দেবো না। কিন্তু অযোধ্যার ফউজ এ এলাকার লোকদের ভয় দেখাবার জন্য আমাদের গাঁয়ে প্রবেশ করলো। গাঁয়ের লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এসে জমা হতে লাগলো আকবর খানের হাবেলীতে। অযোধ্যার কমাণ্ডার আমাদের কাছে দাবি করলো, গাঁয়ের লোক তাদের হাতিয়ার সমর্পণ করলে এবং সরদারের বাড়িতে তালাশি নিতে দিলে তাদের উপর কোনো কাঠোর আচরণ করা হবে না। দুশমনদের বিশ্বাস ছিলো আমরা তাদের হুমকিতে ভয় পেয়ে যাবো, কিন্তু আমরা জওয়াব দিলাম, আকবর খানের ঘরে ঢুকতে হলে আমাদের লাশ মাড়িয়ে যেতে হবে। এক ইংরেজ গর্বভরে হাবেলীর দরজার উপর হাওয়াই গুলি করলো। তার জওয়াবে আমরা গুলি চালিয়ে দিলাম এবং চোখের পলকে দশ পনরো জন সিপাহী সেখানে লুটিয়ে পড়লো। যুদ্ধ এমনি করে হালকা হলো, তাদের মধ্যে দুজন ছিলো ইংরেজ। এক ইংরেজ জখমী হয়ে তার ঘোড়াকে পিছন দিকে হাঁকালো। অযোধ্যার সিপাহীদের কাছে এ পরিস্থিতি ছিলো অপ্রত্যাশিত এবং তারা এবার ছুটে পালালো। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে বেশি ছিলো না, কিন্তু আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করা ঠিক মনে করলাম না।'

'তারপর আমাদের কাছে এলো মীরণপুর কাটরার ময়দানে আমাদের ফউজের পরাজয় ও হাফিজ রহমত খানের পরাজয়ের খবর। আমাদের এলাকার চারশ নওজোয়ান শহীদ হলো আর বাকি লোক ফিরে এলো আকবর খানের সাথে।'

'তিনদিন পর খবর এলো যে, অযোধ্যার সিপাহীদের কয়েকটি দল কিছুসংখ্যক ইংরেজ সিপাহী সাথে নিয়ে আসছে এ গাঁয়ের দিকে। সরদার রাতারাতি গাঁয়ের সব নারী ও শিশুকে পাঠালেন বনের দিকে। আরো শুনলাম ফউজের নেতৃত্ব করছে সেই ইংরেজ অফিসার যে এখান থেকে জখমি হয়ে ফিরে গিয়েছিলো। সে সরদার আকবর খানকে পয়গাম পাঠালো : যদি তুমি ইংরেজ অফিসারদের হত্যাকারীদের আমাদের হাতে তুলে দাও, তাহলে তোমার ভালাই, নইলে তোমার বাড়ি-ঘর পরিণত করা হবে ভস্মস্তূপে।'

'লড়াই শুরু হয়ে গেলো। ইংরেজরা তিনবার হাবেলীর উপর হামলা চালাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রতিবারই আমাদের গুলিবৃষ্টির ভিতর দিয়ে পিছিয়ে যেতে হলো তাদেরকে।'

'পরদিন ওদের দুটো তোপ পৌঁছে গেলো এবং তারা গাঁয়ের উপর আগুনবৃষ্টি করতে শুরু করলো। তৃতীয় প্রহরের মধ্যে গোটা গাঁ পরিণত হলো আবর্জনা স্তূপে। আকবরের তিন চাচাজাদ ভাই ও দুই মামুজাদ ভাই মারা গেলেন। তার মা অন্য লোকদের সাথে না গিয়ে বেটার সাথে সাথে থাকলেন এবং জখমিদের মুখে

পানি দিতে দিতে শহীদ হলেন। আকবর খানের হাবেলীর মুহাফিযদের বাইরে থেকে অবরোধ করে রাখা হলো এবং তারা হাবেলীর ভিতরে খুব দ্রুত আগুনের শিখার মধ্যে চলে যেতে লাগলো। কয়েকটি ঘোড়া বাঁধা ছিল হাবেলীর ভিতরে কিন্তু সরদারের সাথীদের সংখ্যা ছিলো একশ থেকেও বেশি। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেযাবাজদের তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হবার হুকুম দিলেন। তারপর হাবেলীর দরজা খোলা হলো এবং সওয়ারদের সাথে নিয়ে বেরিয়ে গাঁয়ের দক্ষিণে দুশমনের সারির উপর হামলা করলেন। বাকি লোকও বেরিয়ে এলো তার পিছু পিছু। চারজন সওয়ার শহীদ হলো দুশমনের গুলিতে। আকবর খানের ঘোড়ার পায়ে গুলি লাগলে তিনি পড়ে গেলেন। আমার সাথে পনরোজন লোক এগিয়ে গিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তিনি ছিলেন তখন বেহুঁশ। আকবর খানকে সেই অবস্থায় ফেলে যেতে আমরা পারলাম না। তাই আমরা আমাদের হাতিয়ার ছুঁড়ে ফেললাম। দুশমনরা আমাদেরকে গ্রেফতার করলো। বাকি লোকদের কতক হলো জখমি আর কতক শহীদ, আর কতক লোক লড়াই করে বেরিয়ে গেলো। খানিকক্ষণ পর আকবর খানের হুঁশ ফিরে এলে এক ইংরেজ অফিসার তাকে বললো : যদি তুমি তোমার গোষ্ঠীর তামাম লোককে জমা করে আমাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দাও এবং ইংরেজ অফিসারের হত্যাকারীদের আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমায় রেহাই দেওয়া যাবে। নইলে কাল তোমার হবে ফাঁসি। আকবর খান জওয়াব দিলেন : তোমরা আমায় কতল করতে পারবে কিন্তু নীচতার স্তরে নামাতে পারবে না। ইংরেজ অফিসারকে আমি বললাম : যদি আপনারা আমায় ছেড়ে দেন তাহলে কাল পর্যন্ত আমি এ এলাকার তামাম বিশিষ্ট লোককে এখানে হাজির করবার জিম্মা আমি নিচ্ছি।" আমায় ছেড়ে দেবার সময়ে তারা বললো : ওয়াদা খেলাফ করলে আকবর খানের সাথে তোমার বাকি সাথীদেরও দেওয়া হবে ফাঁসি। আকবর খান আমায় ভাৎসনা করলেন গাদ্দার ও বুযদীল বলে। হায় আমি যদি তার কানের কাছে বলতে পারতাম যে, তারই জন্য আমি করেছি সবকিছু।

'আপনার আসার আগেই আমি ইরাদা করেছি রাতেরবেলায় দুশমনের তাঁবুতে হামলা করার। প্রায় তিনশ লোক রাজি হয়েছে আমার সাথে যেতে কিন্তু আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা মনে হয়েছে সুদূর। আমার এবার একিন হচ্ছে, আল্লাহ আপনাকে অকারণে পাঠাননি এখানে। আপনি আসার আগে আমার আবেদনের জওয়াবে অনেকেই নারী ও শিশুদের ছেড়ে যেতে দ্বিধা করেছে, কিন্তু এখন তাদের নারী ও শিশুরাই আপনার সাথে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

একটি কমবয়সী বালক মোয়াযযম আলীর হাত ধরে বললো : আমিও যাবো

আপনার সাথে।'

মোয়াযযম আলী তাকে টেনে কোলে বসাতে বসাতে শুধালেন ঃ বেটা তোমার নাম কি?'

ঃ শাহবাজ।' বালক বললো।

পিছন থেকে এলো বিলকিসের আওয়াজ ঃ শাহবাজ উদ্দিন তোমার চাচাজান।'

৫

অযোধ্যার সিপাহী ও তাদের ইংরেজ সাথীরা রাত দুটোর সময় জেগে উঠলো পাহাদারদের ডাক-চিৎকার বন্দুকের আওয়াজ ও হামলাদারদের ধ্বনি শুনে। দেখতে দেখতে তাঁবুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো বিশৃংখলা। হামলাদাররা তিনদিক থেকে তাঁবুতে ঢুকে শুরু করেছে পাইকারী হত্যা। অযোধ্যার সিপাহীরা অন্ধকারে মনে করছে যেনো রোহিলাখণ্ডের তামাম বাসিন্দা মিলিতভাবে হামলা করছে তাঁদের তাঁবুর উপর। অফিসারদের কেউ সিপাহীদের সারিবদ্ধ করছে, আবার কেউ তাদেরকে পালাবার হুকুম দিচ্ছে। বিশৃংখলার ভিতর অযোধ্যার কতক সিপাহী মারা গেলো আপন লোকের হাতে। দক্ষিণ-পূর্ব দিক ছাড়া সবদিকেই তাদের নজরে আসছে শুধু হামলাদারদের সারি। বেশিরভাগ সিপাহী বেরিয়ে গেলো সেদিক দিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে শুরু হলো সিপাহীদের সাধারণভাবে পশ্চাদপসরণ, কিন্তু প্রায় দুই ফার্লং ক্ষেতের ভিতর থেকে আসতে লাগলো বেপরোয়া গুলি এবং তারা সেদিক থেকেও পিছু হটতে লাগলো। সাথে সাথেই প্রায় দুশো লোক নেযা-তলোয়ার নিয়ে হামলা চালালো তাদের উপর। কতক সিপাহী পিছনের টিলার উপর দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু টিলার উপর দিকটা তখন হামলাদারদের দখলে।

আকবর খান ও তাঁর সিপাহীরা বন্দী অবস্থায় পড়েছিলেন ইংরেজ সিপাহীদের খিমার কাছে। অযোধ্যার যেসব সিপাহীর হেফাজতে তারা ছিলেন অসীম উদ্বেগের অবস্থায় তারা প্রশ্ন করলো ঃ এ কারা? এরা কোত্থেকে এলো?' এরা কেমন আচরণ করবে আমাদের সাথে?'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ তোমাদের পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হলো খানিকক্ষণ পর তা তোমারা জানতেই

পাবে না।

অযোধ্যার ফউজের এক অফিসার ছুটে এসে পাহারাদারকে প্রশ্ন করলো কয়েদিরা কোথায়?

ঃ কয়েদি এখানে।' এক পাহারাদার জওয়াব দিলো ঃ তাদের সম্পর্কে আপনার কি হুকুম?'

অফিসার জওয়াব না দিয়ে এগিয়ে এসে অন্ধকার বিস্ফারিত চোখে কয়েদীদের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ সরদার আকবর খান! এ হামলার জিম্মাদারী তোমার উপর পড়বে। আমাদের সালার ও ইংরেজ অফিসাররা অবিলম্বে তোমায় কতল করবার ফয়সালা করছেন।'

আকবর খান প্রশান্তভাবে জওয়াব দিলেন ঃ আমায় কতল করেও তোমাদের জান বাঁচবে না।'

ঃ কিন্তু তুমি যদি এ পাইকারী হত্যা বন্ধ করবার ওয়াদা কর, তাহলে তোমায় আজাদ করে দিতে আমি রাজি।'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ আমি কোনো ওয়াদা করতে পারি না তোমার সাথে?'

অফিসার জলদি করে খনজর বের করে আকবর খানের হাত- পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে বললো ঃ এক বাহাদুর দুশমনের কাছ থেকে ওয়াদা নেবার দরকার নেই আমার।' তারপর সে সিপাহীদের লক্ষ্য করে বললো ঃ এসব কয়েদিকে আজাদ করে দাও। জলদি করো।

সিপাহীরা কয়েদিদের বাঁধন কেটে দিতে শুরু করলো।

আকবর খান উঠতে উঠতে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের হাতিয়ার আমাদের হাতে দিয়ে দাও এবং এখানেই বসে থাক।

নওজোয়ান অফিসার বললো ঃ যদি আপনি অযোধ্যার সিপাহীদের নিরাপত্তার ওয়াদা করেন, তাহলে আমরা হাতিয়ার সমর্পণ করতে রাজি।'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ লড়াই খতম হবার আগে আমি কোনো ওয়াদা করছি না।

অফিসার তলোয়ার বের করে আকবর খানের কাছে পেশ করলো এবং বাকি পাহারাদাররাও তাদের হাতিয়ার সমর্পণ করলো কয়েদিদের কাছে।'

কয়েদিরা যখন তলোয়ার-বন্দুক গুছিয়ে নিচ্ছেন, অমনি এক দিক থেকে আওয়াজ এলো ঃ কয়েদি কোথায়?'

ঃ কয়েদি এখানে।' আকবর খান জওয়াব দিলেন।

চাপা আওয়াজে অফিসার বললো ঃ এ আমাদের কমাণ্ডার।'

কমাণ্ডার পাঁচজন সিপাহী সাথে নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন ঃ আকবর খান ছাড়া আর সব কয়েদিকে ছেড়ে দাও আর তাদেরকে বলে দাও দশ মিনিটের মধ্যে হামলাদারদের ফিরে যেতে রাজি না করলে আকবর খানের গর্দান কাটা যাবে।'

আকবর খান এগিয়ে গিয়ে হামলা করলে কমাণ্ডার একটুখানি চিৎকার দিয়ে গড়িয়ে পড়ালেন জমিনের উপর। কমাণ্ডারের সাথীরা তাদের ভীতি সংযত করবার আগেই দ্বিতীয় আঘাতে আকবর খান আর একজনকে শেষ করে দিলেন।

বাকি কয়েদিরা আর সবাইর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে পাঠিয়ে দিলো মৃত্যুর দেশে। ইতিমধ্যে তাঁবুর চারদিকে হামলাদারদের বেষ্টনী সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তথাপি তারা অন্ধকারে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াবার জন্য দুশমনের সাথে তীব্র সংঘর্ষের পরিবর্তে কেবল বিক্ষিপ্ত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। হামলাদারদের একটি দল তীব্র হামলার পর এসে পৌঁছলো ইংরেজদের খিমার কাছে।

যে অফিসার কয়েদিদের রেহাই দেবার হুকুম দিয়েছিলো আকবর খান তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এখন তুমি আমাদের সাথী। এক অফিসারকে আমি তার নিজের সিপাহীদের সাথে লড়তে বলতে পারি না। কিন্তু তুমি তাদেরকে হাতিয়ার সমর্পণ করবার পরামর্শ দিয়ে বহু লোকের জান বাঁচাতে পারো।'

অফিসার ছুটে গেলো এবং চারদিক থেকে ছুটে আসা ফউজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললো ঃ কমাণ্ডার মারা গেছেন। দুশমনের সংখ্যা খুবই বেশি। তোমরা হাতিয়ার সমর্পণ করো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে অযোধ্যার সিপাহীরা তার সে পয়গাম একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দিলো। ইংরেজ সিপাহীদের খিমার আশপাশে তখনো চলছে তীব্র লড়াই। আকবর খান তার সাথীদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। তারা পলায়মান সিপাহীদের উপর হামলা করলেন পিছন দিক থেকে। কয়েকজনকে মৃত্যুর পথে পাঠিয়ে তারা পথ সাফ করে মিলিত হলেন হামলাদারদের সাথে। বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন ঃ আমি আকবর খান।

আকবর খানের এক আত্মীয় এগিয়ে এসে বললেন ঃ আকবর খান কোথায় ছিলে তুমি? সারা তাঁবুতে আমরা খুঁজে ফিরেছি তোমায়।

আকবর খান বললেন ঃ তোমার প্রশ্নের জওয়াব দেবার আগে আমি জানতে চাই, এ হামলার নেতৃত্ব করেছেন কে?'

কে যেনো অন্ধকারে এগিয়ে এসে আকবর খানকে বুকে চেপে ধরে বললেন

ঃ বলো তো আমি কে?'

আকবর খান বললেন ঃ আপনি যদি মোয়াযযম আলী হন, তাহলে আমি মনে করছি, আমি আমার জিন্দেগির ভয়ানক রাত্রে এক আজব স্বপ্ন দেখছি।'

লড়াই প্রায় খতম হয়ে এসেছে। ক্লান্ত সিপাহী এখানে-সেখানে হাতিয়ার রেখে বিশ্রামের আয়োজন করছে। মোয়াযযম আলী তামাম কমান্ডারকে এক জায়গায় জমা করবার ও মশাল জ্বালাবার হুকুম দিলেন। হামলাদারদের বিশজন জখমি আর সাতজন হালাক হয়ে গেছে। তাদের মোকাবিলায় অযোধ্যার ফউজের আশিজন হয়েছে হালাক আর দেড়শ জখমি। এরা ছাড়া অযোধ্যার পাঁচশ সিপাহীর মধ্যে মাত্র ত্রিশ চল্লিশ জন অন্ধকারে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, আর বাকি লোক বন্দী হয়েছে হামলাদারদের হাতে। হালাক হয়েছে যারা তাদের মধ্যে পাঁচজন ইংরেজ। দুজন ইংরেজের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এ গাঁয়ে এসেছে যে লেফটেন্যান্ট তাকেসহ বাকি দশজন ইংরেজও হয়েছে বন্দী হামলাদারদের হাতে।

মোয়াযযম আলী আকবর খানকে বললেন ঃ আমার হিসসার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমার গোষ্ঠী আর এখানে থাকতে পারবে না। বহুত জলদি এখান থেকে দূরে চলে যেতে হবে তাদেরকে। কয়েদীদের ব্যাপার ফয়সালা করবে তুমি অথবা তোমার গোষ্ঠীর লোকেরা।'

আকবর খান বললেন ঃ অযোধ্যার সিপাহীদের সম্পর্কে কোনো ফয়সালা করবার আগে আমার ইচ্ছা, ইংরেজদের আমার হাতে ন্যস্ত করে দেওয়া হোক।'

ঃ ওদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে চাও তুমি?'

ঃ তা আমি পরে বলবো। আপনার কাছে আমার অনুরোধ ওদের সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করবেন না আপনি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি তাদেরকে যুদ্ধবন্দী মনে করলে অবশ্যি তাদের সাথে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আচরণ করবার দাবিই করতাম তোমাদের কাছে, কিন্তু এই নেকড়ের জাতকে মানুষ বলে ভুল করবো না আমি। ওদের উপর পূর্ণ এখতিয়ার রইলো তোমার।'

আকবর খানের হুকুমে তার সহচররা লেফটেন্যান্ট ও তার সাথে আর সব ইংরেজ কয়েদিকে আলাদা করে নিলো অপর কয়েদিদের থেকে। তারপর তারা

খিমার রশি কেটে পরিয়ে দিলো তাদের গর্দানে। আকবর খানের সাথে আরো কয়েকটি লোক ইংরেজ কয়েদিদের ঘিরে চললো গাঁয়ের দিকে।

ইংরেজ লেফটেন্যান্ট চিৎকার করে বললো ঃ ফউজ শিগগিরই আসবে এদিকে। আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করলে তারা জিন্দাহ রাখবে না তোমাদের কাউকে।'

এক নওজোয়ান এগিয়ে গিয়ে তার তলোয়ারের মুখ তার গর্দানে রাখলে সে খামোশ হয়ে গেলো।

আকবর খান বললেন ঃ তোমাদের ফউজ আসবে তা আমি জানি, কিন্তু তারা শুধু আমাদের অসহায়তার দৃশ্যই দেখবে না।'

অপর এক ইংরেজ বললো ঃ সরদার সাহেব, আমাদেরকে ছেড়ে দিলে আমরা ওয়াদা করতে পারি যে, এ ইংরেজ এ এলাকায় কোনো বাড়াবাড়ি করবে না।'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ তোমাদের ওয়াদার সঠিকার মূল্যটা আমার বেশ জানা আছে।'

আরো কয়েক কদম চলবার পর লেফটেন্যান্ট বললো ঃ আপনারা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ এখনো এ প্রশ্নের জওয়াব তোমার প্রয়োজন দেখে আমি হয়রান হচ্ছি।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আকবর খানের বাড়ির সামনে আমগাছের এক মজবুত ডালের সাথে দশটি লাশ ঝুলতে দেখা গেলো। তিনি তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছেন সেই আগুনের ধ্বংসলীলা-যা তার জিন্দেগির অধিকাংশ সম্পদ ও হাসি-আনন্দকে ভস্মে পরিণত করেছে।

এদিকে হাবেলীর পাঁচিল তোপের গোলাবর্ষণে ভেঙ্গে পড়েছে। আকবর খান ও তার সাথীরা সেদিক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আঙিনায় কোথাও কোথাও পড়ে রয়েছে লাশ। আকবর খানের সাথীরা লাশ তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তিনি বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই কামরাটির দিকে, যেখানে এখনো ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেখানেই চাপা পড়ে রয়েছে তার মায়ের লাশ।

তার এক সাথী তাকে নাম ধরে আওয়াজ দিলে তিনি বেরিয়ে এলেন হাবেলী থেকে।

ভোরের আভাস যখন দেখা দিয়েছে তখনো রোহিলা শিবিরের লোকেরা সাথীদের লাশ দাফন করতে ব্যস্ত। অযোধ্যার ফউজের যে নওজোয়ান অফিসার রাতেরবেলা আকবর খানকে আজাদ করেছিলো কয়েদ থেকে, সে তার কাছে

এসে বললো ঃ আমাদের সম্পর্কে আপনি কি ফয়সালা করেছেন? জীবনের ভয়ে আমি এ প্রশ্ন করছি না। যেদিন মীরণপুর কাটরার ময়দানে আমার তলোয়ার এক বেগুনাহ মুসলমানের খুনে রাঙা হয়েছে সেদিনই আমার মৃত্যু হয়েছে। আত্মার মৃত্যু হলে তারপর দেহের মৃত্যুর আর কোনো বাস্তবতা থাকে না। কিন্তু এ সব লোকের মধ্যে বেশিরভাগই হয়তো জানে না এ দেশের মুসলমানের জন্য রোহিলাখণ্ডে পয়দা হলে হাফিজ রহমত খানের পক্ষেই তারা লড়াই করতো। ভালো-মন্দের অনুভূতি আমার ছিলো কিন্তু হয়তো এক আত্মজ্ঞান বঞ্চিত শাসকের সাথে জিন্দেগি জড়িয়ে ফেলেই হয়েছে আমার আত্মার মৃত্যু। তাই ওদের তুলনায় আমিই অধিকতর শাস্তির যোগ্য।'

আকবর খান মোয়াযযম আলীর দিকে তাকালেন এবং মোয়াযযম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন নওজোয়ান অফিসারের দিকে। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমার নাম কি?'

নওজোয়ান জওয়াব দিলো ঃ আমার নাম আব্দুল্লাহ।'

ঃ পানিপথের যুদ্ধে অযোধ্যার ফউজের এক সালার ছিলেন আমার সাথে। তার গঠন ছিলো ঠিক তোমারই মতো। সম্ভবত তার নাম ছিলো মুহাম্মদ উমর। আমি দুশমনের অনুসরণ করলে তিনি আমার সাথে ছিলেন এবং তিনি জান দিয়েছিলেন বাহাদুরেরই মত।'

আব্দুল্লাহ অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ তিনি ছিলেন আমার বাপ।'

আকবর খান মোয়াযযম আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ইনি আমায় ফউজের কমাণ্ডারের হাতে কতল হবার সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়েছেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ উমরের বেটা তুমি, আমায় তুমি দোস্ত মনে করো। আমার ইচ্ছা তুমি কমপক্ষে দুদিন এ সিপাহীদের এ এলাকায় রাখবার চেষ্টা করবে। এরই মধ্যে আমাদের নারী ও শিশুরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবার মওকা পাবে। এরপর তুমি এ এলাকার বস্তিগুলো খালি হয়ে গেছে বলে লাখনৌতে খবর পাঠাতে পারবে।'

আবদুল্লাহ জওয়াব দিলো ঃ লাখনৌয়ে কোনো খবর পাঠাবার প্রয়োজন হবে না আমার। আমি আর ফিরে যাবো না সে ফয়সালা আমি করে ফেলেছি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের যেসব লোক রাতেরবেলা পালিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে কতক অবশ্যি লাখনৌ পৌঁছে যাবে। সম্ভবত কতক লাখনৌর দিকে না গিয়ে চলে যাবে মীরণপুর কাটরার শিবিরে এবং সেখান থেকে ফউজের কয়েকটি দল রওয়ানা হয়ে আসবে এদিকে।'

ঃ এহেন অবস্থায়ও তাদের মনোযোগ অপরদিকে নিবদ্ধ রাখা তোমার পক্ষে মুশকিল হবে না। আমাদের জখমি, নারী ও শিশুদের এখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্য দু'দিন সময় পেলেই হবে যথেষ্ট।'

আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি চেষ্টা করবো, যাতে দুদিনের পরিবর্তে আপনারা দুহফতা সময় পান কিন্তু তারপরেও আমার মনজিল লাখনৌ হবে না। হয়তো আমার আরো কতক সাথী লাখনৌ ফিরে যেতে চাইবে না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমি তাদের সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি সেরিঙ্গাপটমে যাবার জন্য। আমার নাম মোয়াযযম আলী এবং আমায় তোমরা সহজেই খুঁজে পাবে সেরিঙ্গাপটমে। আকবর খান তুমি বেড়ো তৈরি করাও এবং এদের সব অস্ত্রশস্ত্র তোমার সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। কেবল আবদুল্লাহর হাতিয়ার ও ঘোড়া ফিরিয়ে দাও।

আবদুল্লাহ বললেন ঃ না, এই মুহূর্তে আমাদের এসব জিনিসের বড়ো বেশি প্রয়োজন হবে না।'

ঃ বহুত আচ্ছা, কিন্তু যাবার আগে আমি তোমার সাথীদের বলতে চাই কয়েকটি কথা। মোয়াযযম আলী কয়েদিদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কোনো রহম পাবার যোগ্য নও।' তোমাদের হাত রঙীন করেছো বেগুনাহ মানুষের বুকের রক্তে-তাদের একমাত্র অপরাধ, অযোধ্যার নিষ্ঠুর প্রাণহীন ও লোভী শাসকের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবার মতো অর্থ তাদের ছিলো না। তোমাদের শাসক রোহিলাখণ্ডের আযাদি-পাগল জনগণের গলা টিপে মারবার জন্য চল্লিশ লাখ টাকার বিনিময়ে ইংরেজের সাহায্য লাভ করেছে। কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইংরেজ তোমাদের বা অযোধ্যার শাসকের বন্ধু হয়ে এখানে আসেনি। নওয়াব শুজাউদ্দৌলা তাদেরকে দিল্লির দিকে আরো কয়েকটি মনজিল অতিক্রম করবার মওকা দিয়েছেন এবং তারা সেই মওকার ফায়দাই নিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করি যদি মারাঠা অথবা আর কোনো দুশমন অযোধ্যার মুসলমানদের ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার জন্য সেই ইংরেজকেই চল্লিশ লাখের বেশি টাকা দিতে রাজি হয়, তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? শুজাউদ্দৌলার ধারণা তিনি ইংরেজের সাহায্যে তার সালতানাতের সীমান্ত প্রসারিত করেছেন, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, তিনি ধ্বংস ও বরবাদীর সয়লাব এগিয়ে এনেছেন বাংলা থেকে লাখনৌয়ে। রোহিলাখণ্ড ছিলো উত্তর ভারতের সবচাইতে মজবুত কেল্লা। অযোধ্যার শাসক এ কেল্লা ভেঙে দিয়ে সাফ করে দিয়েছেন সেই বিদেশি হামলাদারদের পথ, যারা মোগল সালতানাতের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তুলতে

চাইছে তাদের আধিপত্যের ইমরাত। আহা! তোমরা যদি ইংরেজ হতে আর আমরা অন্তরের কোনো পীড়ন অনুভব না করেই ইংরেজ মুরুব্বীদের লাশের পাশে তোমাদের সবাইকে গাছের সাথে ফাঁসিতে ঝুলিয় দিতে পারতাম। কিন্তু যাদের বাড়িঘর তোমরা ভস্মস্তূপে পরিণত করছো তারা অন্তহীন বিলাপ এ প্রতিহিংসার আগুণে জ্বলেও অনুভব করছে যে, তোমরা মুসলমান। কয়েকটি মুদ্রার জন্য তাদের ইজ্জত ও আজাদির উপর হামলা করবার সময়ে তোমরা চিন্ত করোনি যে, তোমরা যাদেরকে কতল করেছো, তারা মুসলমান মায়ের সন্তান, মুসলমান বিধবার স্বামী, মুসলমান বোনের ভাই ও মুসলমান বাচ্চার বাপ। পানিপথের ময়দানে যারা জানবাজি রেখে তোমাদেরকে বাঁচিয়েছে মারাঠাদের গোলামী থেকে, তোমাদের দুশমন তারা নয়, বরং তোমাদের দুশমন সেই বিভ্রান্ত জাতিদ্রোহী শাসক-যে তোমাদের ভাবী বংশধরদের ইজ্জত ও আজাদির সওদা করে ফেলেছে। আমরা সবাই জানি যে, রোহিলাখণ্ডে রোজ কিয়ামত এসে গেছে, কিন্তু যেদিন এর চাইতেও ভীষণতর কিয়ামতের দৃশ্য তোমরা দেখতে পাবে লাখনৌয়ের অলি-গলিতে, সেদিন সম্পর্কে আমি খবরদার করে দিচ্ছি তোমাদেরকে।'

তোমরা আজাদ এবং তোমাদেরকে আজাদি দেওয়া হচ্ছে এই জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে দিতে চাই নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করার মওকা। তোমরা যেনো মিল্লাতের সেই দুশমনদের হাত থেকে নাজাত হাসিল করতে পারো, যারা কেটে দিয়েছে সেই বাহু; যা বিপদের মুহূর্তে তোমাদেরকে রক্ষা করবার জন্য উদ্যত হতে পারতো যারা জ্বালিয়ে দিয়েছে সেইসব ঘর, যা হতে পারতো তোমাদের প্রতিরক্ষা দুর্গ।'

লড়াই শেষ হতেই এক সওয়ার বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা লোকদের বিজয়ের খোশখবর দেবার জন্য রওয়ানা হয়ে এসেছে। আকবর খান ও তার সাথীরা সেখানে পৌছে দেখলেন, প্রায় চার হাজার নারী-শিশু ও বৃদ্ধ বনের বাইরে এসে তাকিয়ে রয়েছে তাদের পথের পানে। স্বামীকে দেখা মাত্রই বিলকিসের চোখ দুটি ভরে উঠলো কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে। ছোট্ট শাহবাজ খান 'আব্বাজান, আব্বাজান' বলে এগিয়ে এলো। আকবর খান ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বুকে তুলে নিলেন। তারপর তিনি বিলকিসের কাছে গিয়ে বললেন ঃ তানবীর কোথায়?'

বিলকিস জওয়াবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। অমনি একটি যুবতী এগিয়ে এসে বললেন ঃ তানবীর আমার কাছে?

আকবর খান শাহাবাজকে নিচে নামিয়ে দিয়ে তানবীরকে কোলে তুলে নিলেন।

মোয়াযযম আলী তাঁর ঘোড়াটিকে নামিয়ে একটি লোকের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এসে আকবর খানের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ এখন চিন্তা করবার বা কথা বলবার সময় নেই। আমাদেরকে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে এখখুনি। তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও, এদের ইরাদা কি।'

আকবর খান বললেন ঃ আমার খেয়াল ছিল আমাদের যেসব সাথী পায়দল আসছে, তারা পৌছলে সবাইর কাছে কথাটি পেশ করা যেতো।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তাহলে আমাদের বনের মধ্যে ইন্তেজার করাই ভালো হবে।'

ঃ বহুত আচ্ছা। আকবর খান তার গোষ্ঠীর লোকদের বললেন ঃ আপনারা সবাই বনের মধ্যে ফিরে যান। আমাদের বাকি লোক পায়দল আসছে। তারা এখখুনি পৌছে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর আকবর খানের সহচরেরা বনের মধ্যে বসে তার বক্তৃতা শুনতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ

'ভাই বোনেরা এই মুহূর্তে আমরা কতো বড়ো ধ্বংসের মোকাবিলা করছি, তা আমাদেরকে বলে দেবার প্রয়োজন নেই। মীরণপুর কাটরার যুদ্ধে আমাদের কওমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের রক্তক্ষয় হয়েছে। আমাদের তলোয়ার গেছে ভেঙ্গে। এখন আমাদের সম্বল শুধু অশ্রু আর আর্তহাহাকার। যাদের ভাই, স্বামী ও বেটা স্বদেশের জন্য জান কোরবান করেছে, সে মা-বোনদের সান্ত্বনার ভাষা নেই আমার। আহা!

যেসব নেকড়ের দল মানুষের রক্তের তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে রোহিলাখণ্ডের মাটিতে, ভাষা যদি তাদের স্বভাবে পরিবর্তন আনতে পারতো। যে দেশের মাটিতে আমাদের পূর্বপুরুষের অস্থি লুকিয়ে আছে, সেই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই আমাদের। এখানে মানুষের কোনো স্থান নেই আর। রোহিলাখণ্ডের কন্যা বস্তির উপর দিয়ে যে আমাদের বস্তির ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে, কেউ জানে না। ব্যক্তিগত বিপদ হলে আমি এখান থেকে কোথাও হিজরত করে যেতাম না। কিন্তু আমার সামনে রয়েছে গোটা গোষ্ঠীর প্রশ্ন। যাদের বাপ, যাদের স্বামী, পুত্র যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, সেসব এতিম বাচ্চা আর বিধবা ও পুত্রহীনা মা-বোনদের সমস্যা রয়েছে আমার সামনে। তাদের মাথা রাখবার মতো আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন রয়েছে এ দেশের কোথাও। আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মোয়াযযম আলী খানের মতে, আমরা তার সাথে মহীশূর চলে যাবো, কিন্তু মহীশূর সম্পর্কে আমি যতোটা জানি, তাতে মহীশূর হচ্ছে এমন এক কেল্লা যেখানে প্রয়োজন শ্রেষ্ঠ সিপাহীর। হায়দার আলীর সম্পর্কে আমি শুনেছি, তিনি এক মহানুভব শাসক। কিন্তু ইংরেজ ও মারাঠার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের ফলাফল এখনো নিশ্চিত বলা যায় না। আমি চাই না এসব অসহায় নারী ও শিশুদের জন্য মহীশূর আর এক রোহিলাখণ্ডে রূপান্তরিত হোক। ভাই মোয়াযযম আলী আমার প্রতি নারাজ হবেন, কিন্তু আপাতত আমার ফয়সালা আমরা মহীশূরে না গিয়ে হায়দারাবাদে চলে যাব এবং ওখানে কোনো চাষযোগ্য এলাকায় আবাদ হবার চেষ্টা করবো আমরা। কতক লোকের মতে আমাদের এখান থেকে দিল্লি, লাহোর অথবা পেশোয়ারের দিকে যাওয়া উচিত। উত্তরে কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারলে অবশ্যি আমাদের পক্ষে আরো ভালো হতো, কিন্তু হায়! ওদিককার কোনো হুকুমাত এতগুলো লোক আশ্রয় দিতে রাজি হবে, সে সম্পর্কে আমি যদি আশ্বস্ত হতে পারতাম। আমার মত আপাতত আমরা হায়দারাবাদে চলে যাবো। তথাপি সবার মিলিত ফয়সালা অনুযায়ী কাজ করা আমি জরুরি মনে করি।'

মোয়াযযম আলী পেরেশান ও উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন আকবর খানের দিকে। বক্তৃতা শেষ করে বসলে মোয়াযযম আলী তার পাশে গিয়ে চাপা গলায় বললেন ঃ আকবর খান আমার ধারণা ছিলো, তুমি মহীশূর যাবার ফয়সালা করে ফেলেছো।'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ এ প্রসঙ্গে আমি আপনার সাথে একা একা কথা বলবো, তবে আমার বিশ্বাস, আমি আপনার অসন্তোষ দূর করতে পারবো।

অন্যান্য বস্তির ছোট ছোট সরদার ও গোষ্ঠীর বৃদ্ধেরা পূর্ণ গাম্ভীর্য সহকারে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। একদল লোক আকবর খানের মত সমর্থন

করেন, অপর এক দল উত্তর দিকে হিজরত করার পক্ষপাতী। আকবর খানের খালাজাদ ভাই মুনাওয়ার খান গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিপত্তির দিক দিয়ে ছিলেন আকবর খানের পরেই। তিনি বললেন ঃ বর্তমানে এ দেশের যে কোনো রাজ্যে আমাদের ইজ্জতও আজাদির জিন্দেগি যাপনের সম্ভাবনা খতম হয়ে গেছে। এসব অযোগ্য, স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক এ দেশের অভিশাপ এবং আমার কাছে অযোগ্য, হায়দারাবাদ ও মহীশূরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যিল্লৎ অবমাননাই যদি হয়ে থাকে আমাদের ভাগ্যলিপি, তাহলে এখান থেকেই আমরা অযোধ্যার গোলামী কেন কবুল করছি না?' আপনারা বলবেন, আজাদি থেকে বঞ্চিত হবার পর আমাদের স্থিতি বিপন্ন হবে, কিন্তু অপর কোনো শাসকের গোলামী যে আমাদের স্থিতির পক্ষে বিপজ্জনক হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?'

গোষ্ঠীর আর একজন প্রতিপত্তিশালী লোক উঠে বললেন ঃ ভাইয়া! আমরাও মত। আমাদের উত্তরে যাওয়া উচিত কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আপনাদের প্রত্যেকের হক রয়েছে নিজস্ব ভবিষ্যতের ফয়সালা করবার। যারা ভাই আকবর খানের সাথী হতে চান, তাদেরকে বাধা দেবো না আমরা। আমি আশা করি আকবর খানের সমর্থকরাও আমাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।'

দেড় ঘন্টাকাল বিতর্ক চললো। অবশেষে মোয়াযযম আলী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ভাইরা! আপনাদেরকে মহীশূরে আসার দাওয়াত আমি আগেই দিয়েছি, কিন্তু আমার পরামর্শ আকবর খানের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এখন আমার কথা হচ্ছে আপনারা সময় নষ্ট না করে খুব জলদি করে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করে ফেলুন।'

আকবর খান বললেন ঃ আমার মনে হয় আলোচনা দীর্ঘ করে কোনো ফায়দা নেই। যারা উত্তরে যেতে চান, আমি তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টা করবো না। তাদের জন্য দোআ করবো, যেনো খোদা তাদের প্রতি সদয় ও সহায় হন কিন্তু সবার আগে আমার জিম্মাদারী হচ্ছে সহায়হীন বিধবা নারী ও এতিম বাচ্চাদের তত্ত্বাবধান এবং আমার বিশ্বাস হায়দারাবাদ পৌঁছে আমি তাদের জন্য অনেক কিছু করতে পারবো। সেখানকার অবস্থা আশাব্যঞ্জক না হলে আমার পরবর্তী মনজিল হবে মহীশূর। যা হোক, যদি আমি জানতে পাই যে, আমার যেসব ভাই ভিন্ন পথ ধরতে চান, তারা কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছেন, তাহলে আমিও হয়তো সেখানে পৌঁছে যাবো একদিন।

মুনাওয়ার খান, তোমরা তৈরি হও। আর কথার সময় নেই। এখান থেকেই আমরা চলতে থাকবো নিজ নিজ মনজিলের দিকে।

৪

কিছুক্ষণ পর মুনাওয়ার খান ও আকবর খানের নেতৃত্বে দু'টি কাফেলা দু'টি ভিন্ন পথ ধরে রওয়ানা হলো। একটি চলছে উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি হায়দারাবাদের পথে। আকবর খানের সাথে বারো শ' লোক। তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি লা-ওয়ারিস বাচ্চা ও বিধবা নারী। বিলকিস তার কন্যা তানবীরকে কোলে নিয়ে সওয়ার হয়েছেন ঘোড়ায়। শাহবাজ আকবর খানের সাথে আর এক ঘোড়ায় চেপেছে। মোয়াযযম আলী ও তার সাথীরা কাফেলার আগে-পিছে, ডানে-বাঁয়ে সশস্ত্র লোকদের পরিচালনা করছেন।

প্রায় দুক্রোশ চলবার পর আকবার খান তার ঘোড়া মোয়াযযম আলীর পাশে নিয়ে বললেন ঃ ভাইজান, আপনি রাগ করেছেন আমার উপরে? যদি আপনি হুকুম দেন তাহলে আমি হায়দারাবাদে না গিয়ে মহীশূরে যেতেও রাজি।

ঃ না, আমি তোমায় মহীশূরে যেতে বলবো না।' মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন।

আকবর খান বললেন ঃ হায়দারাবাদ যাবার ফয়সালা অকারণে আমি করিনি। শেখ ফখরুদ্দিন ও মীর্যা তাহির বেগ দীর্ঘকাল ধরে দাবি করছেন, যেনো আমার খান্দানের লোকজন নিয়ে আমি আবার এই হায়দারাবাদে। যখন মারাঠাদের সাথে আমাদের সংঘাত শুরু হলো, তখন হায়দারাবাদ থেকে শেখ ফখরুদ্দিন ও আধুনী থেকে তাহির বেগের দূত এলো আমার কাছে। তারা পয়গাম পাঠিয়েছিলেন যে, রোহিলাখণ্ডের তুলনায় নিযামের সালতানাত অনেক বেশি সুরক্ষিত। তাই দেশের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমি যেনো ওখানেই থাকি।' আমি জওয়াব দিলাম ঃ আমি এক গোষ্ঠীর সরদার এবং আমার জীবন-মরণ তাদেরই সাথে।'

তারপর শেখ ফখরুদ্দিনের আর এক চিঠি পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন যে, আমি ইচ্ছা করলে হায়দারাবাদে আমার পুরো গোষ্ঠীকে আবাদ করার ইন্তেজাম হতে পারে। তার প্রস্তাবকে আমি মনে করেছিলাম ঠাট্টা। এখন আমার একমাত্র ইচ্ছা, হায়দারাবাদ বা আধুনীর আশপাশে যদি জমিন পাই, তাহলে এই সহায়সম্বলহীন লোকগুলো সেখানে শান্তি ও স্থিতির মধ্যে দিন গুজরান করতে পারবে। আমার বিশ্বাস, আপনার বদৌলতে মহীশূরেও তেমন জায়গা মিলতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, হায়দরাবাদের তুলনায় মহীশূরের ভবিষ্যৎ অধিকতর

আশঙ্কাজনক। আপনি বলেন, হায়দারাবাদের শাসকের তুলনায় মহীশূরের শাসক অধিকতর চেতনাসম্পন্ন, দূরদর্শী ও বাহাদুর এবং তার সামনে রয়েছে এমন সব লক্ষ্য, যার জন্য তলোয়ার ধারণ নেক কাজের শামিল, কিন্তু ভাইজান, আপনি যদি রাগ না করেন, তা'হলে আমি বলবো কোনো শাসককেই আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি না। মানবতার উপর আমার বিশ্বাস উঠে গেছে। শাসকদের পরিণাম-দর্শিতা, নেকি ও শরাফত আমার দৃষ্টিতে মরীচিকার মতো এবং সে মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ানোর হিম্মৎ নেই আমার। আপনি বাংলার স্বাজাতির মুহাফিজ হয়ে নেমেছিলন ময়দানে, কিন্তু কি হাসিল হয়েছে আপনার? যেদিন আমি পানিপথের ময়দানে লড়াই করেছি, তখন আমার মনে হয়েছে যে, যুদ্ধের পর রোহিলা সিপাহীদের অযোধ্যা, দিল্লি ও হায়দারাবাদের বাদশাহ মনে করবেন তাদের উপকারী বন্ধু কিন্তু আমাদের কোরবানীর যে প্রতিদান অযোধ্যার নওয়াব উজির আমাদেরকে দিয়েছেন, তা আপনি দেখতে পেয়েছেন। আমরা গিয়েছিলাম তাদের দুশমনদের বহু দূরে সরিয়ে দিতে, কিন্তু তারা আমাদের ধ্বংস ও বরবাদীর দৃশ্য দেখেছেন বহু দূরে বসে। যাদের কৃতকর্মের ফলে আমাদের বস্তিগুলো ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে, তাদের জন্য আমার অন্তরে নেই কোনো আকর্ষণ কোনো আন্তরিকতা।

ঃ আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি আমায় সাহায্য করেছেন এবং আপনার জন্য আমি দেহের গোশতের টুকরো ছিঁড়ে দিতেও তৈরি, কিন্তু আজ থেকে আমি শপথ নিয়েছি যে, কোনো শাসকের পক্ষে আমি আমার তলোয়ার উত্তোলন করবো না। আমি হবো এক কিষাণ। আমি হবো পশুপালক। আমার জিন্দেগির প্রথম ও শেষ মকসাদ হচ্ছে এই সহায়-সম্বলহীন লোকগুলোর হেফাজত তাদের প্রতিপালন ব্যবস্থা। আপনি বলেন, হায়দার আলী কেবল মহীশূরের নয়, বরং অযোধ্যা ও হায়দারাবাদের মুসলমানদেরও আজাদি ও সৌভাগ্যের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন, কিন্তু সেই কারণেই আমি মহীশূরে যেতে ভয় করছি। আমি ও আমার গোষ্ঠীর জীবনপণ যোদ্ধারা তাদেরই আজাদি ও সৌভাগ্যের জন্য লড়াই করেছি, কিন্তু আমাদের নির্ভেজাল কোরবানী হিংস্র শ্বাপদের খাসলত পরিবর্তন করতে পারেনি এবং আমার আশংকা হয়, এ নিমকহারাম কওম আমাদেরই মতো হায়দার আলীকেও দুশমন মনে না করে বসে।'

ঃ ভাইজান, আমার পুঁজি আমার দগ্ধীভূত গৃহের ভস্মরাশি আর এই সহায়হীন মানুষগুলোর অশ্রু। নিজামের কাছে গিয়ে আমি বলবো, যদি তার রাজ্যে ভালো কিষাণ ও পশুপালকের প্রয়োজন থাকে, তা হলে যেনো তিনি আমাদেরকে সেখানে

আবাদ করে নেন; আর যদি তার আধিপত্যের ঝাণ্ডা তুলে ধরবার জন্য শুধু সিপাহীর প্রয়োজন হয়, তা'হলে আমরা ফিরে যেতেও তৈরি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তোমার অনুভূতি সম্পর্কে আমি গাফেল নই। তুমি দেখে এসেছো এক ভয়াবহতম ইনকিলাব, কিন্তু বিশ্বাস করো, যেদিন আমি বাংলা থেকে হিজরত করে আসি, সে মুহূর্তে আমার দীলেও ছিলো এমনি ধারণা। আমিও চিন্তা করতাম, কোনো শাসকের সাথে আর আমি কোনো সংযোগ রাখবো না। সেই কারণেই আমি শুরু করেছিলাম তেজারত কিন্তু জামানা কোনো ইনকিলাব ধূমায়িত অগ্নিশিখা থেকে ধূম ও জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে তাপ জুদা করে দিতে পারে না। আমি দোআ করি, হায়দারাবাদে তোমার নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জিন্দেগি গুযরান হোক, কিন্তু আমার বিশ্বাস, একদিন তুমি আবার মহীশূরে আসবে। দাক্ষিণাত্যের বিরাটতম জমিদার হওয়া সত্ত্বেও কোনো একদিন তুমি সেরিঙ্গাপটমকেই মনে করবে তোমার আখেরী মনজিল।

মীরণপুর কাটরার পরাজয়ের পর রোহিলাদের সামনে থাকলো বিকল্প পন্থা-মওত অথবা হিজরত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও অযোধ্যার সিপাহীরা তাদেরকে ঘিরে কতল করতে লাগলো বন্য জানোয়ারের মতো, জ্বালিয়ে দিতে লাগলো তাদের বস্তিগুলো। আগুন ও খুনের তুফান থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য তারা আশ্রয় নিতে লাগলো দূর দরাজ এলাকায়।

এ যুদ্ধ কোনো হুকুমাত বা ফউজের বিরুদ্ধে নয়, বরং এ যুদ্ধ তাদেরই বিরুদ্ধে কোনো মীর জাফর, শুজাউদ্দৌলা বা নিজাম আলী খানের মতো জাতিবিরোধীর আনুগত্য স্বীকার না করাই যাদের একমাত্র অপরাধ। রোহিলাখণ্ডের সরজমিন রক্তাক্ত হয়েছিলো এই শরীফ, বাহাদুর ও আত্মসম্ভ্রমশীল কওমের সন্তানদের খুনে এবং রোহিলাখণ্ডের বাইরে কেউ ছিলো না অসহায় কওমের অশ্রুধারা মুছে দেবার মতো। মুহাজিরদের কাফেলা জন্মভূমি ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে পাহাড়ে, বনে ও মরুপ্রান্তরে। তাদের অতীতের বিধ্বস্ত বস্তি কবর-কাফনহীন লাশ ও লুট হয়ে যাওয়া ইজ্জতের কাহিনীতে ভরপুর। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে এক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে দারিদ্র্য, দুঃখ, কাহাত ও নানারকম পীড়নের মোকাবিলা করতে লাগলো। অযোধ্যার নওয়াব উজিরের সালানাতে এক শস্য-শ্যামল ও

উর্বর ভূখণ্ড সংযোজিত হয়েছে বলে তিনি খুশি হলেন। ইংরেজরা খুশি হলো হিন্দুস্তানের শমশেরধারী বাযু ভেঙে গেছে বলে। আর মারাঠা খুশি হলো দিল্লিতে তাদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ণরূপে ঘায়েল হয়েছে বলে।

মোয়াযযম আলী ও আকবর খানের সাথে যে কাফেলা রওয়ানা হয়েছিলো অগুণতি মুসীবতের মোকাবেলা করে তারা এসে পৌঁছলো একদিন হায়দারাবাদের সীমারেখার ভিতরে। পথে দু'বার ডাকাতদল হামলা করলো তাদের উপর। কিন্তু কাফেলার মুহাফিজদের সাথে মামুলি সংঘাতের পর তারা পালিয়ে গেলো আপন পথে। মোয়াযযম আলী খুবই ভয় করেছিলেন যে, অযোধ্যার ফউজ তাদের পিছু ধাওয়া করবে, কিন্তু অযোধ্যার ফউজের সিপাহসালার ততোক্ষণে লাখনৌ পৌঁছে গেছেন বিজয়-উৎসবে হিসসা নেবার জন্য, আর তার সিপাহীরা তখনো আকবর খানের বস্তির উপর হামলাকারী সাথীদের পরিণাম সম্পর্কে বেখবর। তারা রোহিলাখণ্ডের সর্বত্র চালিয়ে যাচ্ছে হত্যা, ধ্বংসতাণ্ডব ও লুট-তরাজ।

চারদিন পর যখন ইংরেজ অফিসাররা তাদের সাথীদের পরিণাম সম্পর্কে খবর পেলো, তখন এ কাফেলা কয়েক মনজিল দূরে চলে গেছে।

হায়দারাবাদের দারুল হুকুমাত থেকে তিন মনজিল দূরে মোয়াযযম আলী আকবর খানকে বললেন ঃ দোস্ত, তোমাদের মনজিল কাছে এসে গেছে। আমার খুব শিগগির সেরিঙ্গাপটমে ফিরে যাওয়া উচিত ছিলো। এবার আমায় এজাযত দাও এবং ওয়াদা করো, হায়দারাবাদের পরিস্থিতি তোমার প্রত্যাশা মোতাবেক না হলে তুমি চলে আসবে আমার কাছে।'

ঃ আমি ওয়াদা করছি।' আকবর খান জওয়াব দিলেন।

মোয়াযযম আলী তার সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ আমি তোমার চিঠির ইন্তেজার করবো।'

তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হচ্ছেন, তখন বিলকিস অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ ভাইজান, ভাবীজানকে আমার সালাম বলবেন। তাকে দেখতে আমি অবশ্যি একবার সেরিঙ্গাপটমে আসবো।'

শাহবাজ খান বললো ঃ আমিও আসবো।'

মোয়াযযম আলী ঘোড়ার রেকাবে পা রেখে বললেন ঃ বেটা, তুমি অবশ্যি এসো। আমার ভয় হয়, হায়দারাবাদে গিয়ে তোমরা তো ভুলে যাবে আমায়।'

মোয়াযযম আলী ও তার পাঁচজন সাথী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একদিকে বেরিয়ে গেলেন এবং আকবর খান কাফেলাকে হুকুম দিলেন এগিয়ে যেতে।

৪

সেরিঙ্গাপটমে পৌঁছে পুনরায় মোয়াযযম আলী ফউজী শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালনার ভার হাতে নিলাম। মারাঠাদের সাথে হায়দার আলীর যুদ্ধ তখনো চলছে এবং দিনের পর দিন মহীশূর সালতানাতে সংযোজিত হচ্ছে নতুন নতুন বিজিত এলাকা। এক বছরের মধ্যে আকবর খানের তরফ থেকে কোন খবর আসেনি মোয়াযযম আলীর কাছে। একদিন তিনি শেখ ফখরুদ্দিনের মারফতে চিঠি লিখলেন তার কাছে। প্রায় একমাস পর আকবর খানের তরফ থেকে এলো তার জওয়াব

ভাইজান,

'আপনি বিলকিসের মামুজানের মারফতে যে চিঠি লিখেছেন, তা বিলম্বে, আমার হাতে এসেছে। হায়দারাবাদে পৌঁছবার পর শেখ ফখরুদ্দিন চেষ্টা করেছিলেন আমায় তার সাথে তেজারতে শরিক করবার জন্য। কিন্তু আমার কাছেন গোষ্ঠীর লোকদের পুনর্বাসনের সমস্যাই বড়ো হয়ে দেখা দিলো। আতিয়ার স্বামী তাহির বেগ আমার জন্য আধুনীর ফউজে এক চাকরির ব্যবস্থা করে এনেছিলেন, কন্তু সেদিকেও আমি মন দেইনি। তারপর শেখ ফখরুদ্দিনের চেষ্টায় ও তাহির বেগের প্রভাবে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মাঝখানে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আমরা খুব সস্তা দামে পেয়ে গেলাম। আমার গোষ্ঠীর লোকেরা বাড়ি ছেড়ে আসার বেলায় যে নগদ অর্থ ও গহনাপত্র সাথে নিয়ে এসেছে, তাই আমাদের কাছে রয়েছে। মারাঠা সীমান্তের মাত্র কয়েক মাইল দূরে এ এলাকাটি। যেসব জমিদার মারাঠা হামলার ভয়ে আধুনীর আশপাশে আবাদ হতে চান, তাদের কাছ থেকে কিছু জমিন আমরা খরিদ করে নিয়েছি, বাকি জমিন সরকারি এবং তার জন্য আমাদেরকে আধুনীর হুকুমাতকে কিছুই দিতে হয়নি। কেবল শর্ত রয়েছে ঃ যদি মরাঠাদের তরফ থেকে কোনো বিপদ আসে, তা'হলে আমাদের আত্মরক্ষার জিম্মা আমাদেরকেই নিতে হবে। এখানকার জমিন খুবই ভালো, কিন্তু জঙ্গল সাফ করে চাষযোগ্য করতে কিছুকাল আমাদের করতে হবে কঠিন মেহনত।

'হায়দারাবাদের আসেপাশে যাতে কোন জায়গীর পাওয়া যায়, শেখ ফখরুদ্দিন তার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং তার চেষ্টা অনেকখানি সফলও হয়েছিলো। কিন্তু জায়গীরদার হিসাবে নিজামের ফউজের জন্য ভাড়াটে সিপাহী সংগ্রহ করে দেবার প্রস্তাব আমি মনজুর করিনি। আধুনীর হুকুমাতের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে

যে, যতোটা জমিন আবাদ হতে থাকবে, আমরা তার রাজস্ব আদায় করতে থাকবো এবং কখনো আমাদের ভিতর থেকে কোনো সিপাহী সংগ্রহের দাবি করা হবে না।

রোহিলাখণ্ডের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আরো কতক লোক দুস্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এ মুলুকে। প্রায় পাঁচশ' লোক আমার দু'মাস পর পৌঁছে গেছে হায়দারাবাদে এবং আমি তাদেরকে নিয়ে এসেছি এখানে। অবস্থা অনুকূলে হলে আমরা দু'তিন বছরের মধ্যে এ অনাবাদী বনভূমিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে পারবো। ভীলদের কয়েকটি গোষ্ঠী এই বনের মধ্যে শিকারের উপর নির্ভর করে দিন গুজরান করতে পারতো। কিন্তু আমাদের প্রভাবে তারা চাষাবাদের দিকে মন দিয়েছে। পঞ্চাশজন ভীলকে আমি কাজে নিযুক্ত করেছি এখানে। এ জায়গাটি এখন আমাদের ছোটখাট দুনিয়া এবং বাইরের তুফানের বিরুদ্ধে আমরা একে মজবুত করে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের দীলের মধ্যে সেরিঙ্গাপটমে যাবার যেটুকু খেয়াল ছিলো, তা'ও এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি আমি কখনো আসি, কেবল আপনাদেরকে দেখতে আসবো। বিলকিস আপনাকে ও ভাবিজানকে সালাম জানাচ্ছে।'

আপনার ভাই আকবর

নতুন আবাসভূমি থেকে এ ছিলো আকবর খানের প্রথম ও শেষ চিঠি। এরপর দুই বন্ধু ব্যস্ত রইলেন নিজ নিজ দুনিয়া গড়ে তুলতে। কারুরও অবকাশ মিললো না অপরের অবস্থা জানবার।

আঠার

আরো ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে মহীশূরের অসংখ্য নওজোয়ান সেরিঙ্গাপটম ফউজী শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষা হাসিল করে হায়দার আলীর ফউজে শামিল হয়েছে। মোয়াযযম আলীর ছেলেরা দুনিয়ার কোলে চোখ মেলেছে তলোয়ারের ঝন্কারের ভিতর দিয়ে। এমন এক মায়ের স্তন্য পান করেছে তারা, যিনি তার নিজের ও স্বামীর খান্দানের শৌর্য সাহসের গর্বে গর্বিতা। শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে তারা জিন, ভূত আর সাপের কাহিনী শোনেনি, শুনেছে কতো যুদ্ধ বিগ্রহের রোমঞ্চকর ঘটনা। বড়ো হয়ে বাপের মজলিসে দেখেছে হায়দার আলীর ফউজের মশহুর সিপাহসালার আর বড়ো বড়ো ফউজী অফিসারকে। সিদ্দীক আলী সতেরো বছর বয়সে সেরিঙ্গপটমের ফউজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা

সমাপ্তির পর জাহাজ চালনার অভিজ্ঞতা হাসিল করবার জন্য ফরাসী শিক্ষকের সাথে চলে গেছে বাংগালোরে। মাসউদ আলী, আনওয়ার আলী ও মুরাদ আলী শিক্ষাগ্রহণ করছে ফউজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মোয়াযযম আলী তার পুত্রদের সবাইকে বানাতে চান শ্রেষ্ঠ সিপাহী ও আলেম। তাই তিনি ঘরে আরবী ও ফারসীর তালিম দেবার জন্য নিযুক্ত করেছেন একজন ইরানী আলেমকে এবং নিজের অবসর সময়ও তিনি ব্যয় করেন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজে।

তখনকার জামানায় হিন্দুস্তানের বিজিত এলাকাগুলোয় ইংরেজদের জুলুম পৌঁছে গেছে চরম পর্যায়ে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মামুলী সিপাহী ও কেরানী থেকে শুরু করে গবর্ণর জেনারেল পর্যন্ত সবাই লুটপাট করতে ব্যস্ত। বাংলার শহরে শহরে ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। সমৃদ্ধ কারবারী কড়ার কাঙাল হয়ে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। মীর জাফরের জঘন্য কার্যকলাপের প্রতিফল পাচ্ছে তার অনুসারীরা। ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস তাদের কাছ থেকে উসুল করে নিচ্ছে লাখো লাখো টাকা। বাংলার এক সম্ভ্রান্ত সাহসী ব্রাহ্মণ নন্দকুমার ওয়ারেন হেস্টিংসের লুট ও জুলুমের প্রতিবাদে আওয়াজ তুলেছিলেন। তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস এক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করে তাকে দেওয়ালেন মৃত্যুদন্ড।

বাংলার উমরাহর ভাণ্ডার যথেষ্ট লুট করবার পর ওয়ারেন হেস্টিংস মনোযোগ দিলেন বেনারসের রাজা চৈৎ সিংয়ের দিকে। রাজা চৈৎ সিং তাকে খুশি করবার জন্য নিজের ভাণ্ডার খালি করে দিলেন, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবার মতো সম্পদ তার ছিলো না। বেনারসের অর্থভাণ্ডার যতো খালি হতে লাগলো, ওয়ারেন হেস্টিংসের দাবিও ততোই বেড়ে গেলো। অবশেষে যখন রাজার কাছে আর কিছু নেই, তখন হেস্টিংস তার উপর তার হুকুম অমান্য করার দোষ চাপিয়ে নিজে বেনারসে এসে রাজার গ্রেফতারী হুকুম জারি করলেন। শান্তিপ্রিয় রাজা চৈৎ সিং নেক নিয়তের প্রমাণ দেবার জন্য বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করলেন, কিন্তু বেনারসের ফউজ ও আওয়াম রাজার এ অবমাননা বরদাশত করলো না। তারা ইংরেজ সিপাহী ও অফিসারদের পাঠালো মৃত্যুর দেশে। তারা কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে আনলো রাজাকে। হেস্টিংস পালিয়ে গেলেন বেনারস থেকে এবং এক বড়ো ফউজ সংগ্রহ করে আর একবার হামলা করলেন। রাজা চৈৎ সিং জান ও ইজ্জতের ভয়ে পালিয়ে গেলেন গোয়ালিয়রের পথে। ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎ সিংয়ের জায়গায় গদিতে বসালেন তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এবং তার প্রাপ্য খেরাজ সোয়া দুলাখ থেকে বাড়িয়ে দিলেন চার লাখ পাউণ্ডে।

অযোধ্যার নওয়াব উজির শুজাউদ্দৌলার ওফাতের পর অযোধ্যার হুকুমাত এলো তার পুত্র আসফুদ্দৌলার হাতে। রোহিলাখন্ড দখল করতে গিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের সাহায্য নেওয়ার ফলে শুজাউদ্দৌলা ঋণী হয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে। আসফুদ্দৌলা গদিতে বসামাত্র ওয়ারেন হেস্টিংস তার কাছে দাবি করলেন পনেরো লাখ টাকা। আসফুদ্দৌলার কাছে অর্থ ছিলো না। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সাহায্যে তার বিধবা মাতা ও দাদীর কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত অর্থ এই শর্তে হাসিল করলেন যে, এরপর ইংরেজ তাদের কাছে আর কোনো দাবি করবে না, কিন্তু অযোধ্যার বেগমদের দৌলতের কিসসা আগেই পৌঁছে গেছে ওয়ারেন হেস্টিংসের কানে। অর্থ হাসিল করবার জন্য যে কোনো পন্থাই তার কাছে তখন বৈধ। তাই তিনি আসফুদ্দৌলা ও লাখনৌর ইংরেজ রেসিডেন্টের উপর অযোধ্যার বেগমদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ হাসিল করবার জন্য চাপ দিলেন। আসফুদ্দৌলা আরো অর্থ দিতে না চাইলে হেস্টিংস ইংরেজ রেসিডেন্টকে হুকুম দিলেন ইংরেজ সিপাহীদের একটি দল ফয়যাবাদে পাঠিয়ে বেগমদের মহলগুলো অবরোধ করতে এবং সর্বপ্রকার সম্ভাব্য লাঞ্ছনা দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ হাসিল করবার চেষ্টা করতে। ইংরেজ রেসিডেন্ট মিডলটন বেগমদের কাছ থেকে যথেষ্ট অর্থ হাসিল করতে অসমর্থ জ্ঞাপন করলে ওয়ারেন হেস্টিংস এই উদ্দেশ্যে তার জায়গায় ব্রিস্টোফ নামে এক নতুন রেসিডেন্ট পাঠালেন। রেসিডেন্ট বেগমদের মহল অবরোধ করার পর নওকরদের গ্রেফতার করে গোপন ভাণ্ডারের সন্ধান করার জন্য কয়েক মাস ধরে তাদের উপর চালালো নির্মম নির্যাতন। কয়েক বছর আগে শুজাউদ্দৌলা ইংরেজের সাহায্য নিয়ে হামলা করেছিলেন রোহিলাখণ্ডের সম্ভ্রম ইজ্জত ও আজাদির উপর। সেই ইংরেজ এবার পৌঁছে গেছে তার হারেম পর্যন্ত, তার বৃদ্ধা মা ও অযোধ্যার শাহজাদিরা যাপন করতে লাগলেন কয়েদির দুঃসহ জিন্দেগি এবং সকাল-সন্ধ্যায় শুনতে লাগলেন তাদের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান ইংরেজের হাতে নির্যাতিত নওকর ও পরিচারিকদের বুকফাটা আর্তনাদ। অবশেষে একবছর ধরে জঘন্যতম নির্যাতন ভোগের পর বেগমরা তাদের যথাসর্বস্ব ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে খালাস পেলেন।

মোগল শাহানশাহ দ্বিতীয় শাহে আলম-যিনি কয়েক বছর আগে ইংরেজ মুরুব্বীদের তত্ত্বাবধান থেকে বেরিয়ে গিয়ে মারাঠা মুরুব্বীদের তত্ত্বাবধানে দিল্লির তখতে উপবেশন করেছিলেন এবং যিনি সম্ভবত তার সালতানাতের সীমান্তের পরিধি সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না- এক নির্বাক অসহায় দর্শক হিসাবে দেখতে লাগলেন তামাম ঘটনাপ্রবাহ।

৫

দক্ষিণ হিন্দুস্তানে কর্ণাটকের অবস্থা ছিলো বাংলা, অযোধ্যা ও বেনারসের চাইতেও নিকৃষ্টতর। মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহ ছিলেন নামে কর্ণাটকের শাসক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এমন এক কলু-যাকে দিয়ে ইংরেজ শক্তি শোষণ করে চলেছিলেন কর্ণাটকের বাসিন্দাদের রক্ত। ওয়ালাজাহ সবচাইতে বড়ো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন যে, ইংরেজ মহীশূর জয় করে তাঁর বিশেষ বিশেষ হিসসা আর্কটের সালতানাতের শামিল করে দেবে; যাতে ইংরেজের উচ্ছিষ্ট দিয়ে তার বেগম ও শাহজাদাদের প্রতিপালন ব্যবস্থা হতে পারে। তার পেশাসংখ্যা তখন কয়েক ডজন পৌঁছে গেছে।

নেকি ও শরাফতের অস্তিত্ব তখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের তকদির ন্যস্ত হয়েছে হিংস্র শ্বাপদের হাতে। কর্ণাটকের ধ্বংসমুখী মানুষ কোনো পরিত্রাণকর্তার আগমন পথ চেয়ে রয়েছে। আল্লাহর গজব তখন আসন্নপ্রায়। সহসা হলো এক অগ্নিগিরির উদগীরণ এবং কর্ণাটকের অদ্বিতীয় ক্ষমতার দাবিদার ইংরেজ এসে দাঁড়ালো তার মুখে। হায়দার আলী এক আতশী সয়লাব নিয়ে বেরিয়ে এলেন মহীশূর থেকে এবং ছেয়ে ফেললেন গোটা কর্ণাটক। সাত সমুদ্রের ওপার থেকে আগত বণিকগোষ্ঠী ধূর্ত বুদ্ধি ও চালবাজির বদৌলতে হিন্দুস্তানের উপর আধিপত্য কায়েম করার স্বপ্ন দেখছে তখন, কিন্তু এই নবাগত সয়লাবের সামনে পালাতে শুরু করলো তারা। যারা তাদের তোপধ্বনির জওয়াবে অসহায় মানুষের আর্তনাদ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো, তারা এবার এমন এক কওমের নওজোয়ানদের শক্তি সাহসের প্রমাণ দেখতে পেলো, যে কওম হয়ে পড়েছিল তাদের প্রত্যাশার অনুরূপ নিষ্ক্রিয় ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। যারা এ দেশের অযোগ্য ওমরাহের জাতিদ্রোহিতা ও সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তিকে মনে করতো তাদের সাফল্যের নিশ্চিত জামানত, তারা হায়দার আলীর [illegible]ায়ে দেখতে পেলো জামানার শ্রেষ্ঠ জেনারেলদের। মারাঠা তাদের প্রভূত শক্তি বলে মহীশূর জয় করবে এবং তারা তাদের কাছ থেকে পাওয়া হিসসা উসুল করে নেবে, এই আশায় কয়েক বছর আগে যে ইংরেজ রাজনীতিকরা মাদ্রাজের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে হায়দার আলীকে মারাঠা হামলার মুখে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিলো, তারা আজ তাদের সামনে দেখতে পেলো নব্বই হাজার সওয়ারের এক বিপুল ফউজ-যারা ময়দানে নেমেছে তাদের সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেবার ইরাদা নিয়ে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মাদ্রাজের গবর্নর কোম্পানির ফউজের নেতৃত্ব দিয়েছেন বক্সার বিজয়ী স্যার হেক্টর মুনরোর উপর এবং কর্ণেল বেইলীকে হুকুম পাঠিয়েছেন তার সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে এসে স্যার

হেক্টরের সাথে মিলিত হতে।

জেনারেল মুনরো মাদ্রাজ থেকে রওয়ানা হয়ে কুঞ্জিবরম পৌঁছে কর্ণেল বেইলীর জন্য ইন্তেজার করতে লাগলেন।

হায়দার আলী কর্ণেল বেইলীর পথরোধ করবার জন্য পাঠালেন শাহজাদা টিপুকে এবং নিজে আর্কটের অবরোধ ছেড়ে দিয়ে গেলেন কুঞ্জিবরমের দিকে। কুঞ্জিবরম থেকে পনরো মাইল দূরে শাহজাদা টিপু কর্ণেল বেইলীর লশকরের উপর হামলা করে প্রথম আঘাতেই দুশো সিপাহীকে হালাক করে দিলেন।

ইতিমধ্যে টিপুর সাহায্যের জন্য সিপাহীদের আরো কয়েকটি দল এসে পৌঁছলো এবং কর্ণেল বেইলী জেনারেল মুনরোর কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, সত্বর সাহায্য না পেলে টিপুর অবরোধ ব্যূহ ভেদ করে তিনি এগিয়ে যেতে পারছেন না। ৯ সেপ্টেম্বর জেনারেল মুনরো কর্ণেল বেইলীর সাহায্যের জন্য পাঠালেন এক হাজার সিপাহীর একটি দল এবং সেই সাথে তিনি এগিয়ে গেলেন কুঞ্জিবরমের দিকে, কিন্তু টিপুর ফউজ তাদের পিছু ছাড়লো না। কর্ণেল বেইলী কুঞ্জিবরম থেকে নয় মাইল দূরে তাঁবু ফেলবার হুকুম দিলেন তার ফউজকে। তার মনে আশা ছিলো যে, ভোর পর্যন্ত জেনারেল মুনরো নিজেই এসে পৌঁছাবেন তার সাহায্যের জন্য, কিন্তু ভোর হতেই টিপুর ফউজ গোলাবর্ষণ শুরু করলো তাদের উপর পিছন থেকে। এর সথে সাথেই হায়দার আলী কুঞ্জিবরমের দিকে অগ্রগতি বন্ধ করে এসে পৌঁছলেন টিপুর সাহায্যের জন্য। কর্ণেল বেইলী হতাশা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু তিনি পিছন থেকে তোপের অগ্নিবৃষ্টি ও পার্শ্বদেশে মহীশূরের অশ্বারোহী সিপাহীদের হামলার দরুন প্রতিপদে ধ্বংসের মোকাবিলা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে কুঞ্জিবরমের ছয় মাইল দূরে ফিরে দাঁড়িয়ে লড়াই করবার ফয়সালা করলেন, কিন্তু এর মধ্যে হায়দার আলীর তোপখানাও পৌঁছে গেছে টিপুর সাহায্যের জন্য। দু'দিক থেকে তোপের অগ্নিবর্ষণের ফলে ইংরেজ ফউজে দেখা দিলো গুরুতর বিশৃঙ্খলা। তাদের ফউজের দেশি সিপাহীরা ময়দান ছেড়ে পালালো এবং ইউরোপীয় সিপাহীরা হাতিয়ার সমর্পণ করলো।

স্যার হেক্টর মুনরো কর্ণেল বেইলীর পরাজয়ে এমন আতঙ্কিত হলেন যে, ভারী তোপগুলো জলাশয়ে নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেলেন মাদ্রাজে। টিপুর তুফানী সেনাদল ছিলো তার পশ্চাতে। মুনরো পদে পদে অগণিত লাশ ফেলে ভগ্নোদ্যম ও নিরুপায় হয়ে পালালেন মাদ্রাজের পথে। বক্সার বিজয়ী বীরকে এহেন অবস্থায় ফিরতে দেখে মাদ্রাজের বাসিন্দারা প্রাণ ভরে হাসলো।

শাহজাদা টিপু মুনরোর সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় গিয়ে মিলিত হলেন পিতার সাথে। মহীশূরের ফউজ কর্ণাটকের দারুল হুকুমাত আর্কটের

দিকে এগিয়ে গেলো এবং মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহ্‌ তার ইংরেজ মুরুব্বীদের সাথে নিয়ে সেখান থেকে পালালেন এবং ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে আর্কটে উড্ডীন হলো হায়দার আলীর বিজয় পতাকা।

হায়দার আলী আর্কটকে কেন্দ্র করে বিজিত এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত হলেন। টিপু দশহাজার সওয়ার সাথে নিয়ে এগিয়ে অবরোধ করলেন সাতগড়ের কেল্লা। কেল্লাটি ছিলো খুব মজবুত এবং কয়েক মাসের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ মওজুদ করে দুহাজার সিপাহী মোতায়েন ছিলো তার হেফাজতে। কিন্তু কেল্লার মুহাফিজ শাহজাদা টিপুর তীব্র হামলায় ভীত হয়ে ১৭৮১ সালের ১৩ জানুয়ারি হাতিয়ার সমর্পণ করলো।

তারপর টিপু হামলা করলেন আম্বুরের কেল্লার উপর। কেল্লার মুহাফিজ ছিলেন কেটন নামে এক ইংরেজ ক্যাপ্টেন। প্রায় পনেরো দিন ধরে তিনি মোকাবিলা করলেন হামলাদার ফউজের, কিন্তু বাঁচবার কোনো পথ না পেয়ে তিনিও হাতিয়ার সমর্পণ করলেন।

কর্ণাটকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা দখল করবার পর শাহজাদা টিপু এগিয়ে গেলেন তেয়াগড়ের দিকে। চার হফতাব্যাপী অবরোধের পর যখন তার ফউজ তেয়াগড় কেল্লার উপর চূড়ান্ত হামলা করলো, তখন তথাকার ইংরেজ কম্যাণ্ডান্ট পাঁচিলের উপর উড়িয়ে দিলো সন্ধির শ্বেতপতাকা। টিপু তার ফউজকে গোলাবর্ষণ করবার হুকুম দিলেন। কিন্তু পরদিন যখন ইংরেজ কম্যাণ্ডান্ট কেল্লা খালি করে দেবার আয়োজন করছে, তখন খবর এলো যে, সেনাসাহায্য নিয়ে স্যার আয়ারকুট সেখানে আসছেন। তাই কেল্লা খালি না করে তিনি মহীশূরের ফউজের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করলেন। আবার শুরু হলো যুদ্ধ কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কেল্লার মুহাফিজরা জানতে পারলো যে, স্যার আয়ারকুট কয়েক মনজিল দূরে তাবু ফেলে রসদের ইন্তেজার করেছেন। ইংরেজ কম্যাণ্ড্যান্ট পুনরায় কেল্লা খালি করবার আয়োজন করলেন, কিন্তু টিপু তাকে কোনো অবকাশ দিতে অস্বীকার করলেন। আর একবার তীব্র হামলার পর তিনি দখল করে নিলেন কেল্লাটি।

এতদিনে কর্ণাটকের সবচাইতে মজবুত কেল্লা বিজিত হয়ে গেছে। টিপুর ফউজ নির্বিঘ্নে ছোট ছোট কেল্লা ও চৌকি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো দুশমন দলকে। জুন মাসে শাহজাদা টিপু গৌরবময় বিজয়ের পর আর্কটে পৌছলে হায়দর আলী শহরের বাইরে এসে সম্বর্ধনা জানালেন বিজয়ী পুত্রকে। এ কেবল এক শাসকের পক্ষ থেকে তার ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্বর্ধনা নয়, বরং এ ছিলো এক মহিমান্বিত সিপাহসালারের তরফ থেকে তার ফউজের এক তরুণ জেনারেলের সম্বর্ধনা যার যোগ্যতা ও বাহাদুরীর কাহিনী পৌছে গেছে সাত সমুদ্রের ওপারে।

বৃদ্ধ ঈগল যেমন বাসায় থেকে তাকিয়ে দেখে তার তরুণ বাচ্চার সঞ্চালন,

জিন্দেগির শেষ পর্যায়ে হায়দার আলীর অবস্থাও ছিলো তেমনি। তিনি তার তীক্ষ্ণ তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে হিন্দুস্তানের নকশার উপর একে দিয়েছেন এক বিপুল সালতানাতের সীমারেখা আর তার ভাবী উত্তরাধিকারী তাকে চিত্রিত করেছেন নতুন রঙে। হায়দার আলীর অভিজ্ঞ জেনারেল প্রত্যেক ময়দানে টিপুর অস্তিত্বকে মনে করেছেন বিজয়ের জামানত। কর্ণাটকের যুদ্ধের পর বছর মহীশূরের সেই মহিমাময় শাসকের দৈহিক শক্তি নিশেষিত হয়ে এলো যার জিন্দেগির বেশিরভাগ দিন গুজরান হয়েছে তলোয়ারের ছায়ায়। এখন তাঁর জিন্দেগির শেষ সন্তোষ, শাহজাদা টিপুর চাইতে শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী কোনো শাসকের ভাগ্যেই জুটতে পারে না।

টিপু কর্নেল বেইলী ও জেনারেল মুনরোর পর স্যার আয়ারকুট ও স্টুয়ার্টের মতো বহুদর্শী বিচক্ষণ জেনারেলদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় উত্তরে এসেছেন।

আর্কটে ইংরেজদের প্রতিরক্ষা শক্তি ধ্বংস করে দিয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন তাঞ্জোরের দিকে এবং তার সামনে ইংরেজ সেনাবাহিনী পালিয়ে গেছে মেষপালের মতো। তোপের সাহায্যে কয়েক হফতা মোকাবিলা করবার আশা পোষণকারী কর্ণেল ব্রেথওয়েটকে ২৬০ ঘণ্টা পর হাতিয়ার সমর্পণ করতে হয়েছে তার কাছে।

ব্রেথওয়েটকে পরাজিত করবার পর টিপু বিনা বাধায় তাঞ্জোরের বেশিরভাগ এলাকা দখল করলেন। ১৭৮২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে হায়দার আলীর নির্দেশে টিপু তাঞ্জোর থেকে এগিয়ে গেলেন পুয়াটোনাবোর দিকে। সেখান থেকে তিনি ফরাসী সেনাদল সাথে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কাডলোর দখল করলেন। মে মাসে টিপুর ফউজ ও ফরাসী সৈন্যদল হায়দার আলীর লশকরের সাথে মিলিত হয়ে হামলা করলো পণ্ডিচেরীর উত্তর-পশ্চিমে পরমোকলের পাহাড়ি কেল্লার উপর। জেনারেল আয়ারকুট কেল্লা মুহাফিজ ফউজের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন, কিন্তু করংগলি পৌঁছে খবর পেলেন যে, মহীশূরের ফউজ কেল্লাটি দখল করে নিয়েছে। জেনারেল আয়ারকুট মহীশূরের সেনাবাহিনীর রসদ ও বারুদের ভাণ্ডার হস্তগত করবার উদ্দেশ্যে আর্নির দিকে চললেন, কিন্তু হায়দার আলী ইংরেজদের অগ্রগতির খবর পেয়েই টিপুকে পাঠালেন তাদের পথরোধ করতে। ২ জুন ভোরবেলা জেনারেল আয়ারকুটের ফউজ একদিকে টিপুর লশকর ও ফরাসি সেনাদলের গোলাবর্ষণের মোকাবিলা করছিলো, অপরদিকে হায়দার আলী এগিয়ে এসে পেছন থেকে তাদের উপর হামলা করলেন। জেনারেল আয়ারকুটের ফউজ ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের বহু গাড়ি ফেলে পলায়ন করলো। স্যার আয়ারকুট যেমন ক্ষিপ্রগতিতে মহীশূরের শক্তি পরীক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তার চাইতেও ক্ষিপ্রতর গতিতে তিনি ফিরে চললেন মাদ্রাজের পথে।

৫

যুদ্ধের জামানায় মোয়াযযম আলী মনে মনে অনুভব করছেন যে, ফউজী শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক হিসাবে তিনি খোদাদাদ সালতানাতের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন। ফউজী শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ছাড়া সেরিঙ্গাপট্টম কেল্লার সম্প্রসারণ ও নতুন ঘাঁটি নির্মাণের কাজও সঁপে দেওয়া হয়েছে তার উপর। যেসব নওজোয়ান ফউজী মাদ্রাজ থেকে শিক্ষা শেষ করে মহীশূর ফউজে শামিল হয়েছে, তাদের কাছ থেকে তার হাতে আসে বহু চিঠিপত্র। তারা এখন বিভিন্ন ময়দানে যুদ্ধ করছে দুশমনের বিরুদ্ধে। তথাপি পীড়ন করে তার অন্তর, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সিদ্দীক আলী হয়েছেন মহীশূরের এক জঙ্গি জাহাজের ক্যাপ্টেন। মোয়াযযম আলী তার সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক খবর পাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তার ছোট মামদুহ আলী শিক্ষা সমাপ্তির পর শামিল হয়েছেন স্থলবাহিনীতে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে মোয়াযযম আলী বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সামনে তার বিদায় ভাষণ দিচ্ছেন। তার তৃতীয় পুত্র আনওয়ার আলী বিদায়ী শিক্ষার্থীদের অন্যতম। তিনি বললেন

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সৌভাগ্য আমার মনে জাগিয়ে তুলছে ঈর্ষা। ইজ্জতের জিন্দেগি ও ইজ্জতের মওতের পথ যুক্ত যেখানে, সেই সরজমিনে জন্ম নিয়েছো তোমরা। যে শাসকের দৃষ্টি দোস্ত ও দুশমনের পার্থক্য করতে পারে, তারই ফউজের সিপাহী হতে চলেছো তোমরা। এ যুগের শ্রেষ্ঠ জেনারেলদের নির্দেশে তোমরা যৌবনদীপ্ত শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে যাচ্ছো। আমার চুল আজ সফেদ হয়ে চলেছে, কিন্তু এমন এক দিন ছিলো যখন আমার শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ নয়, বিজলীপ্রবাহ বয়ে যেতো। যৌবনে আমার সবচাইতে বড় খাহেশ ছিলো, আমি হবো এক বিজয়ী বীরের বিজয় গৌরবের হিসসাদার। কিন্তু আমি এমন এক সরজমিনে চোখ মেলেছিলাম, যেখানে আজাদিপ্রিয় মানুষের জন্য নির্ধারিত ছিলো কয়েদখানার সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কুঠরি কওম ও ওয়াতানকে ভালোবাসেন যারা তাদের জন্য ছিলো ফাঁসির রজ্জু; যেখানে কওমের বীর শহীদদের লাশ পিষ্ট হতে পায়ের তলায় এবং মিল্লাতের দুশমনের জন্য সাজানো হতো হুকুমাতের মসনদ।

কিন্তু তোমরা এমন সব সিপাহসালারের নেতৃত্বে লড়াই করবার মওকা পেয়েছো, যাদের ঘোড়ার রাখাল হওয়াকেও আমি মনে করি সৌভাগ্য। শাহজাদা ফতেহ আলী টিপুর বিজয় কাহিনী শুনে আমার দীলে বারবার ধারণা জাগে ঃ আহা! আমি যদি

এখানে পয়দা হতাম। আমার শৈশব, আমার যৌবন আর আমার বার্ধক্য যদি তারই সাথে কাটতো! এক কাফেলার এর চাইতে বড়ো খোশকিসমতি আর কি হতে পারে যে, তার আমীর নিজস্ব গন্তব্য পথের চড়াই-উতরাইয়ের দিকে রাখেন সতর্ক নজর। যার সিপাহীসালার এক বিশেষ মকসাদের জন্য কোরবানী দিতে প্রস্তুত, সে সিপাহীর জন্য এর বড়ো ইনাম আল্লাহর তরফ থেকে আর কি হতে পারে? আমি দোয়া করছি, তোমাদের বীরত্ব ও হিম্মৎ নওয়াব হায়দার আলী ও শাহজাদা টিপুর উচ্চ সংকল্প সফল করবার সহায়ক হোক। তাহলে আমার মেহনত ব্যর্থ হয়নি মনে করে আমি গর্ববোধ করতে পারবো।'

এক হফতা পর আনওয়ার আলী হায়দার আলীর নামজাদা জেনারেল গাজি খানের নেতৃত্বে লড়াইয়ের ময়দানে রওয়ানা হয়ে গেলো। তার পরিচালনায় ছিলো পঞ্চাশজন সওয়ার। এরপর ঘরে মোয়াযযম আলী ও ফরহাত সকল আকর্ষণের কেন্দ্রে ক্ষুদ্র বালক মুরাদ। মুরাদ আলী ভাইদের মধ্যে সবচাইতে মেধাবী। তার শখ ও দুষ্টুমি হলো তার বাপ-মা, ভাই, নওকর ও পড়শীদের আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু একে একে তিন ভাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর তার হাসি-কোলাহল মুখরিত জিন্দেগিতে অনুভব হতে লাগলো এক বিপুল শূন্যতা। ভাইরা যখন কাছে ছিলেন, তখন মকতব থেকে ফিরে আসার পর তার সারাটা দিন কেটে যেতো খেলাধুলায় কিন্তু এখানে তার অবকাশ মুহূর্তগুলো কাটাতে লাগলো মায়ের কাছে কাছে।

মোয়াযযম আলীর পুত্রেরা নিয়মিত চিঠি লেখেন তার কাছে। মুরাদ আলীর সম্পর্কে তারা জানতে চান। ওর স্বাস্থ্য কেমন? এখনো তেমনি দুষ্টুমি করে, না কিছুটা ধীরস্থির হয়েছে? মহল্লার ছেলেদের সাথে এখনো মারামারি করে কি? সাবেরের সাথে এখনো ওর ঝগড়া চলছে? ওকে খুবই মনে পড়ে।' ফরহাত ছেলেদের চিঠির জওয়াবে লেখেন ঃ মুরাদ আলী এখন খুবই বদলে গেছে– তোমাদের চলে যাবার সাথে সাথে ওর খেয়ালিপনা বিদায় নিয়েছে– আমার একাকীত্ব ওকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে– মকতব থেকে এখন ও সোজা ঘরে চলে আসে– ফউজ শিক্ষা ও কিতাবপত্র ছাড়া ওর তামাম আকর্ষণ এখন যুদ্ধের খবর শোনার দিকে।'

৪

একদিন দুপুরবেলা মোয়াযযম আলী, ফরহাত ও মুরাদ বাড়ির এক কামরায় উপবিষ্ট। আচানক বাহির বাড়িতে শোনা গেলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর সাবের ছুটে আঙিনায় ঢুকে কামরার কাছে এসে বুলন্দ আওয়াজে বললোঃ সিদ্দিক আলী খান এসেছেন।'

মোয়াযযম আলী ও ও ফরহাতের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুরাদ ভাইজান! ভাইজান! বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলো বাইরে। মোয়াযযম আলী ও ফরহাত কামরা থেকে এলেন বারান্দায়। সিদ্দীক আলী মুরাদের হাত ধরে আঙিনায় ঢুকে বাপ মাকে সালাম করলেন। তার মাথায় পাগড়ির বদলে সাদা পট্টি বাঁধা। ফরহাত ভীতি ও উদ্বেগ সহকারে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেনঃ কি হয়েছে বেটা?' তোমার মাথায় পট্টিবাঁধা কেন?'

ঃ আম্মাজান আমি জখমি হয়েছিলাম। জখম অবশ্যি মামুলি। গুলি আমার মাথার খুলি ছুঁয়ে চলে গেছে।'

মুরাদ আলী বললোঃ আম্মাজান, আপনি ভালো করে দেখেননি। ভাইজান খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ মুরাদ ভারী দুষ্টু তুমি। আম্মাজান, আপনি পেরেশান হবেন না। ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে আমার পা দুটো অবশ হয়ে গেছে।'

মোয়াযযম আলী বললেনঃ চলো বেটা! ভিতরে এসে বসো। সাবের খাদেমকে ওর জন্য খানা আনতে বলো।'

সিদ্দীক আলী কামরায় প্রবেশ করলে মোয়াযযম আলী তার কাছে বসিয়ে বললেন ঃ বেটা, আজকাল যে তোমার ঘরে ফিরে আসার মতো ছুটি মিলবে, সে আশা আমি করিনি।'

ঃ আম্মাজান মাত্র দুদিন আমি এখানে থাকবো।'

ঃ এখন তুমি এলে কোত্থেকে?'

ঃ আব্বাজান, আমি সোজা কালিকট থেকে আসছি। মাহের কাছে নৌযুদ্ধে আমি জখমি হয়েছিলাম। আমার জাহাজের উপর হামলা করেছিলো ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজ। তাদের একটি জাহাজ আমি শেষ করে দিয়েছি। তারপর অপর এক জাহাজের গোলাবর্ষণে আগুন লেগে গেলো আমার জাহাজে। আমাদের সাহায্যের জন্য পৌছলো

এক ফরাসি জাহাজ ঠিক সময়মতো। তারা তাড়িয়ে দিলো ইংরেজ জাহাজখানিকে। জ্বলন্ত জাহাজ থেকে আমাদের লাফিয়ে পড়তে হয়েছিল সমুদ্রে। ফরাসি মাল্লারা আমাদেরকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে তাদেরই জাহাজে পৌঁছে দিলো কালিকটে। আমার জখম ছিলো মামুলি। তথাপি কয়েকদিন আমার আরাম করবার প্রয়োজন ছিলো, ছয় সাতদিন আগে ইংরেজ আচানক তেলিচেরী ও মাহে দখল করে হামলা করলো কালিকটের উপর। আমার আফসোস, আমি আমাদের কার্যকলাপের কোনো উৎসাহব্যঞ্জক খবর আনতে পারিনি আপনাদের জন্য। আমি শুধু বলতে পারি যে, দুটি লোক সবার শেষে কালিকটের কেল্লা ছেড়ে এসেছে, তাদের একজন কেল্লার মুহাফিজ আর অপর আমি। আমার বিশ্বাস আমাদের ফউজ খুব শিগগিরই পৌঁছে যাবে এবং অবিলম্বে আমরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবো ওখান থেকে। মাসউদ ও আনওয়ারের কোনো খবর পেয়েছেন?'

ঃ হ্যাঁ ওরা ভালোই আছে। আনওয়ার এখন তাঞ্জোরে পৌঁছে গেছে এবং মাসউদ রয়েছে হায়দার আলীর সাথে। কিছুকাল ধরে আমি চেষ্টা করছি যাতে আমায়ও পাঠানো হয় কোনো ময়দানে। আমি শাহজাদা টিপুর কাছে আবেদন করেছিলাম, কিন্তু এখনো কোনো জওয়াব আসেনি।'

সিদ্দীক আলী বললো ঃ না আব্বাজান! এখন আপনার আরামের প্রয়োজন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার চাইতেও বেশি আরামের প্রয়োজন ছিলো হায়দার আলীর।'

ঃ কিন্তু আব্বাজান, আপনি যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলে এখানে আপনার হিসসার কাজ করবেন কে?'

ঃ আমার জায়গায় কাজ করবার লোক এখন মওজুদ রয়েছেন এখানে।'

তৃতীয় দিন সিদ্দীক আলী বাপ-মা ও ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

৫

এক রাতে আসমান ছিলো নির্মেঘ। মোয়াযযম আলী, ফরহাত ও মুরাদ আলী মাগরিবের নামাজ শেষ করে মুগ্ধকর হাওয়া উপভোগ করছেন আঙিনায় বসে। সাবের দ্রুত এগিয়ে এসে বললো ঃ আসাদ খান আপনার সাথে মোলাকাত করতে এসেছেন।'

আসাদ খান মোয়াযযম আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কয়েক বছর আগে এক লড়াইয়ে জখমি হয়ে ফিরে আসার পর তাকে সেরিঙ্গাপটমের অস্ত্র তৈরির কারখানায় নাজিম পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

মোয়াযযম আলী সাবেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তার সাথে আর কেউ আছেন?'

ঃ জী না।'

মোয়াযযম আলী ফরহাতের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তুমি উপরে চলে যাও। ওকে আমি এখানেই ডাকাচ্ছি।'

ফরহাত উঠে চলে গেলে খানিকক্ষণ পর সাবের আসাদ খানকে নিয়ে প্রবেশ করলো আঙিনায়।

মোয়াযযম আলী সামনে এগিয়ে গিয়ে তার সাথে মোসাফেহা করলেন এবং কুরসি এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ কি খবর? আপনাকে কিছুটা পেরেশান মনে হচ্ছে যেনো।'

আসাদ খান জওয়াব দিলেন ঃ এখখুনি আমার কাছে আর্কটে যাবার হুকুম এলো। হায়দার আলী সেরিঙ্গাপটমের আরো কয়েকজন অফিসারকে ডেকেছেন তার কাছে। মনে হচ্ছে, ওখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরশু বুরহানুদ্দীনের চিঠিতে জানলাম যে, নওয়াব সাহেবের শরীরও অসুস্থ।'

মোয়াযযম আলী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কবে যাচ্ছেন?'

ঃ আমি এখখুনি রওয়ানা হয়ে যাবো। কেবল আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতেই এসেছি এখানে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ খোদা ওকে স্বাস্থ্য দান করুন। এই মুহূর্তে হায়দার আলীর স্বাস্থ্যের চাইতে বড়ো প্রয়োজন মহীশূরের আর কিছুতেই নেই।'

আসাদ খান বললেন ঃ আপনার ছেলেদের কাছে কোনো পয়গাম পাঠাতে চান?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ হায়দার আলীর ক্যাম্পে হয়তো মাসউদ

আলী ছাড়া আর কারুর সাথে দেখা হবে না আপনার। আজকাল সিদ্দীক আলী হয়তো বাঙ্গালোরে, আর আনওয়ার আলী আমায় জানিয়েছে যে, তাকে তাঞ্জোরে পাঠানো হচ্ছে। মাসউদ আলীর সাথে দেখা হলে আমাদের কুশল জানাবেন।'

মুরাদ আলী বললো ঃ চাচাজান! ভাইজানকে আরো বলবেন, যেনো তিনি কদিনের ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। আম্মা তাকে খুব মনে করেন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ শাহজাদা টিপুকে আমি গত হফতায় এক চিঠি লিখেছিলাম। এখনো তিনি কোনো জওয়াব দেননি। আপনি তো তার খুব ঘনিষ্ঠ; তাকে একবার মনে করিয়ে দেবেন আমার চিঠির কথা। যুদ্ধে শরীক হবার এজাযত চেয়ে আমি আবেদন করেছিলাম তার কাছে।'

আসাদ খান উঠে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন ঃ আমি তাকে অবশ্যি বলবো, কিন্তু আমার বিশ্বাস বেশি প্রয়োজন না হলে শাহজাদা টিপু আপনাকে কোনো ময়দানেই পাঠাতে চাইবেন না। তিনি অনুভব করেন যে, সেরিঙ্গাপটমেই আপনি বেশি কল্যাণকর কাজ করতে পারছেন।'

আসাদ খান বেরিয়ে গেলে মুরাদ আলী বললো ঃ আব্বাজান, আমায় কবে পাঠাবেন লড়াইয়ের ময়দানে?'

মোয়াযযম আলী তার বাহু আকর্ষণ করে কোলের উপর বসিয়ে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ বেটা সিপাহী হবার যোগ্য যেদিন তুমি হবে, সেদিন আমার কাছে এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হবে না তোমার।'

মুরাদ আলী বললো ঃ আব্বাজান, আমি কেবলই ভাবি, আমি বড়ো হতে হতে লড়াই খতম হয়ে যাবে, তখন আমি কি করবো?'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ বেটা লড়াই যখন খতম হয়ে যাবে তখন তোমরা গড়ে তুলবে এক সুখী আজাদ কওম। আমাদের আজাদির দুশমনরা যেসব শহর ও বস্তি বিরাণ করে দিয়েছে, পুনরায় তা আবাদ করে তুলবে তোমরা। তোমাদের জন্য থাকবে এই খোদাই ও দেশের জমিনকে শস্য-শ্যামল করে তুলবার কাজ। বেটা তুমি দোআ করতে থাক, যেনো তোমার ভাইয়া বিজয়ের ঝাণ্ডা উড়িয়ে ফিরে আসে ঘরে আর তোমাদের ভাগ্যে আসে যুদ্ধের ক্লেশের বিনিময়ে বিজয়ের প্রাচুর্য।

৪

মহীশূরের ফউজ আর্কটের কয়েক মাইল দূরে তাঁবু ফেলেছে। হায়দার আলী এক খিমার মধ্যে রোগযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। মালাবার অভিযানে যাবে যে লশকর তাদের দেখাশুনা করার পর বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য টিপু এসে ঢুকলেন তাঁবুর মধ্যে। হায়দার আলীর ইশারায় হাকিম ও শুশ্রূষাকারীরা বাইরে চলে গেলে তিনি টিপুকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ফতেহ আলী বসো। আজ আমার অনেক কথাই বলবার আছে তোমার কাছে।' টিপু তার শয্যাপার্শ্বে এক কুরসির উপর বসে পড়লেন এবং খানিকটা ইতস্তত করে হায়দার আলী তাকে বললেন ঃ বেটা তুমি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে চলেছো। মালাবারের বন্দরগুলোকে ইংরেজের দখল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া খুবই জরুরি। লড়াই সম্পর্কে বিশেষ আমি তোমায় কোনো নসিহত করতে পারছি না। তোমার শৌর্যবীর্য সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্য আমি গর্ববোধ করি, দেশের হুকুমাত ও রাজনীতি সম্পর্কে আমার নসিহতের প্রয়োজন নেই তোমার। আমি একটি নিরক্ষর মানুষ, কিন্তু তুমি এ দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামার প্রথম সারিতে দাঁড়াতে পার। আমার জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো আকাঙ্ক্ষা ছিলো আমার বেটা হবে তার জামানার শ্রেষ্ঠ সিপাহী, শ্রেষ্ঠ আলেম ও সর্বোত্তম শাসক। আল্লাহর শোকর, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন কিন্তু আমার দীলের উপর চেপে রয়েছে এক বোঝা.........।'

'এই পর্যন্ত বলে হায়দার আলী খামোশ হয়ে গেলেন। টিপু বললেন ঃ আব্বাজান আমার তরফ থেকে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে তা আমায় বলে দিতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করা উচিৎ হবে না আপনার। আমি ওয়াদা করছি, আমি নিজেকে সংশোধন করে নেবো।'

হায়দার আলী জওয়াব দিলেন ঃ না বেটা তুমি হামেশা আমার উচ্চতম প্রত্যাশা পূরণ করেছো। আমার কেবলমাত্র আফসোস, আমার হিস্সার কাজ আমি করতে পারিনি। মওতের আগে হিন্দুস্তানকে দেখতে চেয়েছিলাম ইংরেজদের কবলমুক্ত-পবিত্র ভূমি কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা বুঝি আর পূরণ হলো না।'

বিষণ্ণকণ্ঠে টিপু বললেন ঃ আব্বাজান, আপনার এ আকাঙ্ক্ষা অবশ্যি পূর্ণ হবে।'

হায়দার আলী মহব্বৎভরা দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ টিপু সম্ভবত কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে আমি তোমার সাহায্যের জন্য পৌঁছে যাব মালাবার, কিন্তু হতে পারে এই আমাদের শেষ মোলাকাত। তাই আমি যা বলতে চাই, মন

দিয়ে শোন। আমার জিন্দেগির আর একটি ব্যর্থতা, নিজাম ও মারাঠা শক্তিকে আমি সোজা পথে আনতে পারিনি। আমরা ইংরেজের সাথে হিন্দুস্তানের আজাদি নিয়ে সওদা করতে পারিনি, তাই তারা আমাদের দুশমন। মারাঠাদের সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ মোগল সালতানাতের পতনের পর হিন্দুস্তানকে তারা মনে করেছে শিকারভূমি এবং এ দেশে অপর কোন শক্তির উত্থান তারা কল্পনা করতেও চায় না। নিজাম আমাদের এক শক্তিশালী সমর্থক হতে পারেন, কিন্তু হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ভবিষ্যতের প্রতি যাদের কোনো আকর্ষণ নেই তেমনি সুযোগসন্ধানী লোকদের খেলনায় পরিণত হয়েছেন তিনি। বর্তমান মুহূর্তে ফরাসিরা নিঃসন্দেহে আমাদের সমর্থক, কিন্তু তারা হামেশা দোস্ত থাকবে এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করা আমাদের উচিৎ হবে না। ইংরেজের সাথে দুশমনির দরুন তারা আমাদের সাথে থাকতে রাজি হয়েছে, কিন্তু যদি ইংরেজদের সাথে তাদের সন্ধি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের নিঃসঙ্গ ফেলে যেতে দ্বিধা করবে না তারা। মুহম্মদ আলীর অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান। তার দোস্তি - দুশমনির উপর আমি কোন গুরুত্বই দেই না। তিনি ইংরেজের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি মাত্র। যদি আমরা কোনোদিন ইংরেজকে হিন্দুস্তানের বাইরে তাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে তার মতো আত্মার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত মানুষের কোনো স্থান থাকবে না এ দেশে। আমার জিন্দেগির বেশিরভাগ সময় কেটেছে লড়াইয়ের ময়দানে, কিন্তু যে লড়াইয়ের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে এ দেশের আজাদি, আজো তার ফয়সালা হয়নি। আমার পর তোমার চালিয়ে যেতে হবে এ লড়াই কিন্তু এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে সাফল্য লাভ করার জন্য সামগ্রিক চেতনার অভাব রয়েছে মহীশূরে। মহীশূরকে তুমি বানাতে চাও হিন্দুস্তানের শেষ প্রতিরোধভূমি এবং তুমি আশা করছো যে, মুসলমান আওয়াম তোমার আহ্বানে সাড়া দেবে, কিন্তু আমার আশঙ্কা রয়েছে আওয়ামের আগে তোমার বোঝাপড়া করতে হবে স্বার্থলিপ্সু উমরাহর সাথে, যারা ইসলামের আওয়ামকে মনে করে তাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমর্থক।'

টিপু জওয়াব দিলেন, 'আব্বাজান, হিন্দুস্তানের মুসলমান যদি তাদের বিভ্রান্তির দরুন অভিশপ্ত কওমে পরিণত না হয়ে থাকে এবং আল্লাহ যদি তাদের সংশোধনের মওকা দিতে চান তাহলে তারা আমাদের ডাকে সাড়া দেবে। যেসব অমুসলমান এ দেশকে ইংরেজের গোলামী থেকে বাঁচাতে চায় তারাও সাড়া দেবে আমাদের ডাকে। কিন্তু তারা যদি আত্মহত্যা করতেই চায় তাহলেও ইংরেজের গোলামী আমাদের ভাগ্যলিপি হবে না। যে মকসাদ আমাদের ব্যক্তিজীবনের চাইতে অনেক অনেক উন্নত, তারই জন্য কোরবান হয়ে যাবো আমরা। আমাদের বিজয় হবে মানবতার বিজয় এবং আমাদের পরাজয় হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই পরাজয়, যারা এখতিয়ার করেছে যিল্লতের পথ।'

হায়দার আলী বললেন ঃ বেটা, আমি তোমায় হতাশ করতে চাই না। আমি শুধু তোমায় বলতে চাই তোমার পথে রয়েছে কতো দরিয়া, কতো পাহাড় এবং তোমায় মনজিলে পৌছতে অতিক্রম করতে হবে কতো কঠিন পর্যায়। হুকুমাত তোমার জন্য কুসুমাস্তরণ নয়, কন্টকশয্যা।'

টিপু বললেন ঃ মহীশূরের শাসক আল্লাহ সালামত রাখুন। আব্বাজান, বর্তমান মুহূর্তে আমি আপনার ফউজের এক সাধারণ সিপাহীমাত্র। মালাবারের ময়দানে আমি আপনার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবো। এ-ই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য।'

হায়দার আলী বললেন ঃ আমি প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে তোমার জন্য দোআ করছি।'

শাহজাদা টিপু বললেন ঃ আব্বাজান চিকিৎসকের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলা আপনার উচিত। সুস্থ হবার আগে সফর করা আপনার ঠিক হবে না, এ তাদের সবারই রায়।'

হায়দার আলী বললেন ঃ চিকিৎসকের পরামর্শ আমি কোনো বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখিনি, কিন্তু এখন তারা সে পরামর্শ না দিলেও শয্যাগ্রহণ ছাড়া কোনো চারা নেই আমার।'

ঃ আব্বাজান আপনি খুব শিগগিরই ভালো হয়ে যাবেন। এবার আমায় এজাযত দিন।'

মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে হায়দার আলী বললেন ঃ বেটা যাও। খোদা তোমার সাথে থাকবেন।'

কিছুক্ষণ পর বিশ হাজার দক্ষ সিপাহীর এক বিরাট ফউজ এগিয়ে চললো মালাবারের পথে।

নভেম্বরের তৃতীয় হফতায় শাহজাদা টিপুর সেনাবাহিনী মালাবারে রামগলির দরজায় করাঘাত করলো। তার আগমন সংবাদ পেয়েই হাম্বার্স্টোনের নেতৃত্বে ইংরেজ ফউজ পলায়নের পথ ধরলো। টিপু তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং রামগলি থেকে কয়েক মাইল দূরে হামলা করলেন তাদের উপর। হাম্বার্স্টোন মহীশূর-সিংহের মোকাবিলা না করে পলায়নই ভালো মনে করলেন। রাতের বেলা হাম্বার্স্টোনের ফউজ দরিয়া পার হয়ে চললো পুনানীর দিকে। ইতিমধ্যে কর্নেল ম্যাকলিয়ডের নেতৃত্বে ইংরেজদের আর একটি ফউজ হাম্বার্স্টোনের সাহায্যের জন্য পৌছলো। টিপু পুনানীর নিকটে অবরোধ বেষ্টনের ব্যবস্থা করে চূড়ান্ত হামলার ব্যবস্থা করেছেন, এমনি সময়ে তার কাছে পৌছলো হায়দার আলীর ওফাতের খবর।

উনিশ

মাদ্রাজের গবর্নর তার দফতরে জেনারেল স্টুয়ার্টের সাথে আলোচনা করছেন। তার সামনে টেবিলের উপর খোলা আছে এক নকশা। গভর্নরের সেক্রেটারীর কামরায় প্রবেশ করলেন নওয়াব মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহকে সাথে নিয়ে। গভর্নর ও জেনারেল স্টুয়ার্ট উঠে দাঁড়ালেন। মোহাম্মদ আলী ঝুঁকে পড়ে সালাম করে মোসাফেহা করার পর গবর্নরের ইশারায় বসে পড়লেন এক কুরসির উপর। মোহাম্মদ আলীর মুখে আমীরসুলভ দীপ্তি ও প্রশান্তির পরিবর্তে ফুটে উঠেছে লোলুপতা ও উদ্বেগ পুরোযোচিত ভাবগাম্ভীর্যের পরিবর্তে ফুটে উঠেছে শৃগালের মতো ধূর্ততা ও নীচতার চিহ্ন। তার মাথার ভারী আমামা ও দামি জুব্বা তার শান-শওকত না বাড়িয়ে বরং একটা অপ্রোয়োজনীয় বোঝা হয়ে উঠেছে তার কাছে।

কুরসির উপর বসেই তিনি গবর্নরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হুজুরেওয়ালা! জেনারেল স্টুয়ার্ট এখনো রয়েছেন এখানে? আমার ভয় হচ্ছে, এবারকার সুযোগ আমরা হারিয়ে বসবো, খোদার কসম, আর দেরি করবেন না। সেরিঙ্গাপটমে আমাদের বন্ধুরা আপনাদের ফউজের আগমন প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রয়েছে। দুশমনদের অবস্থা সামলে নেবার মওকা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

গবর্নর বিদ্রুপ হাসি সহকারে মোহাম্মদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ নওয়াব সাহেব দুশমনকে দুর্বল বা নির্বোধ মনে করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

মোহাম্মদ আলী পেরেশান হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ আমি আপনার মতলব বুঝতে পারছি না।'

ঃ আমার মতলব হচ্ছে, আপনার খবর সব ভুল। টিপুর বিরুদ্ধে আপনার বন্ধুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তারা সব গ্রেফতার হয়েছে এবং টিপু সালতানাতের মসনদে মজবুত হয়ে বসেছেন।'

মোহাম্মদ আলী কিছুক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে গবর্ণর, তার সেক্রেটারী ও জেনারেল স্টুয়ার্টের দিকে তাকালেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ জনাবেওয়ালা আপনার ফউজ হায়দার আলীর মৃত্যুর খবর পেয়েই সেরিঙ্গাপটমের দিকে এগিয়ে গেলে বিদ্রোহীদের উদ্যম বেড়ে যেতো এবং টিপুর তখতে বসার মওকাই মিলতো না।'

জেনারেল স্টুয়ার্ট বললেন ঃ খোদার শোকর, তেমন নির্বুদ্ধিতার পথে আমরা যাইনি, নইলে আমাদের ধ্বংস ছিলো নিশ্চিত।'

ঃ কিন্তু টিপুকে নিশ্চিত মনে প্রস্তুতির মওকা দেওয়া ভুলই হয়েছে। যদি আপনারা সেরিঙ্গাপটমের দিকে এগিয়ে যেতে তৈরি না-ই ছিলেন, তবু কর্ণাটকের অধিকৃত এলাকা থেকে মহীশূরের ফউজ দূর করে দিতে এমন কি মুশকিল হতো?

জেনারেল স্টুয়ার্ট জওয়াব দিলেন ঃ সবচাইতে বড়ো মুশকিল, আমরা দ্রুত হামলা চালাতে প্রস্তুত নই এবং মহীশূরের সিপাহীরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা মেনে না নিয়ে প্রতিপদে বাধা দিতে থাকবে।'

ঃ তাহলে আপনারা কি করতে চান? আপনার মতো বাহাদুর ও অভিজ্ঞ জেনারেল টিপুকে এতটা ভয় করেন দেখে আমি হয়রান হচ্ছি।'

জেনারেল স্টুয়ার্টের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো, তবু তিনি সংযত হয়ে বললেন ঃ নওয়াব সাহেব, টিপু সম্পর্কে আপনি বড়ো পেরেশান, তা আমি জানি, কিন্তু তিনি এক শক্তিমান ও হুঁশিয়ার দুশমন এবং আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নেবার আগে মহীশূরের উপর হামলা করবার বিপদবরণ করে নিতে পারি না। তিনি যদি আপনার মতো একজন নওয়াব হতেন, তাহলে আমি আমার সিপাহীদের নিয়ে চোখে পট্টিবেঁধে এগিয়ে যেতাম সেরিঙ্গাপটমের দিকে। কিন্তু তিনি এক সিপাহী। নিজের সালতানাতের বেশিরভাগ এলাকা হারাবার পরেও যদি তার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে আপনার, তাহলে আমাদেরকে পরামর্শ না দিয়ে নিজেই যেতে পারেন সিরিঙ্গাপটমের পথে।'

স্টুয়ার্টের ধারণা ছিলো যে মোহাম্মদ আলী আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি হতাশ হলেন। মোহাম্মদ আলীর মুখের উপর খেলে গেলো একটা চাপা হাসি। জেনারেল স্টুয়ার্ট হয়রান হলেন, কিন্তু ইংরেজ গবর্নর ও সেক্রেটারীর কাছে এ হাসি নতুন নয়। মোহাম্মদ আলী কর্ণাটকের শাসক হবার পর প্রত্যেক ইংরেজের কাছ থেকে মার খেয়ে এমনি করে হাসতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তিনি।

গবর্নর জেনারেল স্টুয়ার্টকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ নওয়াব সাহেব এ দেশে আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাই এই পেরেশানি নিরর্থক নয়।'

গবর্নরের মন্তব্য শুনে মোহাম্মদ আলীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাপের চড় খেয়ে শিশু কাঁদতে থাকলে বাপ যেমন মিষ্টির লোভ দেখিয়ে তাকে খুশি করবার চেষ্টা করে, এ যেনো ঠিক তেমনি। তিনি বললেন ঃ জনাব জেনারেল সাহেব বাহাদুর, আমার ধারণা ছিলো, মহীশূরের উপর তীব্র আঘাত হানবার এ এক শ্রেষ্ঠ মওকা এবং আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

জেনারেল স্টুয়ার্ট জওয়াব দিলেন ঃ নওয়াব সাহেব আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমরা তৈরি হচ্ছি এবং এক মাসের মধ্যে আমরা মহীশূরের উপর হামলা চালাতে পারবো।'

ঃ আমার বিশ্বাস, আপনাদের বিজয় অনিবার্য।'

গবর্নর উঠে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন ঃ নওয়াব সাহেব, আপনার পরামর্শের চাইতে আমাদের বেশি প্রয়োজন আপনার দোআ।'

কিছুক্ষণ পর নওয়াব মোহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহ গবর্নরের কামরা থেকে বেরিয়ে গবর্নরের আর্দালী, বেয়ারা, খানসামা ও চাপরাসীদের মধ্যে মুদ্রা বিতরণ করতে লাগলেন এবং তারা তাকে জানাতে লাগলো মোবারকবাদ।

৫

মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বেতে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ এবং ইংরেজের স্থল ও নৌ-বাহিনীর জেনারেলরা মিলিতভাবে সেরিঙ্গাপটমের সহজতম পথ নির্ধারণের জন্য আলোচনা চালাচ্ছেন, টিপু তখন মহীশূরে তার শাসনরশ্মি মজবুত করে নিয়েছেন। সুলতান টিপু যখন হুকুমাত ও ফউজের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিব্রত, তখন বন্দীবাসের দিকে জেনারেল স্টুয়ার্টের অগ্রগতির খবর এলো। তার সাথে সাথে তিনি জানতে পারলেন যে, পুনানী থেকে জেনারেল ম্যাকলিয়ডের সেনাবাহিনী বিডনোরের দিকে এগিয়ে আসছে। ইংরেজদের তৃতীয় ফউজ ছিলো জেনারেল ম্যাথুজের নেতৃত্বাধীনে। তিনি উনোরের আশেপাশে মালাবারের কয়েকটি উপকূলবর্তী স্থান দখল করে নিয়েছিলেন এবং তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যে, বিডনোরের দিকে অগ্রসর হবার আগে পেছন থেকে রসদ ও অস্ত্র সরবরাহের পথ নিরাপদ রাখবার জন্য মালাবারের তামাম উপকূল এলাকা দখল করে নিতে হবে। ফিরে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর হুকুমাত অবিলম্বে বিডনোরের দিকে অগ্রগতির জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। তাদের এ সংকল্পের কারণ, বিডনোরের সুবা মহীশূর সালতানাতের উর্বরতম এলাকা এবং সেখান থেকে কোম্পানির রসদ মিলতে পারে খুব সহজে। তা ছাড়া এলাকাটি সমুদ্রোপকূল থেকে খুব দূরে নয়, তাই সেখানে ইংরেজ তার নৌশক্তির পুরোপুরি সুবিধা নিতে পারে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই হুকুমাতের বিশ্বাস ছিলো যে, বিডনোরের উর্বর এলাকা বিপদের মধ্যে দেখে সুলতান টিপু কোম্পানির শর্তে শান্তি স্থাপন করতে রাজি হবেন।

বিডনোরে প্রতিরক্ষা শক্তির উপর সুলতান টিপুর ছিলো দৃঢ় বিশ্বাস। ইংরেজের যে সেনাবাহিনী জেনারেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বন্দীবাশের দিকে এগিয়ে আসছিলো, তিনি সবার আগে মনোযোগ দিলেন তাদের দিকে। ১৩ ফেব্রুয়ারি বন্দীবাশের নিকটবর্তী স্থানে সুলতান টিপু জেনারেল স্টুয়ার্টের গতিরোধ করলেন। ফরাসী সেনাদল ছিলো সুলতানের সাথী। সুলতানের লশকরের তীব্র গোলাবর্ষণের মুখে জেনারেল স্টুয়ার্ট পিছু হটে যেতে বাধ্য হলেন। জেনারেল স্টুয়ার্ট এতো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি বন্দীবাশ ও করংলীর কেল্লা বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, যাতে মহীশূরের সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ও রসদভাণ্ডার থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। কর্ণাটকের ময়দান আর একবার ছেয়ে গেলো ধুম্রজালে এবং জেনারেল স্টুয়ার্টের পশ্চাদপসরণের ফলে মাদ্রাজে কোম্পানি প্রাসাদসমূহে জেগে উঠলো কম্পন।

কিন্তু ইতিমধ্যে বিডনোরে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সাত সমুদ্দুর পারের বেনের জাত তখন এমন এক জাতিদ্রোহীর সন্ধান করে ফিরছিলো, যার গাদ্দারী তাদের তোপ ও বন্দুকের চাইতে বেশি কার্যকর হবে। এ গাদ্দার ছিলো হায়দার আলীর পালিত পুত্র আয়াজ খান।

বাঙ্গালোরের বন্দরগাহে কিশতির সাহায্যে একখানি ছোট জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদে বোঝাই করা হচ্ছে। সিদ্দীক আলী খান বন্দরগাহে এক ফউজী অফিসারের সাথে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। বয়স পঞ্চাশের কিছুটা বেশি মনে হয়, এমনি হাসি খুশি একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন: আপনার নাম সিদ্দীক আলী খান?'

ঃ জী হ্যাঁ, বলুন।'

ঃ আপনি এ জাহাজের কাপ্তান?'

ঃ জী হ্যাঁ।'

ঃ এ জাহাজ কুন্ডাপুর যাচ্ছে?'

ঃ 'জী।'

প্রৌঢ় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ এখখুনি আমি খবর পেলাম। খোদার শোকর, আমি সময়মতো পৌঁছে গেছি।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ বলুন আমার কাছে আপনার কোন কাজ আছে কি?'

আগন্তুক বললেন ঃ আমরা আপনার সাথে যাচ্ছি।'

ঃ মাফ করবেন, এ জাহাজ যাচ্ছে এক ফউজী অভিযানে। এতে মুসাফিরের জন্য কোন জায়গা নেই।'

আগন্তুক নিশ্চিত মনে বললেন ঃ আমি ফউজদারের সাথে দেখা করে এসেছি। তিনি নিজেই এখানে আসছেন। তিনি আপনাকে তঁর ইন্তেজার করতে বলে দিয়েছেন। '

চার বেহারার একটি খুবসুরত পালকি এবং তার পিছনে আসবাসপত্র বহন করে কয়েকটি লোক সেখানে এসে হাজির হলো। প্রৌঢ় ব্যক্তি সিদ্দীক আলীকে হয়রান ও পেরেশান অবস্থায় ফেলে তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি কিশতির কাছেই পালকি ও সামান নামিয়ে দেওয়ালেন।

লেবাস দেখে পরিচারিকা বলে মনে হয়, এমনি একটি কৃষ্ণাঙ্গী নারী এসে দাঁড়ালো পালকির কাছে। ফউজী অফিসার সিদ্দীক আলীকে বললেন ঃ আপনাদের সফর বেশ চিত্তাকর্ষক হবে, মনে হচ্ছে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ আপনি বলতে চান যে, এবুড়ো তার পুরো খান্দান সাথে নিয়ে আমার জাহাজের সওয়ার হবেন?'

ঃ জী হ্যাঁ। আমার আরও মনে হচ্ছে যে, আপনার জাহাজের শ্রেষ্ঠ অংশটি এদের জন্য খালি করে দিতে হবে। ওই দেখুন, ফউজদার সাহেবও তাশরিফ আনছেন।'

ঃ কিন্তু এ বুযর্গ লোকটি কে?'

ঃ ইনি এলাকার একজন মশহুর ব্যবসায়ী। এর নাম নাসীরুদ্দিন। আগে এর ব্যবসাকেন্দ্র ছিলো কালিকট। ওখানে ইংরেজদের হামলায় প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে এসেছেন এখানে। বিডনোরের সুবাদারের সাথে ওর গভীর সম্পর্ক। কিছুদিন আগে শুনেছি যে, ফউজে ওর ছেলের ভালো চাকরি জুটেছে।'

বাঙ্গালোরের ফউজদার সোজা সিদ্দীক আলীর কাছে এগিয়ে এলেন। ফউজী অফিসার তাকে সালাম করে এক দিকে সরে গেলেন।

ফউজদার সিদ্দীক আলীকে বললেন ঃ আমি আপনার উপর আর একটি জিম্মাদারী দিতে এসেছি।'

ঃ বলুন।'

বেহারা ও মজদুরদের পয়সা দিতে ব্যস্ত নাসীরুদ্দিনের দিকে ইশারা করে ফউজদার বললেন ঃ ওর সাথে আপনার দেখা হয়েছে?'

ঃ জী হ্যাঁ, কিন্তু আমার জাহাজে ওর খান্দানের জন্য কোথায় জায়গা হবে ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি।'

ফউজদার বললেন ঃ এ এক বিস্ময়কর অবস্থা। উনি বিডনোরের গবর্নরের দোস্ত। ওখানে ওর ছেলের কাছে যেতে চান উনি। ওকে জাহাজে কুন্দাপুর পৌছবার ইনতেযার করবার জন্য গবর্নর আমায় লিখেছেন গত হফতায়। কিন্তু উনি যাত্রীবাহী জাহাজে যেতে রাজি নন। ফউজী জাহাজে যেতে তকলিফ হবে, তা আমি ওকে বলেছি। কেন উনি ফউজী জাহাজে যাবার জিদ ধরেছেন, আপনাকে বুঝিয়ে বললে আপনি বলবেন না যে, ফউজী জাহাজে নারীর জন্য কোনো জায়গা নেই।'

ঃ ওর জিদ নিয়ে আমার কোনো তর্ক নেই। অবশ্যি আপনার হুকুম আমার মানতে হবে।'

ফউজদার বললেন ঃ যদি আমি না জানতাম যে, ওর সাহেবজাদি বিডনোরের গবর্ণরের বিবি হবার জন্য ওখানে যাচ্ছেন, তা হলে আমি আপনাকে তকলিফ দিতাম না।'

এক ঘন্টা পরে জাহাজে পাল তুলে দেওয়া হলো। নাসীরুদ্দিনের সাথে তার বেটী ছাড়া আর ছিলো এক পরিচারিকা ও দু'টি নওকর। সিদ্দীক আলী তাদেরকে নিজের কামরায় জায়গা দিতে গিয়ে বললেন ঃ আফসোস, আপনাদেরকে এ

জাহাজে এর চাইতে ভালো জায়গা দিতে পারছি না। আপনারা এক ভীষণ বিপদবরণ করে নিয়েছেন। আজকাল সমুদ্রপথে সফর বিপদমুক্ত নয়। ইংরেজদের জঙ্গি জাহাজ এখন আমাদের উপকূলের আশপাশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে।

নাসীরুদ্দিন বিনয় সহকারে জওয়াব দিলেন ঃ আমরা নিরুপায় হয়ে এসেছি। নইলে আপনাকে তকলিফ দিতাম না।'

৪

পরদিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে নাসীরুদ্দিনের কন্যা তাকে ডেকে জাগালো গভীর ঘুম থেকে। নাসীরুদ্দিন চোখ মলতে মলতে অভিযোগের সুরে বললেন ঃ বেটি! তুমি জানো যে, গতরাত্রে আমার মোটেই ঘুম হয়নি এবং এখনো আমি আধঘণ্টার বেশি ঘুমাইনি।'

বালিকা বললেন ঃ আব্বাজান, আপনি পুরো তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। দেখুন না, সন্ধ্যা হয়ে এলো। মাল্লারা ওদিকে শোরগোল করছে। পরিচারিকা বললো যে, জাহাজের কাপ্তান চোখে দূরবীন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।'

নাসীরুদ্দিন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ এটা এমন কি নতুন কথা? জাহাজের কাপ্তান হামেশা অমনি দূরবীন লাগিয়ে দেখে থাকেন।'

ঃ কিন্তু পরিচারিকা বলছে, তিনি নাকি দূরে কোনো জাহাজ দেখে মাল্লাদের খবরদার থাকবার হুকুম দিয়েছেন।'

ঃ পরিচারিকা কোথায়?'

ঃ আমি ওকে আবার খবর নিতে পাঠিয়েছি। আল্লাহর দিকে চেয়ে আপনিও গিয়ে খবর নিন।'

নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ বেটি! কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকলে কাপ্তান নিজেই এসে খবর দিতেন আমাদেরকে।'

সিদ্দীক আলী দরজায় এসে দেখা দিয়ে বললেন ঃ একটু, বাইরে তশরীফ আনুন।'

ঃ খবর ভালো তো? নাসীরুদ্দিন ঘাবড়ে গিয়ে উঠতে উঠতে প্রশ্ন করলেন।

ঃ পেরেশানির কোনো কারণ নেই?

নাসীরুদ্দিন কামরা থেকে বেরিয়ে এলে সিদ্দীক আলী তাকে কয়েক কদম দূরে নিয়ে বললেন ঃ আমি আপনার সাহেবজাদিকে পেরেশান করতে চাইনি। দুপুরবেলা আমরা এক জাহাজ দেখেছিলাম বহু দূরে। জাহাজ ইংরেজদের না

ফরাসির, তখন তা বুঝতে অসুবিধা ছিলো আমাদের। এখন তার উপর ইংরেজের ঝান্ডা সাফ দেখা যাচ্ছে। রাত এসে যাচ্ছে। অবশ্যি কয়েক ঘন্টার জন্য আমাদের কোনো বিপদ নেই, কিন্তু খুব সম্ভব, ভোর হতেই আমরা দুশমনের তোপের নাগালের মধ্যে এসে যাবো। তাই আমার ইচ্ছা, কিশতিতে করে আপনাদের উপকূলে পৌছে দেওয়া যাক।'

যুবতী নেকাবে মুখ ঢেকে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ কি খবর, আব্বাজান?'

নাসীরুদ্দিন জওয়াব দিলেন ঃ বেটি! কোনো পেরেশানির কারণ নেই। যাও, বসো গে।'

যুবতী বললেন ঃ কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকলে তা আমি জানতে চাই।'

নাসীরুদ্দিন পেরেশান হয়ে সিদ্দীক আলীর দিকে তাকালে তিনি বললেন ঃ দেখুন, আমার ভয় হচ্ছে, ভোর পর্যন্ত আমাদের জাহাজে ইংরেজদের জাহাজ থেকে হামলা না হয়, তাই আমি ফয়সালা করেছি, আপনাদের রাতের মধ্যেই উপকূলে পৌছে দেবো। উপকূল এখান থেকে দূরে নয় এবং এ এলাকার কোথাও কোথাও আমাদের চৌকি রয়েছে। কোনো চৌকি থেকে ঘোড়ার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে হয়তো আপনাদের জন্য।'

যুবতী বললো ঃ রাস্তার কোথাও থামা যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তাতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সফর করবার চাইতে আমরা আপনাদের সাথেই থাকবো।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ কয়েক মুহূর্তের জন্যও আমরা থামতে পারবো না। আমার কাজ হচ্ছে কুলাপুর অস্ত্র পৌছানো। যে কিশতি আপনাদেরকে উপকূলে পৌছে দেবার জন্য নিয়ে যাবে, তাঁর জন্য ইন্তেজার করতেও আমি পারবো না। আমার যে লোক আপনাদের সাথে যাবে, তারাই জমিনের পথে আমাদের সফরের বন্দোবস্ত করে দেবে।'

তরুণী দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ কিন্তু আমরা কিশতিতে যাচ্ছি না। আমি কিশতিতে সওয়ার হবার চাইতে জাহাজে থাকাই বেশি পছন্দ করি।

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ সম্ভবত আপনাদের সামনে পরিস্থিতির সঠিক চিত্র আমি তুলে ধরতে পারিনি। আমি আপনাদের হেফাজতের জিম্মাদারী কবুল করেছি। আমার আশংকা হয়, ইংরেজের যে জাহাজ আমি দেখেছি তা' নিঃসঙ্গ নয়। সম্ভবত আরো দু একটি জাহাজ ভোর পর্যন্ত আমাদের মোকাবিলা করতে আসবে। এ অবস্থায় আপনাদের হেফাজতের সমস্যা আমার কাছে অন্তহীন পেরেশানির কারণ

হয়ে থাকবে। এও হতে পারে যে, আমরা বিনা বাধায় মনজিলে পৌঁছে যাবো, কিন্তু তা বলে বিপদের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না আমি।'

তরুণী বললেন ঃ এ জাহাজে সওয়ার হবার সময়ে কেউ আমাদেরকে বলেনি যে, আপনি যখন ইচ্ছা করবেন, পথে আমাদেরকে নামিয়ে দেবেন। আমাদের আগে নিয়ে যেতে না চাইলে ফিরিয়ে বাঙ্গালোর পৌঁছে দিন।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ মাফ করুন, আমি আপনার সাথে তর্ক করতে চাই না। আমি মেনে নিচ্ছি, এ জাহাজে কোনো মুসাফিরের স্থান দেওয়াই ভুল হয়েছে আমার।'

নাসীরুদ্দিন সিদ্দীক আলীর মনোভাব ও কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তখখুনি কথা বলার প্রয়োজনবোধ করে বললেন ঃ রাজিয়া, কাপ্তান সাহেব আমাদের ভালাইর জন্যই তো বলছেন। ইনি বাঙ্গালোর থেকে আমাদেরকে এ জাহাজে নিতেই রাজি ছিলেন না।'

রাজিয়া বললেন ঃ কিন্তু কাপ্তান সাহেবের এমন কোনো হক নেই যে, তিনি আমাদেরকে বাঙ্গালোর থেকে এনে এক বিরাণ জায়গায় ছেড়ে দেবেন।'

নাসীরুদ্দিন সিদ্দীক আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কাপ্তান সাহেব! আসল কথা হচ্ছে, আমরা অবিলম্বে বিডনোর পৌঁছাতে চাই। আমাদের কাছে বিডনোরের সুবাদারের পয়গাম এসে গেছে। তিনি বাঙ্গালোরের কেল্লাদারকে পয়গাম পাঠিয়েছেন, যাতে আমাদের সফরের দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে। আমার বিশ্বাস, কুন্দাপুরের বন্দরগাহে আমার পুত্র আমাদের ইন্তেজার করবে।'

সিদ্দীক আলী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এর মধ্যে মাল্লা গিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে তাকে বললো ঃ জনাব, মনে হচ্ছে, ইংরেজের জাহাজটি আমাদের দিক ছেড়ে দক্ষিণে ঘুরে যাচ্ছে।

সিদ্দীক আলী কোনো কথা না বলে জাহাজের অগ্রভাগে গিয়ে দূরবীন চোখে ইংরেজের জাহাজটির দিকে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে দেখলেন, নাসীরুদ্দিন তার পেছনে দাঁড়িয়ে।

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ মালুম হচ্ছে, যেনো বিপদ কেটে গেছে। আপনি আপনার সাহেবজাদিকে সান্ত্বনা দিন।'

রাতের বেলা নাসীরুদ্দিন রাজিয়াকে বললেন ঃ বেটা কাপ্তান সাহেবের সাথে তোমার এমনি জবরদস্তির সাথে আচরণ করা উচিত হয়নি। উনি সেরিঙ্গাপটমের এক খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ওর ওয়ালেদকে আমি জানি। তিনি মহীশূর ফউজের এক বহু সম্মানিত অফিসার।'

রাজিয়া বললেন ঃ আব্বাজান আমি ওকে বলতে চাচ্ছিলাম যে, আমি বুযদীল নই'। উনি যখন আপনার কাছে এলেন, তখনই আমি বুঝেছি যে, কোনো ভালো খবর নিয়ে আসেননি উনি। তারপর যখন আপনার সাথে উনি একা কথা বলবার চেষ্টা করলেন, তখন আমি অনুভব করলাম যে, হয়তো ওর ধারণা কোনো বিপজ্জনক খবর শুনেই আমি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করবো। যদি উনি ওর ক্ষমতা না দেখিয়ে নরম কথায় বুঝাতেন তাহলে হয়তো আমি কিশতিতে সওয়ার হতে রাজি হতাম। ওর কথা বলার ভঙ্গিই আমার কাছে বরদাশত করার মতো ছিলো না।'

নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ আমি বুঝেছি, তোমার মকসাদই ছিলো ওকে চটানো। নইলে তোমার মুখ দেখে বোঝা গেছে যে, কিশতি নজদিক হলে তুমি আমার আগেই তাতে সওয়ার হবার চেষ্টা করতে এবং আমি এও বলবো যে, ওর কথাবার্তা খুবই সংযত ছিলো। যাহোক, তোমার তরফ থেকে আমি তার কাছে মাফ চেয়েছি।

ঃ আপনি হয়তো বলেছেন, আমার জিদ বড্ড বেশি।'

ঃ না, আমি বলেছি, কিশতিতে চড়তে তুমি ভয় পাও।'

৪

পথে আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। একদিন খুব ভোরে সিদ্দীক আলীদের জাহাজ এসে দাঁড়ালো কুঞ্জপুরের বন্দরগাহে। কেল্লার সিপাহী ও জাহাজের মাল্লারা মিলে সামান নামাতে ব্যস্ত হলো।

রাজিয়া বাপকে জাগাবার চেষ্টা করে বললেন ঃ আব্বাজান, উঠুন, আমরা বন্দরগাহে পৌঁছে গেছি হয়তো।'

ঃ দেখো বেটি, বিরক্ত করো না।' বলে তার বাপ পাশ ফিরে আবার চোখ মুদলেন।

রাজিয়া আবার তার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন ঃ আব্বাজান, কুঞ্জপুর এসে গেলো বুঝি।'

বাপ আবার অনুনয়ের স্বরে বললেন ঃ খোদার ওয়াস্তে আমায় ঘুমুতে দাও। কুঞ্জপুর এখনো অনেক দূর।'

রাজিয়া হতাশ হয়ে কামরার বাইরে চলে গেলেন।

সিদ্দীক আলী জাহাজের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে সামান নামাতে ব্যস্ত সিপাহী ও মাল্লাদের হেদায়াত দিচ্ছিলেন। রাজিয়া কিছুক্ষণ তার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে

দাঁড়িয়ে বন্দরগাহের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখ দুটি ছাড়া তার মুখমণ্ডলের বাকি অংশ নেকাবে আবৃত। সিদ্দীক আলী একবার তাকে দেখে বিশেষ আমল না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন অপরদিকে। জাহাজে প্রথম আলাপের পর তিনি সব সময়েই চেষ্টা করেছেন তার কাছ থেকে দূরে থাকতে। রাজিয়া কিছুক্ষণ কুণ্ঠিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে সাহস করে সামনে এগিয়ে সিদ্দীক আলীর দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললেন-

ঃ এ কুণ্ডাপুর?'

ঃ জী হ্যাঁ! আমরা রাতের তৃতীয় প্রহরে এখানে পৌছে গেছি।'

ঃ আমাদের খোঁজ খবর করতে কেউ আসেননি? আমার বিশ্বাস, আমার ভাই অবশ্যি এসে থাকবেন।'

ঃ সম্ভবত আপনার ভাই বন্দরগাহের কোথাও রয়েছেন। আমার মনে হয়, আপনারা এ জাহাজে আসতে পারেন, তাই কেউ আশা করেননি।'

রাজিয়া খানিকটা ইতস্তত করে বললেন ঃ খোদার শোকর, আমরা ভালোয় ভালোয় পৌছে গেছি, নইলে আপনি তো আমাদেরকে পথেই নামিয়ে দিচ্ছিলেন।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ কর্তব্য কখনো কখনো অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে। এখানেও হয়েছে তাই। অবশ্যি আপনারা যে তকলিফ থেকে বেঁচে গেছেন, তাতে আমি খুশি হয়েছি। এবার আপনারা সব গুছিয়ে নিন; আপনাদের জন্য কিশতি তৈরি। কেল্লাদারকে আপনাদের আগমন সংবাদ আমি পাঠিয়েছি। তিনি হয়তো আসবেন আপনাদেরকে অভ্যর্থনা করে নিতে।'

রাজিয়া বললেন সেদিন সম্ভবতঃ আমার কথাবার্তায় আপনি মনে কষ্ট পেয়েছেন। আমার ইরাদা ছিলো, এখানে পৌছে আপনার কাছে মাফ চেয়ে নেবো।'

সিদ্দীক আলী বেপরোয়াভাবে বললেন ঃ কথায় হয়তো আমিও আপনার সাথে কম বাড়াবাড়ি করিনি। আহা! আমি যদি আগে জানতাম যে, আপনি সন্ধ্যাবেলায় কিশতিতে সওয়ার হতে ভয় পান।' :-P

ঃ জী, এ কথাটা বিলকুল ভুল।' বলে রাজিয়া সিদ্দীক আলীর চাইতেও তার বাপের উপর বেশি রুষ্ট হয়ে কামরার ভিতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বাপের বাযু ধরে ঝাঁকুনিতে ঝাঁকাতে তিনি বললেন ঃ আব্বাজান, এ আধপাগল লোকটাকে কেন আপনি বলতে গেলেন যে, আমি কিশতিতে সওয়ার হতে ভয় পাই?

নাসীরুদ্দিন উঠে বললেন ঃ মালুম হচ্ছে, আজ তুমি আমায় বিলকুল ঘুমুতে দেবে না।'

কিছুক্ষণ পর নাসীরুদ্দিন রাজিয়া, পরিচারিকা ও নওকরসহ কিশতিতে সওয়ার

হয়ে চলেছেন বন্দরগাহের দিকে। তাদের পিছনের কিশতিতে সওয়ার হয়েছেন সিদ্দীক আলী খান। উভয় কিশতি গিয়ে একই সাথে লাগলো উপকূলে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য সেখানে মওজুদ রয়েছেন কতক অফিসার ও সিপাইসহ কুন্দাপুরের কেল্লাদার। এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে আগে নাসীরুদ্দিনকে, তারপরে রাজিয়াকে ধরে কিশতি থেকে তুলে নিলেন। কেল্লাদার সিদ্দীক আলী খানের সাথে মোসাফেহা করে নাসীরুদ্দিনের প্রতি মনোযোগ দিয়ে বললেন ঃ আমরা আপনাদের সফরের ইন্তেজাম করেছি। চলুন, আগে কেল্লায় নাশতা করে নিন।'

যে নওজোয়ান পিছনে রাজিয়ার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তার দিকে সিদ্দীক আলীর মনোযোগ আকর্ষণ করে নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ খান সাহেব এ আমার বেটা ইফতেখারুদ্দিন।'

ইফতেখারুদ্দিন এগিয়ে এসে পরম উৎসাহে সিদ্দীক আলীর সাথে মোসাফেহা করলেন।

কেল্লাদার সিপাহীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ এদের সব সামান কেল্লায় নিয়ে যাও।'

ইফতেখারুদ্দিন কেল্লাদারকে বললেন ঃ না, না, খানা খাবার পর আমার আরাম করতে হবে। আমাদের এখন আর কোনো জলদি নেই।'

সিপাহীরা সামান তুলে নিলে নাসীরুদ্দিন ও তার সাথীরা তাদের পিছু পিছু চলে গেলেন কেল্লার ভিতরে।

কেল্লাদার সিদ্দীক আলীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আপনি যে এদেরকে সাথে নিয়ে এসেছেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে শোকরগুজার। সুবাদার সাহেব আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে তিনি এদের জন্য একটি খাস জাহাজ পাঠাতে হুকুম দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে মওজুদ ছিলো না কোনো জাহাজ। তারপর তৃতীয় হুকুম এলো যে, এদের সফরের ইন্তেজাম করার জন্য হুকুম পাঠানো হয়েছে বাঙ্গালোরের ফউজদারের কাছে, তাই কোনো খাস জাহাজ পাঠানোর প্রয়োজন নেই। হার সাহেবজাদা এক হফতা ধরে ইন্তেজার করছিলেন এখানে। কিন্তু কাল ভোরে তৃতীয় হুকুম এলো যে, সমুদ্রপথ এখন বিপজ্জনক, এরা এখনো পৌছে না থাকলে স্থলপথে কয়েকজন সিপাহী পাঠিয়ে বাঙ্গালোরের ফউজদারকে হেদায়াত দিতে হবে, যেনো তিনি এদেরকে স্থলপথেই পাঠাবার ইন্তেজাম করেন। হুকুম পেয়েই আমি কয়েকজন সওয়ারকে রওয়ানা করে দিয়েছি বাঙ্গালোরের পথে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ গবর্নর সাহেব বেশ খবর রাখেন। সমুদ্রপথে সফর

সম্পর্কে তার আশঙ্কা অমূলক নয়। আমি পথে ইংরেজদের এক জাহাজ দেখছিলাম। আপনাদের হুঁশিয়ার থাকাই উচিত।

এক নওজোয়ান ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে 'ভাইজান, ভাইজান' বলে সিদ্দীক আলীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সিদ্দীক আলী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ মাসউদ, তুমি কবে এলে এখানে?'

ঃ ভাইজান, তিনদিন ধরে আমি এখানে। এই কেল্লার আশপাশের প্রতিরক্ষা চৌকিগুলোর হেফাজতের জন্য পাঠানো হয়েছে এখানে আমাদেরকে। আমাদের দল এখান থেকে দু'মাইল দূরে তাঁবু ফেলেছে। এখন আপনার অবকাশ থাকলে আমার সাথে চলুন। চাচা আসাদ খান আপনাকে দেখতে পেলে খুব খুশি হবেন।

ঃ তিনি এখানে?'

ঃ হ্যাঁ ভাইজান, তিনিই আমাদের কমাণ্ডার, এ কথা শুনে আপনি হয়রান হবেন। চলুন, আমি তার সাথে আপনার দেখা করিয়ে দেবো।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ এখনো জাহাজে রয়েছে দুটো তোপ। আমি সে দুটো নামিয়ে দিয়েই যাবো তোমার সাথে।'

প্রায় দু'ঘন্টার পর যখন তোপ দুটি জাহাজ থেকে উপকূলে পৌছানো হলো, তখন সিদ্দীক আলী কেল্লাদারকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এবার জাহাজের খাদ্যশস্য বোঝাই করার জিম্মাদারী আপনার। কাল ভোর হবার আগেই আমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে চাই।'

কেল্লাদার বললেন ঃ খাদ্যশস্যের জন্য কয়েকদিন ইন্তেজার করতে হবে আপনাকে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ কিন্তু বাঙ্গালোরের ফউজদার আমায় দ্রুত ফিরে যাবার হুকুম দিয়েছেন। তার নির্দেশ আপনার কাছে পৌছেনি?'

ঃ তার নির্দেশ পাওয়া গেছে, কিন্তু বিডনোরের সুবাদারের হুকুম, তার এজাযত ছাড়া কোনো জিনিস এখান থেকে পাঠানো যাবে না। বাঙ্গালোরের ফউজদারের লিপি আমি তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখনো কোনো জওয়াব আসেনি। চলুন, আপনি কেল্লায়ই থাকবেন। আমি আশা করছি, আজকালের মধ্যে জওয়াব মিলবে তার কাছ থেকে।

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ না, আমার জায়গা হচ্ছে জাহাজ। এখন আমি আসাদ খানের সাথে দেখা করে আসি। চলো, মাসউদ!

মাসউদ আলী বললেন ঃ ভাইজান, আমি পয়দল এসেছি। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে কেল্লা থেকে ঘোড়ার ইন্তেজাম হতে পারে।'

ঃ না, আমি পায়দলই যেতে চাই।'

সিদ্দীক আলী ও মাসউদ আলী সমুদ্রের কিনার দিয়ে কয়েকটি চৌকির কাছ দিয়ে পথ চলে ডান দিকে মোড় ঘুরলেন এবং প্রায় দু'মাইল চলবার পর গিয়ে প্রবেশ করলেন রক্ষীবাহিনীর শিবিরে।

আসাদ খান তার খিমার বাইরে পায়চারি করছিলেন। আচানক সিদ্দীক আলীর দিকে নজর পড়তেই তিনি মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ আরে, তুমি কোত্থেকে?'

ঃ জী, আমি বাঙ্গালোর থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আজই এখানে পৌঁছেছি। এখনই মাসউদের কাছে শুনলাম, আপনি এখানে। আমি শুনে হয়রান হয়েছি যে ..... ।'

আসাদ খান বললেন ঃ বলো, ব্যাপার কি? তুমি খামোশ হয়ে গেলে কেন?

ঃ কিছু না, চাচাজান!'

আসাদ খান বললেন ঃ বাছা তুমি বলতে চাও যে এ বয়সে সিপাহীর লেবাস গায়ে আমায় অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ না চাচাজান, আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, যুদ্ধের ময়দানের বাইরে আপনার খেদমতের প্রয়োজন মহীশূরে আরো বেশি।'

আসাদ খান বললেন ঃ আমায় গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কেবল-পুরির জন্য পাঠানো হয়েছে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ চাচাজান, এ দিয়ে আপনি নিজকে ছোট করছেন। আমি জানি, কয়েক বছর আগেই মহীশূর ফউজের শ্রেষ্ঠ অফিসাররা আপনার ফউজী যোগ্যতার তারিফ করতেন।'

আসাদ খান বললেন ঃ এ হচ্ছে তখনকার কথা, যখন আমার শিরায় প্রবাহিত ছিলো উষ্ণ রক্তধারা। এখন খোদার কাছে দোআ করো যেনো নিজকে এ জিম্মাদারীর যোগ্য প্রমাণ করতে পারি।'

ঃ চাচাজান, যে কোনো জিম্মাদারীর যোগ্য আপনি। শুধু আপনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দোআ করা উচিত আমার।'

আসাদ খান বললেন ঃ ফউজে থেকে আমার স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কবে পর্যন্ত এখানে থাকবে?'

ঃ কাল সকালেই আমি এখান থেকে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন হয়তো আরো দু'একদিন আমায় থাকতে হবে এখানে।'

৪

সিদ্দীক আলী বাকি দিন কাটালেন আসাদ খান ও নিজের ভাইদের সাথে। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে যখন তিনি জাহাজে ফিরে যাবার জন্য আসাদ খানের কাছ থেকে এজাযত নিলেন, তখন মাসউদ তাকে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য সাথে গেলেন।

কেল্লার কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা দেখলেন, ইফতেখারউদ্দিন ফিরে আসছেন বন্দরগাহের দিক থেকে। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে দ্রুত পদক্ষেপে তাদের কাছে এসে বললেন ঃ আমি জাহাজে আপনাকে তালাশ করতে গিয়েছিলাম।'

ঃ কেন, খবর ভালো তো? আমি মনে করেছিলাম, আপনারা বুঝি রওয়ানা হয়ে গেছেন।'

ঃ আমি তো তখখুনি রওয়ানা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আব্বাজান আজ সফর করতে রাজি হলেন না। আমরা ইনশাআল্লাহ কাল খুব ভোরে রওয়ানা হয়ে যাবো। আব্বাজানের ইচ্ছা, আপনি আজ রাতের খানা খাবেন আমাদের সাথে।'

ঃ বহুত আচ্ছা। কিন্তু আমি বেশি সময় আপনাদের সাথে থাকতে পারবো না। রাতেরবেলা আমার জাহাজে থাকা জরুরি।

ইফতেখার উদ্দিন বললেন ঃ আমরা আপনাকে খুব জলদি ছেড়ে দেবো। আব্বাজান আপনাকে সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন আমায়।'

সিদ্দীক আলী মাসউদের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এ আমার ভাই মাসউদ আলী।'

ইফতেখার উদ্দীনমাসউদ আলীর সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ আমার নাম ইফতেখারউদ্দিন। আমি দু'তিনবার আপনাকে দেখেছি বন্দরগাহে। আসুন, আপনিও চলুন আমাদের সাথে। আব্বাজান আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন।'

মাসউদ আলী বললেন ঃ কিন্তু আমায় ফিরে যেতে হবে শিবিরে।'

ইফতেখার উদ্দিন বললেন ঃ আমি আমার নওকরের সাথে ঘোড়ায় আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।'

ইফতেখারউদ্দিনের অনুরোধ এড়িয়ে মাসউদ তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর তারা তিনজন কেল্লার এক কামরায় নাসীরুদ্দিনের সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। রাজিয়া ঠিক সামনের কামরায় আধখোলা দরাজার

আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইফতেখারউদ্দিন ও মাসউদ আলী পহেলা মোলাকাতেই অনুভব করছিলেন যেনো তারা অনেক কালের চেনা।

নাসীরুদ্দিনের এক নওকর কামরায় প্রবেশ করে বললো ঃ কেল্লাদার সাহেব আপনার সাথে মোলাকাত করতে চান। তিনি দরজায় দাঁড়ানো।

নাসীরুদ্দিন উঠে বললেন ঃ তাকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

নওকর বেরিয়ে গেলে কয়েক মুহূর্ত পরে কেল্লাদার কামরায় প্রবেশ করলেন। সিদ্দীক আলী, মাসউদ আলী ও ইফতেখারউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন।

কেল্লাদার বললেন ঃ বিডনোর থেকে সুবাদার সাহেবের দূত এখখুনি পৌছে গেছে এখানে। তিনি তাকিদ দিয়েছেন যেনো আপনারা পৌছে গেলে দ্রুত আপনাদেরকে রওয়ানা করে দেয়া হয়।

নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ তাশরিফ রাখুন। আমরা ইনশাআল্লাহ খুব ভোরে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

আমার ধারণা, খানা খাবার পর আপনারা জলদি রওয়ানা হয়ে গেলে ভালো হতো।

নাসীরুদ্দিন জওয়াব দিলেন ঃ হয়তো সুবাদার সাহেব মনে করেন না যে, খোদা রাতটা বানিয়েছেন আরামের জন্য।

কেল্লাদার বললেন ঃ জনাব, সুবাদার সাহেব মনে করেন, উপকূল এলাকায় প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে এবং এখানে আপনাদের দেরি করা ঠিক নয়।

নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ এ কেল্লা অবশ্যি জাহাজের তুলনায় অনেকখানি নিরাপদ এবং আমরা যে এখানে পৌছে গেছি, তাও সুবাদার সাহেবের জানবার কথা নয়।'

ঃ কিন্তু আপনাদের আগমনের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করছেন, এ কথা ঠিক নয়?'

ঃ যা-ই হোক, রাতেরবেলা সফরের কোনো কথাই উঠতে পারে না। আর যদি এ কেল্লায় আমাদের থাকা আপনার অপছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাঁবুর মধ্যে থাকতেও তৈরি।'

ঃ এ আপনি কি বলছেন জনাব? আপনি হুকুম দিলে গোটা কেল্লা আপনাদের জন্য খালি করে দিতে পারি আমরা।'

ঃ সিদ্দীক আলী প্রশ্ন করলেন ঃ সুবাদার সাহেবের দূত খাদ্যশস্য সম্পর্কে কোনো খবর এনেছে কি?'

ঃ না, খাদ্যশস্যের কথা তিনি কিছু লেখেননি, কিন্তু পেরেশানির কোনো কারণ নেই। নেহাত কাল না এলে পরশু অবশ্যি হুকুম এসে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর তারা কেল্লার প্রশস্ততর একটি কামরায় কতক অফিসারের সাথে একত্রে বসে খানা খাচ্ছেন। দস্তরখানের উপর আলাপ-আলোচনা চলছে বেশ হাসিখুশিতে। কিন্তু কেল্লাদারের মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর।

নাসীরুদ্দিন খানিকক্ষণ গল্প শুনবার পর কেল্লাদারকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনাকে কেমন বিষণ্ণ মনে হচ্ছে, সব খবর ভালো তো?'

ঃ জী, আমি বিলকুল ঠিকই আছি।' তিনি হাসবার চেষ্টা করে জওয়াব দিলেন।

খানা খাবার পর নাসীরুদ্দিন ও তার পুত্র সিদ্দীক আলী ও তার ভাইকে বিদায় দেবার জন্য কেল্লার দরজায় বেরিয়ে এলেন। ইফতেখারুদ্দিনের এক নওকর দাঁড়িয়েছিলো মাসউদ আলীর ঘোড়া নিয়ে।

নাসীরুদ্দিন সিদ্দীক আলীর সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ আমরা খুব ভোরে রওয়ানা হয়ে যাবো। তাই আপনার সাথে মোলাকাত সম্ভব হবে না। তথাপি আমার বিশ্বাস, আমাদের এই মোলাকাতই শেষ নয়।'

রাতের তৃতীয় প্রহরে সিদ্দীক আলী গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তোপের গর্জনধ্বনি ও মাল্লাদের ডাক-চিৎকার শুনে। তিনি ছুটে গিয়ে পৌছলেন জাহাজের অগ্রভাগে। দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে দুটি জাহাজের গোলাবর্ষণের নাগালের মধ্যে এসে গেছে তার জাহাজ।

এক মাল্লা ছুটে তার কাছে পৌছে বললো ঃ আমাদের জাহাজ দুশমনের তোপের নাগালের মধ্যে এবং উত্তরের উপকূল এলাকার চৌকিগুলোর উপর তারা গোলাবর্ষণ করছে বলে মনে হচ্ছে।'

সিদ্দীক আলী জাহাজের নোঙর তুলে পাল উড়িয়ে দেবার হুকুম দিলেন, কিন্তু একটি গোলা জাহাজের মাস্তলে লেগে মাস্তলটি ভেঙে পড়লো। সিদ্দীক আলীর জাহাজের উপর পাতা ছিলো পাঁচটি ছোট ছোট তোপ। তিনি জওয়াবী গোলাবর্ষণের হুকুম দিলেন। কিন্তু দুশমনের বড়ো বড়ো সাজানো দুটি বৃহদাকার জঙ্গি জাহাজ ছিলো তাদের নাগালের বাইরে। দশ মিনিটের মধ্যে সিদ্দীক আলীর জাহাজ ফুটো হয়ে গেলো।

এক মাল্লার চিৎকার করে উঠলো ঃ জাহাজ ডুবে যাচ্ছে।'

মাল্লাদের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার হুকুম দিয়ে সিদ্দীক আলী উপকূলের দিকে তাকিয়ে যা দেখলেন, তাতে তার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেনো জমাট হয়ে গেলো।

কেল্লার তোপগুলো তখন খামোশ হয়ে রয়েছে এবং একটি বুরুজের উপর দেখা যাচ্ছে মশালের আলো। উপকূলের চৌকিগুলোর উপর গোলাবর্ষণরত তোপের অগ্যন্ধার রাতের অন্ধকারে সৃষ্টি করে তুলছে এক বীভৎস বিভীষিকাময় দৃশ্য। ডুবন্ত জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিদ্দীক আলী উপকূলের দিকে সাঁতরে যেতে লাগলেন। কেল্লার দিকে তখনো পরিপূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করছে এবং বুরুজের উপর জ্বলন্ত মশালের গতি নির্দেশ সত্ত্বেও দুশমনের তোপের লক্ষ্য রয়েছে তাদের ভেস্ত জাহাজ দেখে তিনি হয়রান হলেন।

কয়েকজন সাথী ইতিমধ্যেই কিনারে পৌছে গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে বাকি সাথীদের ইন্তেজার করো। তারা কিনারে পৌছলে তোমরা সবাই উঁচু উপকূলের চৌকিগুলোর দিক এসে যেয়ো। চৌকিগুলোর পেছনে রক্ষীবাহিনীর শিবির। আমি ওখানে তোমাদের ইন্তেজার করবো।'

এক মাল্লা বললো ঃ অতো দূরের শিবিরে না গিয়ে আপনি কেল্লার দিকে কেন যাচ্ছেন না? দেখুন, বুরুজের উপর মশাল জ্বলছে। আর মনে হচ্ছে যেনো কেল্লার সিপাহীরা ভাংয়ের নেশা করে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার মনে হয়, কেল্লার মুহাফিজ সারারাত মোটেই ঘুমোয়নি। দুশমনের আগমনের খুশিতে তারা দীপালী উৎসব করছে। তোমাদের জন্য এখন খোলা হবে না কেল্লার দরজা। দুশমন ফউজ যখন আসবে কেল্লা দখল করতে, তখনই তার দরজা খুলবে।'

ঃ আপনি যদি শিবিরের দিকে যেতে চান, তা'হলে কতক লোক নিয়ে যান আপনার সাথে।'

ঃ বহুত আচ্ছা। তোমাদের মধ্যে খুব দ্রুত ছুটতে পারে, এমন দু'জন এসো আমার সাথে।'

রাতের অন্ধকারে শত্রু তোপের অগ্নিবিচ্ছুরণ সিদ্দীক আলীর পথ নির্দেশ করছে। প্রথম চৌকিতে যেয়ে তিনি জানলেন যে, শিবির থেকে রক্ষীবাহিনীর সিপাহীরা এসেছে উপকূল ঘাটিগুলোর হেফাজতের জন্য। সিদ্দীক আলী শিবিরের দিকে যাওয়ার ধারণা ত্যাগ করে আসাদ খানকে খুঁজে বের করবার জন্য সামনে চৌকিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। তার পেছনে ডানে বাঁয়ে কেবল গোলাবৃষ্টি হচ্ছে। তার সাথীরা দু'জন হিম্মৎ হারিয়ে আশ্রয় নিলো কাছেরই এক ঘাটিতে। প্রতিটি চৌকির কাছে গিয়ে তিনি বুলন্দ আওয়াজে ডাক দেন ঃ কমাণ্ডার কোথায়?' জওয়াবে তিনি শুনতে পান ভীত সিপাহীদের আওয়াজ ঃ কমাণ্ডার এখখুনি এখানে

ছিলেন।' কমাণ্ডার সাহেব ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আগে বেরিয়ে গেলেন।'

সিদ্দিক আলী পঞ্চম চৌকিতে পৌছে তেমন ডাক দিলেন। রাতের অন্ধকারে ভেসে এলো মাসউদের আওয়াজ ঃ ভাইজান, ভাইজান, কমাণ্ডার সাহেব আগের ঘাঁটিতে। তিনি জখমি হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ঘোড়া থেকে।'

ঃ মাসউদ! মাসউদ!!' সিদ্দীক আলী এগিয়ে গিয়ে তার বাযু ধরে বললেন আমায় নিয়ে চলো তার কাছে।'

তারা ছুটতে ছুটতে গিয়ে আগের ঘাঁটিতে প্রবেশ করলেন। আসাদ খান জমিনের উপর শায়িত। কতক অফিসার ও সিপাহী জমা হয়ে আছে তার পাশে।

ঃ চাচাজান! সিদ্দীক আলী তার কাছে বসে ভারাক্রান্ত আওয়াজে বললেন।

আসাদ খান ক্ষীণ আওয়াজে বললেন ঃ কে? -সিদ্দীক আলী - তুমি এখানে? কিন্তু তোমার জাহাজ?

ঃ আমার জাহাজ ডুবে গেছে। আপনার জখম তো খুব সাংঘাতিক নয়?'

ঃ আমার জখমের জন্য পরোয়া করো না। আমি আমার মনজিলে পৌছে গেছি।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ চাচাজান, এ পরিস্থিতিতে ফউজকে আগে না নিয়ে পিছু হটানোর প্রয়োজন ছিলো।'

আসাদ খান বললেন ঃ এসব চৌকির হেফাজত ছিলো আমার ফরজ।'

সিদ্দিক আলী বললেন ঃ শক্তিশালী তোপ ছাড়া চৌকির সিপাহীরা কিছু করতে পারে না। সে তোপ আপনাদের কাছে নেই।'

আসাদ খান বললেন ঃ চারটি বড়ো তোপ ছিলো আমাদের কাছে। কেল্লাদারের অনুরোধে এখানে পৌছতেই আমি তা কেল্লার ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার পাশে জমা হবার কোনো প্রয়োজন নেই তোমাদের। এখন তোমাদের কর্তব্য রাতেরবেলায় দুশমন যাতে উপকূলে নামবার মওকা না দেওয়া।

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ চাচাজান! দুশমন এখানে ফউজ নামাবে না। তারা জানে কেল্লার আশপাশের এলাকা তাদের জন্য অনেকখানি নিরাপদ।'

আসাদ খান বললেন ঃ তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ দুশমনের জাহাজ যখন আমাদের জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করছিলো, তখন কেল্লার তোপ ছিলো খামোশ। শুধু তাই নয়, বরং কেল্লার মুহাফিজ বুরুজের উপর মশাল জ্বেলে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা সেখানে রয়েছে এবং তোপের লক্ষ্য অপর দিকে থাকবে।'

আসাদ খান আচানক উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বেদনায় কাতরাতে

কাতরাতে শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন ঃ সিদ্দীক আলী! আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। তোমার পরামর্শ কি?'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ আমার বিশ্বাস, এসব ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ দুশমনদের তরফ থেকে নিছক লোক দেখানো ব্যাপার। ওরা ভোরের দিকে নিশ্চিন্ত মনে কেল্লার আশেপাশে তাদের ফউজ নামিয়ে দেবে। কুণ্ডাপুরকে যদি আপনারা বাঁচাতে চান, তাহলে ভোর হবার আগেই কেল্লা দখল করতে হবে আমাদেরকে। আপনি শিবিরের অশ্বারোহী দলকে নির্দেশ দিন যে, এদিকে তাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তারা দুশমনের সামরিক আবেষ্টনের তোপের নাগাল থেকে যেনো দূরে থাকে। তারপর দুশমন যদি কোথাও তাদের ফউজ নামিয়ে দেয়, তখন তাদেরকে কাজে লাগানো যাবে।'

আসাদ খান বললেন ঃ সিদ্দীক, আমার সময় সমাগত। আমি অনুভব করছি যে, খোদা তোমায় এখানে অকারণে পাঠাননি। যতোক্ষণ এখানে আমার স্থান পূরণ করবার জন্য আর কেউ না আসেন, ততোক্ষণের জন্য এ ফউজের পরিচালনার ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করছি।'

ঃ চাচাজান, আমার বিশ্বাস, আপনি ভালো হয়ে যাবেন।' বলে সিদ্দীক আলী সিপাহীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ একে শিবিরের পেছনে কোনো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও। এ জায়গাটি নিরাপদ নয়।'

আসাদ খান বললেন ঃ বেটা, বৃথা সময় নষ্ট করো না। এখন আমার জন্য সব জায়গাই সমান নিরাপদ।'

সিপাহীরা আসাদ খানকে দু'হাতায় তুলে উঠিয়ে নিচ্ছে, অমনি একজন বললেন ঃ জলদি পানি নিয়ে এসো। উনি বেহুঁশ হয়ে গেছেন।'

ফউজী চিকিৎসক জলদি করে নাড়ি পরীক্ষা করে বুকের কাছে কান দিয়ে বললেন ঃ আর ওর পানির প্রয়োজন হবে না।'

৫

সিদ্দীক আলী দেড়শ সিপাহী উপকূলবর্তী চৌকিগুলোর হেফাজতের জন্য রেখে রক্ষীবাহিনীর এক হাজার সিপাহীকে হুকুম দিলেন কেল্লার দিকে এগিয়ে যেতে। ভোরের আলো দেখা দেবার সাথে সাথে দুশমনের জঙ্গি বেড়ের গোলাবর্ষণ থেমে গলো। সিদ্দীক আলীর পরিচালনায় এ ফউজ কেল্লার নিকটবর্তী হলে বুরুজের উপর উড়িয়ে দেওয়া হলো সফেদ ঝাণ্ডা। সিদ্দীক আলী দরবার কাছে গিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ দরজা খোল।'

কিছুক্ষণ ধরে কোনো জওয়াব নেই। তারপর বড়ো ফটকের বদলে পাশের একটি দরজা খুলে গেলো এবং সিদ্দীক আলীর প্রত্যাশার বিরুদ্ধে কেল্লাদার বাইরে এসে বললেন ঃ তোমাদের কমাণ্ডার কোথায়?

সিদ্দীক আলী এগিয়ে এসে বললেন ঃ এ প্রশ্নের জওয়াব দেবার আগে আমি জানতে চাই, এ সন্ধির ঝাণ্ডা আপনি কার হুকুমে উড়িয়েছেন?'

কেল্লাদার জওয়াব দিলেন ঃ আমার কাছে এ ধরনের প্রশ্ন করবার কোনো অধিকার তোমার নেই। তথাপি তোমার তসল্লির জন্য এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি বড়োদের হেদায়েত অনুযায়ী কাজ করছি।'

ঃ আর হামলার সময়ে আপনি বুরুজের যে রোশনি করেছিলেন, তাও হয়তো সেই বড়োদের হেদায়েত মোতাবেক?

ঃ হ্যাঁ।'

ঃ আমি জানতে চাই, সেই বড়ো ব্যক্তিটি কে?'

ঃ এই মুহূর্তে এ প্রশ্নের জওয়াব আমি শুধু ফউজের কমাণ্ডারকেই দিতে পারি। এসব ব্যাপারের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

ঃ বর্তমান মুহূর্তে আমিই এ ফউজের কমাণ্ডার।'

ঃ যদি তাই হয়, তাহলে বিডনোরের গবর্নরের হুকুম তুমি ফউজ নিয়ে এখান থেকে হায়দরগড়ে পৌছে যাও। সেখানে তোমাদের বিস্তারিত পথ নির্দেশ দেওয়া হবে।'

ঃ বিডনোরের গবর্নরের কাছ থেকে এর সত্যতা যাচাই করবার আগে কোনো নতুন পদক্ষেপের জন্য আমি তৈরি নই। এ ফউজ কুণ্ডাপুর হেফাজতের জিম্মাদারি দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং দুশমন যতোক্ষণ না এ কেল্লার পাঁচিল জমিনের সাথে মিশিয়ে দেয়, ততোক্ষণ আমরা কুন্ডাপুরের হেফাজত করবো।

কেল্লাদারের মুখ রাগে ফুলে উঠলো। তিনি বললেন ঃ এ কেল্লার সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এর হেফাজতের চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য।'

আর তুমি এর হেফাজতের যে নয়া তরিকা এখতিয়ার করেছো, তা হচ্ছে রাতের বেলা কেল্লার বুরুজে রোশনির ব্যবস্থা করা আর ভোর হলে সফেদ ঝাণ্ডা উড়ানো'

ঃ আমি যা কিছু করেছি, তার পুরো জিম্মাদারি নিতে আমি তৈরি। আমাদের উপর হুকুম রয়েছে যে, বিপদের সময়ে কেল্লা খালি করে দেওয়া হবে।'

ঃ আরো তোমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে বিপদকালে দুশমনকে জানিয়ে দেবে যে, তাদের মোকাবিলা করবে যে ফউজ, তারা রয়েছে বাইরের শিবিরে।'

ঃ আমার কর্তব্য হচ্ছে নিজের ফউজকে অকারণ প্রাণহানি থেকে বাঁচানো। কিন্তু তোমার মতো উদ্ধত বেআদবের সাথে কথা বলায় কোনো ফায়দা নেই। তোমার কাছে যদি এ সিপাহীদের জিন্দেগির কোনো মূল্য না থাকে, তাহলে তোমরা দুশমনের তোপের সামনে স্বাধীনভাবে সিনা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারো, কিন্তু হায়দরগড় চলে যাবার নির্দেশ আমার কাছে পৌঁছে গেছে।'

এই কথা বলে কেল্লাদার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু সিদ্দীক আলী আচানক এগিয়ে গিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়ালেন এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করে তার সিনার উপর রেখে বললেন ঃ তুমি কেল্লার ভিতরে যেতে পারবে না।'

ইতিমধ্যে পাহারাদার কেল্লার পাশের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলো।

কেল্লাদার বললেন ঃ তুমি হয়তো জানো না, তোমার সিপাহীরা এই মুহূর্তে আমাদের গুলির নাগালের মধ্যে। যদি তুমি পাঁচিলের দিকে চোখ তুলে দেখবার তকলিফ কর, তাহলে তোমার অনেক ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ আমাদের ভুল ধারণা কতোটা দূর হলো তা দেখবার জন্য তুমি মওজুদ থাকবে না। যদি এক মিনিটের মধ্যে কেল্লার দরজা খুলে দেওয়া না হয় তাহলে আমার তলোয়ার তোমার সিনা পার হয়ে যাবে।'

কেল্লাদার তখন সিদ্দীক আলীর কথার চাইতেও বেশি করে অনুভব করছেন তার সিনার উপর তার তলোয়ারের ধার। বিনাদ্বিধায় তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ 'দরজা খুলে দাও।'

দরজা খুলে গেলো। সিদ্দীক আলীর এক হাজার সিপাহী কেল্লায় ঢুকে গেলো তার সাথে সাথে। কেল্লার সিপাহীরা পেরেশান ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দেখতে লাগলো এ দৃশ্য। সিদ্দীক আলী বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ যে দেশের ফউজে থাকে গাদ্দার, সেখানকার লোহার কেল্লাও কোনোদিন নিরাপদ নয়। আমার বন্ধুরা! এ

কেল্লার মুহাফিজ দুশমনের সাথে মিলে গেছে। মহীশূরের ফউজ তোমাদের ও তোমাদের ভাবী বংশধরদের ইজ্জত ও আজাদির জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। মহীশূরের বিজয় হবে এ দেশের ইজ্জতের অধিকারী প্রতিটি মানুষের বিজয়- যে চায় এক ইজ্জতসম্পন্ন কওমের অংশ হিসাবে জিন্দাহ থাকতে। খোদা না খাস্ত যদি মহীশূরের পরাজয় ঘটে, তাহলে তার ফলাফল শুধু মহীশূরের ভিতরেই সীমিত থাকবে না। বরং হিন্দুস্তানের প্রতিটি আজাদি-পিয়াশী মানুষ সেদিন অনুভব করবে যে, তাদের জন্য ইজ্জত ও আজাদির জিন্দেগি যাপন করার সম্ভাবনা চিরতরে খতম হয়ে গেছে। তোমাদের কেল্লাদার দুশমনের হামলার আগেই যথাসময়ে সে সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলো এবং দুশমনের অভ্যর্থনার জন্য কেল্লায় দীপালি উৎসব করেছিলো। তার বুযদীলি ও গাদ্দারীর দরুন আমাদের কতগুলো লোক শহীদ হয়েছে। হায়! প্রত্যেক গাদ্দারকে যদি আমি কেল্লার দরজায় চল্লিশবার করে ফাঁসি দিতে পরতাম! আমি জানতে চাই, তোমাদের মধ্যে কে কে রয়েছে এ ষড়যন্ত্রের শরীক।'

কেল্লার সিপাহীরা কোনো জওয়াব দিলো না।

সিদ্দীক আলী খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ আমি জানতে চাই, তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাথে লড়তে চাও, না বুযদীল ও গাদ্দারের মওত মরতে চাও?'

এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে জওয়াব দিলো ঃ আমরা আছি আপনাদের সাথে।'

আরো কতকলোক তার অনুসরণ করলো এবং তারা একে একে সিদ্দীক আলীর পাশে এসে জমা হতে লাগলো।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ এ কেল্লায় অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই। বারুদের যে ভাণ্ডার আমি নিয়ে এসেছি, তা দিয়ে কম-সে-কম এক হফতা মোকাবিলা করা যাবে দুশমনদের। এর সময়ের মধ্যে আমাদের অস্ত্র সরবরাহ অবশ্যি পৌঁছে যাবে।'

এক নওজোয়ান অফিসার সামনে এগিয়ে এসে বললেন ঃ আমরা আপনার সাথে জান দিতে তৈরী, কিন্তু আমাদের হাতে যে বারুদ রয়েছে, তা একদিনের জন্যও যথেষ্ট নয়। আপনি যে বারুদ জাহাজে বোঝাই করে এনেছিলেন, রাতের হামলার আগেই তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কেল্লাদার দুশমনের সাথে চক্রান্ত করবার পর আমাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। আমরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি, এই আশঙ্কা ছিলো তার।'

ঃ এর অর্থ হচ্ছে, এ লোকটি দুশমনের আসার আগেই কুণ্ডাপুরের কিসমতের ফয়সালা করে ফেলেছিলো। ওকে নিয়ে গিয়ে কেল্লার বাইরে লটকে দাও কোনো গাছের সাথে।

সিদ্দীক আলীর ইশারায় কয়েকজন সিপাহীর উদ্যত সঙ্গিন নিয়ে কেল্লাদারের দিকে এগিয়ে গেলে তিনি তাকে বাইরে নিয়ে যেতে বললেন।

কেল্লাদার চিৎকার করে বললো ঃ বিডনোরের গবর্নর আমার বদলায় তোমাদের প্রত্যেককে ফাঁসিতে ঝুলাবেন। আমি তারই হুকুম তামিল করেছি। আমি দাবি করছি, আমার ব্যাপারে তার হাতে সোপর্দ করা হোক। আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো লোক পাঠিয়ে আমার সম্পর্কে জেনে নাও তার কাছ থেকে, নইলে আমায় পাঠিয়ে দাও বিডনোরে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ তুমি বিডনোরের সুবাদারের ভাই হলেও এ গাদ্দারীর পর তোমার সম্পর্কে কিছু যাচাই করবার প্রয়োজনবোধ করছি না আমি। তুমি মহিমান্বিত সুলতানের ভাই হলেও তোমার সাথে এ আচরণের ব্যতিক্রম হতো না।'

নাসীরুদ্দিন ইফতেখারউদ্দিন ও রাজিয়া নিজ নিজ কামরা থেকে বেরিয়ে এসে অন্তহীন পেরেশানির সাথে দেখছিলেন এ দৃশ্য। ইফতেখারউদ্দিন সিপাহীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন ঃ ভাইরা, এ লোক মিথ্যা কথা বলছে। যে ব্যক্তিকে হায়দার আলী নিজের পুত্র মনে করতেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণের জন্য সে দায়ী। এর জন্য কোনো সাজাই যথেষ্ট নয়। আমি বলতে চাই, এর চক্রান্তে যেসব অফিসার ও সিপাহী শরীক হয়েছে, তাদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হোক।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ আমি এক সিপাহী এবং আমার আব্বা ও বোন আমার ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া পছন্দ করবেন না। আমার সাথে যে দশজন লোক এসেছে, তারাই ওদেরকে বিডানোরে পৌছে দেবার জন্য যথেষ্ট।'

সিদ্দীক আলী এগিয়ে গিয়ে নাসীরউদ্দিনকে বললেন ঃ আমার ইচ্ছা, আপনারা আর সময় নষ্ট করবেন না। আপনি বিডনোর পৌছে গবর্নরকে আমার পয়গাম দেবেন যে, কুণ্ডাপুরের ফউজ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দুশমনের মোকাবিলা করবে।'

নাসীরউদ্দিন বললেন ঃ ওখানে পৌছেই আমি আপনাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহের চেষ্টা করবো।'

অল্পক্ষণ পর কেল্লার দরজার বাইরে ইফতেখারউদ্দিন তার বাপ ও বোনকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। সামনে এক গাছের সাথে তখন ঝুলছে কেল্লাদারের

লাশ।

রাজিয়া ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বললেন ঃ ভাইজান খেয়াল রাখবেন।'

পাঁচিল থেকে সিপাহী বুলন্দ আওয়াজে বললো ঃ সামনে দুটি জাহাজ থেকে কিশতিতে ফউজ নামানো হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম থেকে আরো চারটি জাহাজ আসছে এদিকে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ সিপাহীরা! নিজ নিজ ঘাঁটি সামলাও। সফেদ ঝাণ্ডা নামিয়ে ফেলো। কেল্লার দরজা বন্ধ করো।

ইফতেখারউদ্দিন বললেন ঃ ইংরেজ লড়াইয়ের চাইতে বেশী ভরসা করে চাল ও দাগাবাজির উপর। তাদের কিশতি আমাদের তোপের গোলার মধ্যে এসে গেলে তখন সফেদ ঝাণ্ডা নামিয়ে ফেলাই হবে ভালো।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে আমাদের নীতি তাদের থেকে স্বতন্ত্র। আমি সুলতান টিপুর সিপাহী এবং আমরা ধোঁকাবাজিতে দুশমনের অনুকরণ করলে সুলতান তা কখনো সমর্থন করবেন না। কেল্লাদারের অপরাধের সাজা আমি দিয়েছি। তাহলে তার গাদ্দারীর প্রতিশোধ দুশমনের উপর নিতে পারি না।'

সিদ্দীক আলী পাঁচিলের উপর উঠলেন। দুশমনের জাহাজ থেকে ছয়টি কিশতী তখন কিনারার দিকে আসছে। এক কিশতির উপর উড়ছে সফেদ ঝাণ্ডা। দুশমনকে খবরদার করবার জন্য সিদ্দীক আলী তোপ চালাবার হুকুম দিলেন। তোপের আওয়াজ শুনে কিশতী ফিরে চলে গেলো এবং দুশমনের জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হলো। প্রায় এক ঘন্টা পর দুশমনের অপর জাহাজগুলোও এসে গেলো বন্দরগাহের সামনে।

এই জাহাজগুলো সারাবেলা উত্তর দিকের উপকূল চৌকিগুলোর গোলাবর্ষণ করেছে। কেল্লার মধ্যে শহীদের সংখ্যা সাত ও জখমির সংখ্যা দেড়শ হয়ে গেছে। সিদ্দীক আলী দূরবীণ নিয়ে এক বুরুজের উপর থেকে হেদায়াত দিচ্ছেন তোপচালক সিপাহীদের। ইফতেখারউদ্দিন ছুটে তার কাছে এসে বললেন ঃ দেখুন একটা জাহাজ উপকূলের কাছে আসছে।'

ঃ আমি তা জানি।' সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন কিন্তু ওদিকে তাকাও দুটি জাহাজ পিছু হটে যাচ্ছে। ওর মধ্যে একটি সম্পর্কে আমার বিশ্বাস, ওটি শোচনীয়রূপে বিপর্যস্ত হয়েছে।'

ইফতেখারউদ্দিন বললেন ঃ আমার শুধু আফসোস আমি এখনো এক দর্শকের বেশি কিছু নই! হায়! আমার বন্দুকের গুলি যদি দুশমন পর্যন্ত পৌছতে পারতো।

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ তোমার পরীক্ষার সময়ও আসছে। এ লড়াইয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে তলোয়ার ও বন্দুক দিয়েই।'

সিদ্দীক আলী দূরবীন লাগিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখতে লাগলেন। আচানক তার ডান পাশে একটি ক্ষীণ চিৎকার ও তার সাথেই কারুর পতনের আওয়াজ শোনা গেলো। তিনি ফিরে দেখলেন ইফতেখার মুখ থুবরে পড়ে রয়েছেন। সিদ্দীক আলী তাকে তুলবার চেষ্টা করলে তার হাত রক্তে রঙিন হয়ে গেলো।

ঃ ওকে নিচে নিয়ে যাও।' ভেঙে-পড়া আওয়াজে তিনি বললেন সিপাহীদের।

সিদ্দীক আলী কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে। তারপর দূরবীন লাগিয়ে আবার দেখতে লাগলেন সমুদ্রের দিকে।

কিছুক্ষণ পর তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন এবং একই সঙ্গে কেল্লার কয়েকটি তোপের গর্জনে কেঁপে উঠলো আকাশ বাতাস।

বিশ

বিডনোরের গবর্ণর আয়াজ খান তার মহলের এক কামরায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে নেকড়ের নিষ্ঠুরতা আর মুখে ফুটে উঠছে শৃগালের ধূর্ত। নাসীরউদ্দিন কামরায় প্রবেশ করে বললেন ঃ সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি। কুন্দাপুরের কোনো খবর এসেছে?'

ঃ না, আমার দূত কেন এত দেরি করছে, ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি।'

ঃ আমার মনে হয়, আপনার অস্ত্র সরবরাহ সেখানে পৌছে গেছে।'

ঃ আয়াজ খান জওয়াব দিলেন ঃ অস্ত্র পাঠালেও কোনো ফায়দা হতো না। কেল্লার মুহাফিজকে আমি হুকুম দিয়েছিলাম ফউজ সরিয়ে নিয়ে হায়দরগড়ে যেতে।'

ঃ কিন্তু আমায় তো আপনি এখন বলেছিলেন যে, অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে।'

ঃ ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি কেল্লার হেফাজত নিরর্থক মনে করছি। আমার দুঃখ হচ্ছে, কেল্লার নয়া মুহাফিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য বহু প্রাণহানি হবে অকারণে। আমার আরো আফসোস হচ্ছে, এমন লোকদের কাছে আপনি ইফতেখারউদ্দিনকে ছেড়ে এলেন। যা হোক আপনার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত হবে

না। আমার বিশ্বাস কেল্লার ফউজ এতক্ষণে হায়দরগড়ে পৌছে গেছে। ইফতেখারউদ্দিনকে আমি হুকুম পাঠিয়েছি যেনো সে অবিলম্বে চলে আসে এখানে।'

নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি কুপ্তাপুর খালি করে দেবার হুকুম পাঠিয়ে থাকলে সিদ্দীক আলী আপনার দূতের উপর আস্থা স্থাপন করবেন না। আপনি এত বড়ো ভুল করতে পারেন না এ বিশ্বাস তার হবে না।'

আয়াজ খান দাঁত ঘষে বললেন ঃ সে বে-অকুফকে কোথায় ফাঁসি দেওয়া যাবে, তাই আমি চিন্তা করছি।'

নাসীরউদ্দিন বললেন ঃ তিনি এক দেশপ্রেমিক সিপাহীর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং তিনি সাজা পেতে পারেন না, পেতে পারেন ইনাম। কেল্লাদারের গাদ্দারীর পর ওখানে তার উপস্থিতি এক গায়েবি সাহায্যের শামিল।'

আয়াজ খান বললেন ঃ তশরিফ রাখুন। একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আমি আলাপ করতে চাই আপনার সাথে।'

নাসীরুদ্দিন এক কুরসির উপর বসলে আয়াজ খান তার কাছে বসে খানিকক্ষণ চুপ করে বললেন ঃ এখানে পৌছা মাত্রই আপনাকে পেরেশান করতে চাইনি, কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি যে, আমাদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হওয়া উচিত নয়। কুপ্তাপুরের কেল্লাদার আমার সাথে গাদ্দারী করেনি।'

নাসীরুদ্দিন কয়েক মুহূর্ত আচ্ছন্নের মতো আয়াজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ আপনার মতলব সে আপনারই হুকুম তামিল করেছে?'

ঃ হ্যাঁ'

ঃ আর আপনি হুকুম দিয়েছিলেন বিনা বাধায় কুপ্তাপুর কেল্লা দুশমনের হাতে তুলে দিতে?'

ঃ জী হ্যাঁ।'

নাসীরুদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু আয়াজ খান তার হাত ধরে আবার কুরসির উপর বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমার কথা এখনো খতম হয়নি। যিন্দেগির পথে আমাদেরকে কখনো কখনো এমন সব বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়, যাকে মনে হয় অবিশ্বাস্য। আমরা যে যুদ্ধে হেরে গেছি, এও এক বাস্তব পরিস্থিতি।'

ঃ আপনি তামাশা করছেন।' নাসিরুদ্দীন মানসিক উদ্বেগ সংযত করবার চেষ্টা করে বললেন–

ঃ আমি তামাশা করছি না। মহীশূর সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে পারে না। কুপ্তাপুরের বন্দরগাহে আপনি যে কটি জাহাজ দেখে এসেছেন, তা হচ্ছে

জবরদস্ত সামরিক আবেষ্টনের অগ্রগামী দল। ইংরেজ ফউজ কয়েকদিনের মধ্যে এখানে পৌছে যাবে। মালাবারের তামাম উপকূল এলাকায় তাদের দখল নিশ্চিত। সুলতান টিপু দক্ষিণ ও পূর্বদিকের তামাম এলাকা বিপদের মুখে ঠেলে না দিয়ে এদিকে আসতে পারবেন না।

এখন আমাদের ভাবতে হবে মহীশূরের পরিবর্তে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ।'

নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ আমি আমার ভবিষ্যৎ মহীশূরের সাথে জড়িত করে ফেলেছি।'

ঃ না, আপনার ভবিষ্যৎ বিডনোরের সুবাদারের সাথে জড়িত হয়ে গেছে।'

ঃ কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে যখন ইংরেজের ফউজ .....

আয়াজ খান তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ আপনার হতাশ হবার কারণ নেই। ইংরেজ আমার হাত থেকে বিডনোরের সুবাদারী ছিনিয়ে নেবে না।'

ঃ এহেন পরিস্থিতিতে এখানে আমার জায়গা নেই। ইফতেখারুদ্দিন এখানে পৌছলেই আমি ফিরে চলে যাবো বাঙ্গালোরে।'

ঃ রাজিয়াকে ছেড়ে আপনি কি করে যাবেন?

মুহূর্তের জন্য নাসীরুদ্দিনের যবান আড়ষ্ট হয়ে গেলো। অবশেষে তিনি বললেন ঃ রাজিয়া আমার সাথেই চলে যাবে।'

ঃ না, রাজিয়া এখানেই থাকবে এবং আপনিও থাকবেন এখানেই। আমাদের পরস্পরকে প্রয়োজন রয়েছে। এখন থেকে আপনি বাঙ্গালোরের ধারণাও রাখবেন না। আপনাদের ওখানে পৌছবার আগেই ইংরেজের দখলে চলে যাচ্ছে বাঙ্গালার।'

আমরা আর কোথাও চলে যাবো।'

আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, আপনার সাহেবজাদির জন্য এদেশে বিডনোরের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোনো স্থান থাকতে পারে, তাহলে খুশি হয়ে আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবো। তিনি এই মহলে থাকবার জন্যই পয়দা হয়েছেন। আমার সম্পর্কে আপনার কোনো সন্দেহ থাকলে আমি আজই তাকে করে নেবো আবার জীবনসঙ্গিনী। এ মহলের বাইরে আপনারা কোনো মামুলি গৃহে বাস করবেন, তা হতে পারে না।'

বাইরে পাহারাদারদের কোলাহল শোনা গেলো। এক ব্যক্তি বুলন্দ আওয়াজে বলছেন ঃ আমি এই মুহূর্তে সুবাদারের সাথে মোলাকাত করতে চাই। তোমরা আমার পথরোধ করতে পারবে না। আমি এসেছি কুণ্ডাপুর থেকে।'

আয়াজ খান উঠে দাঁড়ালেন। এক নওজোয়ান এসে প্রবেশ করলেন কামরার মধ্যে। তার ডানে-বাঁয়ে ও পেছনে চারজন পাহারাদারের উদ্যত নাঙ্গা তলোয়ার।

আয়াজ হাত দিয়ে ইশারা করলে তারা পিছু হটে গেলো। নওজোয়ান কয়েক কদম এগিয়ে দাঁড়ালেন আয়াজ খানের সামনে। নাসীরুদ্দিন তাকে দেখেই চিনলেন। নওজোয়ান মাসউদ আলী।

আয়াজ খান প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কুঞ্জপুর থেকে এসেছো?'

ঃ জী হ্যাঁ, ওখানকার অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমাদের বারুদ শেষ হয়ে গেছে। দুশমনের সামরিক আবেষ্টনের আরো পাঁচটি জাহাজ ওখানে পৌঁছে গেছে। তারা কেল্লার আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে তিনবার ফউজ নামাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই আমরা তাদেরকে সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কেল্লার মুহাফিজ এখন আবর্জনা স্তূপের উপর ঘাঁটি বানিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। আমাদের অর্ধেকের বেশী সিপাহী হতাহত হয়েছে। আমাদেরকে খুব শিগগিরই পিছু হটে উপকূলে আগত ফউজের সাথে চূড়ান্ত লড়াই করতে হবে। কিন্তু কাল আমাদেরকে দূতের ছদ্মবেশে কয়েকজন গাদ্দার ওখানে পৌঁছে গেছে এবং তারা আমাদেরকে আপনার তরফ থেকে হুকুম দিয়েছে, যেনো আমরা তিন হিসসায় বিভক্ত হয়ে হায়দরগড়, অনন্তপুর ও ওনোরে চলে যাই। এই অদ্ভুত হুকুম শুনে কমাণ্ডার তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়েছেন এবং আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এর সত্যতা যাচাই করতে।'

আয়াজ খানের মুখ রাগে রক্তিম হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ এখন যদি তোমার বিশ্বাস হয় যে, তিনি তোমায় গাদ্দার মনে করবে না, তাহলে তুমি অবিলম্বে ফিরে গিয়ে তাকে আমার হুকুম জানিয়ে দেবে, যেনো তিনি কুঞ্জপুর খালি করে সোজা আমার কাছে চলে আসেন। তুমি সময়ের অপচয় করো না। তোমার সাথে আর কজন লোক রয়েছে?'

মাসউদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমার সাথে মাত্র দুজন লোক রয়েছে।'

আয়াজ খান পাহারাদারদের বললেন ঃ তোমরা এর সাথে গিয়ে আস্তাবলের দারোগাকে বলো যেনো এদেরকে তাজাদম ঘোড়া দিয়ে দেওয়া হয়।'

পাহারাদাররা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো, কিন্তু মাসউদ আলী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তার দৃষ্টি নাসীরুদ্দিনের দিকে নিবদ্ধ। তিনি অতি কষ্টে বললেন ঃ আমি এখানে পৌঁছেই আপনার সন্ধান করেছি। আপনি ঘরে ছিলেন না। আমার আফসোস কোনো ভালো খবর আমি আপনার জন্য আনতে পারিনি। .... ইফতেখারুদ্দিন শহীদ হয়েছেন।'

ঃ আমি তা জানতাম। নাসিরুদ্দিন নিরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন।'

আয়াজ খান অন্তহীন পেরেশানির দৃষ্টিতে কখনো তাকাচ্ছেন নাসীরুদ্দিনের

দিকে, আর কখনো মাসউদ আলীর দিকে। নাসীরুদ্দিন উঠলেন এবং কোনো কথা না বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আয়াজ খান তার বাযু ধরে বললেন ঃ চলুন আমি আপনাকে ঘরে রেখে আসি।'

নাসীরুদ্দিন বললেন ঃ না। খোদার দিকে চেয়ে আমায় একা যেতে দাও। আমি কয়েক ঘণ্টা একা থাকতে চাই।'

এই কথা বলে নাসীরুদ্দিন বেরিয়ে গেলেন বাইরে। মাসউদ আলী তার পিছু পিছু যাচ্ছিলেন, কিন্তু আয়াজ খান বললেন ঃ নওজোয়ান দাঁড়াও। মনে হচ্ছে তুমি এখনো নাশতা করোনি।'

ঃ নাশতা আমার পথেই মিলবে। আপনার এজাযত পেলে আমি এখখুনি চলে যেতে চাই।'

ঃ তুমি নাসীরুদ্দিনের ঘরেও এ খবর দিয়ে এসেছো?'

ঃ জী হ্যাঁ।

ঃ আবার ফেরার পথে ওখানে যাচ্ছো?'

ঃ জী না। ওকে এখানে না পেলেও খুঁজে বেড়াবার মতো সময় আমার ছিলো না।' ওর বেটার মৃত্যুতে আমার বড়োই আফসোস হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি যাও, আর কুণ্ডাপুরের মুহাফিজকে বলো যে, আমি তার প্রতি যেমন রুষ্ট হয়েছি, তেমনি খুশিও হয়েছি। রুষ্ট হয়েছি এই জন্য যে, তিনি আমার দূতদের গ্রেফতার করেছেন এবং কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন বলে খুশি হয়েছি। কিন্তু এখন কেল্লা খালি করা সম্পর্কে তাকে আমার হুকুম মানতে হবে।'

৫

খানিকক্ষণ পর যখন মাসউদ আলী ও তার সাথীরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুতগতিতে শহরের বাইরে চলে যাচ্ছেন। তখন তাদের সামনে দেখা দিলো এক সওয়ার। তারা নিকটে এলে সওয়ার হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললো ঃ মাসউদ আলী সাহেব দাঁড়ান।'

মাসউদ আলী ঘোড়া থামালে সওয়ার বললো ঃ আমি নাসীরুদ্দিনের নওকর। তিনি আপনার সাথে কিছু কথা বলবেন। আপনি একটুখানি এগিয়ে গিয়ে তার ইন্তেজার করুন।'

ঃ তিনি এখানে আসবেন?'

ঃ হ্যাঁ। চলুন আর একটু আগে চলুন।'

প্রায় আধমাইল চলার পর নওকর বললো ঃ বাস এখানে থামুন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি পৌছবেন।'

মাসউদ আলী ও তার সাথীরা ঘোড়া থেকে নেমে জমিনের উপর বসে পড়লেন। প্রায় আধঘন্টা ইন্তেজার করবার পর মাসউদ আলী বললেন ঃ খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের। এর বেশি ইন্তেজার করতে আমরা পারছি না।'

নওকর বললো ঃ জনাব তিনি আমায় বলে দিয়েছেন যে, আপনার দেরি করা খুব জরুরি। তিনি আরো বলেছেন, আপনাকে রাখতে না পারলে বিডনোর ও মালাবারের ধ্বংস নিশ্চিত।

মাসউদ আলীর এক সাথী শহরের দিকে ইশারা করে বললো ঃ হয়তো কেউ আসছেন।'

মাসউদ আলী উঠে দাঁড়ালেন। এক সওয়ার পূর্ণ গতিতে ছুটে আসছেন। কাছে এলে মাসউদ আলী বললেন ঃ কিন্তু একে তো নাসীরুদ্দিন বলে মনে হচ্ছে না, এযে এক নারী।

নওকর বললো ঃ এ নাসীরুদ্দিনের সাহেবজাদি।'

মাসউদ আলী ও তার সাথীরা পেরেশান হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাজিয়া ঘোড়া থামিয়ে কোনো ভূমিকা না করেই বললেন ঃ চলুন।'

ঃ কোথায়?' মাসউদ আলী প্রশ্ন করলেন।'

ঃ কালীপুর।'

ঃ আপনি আমাদের সাথে যাবেন?'

ঃ হ্যাঁ, আর সময় নষ্ট করবেন না।'

ঃ কিন্তু কুণ্ডাপুরে তো কোন নারীর জন্য স্থান নেই এখন।'

ঃ আপনার ভাই আছেন ওখানে?'

ঃ হ্যাঁ।'

ঃ আব্বাজান এক জরুরি পয়গাম দিয়ে আমায় পাঠিয়েছেন তার কাছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আর সময়ের অপচয় করবেন না।'

মাসউদ আলী কোনো কথা না বলে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তার সাথীরা তার অনুকরণ করলো।

কিছুক্ষণ পর তাদের ঘোড়া ছুটে চললো হাওয়ার বেগে। মাসউদ আলী ও তার সাথীরা তাদের দলের শ্রেষ্ঠ সওয়ার। কিন্তু তাদের সামনে রাজিয়ার হিম্মৎ ছিলো প্রশংসনীয়। মাসউদ আলীর মাথায় কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে। তিনি রাজিয়ার কাছে তা জিজ্ঞেস করতে চান কিন্তু দুঃখ-বিষাদের মূর্ত প্রতীকটির দিকে তাকিয়ে তার মুখে আর কথা যোগায় না। পথের প্রথম চৌকিতে তারা থামলেন ঘোড়া বদল করাবার জন্য। মাসউদ আলী ও তার সাথীরা ক্ষুধায় পীড়িত। মাসউদ আলী চৌকির মুহাফিজকে খানার ব্যবস্থা করতে বলে রাজিয়াকে বললেন ঃ আপনিও কিছু খেয়ে নিন।'

ঃ 'আমার ভুখ নেই। আপনি জলদি করুন।'

সন্ধ্যাবেলায় তারা কুণ্ডাপুর থেকে খানিকটা দূরে এক চৌকিতে পৌছলেন। মাসউদ আলী রাজিয়াকে এক কামরায় পৌছে দিয়ে বললেন ঃ আপনার আরামের প্রয়োজন। আপনি খানা খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। আমি আপনার নওকর ও আমার এক সাথীকে রেখে যাচ্ছি আপনার কাছে। আমাদের মনজিল এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমি দুঘন্টার মধ্যে ওখানে পৌছে যাবো। ওখানকার অবস্থা কেমন, খোদাই জানেন। তাই রাতেরবেলা আপনার এখানে থাকাই ভালো। ওখানকার অবস্থা দেখে আমি লোক পাঠাবো আপনার কাছে। আপনার কাছে কোনো জরুরি খবর থাকলে আমায় বলে দিতে পারেন।'

রাজিয়া দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ আমি আপনার সাথে যাবো। আরামের প্রয়োজন নেই আমার।'

মাসউদ আলী বললেন ঃ ইফতেখারুদ্দিনের বোনকে আমি নারাজ করতে পারি না। কিন্তু হায়! কুণ্ডাপুর আপনার জন্য নিরাপদ, এ খবরটি যদি আমি জানতে পারতাম। আপনার কাছে আপনার ভ্রাতার মৃত্যু নিঃসন্দেহে এক কঠিন আঘাত, কিন্তু ওখানে গিয়ে আপনার সে দুঃখ মুছবে না। আপনার আব্বাজান যদি

কোনো জরুরি পয়গাম পাঠিয়েও থাকেন, তার জন্য আপনাকে পাঠানোর প্রয়োজন ছিলো না। তিনি আমার উপর আস্থা রাখতে পারতেন।'

রাজিয়া ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন ঃ আপনি সময় নষ্ট করছেন। আমি শুধু এইটুকু আপনাকে বলতে পারি যে, অবিলম্বে আমার কুণ্ডাপুরে পৌঁছা প্রয়োজন।'

মাসউদ আলী খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন ঃ যদি আপনি কোনো বিপদের মুখ থেকে পালাতে চান, তা হলেও আমার উপর নির্ভর করা আপনার উচিত। আমি সিদ্দীক আলীর ভাই।'

রাজিয়া মাসউদ আলীর দিকে তাকালে আচানক তার চোখে উথলে উঠলো অশ্রুধারা। কয়েক মুহূর্ত অশ্রু সংযত করার ব্যর্থ প্রয়াসের পর ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার চোখ থেকে।

এক সিপাহী খানার পাত্র নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। মাসউদ আলী পাত্রটি হাতে নিয়ে রাখলেন রাজিয়ার সামনে। মাসউদ আলী রাজিয়াকে বললেন ঃ আমার কোনো কথায় আপনার মনে দুঃখ লেগে থাকলে আমি আপনার কাছে মার্জনাপ্রার্থী।'

রাজিয়া, চোখের পানি মুছে বললেন ঃ আপনার উপর নির্ভর করতে না পারলে কি করে আমি এসেছি আপনার সাথে এতো দূর। শুনুন ঃ আব্বাজান মহল থেকে ফিরেই আমায় বললেন যে, আয়াজ ইংরেজের সাথে বিডনোরের সওদা করে ফেলেছে। কুণ্ডাপুরের কেল্লাদার তারই নির্দেশে কার্য করেছিলো। আয়ায বিডানোরের তামাম কেল্লা ইংরেজের দখলে ছেড়ে দেবার ফয়সালা করে ফেলেছে।'

মাসউদ আলী খানিকক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলেন রাজিয়ার মুখের পানে। অবশেষে তিনি বললেন ঃ এ খবর অত্যন্ত মর্মান্তিক, কিন্তু তার জন্য আপনার কুণ্ডাপুর যাবার প্রয়োজন ছিলো না।'

রাজিয়া বললেন ঃ আপনি জানেন না, এই মুহূর্তে বিডনোরের তামাম ফউজ আমায় তালাশ করে ফিরছে। আব্বাজান মহল থেকে এসেই আশঙ্কা জানালেন যে, গাদ্দার আয়াজ এখন জবরদস্তি করে আমায় শাদি করতে চাচ্ছে। তাই পালিয়ে আসা ছাড়া এখন পথ নেই আমার। আববাজানের বিশ্বাস, আপনার ভাইজান আমায় কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবেন। আয়াজের সাথে আমার শাদি ঠিক করার সময়ে আব্বাজান মনে করেছিলেন যে, এক বড়ো লোকের সাথে সম্পর্ক পাতাচ্ছেন এবং আমি নিজেকে খোশ কিসমত মনে করেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় এই জাতিদ্রোহীর হাতের নাগালের বাইরে কোথাও পৌঁছে দিন।'

মাসউদ আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এখন আর আপনার কোনো বিপদ নেই। কিন্তু আপনার ওয়ালেদের কথা ভেবে আমি

পেরেশান হচ্ছি। তিনি কেন এলেন না আপনার সাথে?'

ঃ তিনি ভয় করছিলেন যে, আয়াজ খুব শিগগির আমাদের ঘরে আসবে। তাকে ভুল ধারণায় জড়িয়ে রাখার জন্য তিনি ওখানে থাকা জরুরি মনে করেছেন। মওকা পেলে তিনি আজ রাত্রে রওয়ানা হয়ে স্থলপথে সোজা চলে যাবেন বাঙ্গালোরে। তিনি আরো বলেছেন ঃ বাঙ্গালোরে কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখলে তিনি চলে যাবেন সেরিঙ্গাপটমে।'

মাসউদ আলী বললেন ঃ আমি ঘোড়া দেখে নিচ্ছি। এবার হয়তো আমাদের সফর হবে সুদীর্ঘ। আপনি কিছু খেয়ে নিন।'

ঃ মোটেই ভুখ নেই আমার। আপনি জলদি তৈরি হয়ে নিন।'

ঠ

কয়েক মিনিট পর মাসউদ আলী রাজিয়া ও তাদের সাথীরা রাতের অন্ধকারে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং চার মাইল অতিক্রম করার পর যখন এক নদীর পুলের কাছে এসেছেন, তখন কে যেনো বুলন্দ আওয়াজে বললো ঃ থাম। কে ওখানে।'

মাসউদ আলী ঘোড়া থামিয়ে জওয়াব দিলেন" 'আমি মাসউদ আলী।'

চারজন সশস্ত্র সিপাহী এগিয়ে এলো এবং তাদের একজন বললো ঃ আপনি কমাণ্ডার সিদ্দীক আলী খানের ভাই?'

ঃ হ্যাঁ। আর তোমরা কাপ্তান ফউজের লোক?'

ঃ জী হ্যাঁ।'

ঃ এখানে কি করছো?'

ঃ ফউজ এখানে এসে গেছে আর আমরা শিবিরের আশেপাশে পাহারা দিচ্ছি।'

ঃ কেল্লা খালি হয়ে গেছে?'

ঃ জি হ্যাঁ। কেল্লায় এখন আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নেই। সূর্যাস্তের পর আমরা বেরিয়ে এসেছি ওখান থেকে।'

মাসউদ আলী তার ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে চান, কিন্তু তার মুখে কথা যোগায় না। রাজিয়া ঘোড়া আগে বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ সিদ্দীক আলী খান কোথায়?'

ঃ তিনি এখানেই আছেন।' সিপাহী জওয়াব দিলো।

মাসউদ আলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ তার কাছে আমাদের নিয়ে চলো।'

ঃ চলুন।'

কিছুক্ষণ পর তারা গিয়ে দাঁড়ালেন সিদ্দীক আলী ও আরো কয়েকজন ফউজী অফিসারের সামনে। রাজিয়া তাদেরকে শুনালেন আয়াজ খানের গাদ্দারীর কাহিনী। রাজিয়ার বর্ণনা শোনবার ও মাসউদ আলীর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করার পর সিদ্দীক আলী বললেন ঃ মাসউদ, তুমি বড়ই ক্লান্ত, কিন্তু আজ রাত্রেও তোমার আরাম মিলবে না। তুমি পাঁচজন সওয়ার সাথে নিয়ে এই মুহূর্তে রওয়ানা হয়ে যাবে শীমুগার দিকে এবং ওখানকার কেল্লার মুহাফিজকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার করে দেবে। আমার তরফ থেকে তাকে পয়গাম দেবে যে, ইংরেজ মালাবার ও বিডনোরের কোনো কোনো উপকূল এলাকায় ফউজ নামিয়ে দিয়েছে। আমরা কুন্ডাপুর কেবল তখনই খালি করেছি যখন দুশমনের তোপ কেল্লাকে আবর্জনাস্তূপে পরিণত করেছে। তাদের ফউজ কুণ্ডাপুরের উত্তর ও দক্ষিণে কয়েকটি স্থানে নেমে এসেছে এবং আমাদের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহের তামাম পথ বন্ধ হয়ে যাবার বিপদ-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেল্লার তোপগুলো বের করে আমরা হায়দরগড় ও বিডনোর পাঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন তা পাঠানো হবে শীমুগায়। বর্তমানে উপকূলের কোনো চৌকি আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আয়াজ খানের গাদ্দারীর পর বিডনোরকে বাঁচাবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমাদের; কিন্তু বিডনোরের দিকে যে ফউজ এগিয়ে যাবে, তাদেরকে পিছন থেকে হামলা করে আমরা যথাসম্ভব বেশি সময় ব্যিব্রত করে রাখবো। আমার কাছে এখন মাত্র সাড়ে তিনশ' সওয়ার ও আটশ পদাতিক রয়েছে। একটি দলেল হেফাজতে জখমীদের পাঠানো হয়েছে শীমুগায়। আমাদের বারুদের অভাব, তাই অস্ত্র-সাহায্য পাওয়া পর্যন্ত দুশমনের পিছন দিকে বিক্ষিপ্ত হামলা করায়ই আমাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।'

মাসউদ আলী বললেন ঃ ইফতেখারুদ্দিনের বোনের সম্পর্কে আপনি কি ফয়সালা করলেন?'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ এখন অনন্তপুরও বড়ো বেশি নিরাপদ নয়। তাই শীমুগাকেই আমাদের ফউজীকেন্দ্র বানাতে হবে। জখমি ও আশ্রয় প্রার্থীদের কাফেলা বেশি দূর যায়নি এখনো। রাজিয়াকে আমি তাদের কাছে পৌঁছে দেবার ইন্তেজাম করছি।' তারপর এক অফিসারকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ একে কাফেলায় শামিল করে দেওয়া তোমার জিম্মা থাকলো। পাঁচজন সিপাহী সাথে নিয়ে এক্ষুনি রওয়ানা হয়ে যাও।'

রাজিয়া বললেন ঃ আমি এখানে থেকেই আব্বাজানের ইন্তেজার করবো।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমরা দু'তিন ঘন্টার বেশি এখানে থাকবো না। কুপ্তাপুরের উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে যে ফউজ, আমি তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়েছি। তাদের খবর পেলেই আমরা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

রাজিয়া বললেন ঃ লড়াইয়ে আমি আপনার ফউজকে সাহায্য করতে পারবো।'

ঃ না, আমাদের বোনদের তলোয়ার ধরবার সময় আজো আসেনি। আমাদের শিরায় এখনও কয়েকটি রক্তবিন্দু অবশিষ্ট রয়েছে।'

রাজিয়া বললেন ঃ আপনি যদি আমায় শীমুগা পাঠানো জরুরী মনে করেন, তা হলে আমায় কাফেলার সাথে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। আপনার ভাইয়ের সাথেই আমি পারবো সফর করতে।'

ঃ আপনার খুব তকলিফ হবে। মাসউদ পথে কোথাও থামবে না এক লহমার জন্যও। তবে যদি আপনি যেতে পারেন মাসউদের সাথে, তাহলে একটা ফায়দা অবশ্যি হবে। শীমুগার কেল্লাদারকে আপনি প্রভাবিত করতে পারবেন যে কানো লোকর চাইতে বেশি।'

রাজিয়া বললেন ঃ কোনো তকলিফই হবে না আমার। আব্বাজান যদি আপনার কাছে আসেন, তাকে বলবেন আমার কথা।'

সিদ্দীক আলী বলবেন ঃ বহুত আচ্ছা। মাসউদ, তুমি ওকে নিয়েই রওয়ানা হয়ে যাও।'

মাসউদ আলীকে রওয়ানা করে দেবার দু'ঘন্টা পর গুপ্তচর ফিরে এসে সিদ্দীক আলীকে খবর দিলো যে, ইংরেজ সেনাবাহিনী জেনারেল ম্যাথুজের নেতৃত্বে হুসনগন্দী উপত্যকার কাছে শিবির সন্নিবেশ করছে। তিনি তাঁর ফউজকে এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন।

ভোরবেলা যখন জেনারেল ম্যাথুজের সেনাবাহিনী উপত্যকার এক সঙ্কীর্ণ ঘাঁটি অতিক্রম করে যাচ্ছে, মহীশূরের সিপাহীরা তখন আশপাশের গিরিশৃঙ্গ থেকে আচানক বেরিয়ে এসে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করলো পিছনের সেনাদলের উপর। ইংরেজ ফউজ পিছনে ফিরে হামলা না করে তাদের গতি দ্রুততর করে দিলো। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়ে উপত্যকাটিকে মনে করা হতো খুবই মজবুত এবং সাত মাইল ধরে পথের স্থানে স্থানে তোপ পাতা ছিলো। দুশমনের পিছু ধাওয়া করার সময়ে সিদ্দীক আলী প্রত্যাশা করেছিলেন, আয়াজ খানের গাদ্দারী সত্ত্বেও কোনো চৌকির সিপাহীরা হয়তো দুশমনদের পথরোধ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তার সে প্রত্যাশা ব্যর্থ প্রমাণিত হলো। জেনারেল ম্যাথুজের পথ ছিলো খোলা।

পিছন থেকে বারবার হামলাকারী ফউজের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া তিনি তাদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করলেন।

সিদ্দীক আলীর সিপাহীরা প্রায় দেড়শ ইংরেজকে হতাহত করার পর তাদের বারুদ বোঝাই কয়েকটি খচ্চর ছিনিয়ে নিলো, কিন্তু এ ক্ষতির জন্য জেনারেল ম্যাথুজের কোনো পরোয়া ছিলো না। ইংরেজ ফউজ উপত্যকা পথ অতিক্রম করে গিয়ে হায়দরগড় কেল্লায় প্রবেশ করলো। হায়দরগড় কেল্লার সত্তরজন মুহাফিজ সিপাহীর বেশিরভাগ তখন আয়াজ খানের হুকুমে পৌঁছে গেছে বিডনোরে। বাকি সিপাহী কেল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে গেলো দুশমনের অভ্যর্থনার জন্য। অতি উচ্চে অবস্থিত এ কেল্লাটিকে মনে করা হতো অপরাজেয় আর ভিতরে পাতা ছিলো পঁচিশটি তোপ, কিন্তু কেল্লাদার তা ব্যবহার করলো শুধু দুশমনকে সালাম জানাবার জন্য। হায়দরগড় থেকে বিডনোরের পথ ছিলো ইংরেজ বাহিনীর জন্য উন্মুক্ত এবং সিদ্দীক আলীর শ্রান্ত-ক্লান্ত সিপাহীদের পক্ষে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাওয়া ছিলো অসম্ভব।

১৭৮৩ ঈসায়ী সালের ২৮ জানুয়ারি বিডনোরের বাসিন্দারা দুঃখ-বেদনাভরা দৃষ্টিতে কেল্লার দরজায় দেখতে পেলো মহীশুরের পতাকার পরিবর্তে ইংরেজদের বিজয়-পতাকা এবং আয়াজ খান তখন কোম্পানির ফউজী অফিসারদের মধ্যে বণ্টন করছিলেন সরকারি মালখানার সঞ্চিত অর্থ।

মাসউদ আলী শীমুগার কেল্লায় প্রবেশ করেই মোলাকাত করলেন কমাণ্ডারের সাথে। তিনি নয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সুলতান টিপু ও মালাবারের বিভিন্ন ফউজী চৌকির মুহাফিজদের খবরদার করবার জন্য হরকরা পাঠালেন। রাজিয়াকে তিনি স্থান দিলেন আপন মহলে।

দু'দিন পর কুণ্ডাপুরের জখমি ও শরণার্থীদের কাফেলা শীমুগায় পৌঁছলো এবং তার সাথে সাথেই কেল্লার মুহাফিজদের কাছে খবর পৌঁছলো যে, বিডনোর ও হায়দরগড় ইংরেজের দখলে চলে গেছে। চতুর্থদিন লুতফে আলী নামে সুলতানের ফউজের এক অফিসার চাতল দুর্গ থেকে কয়েক ডিভিশন সৈন্য সাথে নিয়ে শীমুগায় পৌঁছলেন এবং কেল্লার মুহাফিজকে তিনি খোশখবর শোনালেন যে, সুলতানের লশকর খুব শিগগিরই পৌঁছবে।

পরদিন রাজিয়া কেল্লাদারের ঘরের ভিতরে আসরের নামাজ পড়ছেন, এমন সময়ে বাইরে শোনা গেলো ফউজ আসার কোলাহল। তিনি নামাজ খতম করে উঠলেন এবং কেল্লাদারের বিবি ও মেয়েদের সাথে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন বাইরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে।

মাসউদ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন অফিসারের সাথে। কিছুক্ষণ পর সিদ্দীক আলী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে প্রবেশ করলেন কেল্লার ভিতর। তাকে দেখে রাজিয়া দীলের মধ্যে অনুভব করলেন এক খুশির কম্পন। কয়েক মুহূর্ত পর যখন সওয়ারদের দল প্রবেশ করতে লাগলো, তখন রাজিয়া তাদের মধ্যে সন্ধান করতে লাগলেন তার বাপকে। মাসউদ আলী ছুটে এগিয়ে গেলেন। সিদ্দীক আলী তাকে দেখেই ঘোড়া থেকে নেমে তার সাথে আলাপ করতে শুরু করলেন। রাজিয়া তার বাপের কথা শুনবার জন্য বেতাল হয়ে উঠেছেন এবং তার কাছে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসও যেনো ভারী হয়ে উঠছে। মাসউদ আলীর সাথে খানিকক্ষণ আলাপের পর সিদ্দীক আলী কেল্লাদার ও তার সাথীদের দিকে তাকালেন এবং এগিয়ে এসে তাদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত হলেন।

রাজিয়ার সহনশক্তি ততোক্ষণে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আচানক তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে জোর কদমে এগিয়ে গেলেন সিদ্দীক আলীর কাছে। মাসউদ আলী সিদ্দীক আলীর কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ ভাইজান রাজিয়া আসছেন। তিনি তার বাপের জন্য বড়ই পেরেশান।

সিদ্দীক আলী ফিরে রাজিয়ার দিকে তাকালেন। রাজিয়ার পা দু'টি যেনো আচানক জমিনের ভিতর বসে গেলো। পাথরের মতো চোখ দুটি তুলে রাজিয়া তাকালেন সিদ্দীক আলীর বিষাদক্লিষ্ট মুখের দিকে। সিদ্দীক আলী ধীরে পদক্ষেপে তার কাছে এসে বললেন ঃ রাজিয়া! আমার আফসোস, তোমার জন্য কোন ভালো খবর নিয়ে আসতে পারিনি আমি।

'আব্বাজান কোথায়?' রাজিয়া ডুবন্ত আওয়াজে প্রশ্ন করলেন

সিদ্দীক আলী দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন ঃ আমার আফসোস, আমি তাকে সাথে নিয়ে আসতে পারিনি। তিনি এখন আমাদের কাছ থেকে বহু বহু দূরে চলে গেছেন তার সন্ধান করবার জন্য আমি বিডনোরে আমার এক চর পাঠিয়েছিলাম। তোমাদের নওকররা তাকে বলেছে, সেইদিনই রাতের বেলায় তিনি বিডনোর থেকে ফেরার হবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শহরের কিছু দূরে আয়াজ খানের লোকেরা তার সন্ধান পেলো। রাতের অন্ধকারে তিনি পথ ছেড়ে পালাতে লাগলেন একদিকে। কিন্তু ঘোড়া সমেত তিনি পড়ে গেলেন এক গভীর খাদে। এক নওকর শেষ মুহূর্ত অবধি তার সাথে ছিলো এবং আমার চর তার সাথে দেখা করে নিয়ে এসেছে তার মৃত্যুর নিশ্চিত খবর।'

রাজিয়া দাঁড়িয়ে রইলেন মোহাবিষ্টের মতো। মাসউদ আলী ও কেল্লাদার এগিয়ে গেলেন সামনে। কেল্লাদার বললেন ঃ বেটি! তোমার বাপের মৃত্যুতে আমার

আফসোস হচ্ছে।'

রাজিয়া কোন জওয়াব না দিয়ে ফিরে ঘরের দিকে চলে গেলেন ধীর পদক্ষেপে।

এশার নামাজের পর কেল্লাদার মসজিদ থেকে বেড়িয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন, অমনি সিদ্দীক আলী এগিয়ে এসে তার পথরোধ করে বললেন ঃ নাসীরুদ্দিনের সাহেবজাদির সাথে আমার কিছু কথা বলার আছে।'

ঃ চলুন। আমার বিবি বলছিলেন, বাপের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর সে কারুর সাথে কথা বলেনি। আপনি তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে খুব ভালো হয়।'

সিদ্দীক আলী কেল্লাদারের সাথে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। কেল্লাদার এক কামরার দরজায় থেমে গিয়ে বললেন ঃ সে এই কামরায় রয়েছে।'

সিদ্দীক আলী ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত দিলেন।

ঃ কে? ভিতর থেকে আওয়াজ এলো।

ঃ আমি সিদ্দীক আলী।'

কামরার ভিতর পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। তারপর আধখোলা কপাটের আড়াল থেকে আওয়াজ এলো ঃ আমি মনে করেছিলাম, আপনি কেথাও চলে গিয়ে থাকবেন।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি এই কেল্লায় আশ্রিত জখমিদের খোঁজ খবর নিতে ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু আমার কোথাও চলে যাওয়াও এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হতো না। আপনার উপর দিয়ে যে বিপর্যয় চলে গেছে, তার পূর্ণ অনুভূতি আমার রয়েছে, কিন্তু হায়! কোন সান্ত্বনা বাণী আপনার অন্তরের সে ক্ষত যদি মুছে দিতে পারতো! আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে বর্তমানে শীমুগা ও তার আশেপাশের কোন শহর বা কেল্লা নিরাপদ নয়। কিছুক্ষণ আগে আমরা বিডনোর ও হায়দরগড় থেকে ইংরেজ সেনাবাহিনীর গতিবিধির খবর পেয়েছি, কিন্তু তাদের মনজিলে মকসুদ কোন দিকে, তা এখনো জানা যায়নি। সম্ভবত দুএকদিনের মধ্যে আমায় চলে যেতে হবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ময়দানে। তাই আমি আপনাকে কোনো নিরাপদ জায়গায় পাঠাতে চাই। আপনার নওকর আমায় বলেছে , বাঙ্গালোরে নাকি আপনার কোনো স্বজন রয়েছেন।

ঃ বাঙ্গালোরে আমাদের কিছু আত্মীয় আছেন, কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি তাদের কাউকেও দেখিনি। তাদের আশ্রয় নেবার চাইতে এই কেল্লায় থেকে জান দেওয়াই আমি সহজ মনে করি।'

সিদ্দীক আলী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন ঃ যদি আর কোথাও যাওয়া আপনি পছন্দ না করেন, তাহলে সেরিঙ্গাপটমে আমাদের বাড়ির দরজা আপনার জন্য

সব সময়ই খোলা। ওখানে আপনার কোনো তকলিফ হবে না। আমার আম্মাজান আপনার মন খুশি রাখতে পারবেন। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি কালই আপনার সফরের বন্দোবস্ত করে দেবো। আপনার নওকর ও কয়েকজন সিপাহী আপনার সাথে যাবে।'

সিদ্দীক আলী রাজিয়ার তরফ থেকে কোন জওয়াবের পরিবর্তে দরজার আড়াল থেকে শুনতে পেলেন তার ফোঁপানোর আওয়াজ। ধীর ধীরে ফুঁপিয়ে কান্না রূপান্তরিত হলো চাপা আর্তনাদে।

কেল্লাদার বললেন ঃ বেটি! সিদ্দীক আলীর আব্বাজানকে আমি জানি। তোমার জন্য সেরিঙ্গাপটমে তার ঘরের চাইতে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কোথাও হতে পারে না। শীমুগা এখন আমাদের ফউজী কেন্দ্র হতে চলেছে। তাই আমিও পাঠিয়ে দেবো আমার বাচ্চাদের এখান থেকে।'

কেল্লাদারে এক নওকর ছুটে এলো তার কাছে। বললো ঃ এক অফিসার দরজায় অপেক্ষা করছেন। তিনি এখখুনি মোলাকাত করতে চান আপনার সাথে।'

ঃ তাকে মোলাকাতের কামরায় বসাও। আমি এখখুনি আসছি।'

নওকর চলে গেলো। কেল্লাদার সিদ্দীক আলীকে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর শুনতে হবে আমাদেরকে। আপনি ওকে সান্ত্বনা দিন। আমি এখখুনি খবর নিচ্ছি।

কেল্লাদার মোলাকাতের কামরার দিকে চলে গেলেন এবং সিদ্দীক আলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ রাজিয়া, যদি আপনার আমাদের ঘরে যেতে কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার ইচ্ছা যে, কালই আপনারা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবেন।'

রাজিয়া তার কান্না সংযত করবার চেষ্টা করে বললেন ঃ আপনি আসার খানিকক্ষণ আগে আমি ভাবছিলাম, এ দুনিয়ায় আমার কোনো জায়গা নেই। আপনি এত রহমদিল।'

ঃ আপনি বলতে চান যে, আমি পাথর নই।'

রাজিয়া বললেন ঃ হায়! আমি যদি আপনার ফউজে শামিল হয়ে আমার বাপ ও ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারতাম।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ আপনার আব্বাজান ও ভাইয়ের রক্তদান ব্যর্থ হবে না।'

কেল্লাদারের নওকর ছুটে এসে বললো ঃ উনি আপনাকে ডাকছেন। ইংরেজের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ হায়! কথা বলবার যদি আমার সময় থাকতো, রাজিয়া! এখখুনি যদি আমায় কোনো অভিযানে যেতে হয়, তা'হলে আমার অনুপস্থিতিতে কেল্লাদার আপনার সফরের বন্দোবস্ত করবেন।' তারপর নওকরের দিকে ফিরে বললেন ঃ চলো।'

রাজিয়া কয়েক মিনিট কপাটের সাথে লেগে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিজের বিছানার কাছে একটা মোড়ার উপর তিনি বসে পড়লেন। তার মাথায় তখন ভেসে আসছে সেরিঙ্গাপটমের সিদ্দীক আলীর বাপ-মা ও তাদের ঘরের বিভিন্ন কাল্পনিক ছবি। কখনো তিনি ভাবছেন ঃ যুদ্ধের পর যখন সিপাহীরা ফিরে যাবে আপন ঘরে, তখন সিদ্দীক আলী ও মাসউদের মায়ের সাথে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনিও চেয়ে থাকবেন তাদের পথের দিকে। তার দৃষ্টির সামনে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে আশার বাতি। আবার তিনি ভাবেন ঃ যুদ্ধের ময়দান থেকে কোনো দূত এসে হয়তো বৃদ্ধা মাকে খবর দেবে যে, তার জোয়ান বেটা জান দিয়েছে যুদ্ধের ময়দানে এবং তার দৃষ্টির সামনে ছেয়ে যায় ভয়ানক অন্ধকার। জাহাজে সিদ্দীক আলীর সাথে তার প্রথম মোলাকাতকে তিনি মনে করেছিলেন একটি আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু কুণ্ডাপুর থেকে বিদায় নেবার সময়ে তার মনে আফসোস হয়েছে যে, এত শিগগির তাদের পরস্পরের পথ জুদা হয়ে গেলো। কিন্তু সে অনুভূতি এত তীব্র ছিলো না যে, তিনি পেছনে ফিরে তাকাতেন। দুনিয়া এখন বদলে গেছে। এবং সিদ্দীক আলী এখন হয়েছেন তার জিন্দেগির শেষ অবলম্বন। বাপ-ভাইয়ের মৃত্যুর পর বারবার তিনি ভেবেছেন, যদি সিদ্দীক আলী না থাকতেন, তাহলে তার চোখের সামনে এ দুনিয়া হতো কতো অন্ধকার।

বহু সময় ধরে তিনি চিন্তা করলেন নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রায় এক ঘন্টা পর কেল্লার প্রাঙ্গণে তিনি শুনতে পেলেন ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ এবং তার দীল বসে যেতে লাগলো। 'সিদ্দীক আলী কোথায় যাচ্ছেন' 'সিদ্দীক কোনো বিপজ্জনক অভিযানে চলে যাচ্ছেন, হয়তো তিনি আর ফিরবেন না'- না, না, সিদ্দীক আলী, তুমি যেয়ো না, দুনিয়ায় আমার আজ কেউ নেই। আমি নিঃসঙ্গ-একা। এখন আমি ইফতেখারুদ্দিনের বোন আর নসীরুদ্দিনের বেটি নই। এখন আর মিডল্যারের গবর্ণরের মহল আমার জন্য নয়। আমি এক অসহায় বালিকা।' সিদ্দীক আলী, আমায় নিয়ে চলো তোমার সাথে। গুলিবৃষ্টির মধ্যে আমি হবো পারবো তোমার সাথী।'

রাজিয়ার মন ও মস্তিষ্কে বয়ে চলেছে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়। তিনি উঠে বাইরে গেলে তার পা কাঁপতে লাগলো ঠক্ ঠক্ করে। তিনি কেল্লার প্রাঙ্গণে প্রবেশ

করলেন। সদর দরজায় সিপাহীদের আওয়াজ এবং কেল্লার বাইরে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। রাজিয়ার অবস্থা মরুভূমির মাঝখানে নিঃসঙ্গ কাফেলা পরিত্যক্ত মুসাফিরের মতো। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল-নিঃসাড় হয়ে। আসমান থেকে ছুটে পড়েছে এক সিতারা এবং এক মুহূর্তের জন্য আলোর ভাণ্ডার ছড়িয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আচানক কার যেনো আওয়াজ এলো, তার কানে ঃ ঃ কে?'

রাজিয়া কেল্লাদারের আওয়াজ চিনতে পেরে জওয়াব দিলেন ঃ আমি-আমি রাজিয়া। সিদ্দীক আলী কোথায়?'

ঃ তিনি এক অভিযানে চলে গেছেন, কিন্তু তুমি এখানে কি করছো? ভিতরে চলো। তিনি তোমার সম্পর্কে তাকিদ করেছেন আমায়। তোমার সফরের বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন তোমার প্রয়োজন আরাম করবার।'

ঃ তিনি কোথায় গেছেন?'

ঃ তিনি গেছেন অনন্তপুর। এখখুনি অনন্তপুর ফউজের এক অফিসার এখানে পৌছেছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যে, ইংরেজ ফউজ অনন্তপুরের দিকে এগিয়ে আসছে। বিডনোরের গভর্নর ওখানকার সিপাহীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিনাবাধায় কেল্লা ছেড়ে দেওয়া হোক ইংরেজের হাতে। সিদ্দীক আলী তিনশ' সওয়ার সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তিনি সময় মতো পৌছলে আমার বিশ্বাস, অনন্তপুরের কেল্লা বেঁচে যাবে।'

ঃ তার ভাই কোথায়?'

ঃ তিনিও ফউজের সাথে গেছেন। কিন্তু তোমায় সেরিঙ্গাপটমে নিয়ে যাবার জন্য তিনজন সিপাহী তিনি রেখে গেছেন। সিদ্দীক আলী তার ওয়ালেদের নামে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে আপনার নওকরের কাছে দিয়ে গেছেন।'

রাজিয়া বললেন ঃ যদি আমায় আপনারা নেহাত পাঠাতেই চান, তা'হলে আমি এখখুনি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে চাই।'

ঃ এখন ঠিক সময় নয়। রাতের বেলাটা তুমি আরাম করো। ভোরে দেখা যাবে।'

রাজিয়া খানিকক্ষন চুপ থেকে বললেন ঃ অনন্তপুরে ওর অভিযান তেমন বিপজ্জনক তো নয়?'

ঃ অনন্তপুরের কেল্লা আমাদের সবচাইতে মজবুত কেল্লা। সেখানে পাতা রয়েছে আটটি বড়ো বড়ো তোপ। সিদ্দীক আলীর পৌছবার আগে যদি গাদ্দাররা কেল্লাটি দুশমনের হাতে ছেড়ে না দেয়, তাহলে আমরা ইংরেজদের উপর বিডনোর

ও হায়দরগড়ের পরাজয়ের বদলা নিতে পারবো।'

রাজিয়া বললেন ঃ রাতের শেষ প্রহরে আমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো। তখন আপনাকে জাগানো ঠিক হবে না, তাই যেসব সিপাহী আমার সাথে যাবে, ঘুমোবার আগে আপনি তাদেরকে নির্দেশ দেবেন, যেনো শেষ প্রহরে তারা তৈরি থাকে।'

ঃ বহুত আচ্ছা। কিন্তু যদি আরো একদিন তুমি এখান থেকে যেতে পারো, তাহলে সম্ভবত পরশু পর্যন্ত আমি আমার বাল-বাচ্চাদের তোমার সাথে রওয়ানা করে দিতে পারবো।'

ঃ না, আমি এখানে আর থাকতে চাই না।'

কথাটি বলেই রাজিয়া মুখ ফিরালেন। কেল্লাদারের বাড়ির সামনেই দেখা পেলেন তার নওকরের। সে জলদী করে এগিয়ে এসে বললো ঃ আমি আপনাকে খোঁজ করছি। সিদ্দীক আলী খান কোথাও চলে গেছেন। তিনি তাকিদ করে গেছেন, যেনো আমরা অবিলম্বে সেরিঙ্গাপটমে রওয়ানা হয়ে যাই। তিনি তার ওয়ালেদের নামে লিখে দিয়ে গেছেন এ চিঠিখানা, এই নিন।'

রাজিয়া চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন ঃ আমি এখখুনি কেল্লাদারের সাথে দেখা করেছি। তুমি গিয়ে তৈরি হও। আমরা শেষ প্রহরে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

কিছুক্ষণ পর রাজিয়া তার কামরায় চেরাগের রোশনিতে সিদ্দীক আলীর সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা পড়তে লাগলেন

আব্বাজান ও আম্মাজান!

'আমি একটি অসহায় বালিকাকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। বিস্তারিত বিবরণ দেবার সময় আমার নেই। আপনাদের মুহাব্বত, স্নেহ ও নেক দোআ রাজিয়ার প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, আপনারা তাকে হতাশ করবেন না।

আপনাদের বেটা
সিদ্দীক আলী

৫

সিদ্দীক আলী অনন্তপুরের কেল্লার দরজায় এক বুরুজের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে ইংরেজের সওয়ারদের ফউজ দেখছেন। তাদের অগ্রবর্তী সেনাদল মামুলি গতিতে এগিয়ে আসছে কেল্লার দিকে। সবার আগে এক সওয়ার ধরে রেখেছে সফেদ ঝাণ্ডা।

কিছুক্ষণের মধ্যে সওয়ার কেল্লার তোপ ও বন্দুকের সীমানার মধ্যে এসে গেলো। সিদ্দীক আলীর ইশরায় কয়েকজন সিপাহী হাওয়াই গুলি করলো তারপর চললো তোপ। যে ইংরেজ ফউজ এতক্ষণ নিশ্চিত মনে এগিয়ে আসছিলো তারা এবার থেমে গেলো। কয়েক মিনিট পর ইংরেজ ফউজের দু'জন সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে এলো কেল্লার দরজার কাছে। তাদের একজনের হাতে সফেদ ঝাণ্ডা আর একজনকে দেখে মনে হয় যেনো এক বড়ো ফউজী অফিসার। অফিসারটি বুলন্দ আওয়াজে বললো ঃ সফেদ ঝাণ্ডার উপর গুলি চালানো যুদ্ধের নীতিবিরুদ্ধ। তোমাদের কমাণ্ডার আমাদের সাথে ওয়াদা করেছে যে, কেল্লা আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে। কমাণ্ডারের সংকল্প বদলে গেলে তাতে আমাদের সাথে বিডনোরের গবর্ণরের চুক্তির খেলাফ করা হবে।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ বিডনোরের গভর্ণর মহীশূর হুকুমাতের গাদ্দার এবং যে কমাণ্ডার গাদ্দারের হুকুম তামিল করবার ইরাদা করেছিলো তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। আমরা তোমাদের সফেদ ঝাণ্ডার উপর গুলি চালাইনি, বরং তোমাদেরকে খবরদার করে দিয়েছি যেনো এখানে সব গাদ্দারই রয়েছে মনে করে তোমরা আশায় বুক বেঁধে কেল্লার তোপের নাগালের মধ্যে না আস।'

ইংরেজ অফিসার বললো ঃ বিডনোরের গভর্ণর হিসেবে আয়াজ খান এ কেল্লা সম্পর্কে আমাদের সাথে চুক্তি করেছেন এবং মহীশূর হুকুমাত তাদের ক্ষমতাসীন গবর্ণরের সম্পাদিত চুক্তি মানতে বাধ্য।'

ঃ বিডনোরের গবর্নরের সরকারি ক্ষমতা সেদিনই খতম হয়ে গেছে, যেদিন সে তোমাদের সাথে বিডনোর ও হায়দরগড়ের সওদা করেছে। তারপর সে এক গাদ্দার ছাড়া আর কিছুই নয়।'

ঃ আমরা তোমাদের খবরদার করে দিচ্ছি, তোমরা ভুল করেছো। কয়েক ঘন্টার বেশি তোমরা আমাদের লশকরের মোকাবিলা করতে পারবে না। আমরা তোমাদেরকে পনেরো মিনিট ভাববার সময় দিচ্ছি। এরপর তোমরা কোনো বাধা

দিলে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে তোমাদের একটি সিপাহীকেও জিন্দাহ ছেড়ে দেবো না।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ যদি দুমিনিটের মধ্যে তোমরা ফিরে না যাও তাহলে আমি সিপাহীদের গুলি চালাবার হুকুম দেবো।'

ইংরেজ সিপাহীরা কয়েক মুহূর্ত নিজেদের মধ্যে আলাপ করে ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে নিলো।

আচানক সিদ্দীক আলী তার ডান দিকে দৃষ্টিসীমায় দেখতে পেলেন একদল সওয়ার। এক অফিসারের হাত থেকে তিনি দূরবীন নিয়ে দূর দিগন্তে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন।

ঃ মনে হচ্ছে, এ আমাদেরই লোক।' তিনি বুলন্দ আওয়াজে বললেন।'

কিছু সময়ের মধ্যে স্পষ্ট দেখা গেলো পাঁচজন সওয়ার। আচানক তিনি দীলের মধ্যে অনুভব করলেন অখুশির কম্পন। কয়েক মুহূর্ত ভালো করে দেখার পর দূরীবন নিচু করে তিনি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ মাসউদ! রাজিয়া আমার কথা মানেনি। নিচে গিয়ে ওকে ভিতরে আসতে দেবার জন্য পাহারাদারদের বলে দাও। ইংরেজরা অবরোধের জন্য সৈন্যদের সারি দুরস্ত করছে। এখন হয়তো তাদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হবে না, কিন্তু সম্ভবত ওরা এদেরকে কেল্লায় ঢুকতে বাধা দেবার চেষ্টা করবে।'

মাসউদ আলী জলদি করে নিচে নেমে গেলেন এবং সিদ্দীক আলী উদ্বিগ্ন হয়ে কখনো তাকাতে লাগলেন বাম দিকে ইংরেজ ফউজের দিকে, আবার কখনো বা ডান দিকে কেল্লার কাছে আগত সওয়ারদের দিকে। এখন তিনি দূরবীন ছাড়াও চিনতে পারেন রাজিয়া ও তার সাথীদের। আচানক ইংরেজ ফউজের কয়েকজন সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রাজিয়া ও তার সাথীদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পাঁচিল থেকে গুলিবর্ষণের দরুন তাদের পিছু হটতে হলো। ইংরেজ সিপাহী জওয়াবে গুলি ছুঁড়তে লাগলো, কিন্তু ইতিমধ্যে রাজিয়া ও তার সাথীরা প্রবেশ করলেন কেল্লার ভিতরে। সিদ্দীক ছুটতে ছুটতে প্রাঙ্গণে পৌছলেন। তিনি তার নিজের মনের অবস্থা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। রাজিয়ার মুখখানা ঘামে ভেসে যাচ্ছে। তিনি যে অপরিচিত লোকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সে অনুভূতি যেনো লোপ পেয়ে গেছে তার। তারপর তিনি সিদ্দীক আলীর দিকে তাকিয়ে জলদি করে গর্দান নিচু করে নেকাব ঠিক করে নিলেন। মাসউদ আলী তাকে সাহায্য করলেন ঘোড়া থেকে নামতে। সিদ্দীক আলী এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ রাজিয়া আপনি খুবই অন্যায় করেছেন। এ কেল্লায় ইতিমধ্যেই চারশ নারী ও শিশু

আশ্রয় নিয়েছে এবং খোদা মালুম দুশমনের গোলাবর্ষণের সামনে এর দেওয়াল আর কতোদিন টিকে থাকবে।'

রাজিয়া জওয়াব দিলেন ঃ এ কেল্লায় আমি আশ্রয় নিতে আসিনি। আমার নাম আপনি আপনার সিপাহীদের মধ্যে শুমার করতে পারেন।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ যদি আপনি নারী ও শিশুদের দেখাশোনা করতে পারেন ঃ তাহলেই আমি গণিমত মনে করবো। মাসউদ ওকে মেয়েদের কাছে পৌঁছে দাও।'

ঃ চলুন।' মাসউদ আলী বললেন। রাজিয়া কোনো কথা না বলে কেল্লায় নারী ও শিশুদের জন্য নির্ধারিত হিস্সায় চলে গেলেন।

সিদ্দীক আলী তার অফিসার ও সিপাহীদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বন্ধুগণ! আমাদের সংকল্প ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা সমাগত। আমি এই নির্দেশ নিয়ে এসেছি যে, যতোক্ষণ আমাদের লশকর এখানে না পৌঁছে, যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে এ কেল্লা হেফাজত করতে হবে। এ কেল্লা দুশমনের হাতে চলে গেলে এ তামাম এলাকা পড়বে বিপদের মুখে। বিজয়ের লোভ ইংরেজকে নিয়ে এসেছে হাজারো মাইল দূর থেকে এই দেশের মাটিতে। 'সাত সমুদ্দুরের' ওপার থেকে এসে তারা এদেশে তাদের কওমী সৌভাগ্যের ঝাণ্ডা উড্ডীন করতে চাচ্ছে এবং তারই জন্য তারা আমাদের সাথে যুদ্ধবরণ করে নিয়েছে। এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় তাদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা নয়। কিন্তু আমরা লড়াই করছি আমাদের আজাদি ইজ্জত ও সৌভাগ্যের জন্য। জিন্দাহ থাকবার জন্য দুশমনের কাছে আমাদেরকে প্রমাণ করে নিতে হবে যে, তারা যে বনে শিকার খেলতে এসেছে, সেখানে ভেড়া-বকরীর পালই থাকে না; থাকে ব্যাঘ্র শিশুরা। সিপাহীর জিন্দেগিতে আসে এমন সময়, যখন জয়-পরাজয় সম্পর্কে নির্বিকার থেকে তাকে জান কোরবান করতে হয়। অনন্তপুরে আমাদের যুদ্ধের ফল কি হবে তা আমি বলতে পারবো না। সম্ভবতঃ সময়মতো আমাদের সাহায্য পৌঁছবে আমাদের কাছে এবং দুশমনকে আমরা তাড়িয়ে নিয়ে যাবো সমুদ্রের দিকে। হতে পারে, দেশের আজাদির জন্য আমাদের জান কোরবান করতে হবে। উভয় পরিস্থিতিতেই আমাদের ভাবী বংশধরগণ আমাদের সম্পর্কে এ কথা বলতে পারবে না যে, আমরা যিল্লাতের পথ এখতিয়ার করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে আশ্বাস দিতে পারি যে, এই কেল্লার প্রতিটি সিপাহীর কোরবানী কওমের হাজারো মানুষকে বাঁচাতে পারে ধ্বংস ও বরবাদী থেকে। আমাদের প্রমাণ করে দিতে হবে যে, দুশমন আমাদের লাশের উপর দিয়ে ছাড়া অনন্তপুর থেকে সামনে এগুতে পারবে না।'

এক ঘন্টা পর লড়াই শুরু হলো এবং ইংরেজ বাহিনীর তোপ চারদিক থেকে গোলাবর্ষণ করতে লাগলো। কেল্লার ভিতর সঞ্চিত বারুদের হিসাব করে দেখে সিদ্দীক আলী সিপাহীদের নির্দেশ দিলেন যে, গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত তারা গুলিবর্ষণ করবে না। তৃতীয় প্রহরে ইংরেজরা চারদিক থেকে কেল্লার উপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কেল্লার তোপগুলো পহেলাবার পূর্ণ শক্তিতে গোলাবর্ষণ করলো এবং হামলাদার কঠিন ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। এরপর দুশমন শুধু তাদের তোপখানা থেকে গোলাবর্ষণেই সীমাবদ্ধ রাখলো তাদের তৎপরতা। সূর্যাস্তের সময়ে সিদ্দীক আলী চোখে দূরবীন লাগিয়ে এক বুরুজের উপর দাঁড়ালেন। কেল্লার কাছে দুশমনের সংখ্যা তখন আগের চাইতেও বেশি। তারা চারদিকে ছোট ছোট তোপের পরিবর্তে পাতছে বড়ো বড়ো তোপ। মাগরিবের আজান শুনে সিদ্দীক আলী পাঁচিল থেকে নিচে নামলেন এবং গিয়ে এক গোলা এসে লাগলো পাঁচিলের এক বুরুজে এবং তার টুকরো এসে পড়লো প্রাঙ্গণে। তারপর চললো চারদিক থেকে তীব্র গোলাবর্ষণ। নামায খতম করাবার পর সিপাহী ও অফিসার সবাই নিজ নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে গেলো।

রাতটি ছিলো রোজ কিয়ামতের রাত্রির মতো বিভীষিকাময়। দুশমনের তোপখানা বিক্ষিপ্তভাবে অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে। কেল্লার কয়েকটি বুরুজ ভেঙে পড়েছে। ছাদে ও পাঁচিলে কোথাও কোথাও গর্ত হয়ে গেছে। কতক সিপাহী হয়েছে জখমি আর কতক হয়েছে শহীদ। শেষ প্রহরে সিদ্দীক আলী পাঁচিলের উপর দিয়ে ঘুরে এসে নিচে নামলেন এবং এক সিপাহীর হাত থেকে মশাল নিয়ে কেল্লার ভিতরে টহল দিয়ে চললেন। কোথাও কোথাও তার সিপাহীদের লাশ দেখে তিনি এসে প্রবেশ করলেন এক প্রশস্ত কামরায়। সেখানে কয়েকজন নারী জখমিদের শুশ্রূষা করছে। কামরার এক ধারে খুন রাঙ্গা কামিজ গায়ে এক সিপাহী কাতরাচ্ছে। রাজিয়া তার মাথায় পট্টি বেঁধে দিচ্ছেন। সিদ্দীক আলী তাদের কাছে গিয়ে থামলেন। রাজিয়া তার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি অবনত করলেন। সিদ্দীক আলী কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তার গলা থেকে আওয়াজ বেরুলো না। তিনি পিছন ফিরে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

কিছুক্ষণ পর তিনি পুনরায় পৌছলেন পাঁচিলের উপর এবং তার চারদিক ঘুরে সিপাহীদের নির্দেশ দেবার পর এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে এক বুরুজের নিচে। কেল্লার চারদিকের অগ্নিবর্ষী তোপের গর্জন মনে হচ্ছে আজদাহার গর্জনের চাইতেও

ভয়াবহ। আচানক তার কাছেই শুনতে পেলেন কারুর চাপাকান্নার আওয়াজ।

ঃ কে?' তিনি চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন।

ঃ আমি রাজিয়া।' অস্পষ্ট নারীকণ্ঠের আওয়াজ জওয়াব দিলো।

ঃ আপনি কি করছেন এখানে?'

ঃ কিছু না'। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আপনি আমার উপর রাগ করেছেন।'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ আমি আপনার উপর রাগ করিনি, রাজিয়া! কিন্তু আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

ঃ কিন্তু অসংখ্যনারী মওজুদ রয়েছে এখানে। আমার আসায় এমন কি দোষ হলো?'

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ অনন্তপুরে দুশমনের আচানক অগ্রগতিতে বাধ্য হয়ে এসব নারী এখানে এসে জমা হয়েছে, কিন্তু আপনার তেমন নিরুপায় অবস্থা ছিলো না। আমি আপনাকে আমার গৃহে পৌঁছে দেবার ইন্তেজাম করে দিয়েছিলাম।'

রাজিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ এখানে এসে মওতের ভয় আর নেই আমার, কিন্তু আপনি আমার উপর রাগ করেছেন, এ চিন্তাই আমার কাছে অসহনীয়।'

ঃ আমি আপনার উপর রাগ করিনি, রাজিয়া! কিন্তু হায়! আমি যদি আপনাকে বুঝাতে পারতাম যে, এখানে আমরা জিন্দেগির চাইতে মওতের কতো কাছে! দুশমন তাদের পূর্ণশক্তি এখানে জমা করেছে। খোদা মালুম, কাল ওরা আরো কতো বড়ো তোপ এ কেল্লার সামনে পাতবে। আমাদের সঞ্চিত বারুদে বেশি হলে আর একদিন চলবে। আমার সিপাহীদের উদ্যম অপরিসীম, কিন্তু নারী ও শিশুদের সমস্যা আমাদের কাছে খুবই উদ্বেগজনক। হায়! আপনি যদি আমার কথা মানতেন।'

রাজিয়া বললো ঃ কেন আমি এখানে এসেছি তা আমি নিজেও জানি না। আমি শুধু জানি, আমাদের মনজিল এক এবং আমাদের পথ কখনো একে অন্যের থেকে জুদা হতে পারে না।'

সিদ্দীক আলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ রাজিয়া, আমি এখানে রয়েছি কেবল তারই জন্য তুমি এখানে এসেছো?

সিদ্দীক আলীর কথাগুলো কান্নার মতো শোনা গেলো। তিনি বললেন ঃ রাজিয়া সত্যি করে বলো, তোমার দীলে এ খেয়াল আসেনি যে, আমি হয়তো অনন্তপুর থেকে ফিরে এসে তোমায় দেখবো না?'

রাজিয়ার ফুঁপিয়ে কান্না আচানক বন্ধ হয়ে গেলো এবং তিনি কয়েক মুহূর্ত

চুপ করে থেকে জওয়াব দিলেন ঃ আমি শুধু অনুভব করছিলাম যে, আপনি কোনো বিপজ্জনক অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং বিপদের সময়ে আমি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইনি। আপনি আমার হেফাজতের জন্য আমায় পাঠাতে চেয়েছেন সেরিঙ্গাপটমে কিন্তু আপনাকে ছাড়া আমার যিন্দেগির কোনো অর্থ নেই।'

আচানক শোনা গেলো এক তীব্র আওয়াজ আর তারপরই বুরুজের একটি স্তম্ভ ও ছাদের কিছু ইট ছিটকে নিচে পড়লো। তারপর একই সঙ্গে একজনের মুখে 'রাজিয়া' ও অপরের মুখে 'সিদ্দীক আলী' উচ্চারণের সাথে সাথে উভয় মহা উদ্বেগে জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে। :-/

ঃ রাজিয়া, তুমি ঠিক আছো না?'

ঃ আমি বিলকুল ঠিকই আছি। আপনার জন্য আমি ভয় পেয়েছিলাম। আপনার কোনো চোট লাগেনি তো?'

সিদ্দীক আলী তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ রাজিয়া, তুমি নিচে চলে যাও।'

ঃ ভাইজান! ভাইজান!!' কয়েক কদম দূর থেকে শোনা গেলো মাসউদ আলীর আওয়াজ।

ঃ কি হলো মাসউদ?'

মাসউদ দ্রুত ছুটে এসে বললেন ঃ ভাইজান, এ বুরুজ ভেঙে পড়ছে। আপনি একদিকে সরুন।'

ঃ বহুত আচ্ছা। তুমি রাজিয়াকে নিচে নিয়ে যাও।'

মাসউদ বিস্ফারিত চোখে রাজিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আপনি এখানে কি করছেন? চলুন।'

রাজিয়া কোনো কথা না বলে তার সাথে নেমে গেলেন পাঁচিল থেকে।

সিদ্দীক আলী ধীরে ধীরে পাঁচিলের উপর দিয়ে এগিয়ে চললেন। সিপাহীরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়ানো। তাদের প্রশান্ত স্তব্ধতা সিদ্দীক আলীর কাছে মনে হয় চিৎকারের চাইতেও উত্তেজনক। দুশমনের গোলাবর্ষণ প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর তিনি পাঁচিলের অপরদিকে এক অফিসারের সাথে কথা বলছেন, অমনি নিচে থেকে এক সিপাহী বুলন্দ আওয়াজে তাকে ডাকতে লাগলো।

সিদ্দীক আলী এগিয়ে গিয়ে জওয়াব দিলেন ঃ এই যে আমি এখানে। কি ব্যাপার?

ঃ মাসউদ আলী খান জখমি হয়েছেন। আপনি নিচে আসুন।'

সিদ্দীক আলীর দীল বসে গেলো। জলদি করে তিনি নিচে নামলেন। সিপাহীর সাথে ছুটে গিয়ে তিনি এক কামরায় প্রবেশ করলেন। মেঝের উপর পড়ে মাসউদ

আলী মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছেন। তার সিনা থেকে ছুটে চলেছে রক্তের ফোয়ারা। কয়েকজন সিপাহী দাঁড়িয়ে তার পাশে এবং মোহাবিষ্টের মতো তার কাছে বসে রয়েছেন রাজিয়া।

ঃ মাসউদ! মাসউদ!! সিদ্দীক আলী তার কাছে বসে বললেন। মাসউদ আলীর ঠোঁটের উপর খেলে গেলো একটুখানি হালকা হাসির রেখা। তারপর কয়েক মুহূর্ত পর তিনি চোখ বন্ধ করে গর্দান ঢিলা করে দিলেন। রাজিয়ার পাথর হয়ে যাওয়া চোখ দিয়ে আচান ফুটে বেরুলো অশ্রুর সয়লাব।

এক অফিসার কামরায় প্রবেশ করে সিদ্দীক আলীর কাছে এসে বললেন ঃ জনাব ভোর হয়ে আসছে। দুশমনের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে তারা কেল্লার দিকে এগিয়ে আসবার ইরাদা করেছে।'

৫

দিনের আটটা পর্যন্ত কেল্লার পাঁচিলের কোথাও কোথাও ভেঙে গেছে। ভিতরে কিছুসংখ্যক গৃহ পরিণত হয়েছে আবর্জনাস্তূপে। লড়াইরত সিপাহীদের তুলনায় জখমি ও শহীদ মুজাহিদের সংখ্যা বেশি। সিপাহী ছাড়াও কতক নারী ও শিশু পড়ে যাওয়া ছাদের নিচে চাপা পড়ে মরেছে। দুপুরবেলা আর একবার দুশমন চেষ্টা করলো কেল্লার উপর আঘাত হানতে কিন্তু কেল্লার মুহাফিজরা তীব্রভাবে তোপ চালিয়ে ও বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। কেল্লার মুহাফিজদের এ কামিয়াবী নিভু নিভু প্রদীপের শেষ জ্বলে ওঠার মতো। তাদের বারুদ খতম হয়ে গেছে। সিদ্দীক আলী তাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, যেনো এরপর আর তোপ চালানো না হয়। এরপরও যদি দুশমন আবার হামলা করে, তাহলে শেষ অবলম্বন হবে বন্দুক, নেজা আর তলোয়ার।

তৃতীয় প্রহরে দুশমনের পদাতিক ফউজ তাদের তোপখানা থেকে গোলাবর্ষণ করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নতুন ঘাঁটি তৈরি করছিলো। সিদ্দীক আলী পাঁচিলের এক ঘাঁটিতে বসে গুলি ছুঁড়ছিলেন দুশমনের উপর। একবার গুলি করার পর বন্দুক বোঝাই করতে গেছেন, অমনি একজন নিজ বন্দুক তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন ঃ এই নিন। এটি ভরা রয়েছে। খালি বন্দুক দিন আমার হাতে। আমি গুলি বারুদ বোঝাই করে দিচ্ছি।'

সিদ্দীক আলী কোনো কথা না বলে রাজিয়ার হাত থেকে বন্দুক নিয়ে নিলেন এবং তিনিও তার কাছে বসে খালি বন্দুক বোঝাই করতে লাগলেন। নিশানা

করতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ আমাদের মনজিল হয়তো খুব কাছে এসে গেছে। হাজারো কথা ছিলো আমার মনে তোমার কাছে বলবার মতো। কতোবার আমি ভেবেছি তোমার কাছে বসে মাসউদের কথা বলবো, তোমায় বলবো– কেমন ছিলো তার শৈশব ও যৌবন; সে কতো প্রিয় ছিলো আমার। ওর শাহাদতের একটুখানি আগে কল্পনার চোখে আমি দেখতে পেয়েছি, যেনো আমরা সেরিঙ্গাপটম পৌঁছে গেছি– আমরা বেড়াচ্ছি কাবেরী নদীর কিনারে–আব্বাজান ও আম্মাজানের কাছে বলছি তোমার কথা আর আমার ছোট ভাই তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছে অবাকবিস্ময়ে।'

রাজিয়া বললেন ঃ আর আমি যেনো আপনার সাথে সাথে ভেসে চলেছি একই জাহাজে– আমরা চলেছি এমন এক দ্বীপের পথে যেখানে মানবতা যুদ্ধের বিভীষিকা ও মুসীবৎ থেকে আজাদ; যেখানে জাতিদ্রোহীরা কওমী আজাদি কওমের দুশমনদের কাছে বিক্রি করে না।'

সিদ্দীক আলী গুলি করার পর রাজিয়ার হাত থেকে ভরা বন্দুক নিতে গিয়ে বললেন ঃ রাজিয়া' আমার জিন্দেগির সবচাইতে বড়ো খাহেশ ছিলো আমি হবো এক সফল জাহাজচালক। বাঙ্গালোর থেকে রওয়ানা হবার সময়ে আমার স্বপ্ন ও ধারণার এমন কথা ছিলো না যে, আমাকে নৌবাহিনীর একজন অফিসার বানিয়ে দেওয়া হবে। তুমি যখন জাহাজে সওয়ার হয়েছিলে তখন কে বলতে পারতো যে, আল্লাহ আমাদের পরস্পরের দীলের স্পন্দন শুনবার জন্য নির্বাচন করেছিলেন অনন্তপুরের কেল্লা।

রাজিয়া বললেন ঃ আমি আপনার কাছ থেকে একটা ওয়াদা নিতে চাই এবং তা হচ্ছে কোনো পর্যায়েই আপনি আমায় আপনার দৃষ্টির আড়ালে যাবার হুকুম দেবেন না।

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কোনো অস্ত্র সরবরাহ না আসে, তাহলে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার খাতিরে আমরা হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য হবো। দুশমন তাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার মওকা দিতে রাজি হলে আমি অবশিষ্ট সাথীদের নিয়ে তাদের কয়েদ কবুল করে নেবো, তাদের কয়েদখানা হবে আমাদের জন্য মওতের চাইতেও ভয়াবহ। যা-ই হোক, এই কেল্লার কমাণ্ডার হিসাবে বাকি নারী ও শিশুদের জন্য আমার যে হুকুম হবে, তোমার জন্যও হবে সেই একই হুকুম।'

রাজিয়া আশান্বিত হয়ে বললেন ঃ তেমন সময় এলে আমি আপনার হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করবো না। আমার বিশ্বাস, আমার জিন্দেগিতে কখনো

আসবে না সে সময়।'

সন্ধ্যাবেলায় কেল্লার বাকি অফিসার সিদ্দীক আলীকে বলতে লাগলো যে, তাদের বারুদ বিলকুল খতম হয়ে গেছে। অল্পসময়ের মধ্যে কোনো অস্ত্র সাহায্য পাওয়া না গেলে সম্ভবত রাতের বেলা বিনাবাধায় দুশমন এসে প্রবেশ করবে কেল্লার ভিতরে।

সিদ্দীক আলী জওয়াব দিলেন ঃ এখন আমাদের মকসদ হচ্ছে এখানকার লড়াইয়ে দুশমনকে যতো বেশি সম্ভব বিব্রত করে রাখা। আমাদেরকে কোনো মতে রাতটি কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে।'

রাতেরবেলায় কেল্লার তোপ খামোশ দেখে ইংরেজ তাদের তোপ আরো কাছে নিয়ে এলো। এবার তাদের গোলাবর্ষণ হলো আগের চাইতেও ধ্বংসকর। যে ঘাঁটিতে সিদ্দীক আলী বসেছিলো তার আশেপাশের পাঁচিলের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বহু অনুনয় করে রাজিয়াকে রাজি করালেন নিচে যেতে। নারীদের এক কামরায় গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। অল্পসময়ের মধ্যেই ঘুমের মায়া তার সব উদ্বেগ ভুলিয়ে দিলো।

সারারাত্রি গোলাবর্ষণের পর ভোরের রোশনিতে অনন্তপুর কেল্লা গ্রহণ করেছে ধ্বংস ও জনশূন্যতার মর্মবিদারক রূপ। কেল্লার মুহাফিজ শেষ গুলি চালিয়ে নিরস্ত হয়েছে। সিদ্দীক আলী অন্তহীন উদ্বেগ ও মর্মপীড়া নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে এক সিপাহীকে পাঁচিলের উপর সফেদ ঝাণ্ডা উড়াতে বললেন। দুশমনের তোপ আচানক খামোশ হয়ে গেলো। সিদ্দীক আলী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরুলেন এবং কেল্লা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কদম দূরে গিয়ে থামলেন। দুশমনের সারি থেকে একদল সওয়ার দেখতে দেখতে বেরিয়ে সিদ্দীক আলীর কাছে এসে থেমে গেলো। সিদ্দীক আলী বললেন ঃ আপনাদের কমাণ্ডারের কাছে আমি এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি যে, কেল্লা আপনাদের হাতে ছেড়ে দিতে তৈরি।'

এক ইংরেজ অফিসার জওয়াব দিলো ঃ এ আবেদন নিয়ে তোমায় আর কমান্ডারের কাছে যেতে হবে না। যারা চুক্তিভঙ্গ করে আমাদের শান্তি পতাকার উপর গুলি চালিয়েছে, আমাদের কমাণ্ডার তাদের সাথে কথা বলতে রাজি নন। যদি তোমরা বিনাশর্তে হাতিয়ার সমর্পণ করতে রাজি না হও তাহলে পুনরায় গোলাবর্ষণ করা হবে এবং কেল্লা দখল করার পর তোমাদের নিকৃষ্টতম আচরণের যোগ্য মনে করা হবে।'

সিদ্দীক আলী বললেন ঃ যে লোক আপনাদের সাথে চুক্তি করেছিলো, সে ছিলো মহীশূরের গাদ্দার।'

অফিসার বললো ঃ আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। তুমি ফিরে যেতে পারো। আমাদের বিশ্বাস, তোমরা বাধা দিলেও এক ঘন্টার মধ্যে আমরা দখল করে নেবো এ কেল্লা।'

সিদ্দীক আলী হতাশ হয়ে বললেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমরা বিনাশর্তে হাতিয়ার সমর্পণ করলে নারী ও শিশুদের প্রতি আপনারা কিরূপ আচরণ করবেন?

অফিসার জওয়াব দিলো ঃ তোমাদের হাতিয়ার সমর্পণ করবার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমরা জানি, তোমাদের বারুদ শেষ হয়ে গেছে। আর কোনো পথ নেই দেখেই তোমরা শান্তি পতাকা উড়িয়েছো। আমাদের সময় নষ্ট করো না। বিনাশর্তে হাতিয়ার সমর্পণ করলেই তোমাদের ভুলাই। নারী ও শিশুদের প্রতি বাড়াবাড়ি করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোনো কথা আমরা বলতে চাই না তোমাদের সাথে। তুমি চলে যেতে পারো।'

সিদ্দীক আলী কেল্লার দিকে তাকালেন এবং কোনো কথা না বলে কোমর থেকে তলোয়ার খুলে দিলেন ইংরেজ অফিসারের হাতে।

কিছুক্ষণ পর ইংরেজ ফউজ বিজয়ের নাকাড়া বাজিয়ে কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করলো। ইংরেজ কম্যাণ্ডান্টের হুকুমে কেল্লার মুহাফিজদের নিরস্ত্র করে এক দিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। তাদের বেশির ভাগই ছিলো জখমি। কতক সিপাহী তাদের সামনে পাহারায় দাঁড়ালো বন্দুক নিয়ে এবং বাকি সিপাহীরা ক্ষুধিত নেকড়ের মতো হামলা করলো নারীদের উপর। কেউ তাদের জেওর খুলে নিলো, কেউ তাদের লেবাস ছিনিয়ে নিলো। নারী ও শিশুদের আর্ত-চিৎকারের সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজ সিপাহীদের অট্টহাস্য উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগলো।

সিদ্দীক আলী এই মর্মান্তিক দৃশ্য বরদাশ করতে পারলেন না। তিনি একলাফে এগিয়ে গিয়ে এক সিপাহীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চোখের পলকে এক ইংরেজ অফিসারের টুঁটি চেপে ধরলেন। অফিসারটি এক যুবতীর চুল ধরে ঝাঁকাচ্ছিলো। তিনি তাকে এক ধাক্কা মেরে ভূতলশায়ী করে দু'হাতে তার টুঁটি চেপে ধরলেন। সিপাহীরা বন্দুকের হাতল দিয়ে তাকে মেরে মেরে আলাদা করে তার হাত দুটি বেঁধে ফেললো রশি দিয়ে। এরই মধ্যে সিদ্দিক আলীর কয়েকজন সাথী ইংরেজ সিপাহীদের হাত থেকে সঙ্গিন ছিনিয়ে নিয়ে হালকা করে দিয়েছে তাদের ছয় জনকে। এবার জওয়াবে ইংরেজরা তাদের পাইকারীভাবে কতল করতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে পঞ্চাশ জন কয়েদিকে তারা পাঠালো মৃত্যুর মুখে। এই বর্বরসুলভ কতলে আমের মধ্যে কতক নারী ও তরুণী দুশমনের হিংস্র বর্বরতার

হাত থেকে বাঁচবার জন্য কেল্লার প্রান্ত থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান দিলো।

ইংরেজ কম্যাণ্ডান্ট পরিস্থিতি সামলে নিয়ে বাকি কয়েদিদের বিশজনকে আলাদা করে তাদের হাত-পা বেঁধে পাঁচিলের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলো। সিদ্দীক আলী ছিলেন তাদের মাঝখানে দাঁড়ানো। তার পেশানী থেকে বয়ে যাচ্ছে রক্তের ধারা। ইংরেজ সিপাহীদের একটি দল দেয়াল থেকে কয়েক কদম দূরে কয়েদিদের সামনে দাঁড়ানো। রাজিয়া কয়েকটি নারীর সাথে কয়েদিদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মোহাবিষ্টের মতো দেখছেন এ মর্মান্তিক দৃশ্য। ইংরেজ কম্যাণ্ডান্ট হাত বাড়িয়ে দেওয়ামাত্রই সিপাহীরা তাদের বন্দুক উদ্যত করলো।

রাজিয়া আচানক ছুটে এলেন নারীদের ভিড়ের ভিতর থেকে এবং সিদ্দীক, সিদ্দীক বলে চিৎকার করতে করতে এসে পড়লেন বন্দুকের নাগালের মধ্যে। ইতিমধ্যে কম্যান্ডান্ট গুলি ছুঁড়বার হুকুম দিয়ে হাত নিচু করলো। বন্দুকের ভয়াবহ গর্জনের সাথে সাথে এক নারীকণ্ঠে চিৎকার শোনা গেলো। রাজিয়া সিদ্দীক আলীর কাছ থেকে আট দশ কদম দূরে পড়ে গেলেন- উঠলেন- আবার পড়ে গেলেন - তারপর জমিনের উপর রক্তরাঙ্গা সিদ্দীক আলীর লাশের উপর এসে পড়লেন। :-

এক ইংরেজ অফিসার এগিয়ে এসে তাকে উঠাবার চেষ্টা করলো। তারপর সিপাহীদের দিকে তাকিয়ে সে বললো ঃ মরে গেছে।'

কিছুক্ষণ পর ইংরেজ সিপাহী কয়েদিদের আর একটি দলের উপর তাদের বন্দুকের নিশানা পরীক্ষা করলো। তাদের যখন বিজয়ী লশকর অনন্তপুরের কেল্লায় তাদের বিজয় পতাকাকে সালাম করছে, তখন কয়েকজন জখমি ও রোগী ছাড়া কেল্লায় মুহাফিজদের সবারই জীবনের সফর শেষ হয়ে গেছে। নিতান্ত অসহায় দেখেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেই জখমি ও রোগীদের। যে ক'জন নারী বেঁচে রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন মুখ কমই, যেখানে জখমের নিশানা নেই।

একুশ

মোয়াযযম আলী আয়াজ খানের গাদ্দারি ও বিডনোরের উপর আচানক ইংরেজদের দখল কায়েম হবার খবর শুনেছেন, কিন্তু সিদ্দীক ও মাসউদের পরিণাম সম্পর্কে তিনি কোনো খবর পাননি কয়েকদিন। একদিন ভোরে ফরহাত যথারীতি নামাজ শেষ করে কোরআন তেলাওয়াত করছেন এবং মোয়াযযম আলী মুরাদকে সাথে নিয়ে ফউজী শিক্ষাকেন্দ্রে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় নওকর ভিতরে এসে খবর দিলো ঃ এক ফউজী অফিসার মোলাকাত করতে চান আপনার সাথে। তিনি নাকি মালাবার থেকে এসেছেন কয়েকটি জরুরি খবর নিয়ে। তাকে আমি দেওয়ানখানায় বসিয়ে রেখেছি।'

মোয়াযযম আলী দীলের মধ্যে এক অস্বস্তিকর কম্পন অনুভব করলেন এবং দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন দেওয়ানখানার দিকে। সেখানে তিনি মহীশূর ফউজের এক বড়ো অফিসারের সাথে মোসাফেহা করলেন। মোয়াযযম আলী বললেন ঃ তশরিফ রাখুন। আপনি মালাবার থেকে এসেছেন?'

ঃ জী হ্যাঁ, আমার নাম লুতফে আলী বেগ।'

মোয়াযযম আলী তার কাছে বসে বললেন ঃ আমি আপনার নাম শুনেছি। বলুন।'

লুতফে আলী বললেন ঃ সুলতান মোয়াযযম আমায় পাঠিয়েছেন আপনার খেদমতে। আমার আফসোস, আমি কোনো ভালো খবর নিয়ে আসিনি।'

মোয়াযযম আলী লুতফে আলীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন ঃ আপনি সিদ্দীক, মাসউদ অথবা আনোয়ারের সম্পর্কে কিছু বলতে চান?'

ঃ জী, আমি সিদ্দীক ও মাসউদ সম্পর্কে দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।'

কয়েক মুহূর্তে মোয়াযযম আলীর মুখ থেকে কোনো কথা সরলো না। তারপর তিনি ভাঙা আওয়াজে বললেন ঃ আমার পুত্রেরা যদি লড়াইয়ের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে থাকে, তাহলে আমার কাছে তাদের কোনো খবরই খারাপ হতে পারে পারে না। বলুন, কি খবর নিয়ে এসেছেন?'

লুতফে আলী বললেন ঃ আপনি অনন্তপুরে ইংরেজদের জুলুমের ঘটনা শুনেছেন?

ঃ জী।

ঃ সিদ্দীক আলী খান ছিলেন অনন্তপুর কেল্লার মুহাফিজ এবং মাসউদ আলী

ছিলেন তার সাথে।'

ঃ আর তারা দুজন .....?'

ঃ তারা দু'জন শহীদ হয়েছেন।'

মোয়াযযম আলী মোহাবিষ্টের মতো কয়েক মূহূর্ত তাকিয়ে রইলেন লুতফে আলীর মুখের দিকে। অবশেষে তিনি বললেন ঃ কিন্তু সিদ্দীক আলী তো নৌবাহিনীতে ছিলো। কি করে সে অনন্তপুরে পৌছলো, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।'

লুতফে আলী জওয়াব দিলেন ঃ তিনি বাঙ্গালোর থেকে যুদ্ধের সামান নিয়ে গিয়েছিলেন কুণ্ডাপুরে। সেখানে আয়াজ খানের গাদ্দারীর পর এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, তাকে কুন্ডাপুরের ফউজ পরিচালনার ভার নিতে হলো। তারপর বিডনোর এলাকায় আমাদের অবশিষ্ট সেনাবাহিনী এসে জমা হলো তার পাশে। মাসউদ আলী থেকেই ওখানে ছিলেন। তিনি ইংরেজ হামলার কয়েকদিন আগে আসাদ খানের নেতৃত্বে কুণ্ডাপুরে আসেন। আসাদ খান কুণ্ডাপুরের লড়াইয়ে শহীদ হন মরবার আগে তিনি তার জিম্মাদারী ন্যস্ত করে গেলেন সিদ্দীক আলীর উপর। আমি শুনেছি আসাদ খান নাকি আপনার দোস্ত ছিলেন।'

ঃ জী হ্যাঁ তিনি ছিলেন আমার শ্রেষ্ঠ দোস্ত।'

ঃ সিদ্দীক আলী ও মাসউদ আলীর শাহাদতের খবর পেয়ে সুলতানে মোয়াযযম খুবই ব্যথিত হয়েছেন এবং আপনার নামে এক ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে তিনি আমায় পাঠিয়েছেন।'

লুতফে আলী এক চিঠি বের করে মোয়াযযম আলীর হাতে দিলেন।

মোয়াযযম আলী চিঠি খুলে পড়লেন। সুলতান টিপু লিখেছেন ঃ

মোয়াযযম, দোস্ত! এক মর্মান্তিক খবর শোনাবার জন্য আমি লুতফে আলীকে পাঠাচ্ছি আপনার কাছে। হায়! আমার কথা যদি আপনার জখমের উপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারতো! আমার সালতানাতের তামাম অর্থভাণ্ডার সিদ্দীক আলী ও মাসউদ আলীর মতো জানবাজ যোদ্ধার এক কাতরা খুনের মূল্য দিতে পারে না। কিছুকাল আগে আপনি যুদ্ধে হিসসা নেবার খাহেশ জানিয়েছিলেন, কিন্তু আমি আপনার আবেদনের কোনো জওয়াব দেইনি, কেননা যুদ্ধের ময়দানের চাইতে সেরিঙ্গাপটমের ফউজী শিক্ষাকেন্দ্রে আমি আপনার প্রয়োজন অনুভব করেছি আরো বেশি। এখনো আমি মনে করি যে অত্যাধিক কল্যাণকর কাজ করে যাচ্ছেন। তথাপি আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো সময়ে সেরিঙ্গাপটমে কোনো যোগ্য লোকের হাতে আপনার জিম্মাদারী অর্পণ করে তশরিফ আনতে পারেন। যুদ্ধের ব্যাপারেও

আমার আপনার মতো লোকের পরামর্শের প্রয়োজন।'

চিঠি পড়ে মোয়াযযম আলী বহুক্ষণ গর্দান নিচু করে চিন্তা করলেন। অবশেষে লুতফে আলীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ আপনি ওদের শাহাদতের খবর ভালো করে যাচাই করে দেখছেন?'

ঃ জী হ্যাঁ। অনন্তপুরের বর্বরোচিত কতলে-আমের পর ইংরেজ কয়েকটি নারী ও শিশুকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলো জখমি। আপনার পুত্রদের শাহাদতের খবর তারাও স্বীকার করেছে। আমার বিশ্বাস, যেদিন অনন্তপুরের ঘটনা মানুষের চোখের সামনে আসবে, সেদিন মহীশূরের প্রত্যেক বাসিন্দা তাদের সাহস, হিম্মত ও আত্মসম্ভ্রবোধের জন্য গর্ব করবে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ হায়! যে কওমের ইজ্জত ও আজাদি আজ কতিপয় গাদ্দার ও সুযোগ-সন্ধানীর উপর নির্ভরশীল, ওদের কোরবানী যদি সে কওমের তকদীর বদলে দিতে পারতো! আহা! মহীশূরে যদি কোনো আয়াজ পয়দা না হতো!'

লুতফে আলী বললেন ঃ এবার আমায় এজাযত দিন। আমি আজই ফিরে যেতে চাই। যদি সুলতানে মোয়াযযমের কাছে আপনি কোনো পয়গাম পাঠাতে চান, আমি তা পৌঁছে দেবো।'

ঃ আপনি আমার তরফ থেকে সুলতানে মোয়াযযমকে শোকরিয়া জানাবেন এবং তাকে বলবেন, আমি খুব শিগগিরই তার খেদমতে হাজির হবো।'

এক হফতা পর রাতের শেষ প্রহরে মোয়াযযম আলী ও ফরহাত বাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন। মোয়াযযম আলী সফরের লেবাস পরিহিত। মুরাদ চোখ ঘষতে ঘষতে বারান্দায় এসে বললো ঃ আব্বাজান, আপনি তৈরি হয়ে গেছেন? এখনো তো অনেক রাত বাকি।'

ঃ না বেটা, ঐ যে দেখো, ভোরের সিতারা দেখা দিয়েছে।'

মুরাদ আম্মীকে লক্ষ্য করে অভিযোগের স্বরে বললো ঃ আম্মাজান, আপনি ওয়াদা করেছিলেন, আব্বাজান উঠলে আমায়ও জাগিয়ে দেবেন।'

মা জবাব দিলেন ঃ বেটা, আমি তো ওয়াদা করেছিলাম যে, তোমায় তিনি দেখা দিয়ে যাবেন।'

মোয়াযযম আলী তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ বেটা, তুমি ওয়াদা করো,

আমার অনুপস্থিতিতে সময় নষ্ট করবে না। সিদ্দীক আর মাসউদ এক অতি বড়ো মকসাদের জন্য জান কোরবান করেছে এবং সে মকসাদ পুরো করবার জন্য মহীশূরের প্রয়োজন হবে শ্রেষ্ঠ মানুষের। আমি তোমায় দেখতে চাই মহীশূরের শ্রেষ্ঠ নওজোয়ান।'

মুরাদ আলী প্রশ্ন করলো ঃ আব্বাজান, কবে পর্যন্ত ফিরে আসবেন আপনি?

ঃ বেটা, আমি জলদি ফিরে আসবার চেষ্টা করবো। আনোয়ার আলী বাসবারে পৌছে থাকলে তাকে কয়েকদিনের জন্য পাঠিয়ে দেবো তোমাদের কাছে।

তারপর মোয়াযযম আলী ফরহাতের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি পেরেশান হয়ো না যেনো। আমি ইনশাআল্লাহ জলদি ফিরে আসবো।'

ফরহাত বিষণ্ণকণ্ঠে জওয়াব দিলেন ঃ আমি পেরেশান হইনি। আমি শুধু ভাবছি, গত ত্রিশ বছরে আমাদের খান্দানে তিনপুরুষ ক্রমাগত কওমের গাদ্দারদের গুণাহর কাফফারা আদায় করে এসেছে। খোদা মালুম, এদেশে মীর জাফরের রুহ আর কতো কাল জিন্দাহ থাকবে এবং এ ধারা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ ফরহাত এ দুনিয়া ভালো-মন্দের যুদ্ধভূমি। আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, সুযোগসন্ধানী, গাদ্দার ও জাতিদ্রোহীদের হিসাব-নিকাশের দিন আসন্ন। বিডনোরের ঘটনা সুলতান টিপুর চোখ খুলে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ করার পর তার সামনে প্রথম সমস্যা হবে কওমকে অপবিত্র উপাদানের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করা। ইংরেজের সাথে বোঝাপড়া করবার পর আমি সুলতানের কাছে দাবি জানাবো, যেনো বিডনোরের গাদ্দারদের ব্যাপার তিনি আমার হাতে সোপর্দ করে দেন। যে কওম সুলতান টিপুর মতো মানুষের জন্ম দিতে পারে, তার হতাশার কোনো কারণ নেই, ফরহাত! আমি শিগগিরই ফিরে তোমায় খোশ খবর শোনাবো যে, সিদ্দীক ও মাসউদের রক্তদান ব্যর্থ হয়নি এবং অনন্তপুর ও বিডনোরের উপর উড্ডীন হয়েছে আমাদের বিজয়-ঝাণ্ডা।'

ফরহাতের চোখে জ্বলজ্বল করে ওঠে অবাধ্য অশ্রু। মোয়াযযম আলী কয়েক মূহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকেন নির্বাক হয়ে; তারপর খোদা হাফিজ বলে নেমে পড়েন পথে। তিনি প্রাঙ্গণের বাইরে চলে গেলে ফরহাত মুরাদের হাত ধরে বাহির বাড়ির দিকে খোলা দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। দরজা থেকে কয়েক কদম আগে মোয়াযযম আলী ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন এবং নওকররা জমা হয়েছিলো তার কাছে। মোয়াযযম আলী ঘোড়াকে চাবুক লাগালেন এবং ফরহাতের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা।

মুরাদ আলী কিছুক্ষণ তার মা'র সাথে থাকলো নিশ্চল-নিঃসাড় হয়ে। অবশেষে সে বললো ঃ চলি, আম্মাজান!'

মা তার গর্দানে হাত দিয়ে বললেন ঃ চলো, বেটা, এবার তোমার উপর ভর করবার দরকার হয়েছে আমার।'

৫৪

মহীশূরের সেনাবাহিনী ইংরেজদের হাত থেকে উপকূল চৌকিগুলো ছিনিয়ে নেবার পর হায়দরগড় ও বিডনোরের আশেপাশের ছোট ছোট কেল্লাগুলো দখল করে নিয়েছে এবং সমুদ্রের দিক দিয়ে রসদ ও অস্ত্র সরবরাহের তামাম রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবার দরুন বিডনোর জেনারেল ম্যাথুজের ফউজ অবরোধ-অবস্থার মোকাবিলা করছে। সুলতান টিপু হায়দরগড় ও বিডনোরের মাঝখানে এক অধিত্যকায় শিবির সন্নিবেশ করে বিভিন্ন ময়দানে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর দেখাশোনা করছেন।

যুদ্ধের দিনেও তিনি সালতানাতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকেন। উজির, সুবাদার ও অন্যান্য কর্মচারী তাকে নিয়মিত লিখে পাঠান তাদের কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ। সুলতান প্রতিদিন তার প্রতিনিধিদের বেশুমার চিঠিপত্র ও প্রজাদের দরখাস্তের জওয়াব এবং জরুরি মামলার ফয়সালা লিখিয়ে নেন। মোলাকাতীদের সাথে আলাপ করেন এবং তারপর তিনি ফউজী ব্যাপারের দেখাশোনায় লিপ্ত হন। একদিন প্রায় এগারোটার সময়ে সুলতান তার দফতরের কাজ শেষ করেছেন, অমনি তার সামনে পেশ করা হলো মোলাকাতীদের ফিরিস্তি। সুলতান কাগজের উপর নজর দিয়েই প্রশ্ন করলেন ঃ মোয়াযযম আলী কখন এলেন?'

অফিসার জওয়াব দিলেন ঃ আলীজাহ! তিনি কাল রাত্রে এখানে এসেছেন।'

সুলতান টিপু বললেন ঃ ওকে নিয়ে এসো।'

অফিসার বেরিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরেই মোয়াযযম আলী ভিতরে প্রবেশ করলেন। সুলতান মসনদ থেকে উঠে এসে মোসাফেহা করলেন তার সাথে। তাকে নিজের কাছে এক কুরসিতে বসিয়ে তিনি বললেন ঃ 'আমরা অনন্তপুরে জানবাজদের যথাসময়ে অস্ত্র-সাহায্য পাঠাতে পারিনি, তার জন্য হামেশা আমার মনে আফসোস থাকবে। দুশমন আচানক বাঙ্গালোরের উপর হামলা করে আমাদের সেনাবাহিনীকে ওখানকার ময়দান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছিলো, কিন্তু এখন সে জালেমদের হিসাব-নিকাশের দিন এসে গেছে। আমরা সমুদ্রের দিক দিয়ে দুশমনের রসদ ও অস্ত্র চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। হায়দরগড় জয় করা হয়ে গেছে এবং কালই আমাদের ফউজের এক হিসসা অনন্তপুরে রওয়ানা হয়ে যাবে। তার কয়েক দিনের মধ্যে বিডনোরের কেল্লা এসে যাবে আমাদের তোপের নাগালের মধ্যে। সিদ্দীক আলী ও মাসউদ আলীর মতো গুণান্বিত পুত্রকে হারিয়েছেন যে পিতা, আমার কথাগুলো তার সে জখমের এলাজ হতে পারে না, কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, অনন্তপুরের শহীদানের কোরবানী কখনো ব্যর্থ হবে না।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ যে বাপের পুত্র তার চোখের সামনে ইজ্জতের আসন হাসিল করেছে, তার জন্য এর চাইতে বড়ো উৎসাহব্যঞ্জক খবর আর কি হতে পারে?'

সুলতান বললেন ঃ আপনি যুদ্ধে হিসসা নেবার ইচ্ছা করেছেন। যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে অন্তপুরের উপর হামলাকারী ফউজের পরিচালনা ভার আমি আপনার উপর ন্যস্ত করতে তৈরি।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ আলীজাহ! আপনি যদি আমায় তার যোগ্য মনে করেন, তাহলে আমি শোকরিয়ার সাথে এ জিম্মাদারী কবুল করবো।'

সুলতান টিপু বললেন ঃ আপনি যখন এ অভিযান থেকে ফিরে আসবেন, তখন আমি আপনাকে এর চাইতেও বড়ো গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী অর্পণ করবার ইরাদা রাখি। বিডনোরের সুবাদারীর জন্য আপনার চাইতে যোগ্যতম কোনো লোক আমার নযরে পড়ছে না। আপনি হায়দরগড় যাবার জন্য তৈরি হয়ে যান। সন্ধ্যার আগেই ওখানকার সিপাহসালারের নামে আপনার নিয়োগপত্র পৌছে যাবে।'

মোয়াযযম আলী কৃতজ্ঞতা সহকারে শেরে মহীশূরের দিকে তাকালেন এবং উঠে বেরিয়ে গেলেন খিমার বাইরে।

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে মোয়াযযম আলী ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে হাজির হলেন হায়দরগড় কেল্লার দরজায়। কয়েকজন সিপাহী ও অফিসার কেল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে। এক সিপাহী এগিয়ে এসে তার ঘোড়ার বাগ ধরলো। ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে মোয়াযযম আলীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এক নওজোয়ানের মুখের উপর। নওজোয়ান তার তৃতীয় পুত্র আনোয়ার আলী। তার মুখের উপর লেগে রয়েছে এক টুকরো বিষণ্ন হাসি এবং চোখের উপর জ্বলজ্বল করছে অশ্রুবিন্দু। কতোক্ষণ মোয়াযযম আলীর মুখে কোনো কথা যোগালো না। অবশেষে তিনি বললেন ঃ আনোয়ার, কবে থেকে তুমি এখানে?'

আনোয়ারের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি জওয়াব দিলেনঃ আব্বাজান, আমাদের ফউজ গত হফতায় এখানে এসেছে। সিপাহসালার আমাকেও বলেছিলেন যে, আপনি এখানে তশরিফ আনছেন। আম্মাজান ও মুরাদের খবর কি?'

ঃ ওরা ভালোই আছে। তোমাদের সিপাহ্সালার কোথায়?'

ঃ তিনি ভিতরে আপনার ইন্তেজার করছেন। চলুন।'

মোয়াযযম আলী আনোয়ার আলীকে সাথে নিয়ে কেল্লার এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন। মহীশূর ফউজের নামজাদা জেনারেল গাজি খান এক কুরসিতে উপবিষ্ট। তার সামনে ছড়ানো রয়েছে কতকগুলো নকশা ও কাগজপত্র। গাজি খান উঠে মোয়াযযম আলীর সাথে পরম উৎসাহে মোসাফেহা করে বলবেন ঃ আপনার সম্পর্কে হুকুম আমার হাতে এসেছে। আপনার ফউজ ভোরবেলা ময়দানে রওয়ানা হবার জন্য তৈরি।'

৫

অনন্তপুর কেল্লার উপর দু'দিন ধরে তীব্র গোলাবর্ষণ চললো। ইংরেজ কেল্লার বাইরে তাদের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতাশ হয়ে গেছে। তৃতীয় দিন মোয়াযযম আলীর ফউজ কেল্লার উপর চূড়ান্ত হামলার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে কেল্লার এক ভাঙা বুরুজের উপর উড়ানো হলো সফেদ ঝাণ্ডা। মোয়াযযম আলী সিপাহীদের গোলাবর্ষণ বন্ধ করবার হুকুম দিলে আকাশ-বাতাস আচানক স্তব্ধ হয়ে গেলো। ফউজের এক নওজোয়ান অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে মোয়াযযম আলীর কাছে এসে বললো ঃ জনাব, এ কেল্লার ফউজের নিরাপত্তা বিধান গুনাহ। এদেরই হাত আমাদের বেগুনাহ ভাই-বোনদের খুনে রঙিন হয়েছিলো। জঙ্গী কয়েদিদের এরা বানিয়েছিলো তীরের নিশানা। এদেরকে আমরা মাফ করতে পারি না।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ দুস্কৃতিতে আমরা দুশমনের অনুকরণ করবো না। শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের রয়েছে নিজস্ব নীতি।'

ঃ কিন্তু আপনার পুত্রদের সাথে এরা কিরূপ আচরণ করেছিলো, তা আপনি জানেন না।'

কেল্লার দরজা খুলে গেলো এবং সফেদ ঝাণ্ডা হাতে ইংরেজ অফিসার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর সে মোয়াযযম আলীর কাছে এসে বললো ঃ আমাদের কমাণ্ডার যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আপনার সাথে আলোচনা করতে চান।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার সাথে তার কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। তুমি তাকে বলবে যে, যুদ্ধ খতম করবার একটিমাত্র পন্থা রয়েছে এবং তা হচ্ছে হাতিয়ার সমর্পণ।'

ইংরেজ অফিসার বললো ঃ আপনারা আমাদেরকে আপনাদের হেফাযতে সদাশিবগড়ে পৌছে দেবার জিম্মা নিলে আমরা এ কেল্লা খালি করে দিতে তৈরি।'

মোয়াযযম আলী তিক্ততার সাথে জওয়াব দিলেন ঃ তুমি আমাদের সময় নষ্ট করেছো। যুদ্ধ বন্ধ করবার একমাত্র পন্থা, তোমরা বিনাশর্তে হাতিয়ার সমর্পণ করবে।'

ইংরেজ অফিসার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো ঃ যদি আমরা বিনাশর্তে হাতিয়ার সমর্পণ করি, তাহলে আপনারা আমাদের সাথে জঙ্গী কয়েদির মতো আচরণ করবেন, তার জামানত কোথায়?'

ঃ আমরা তোমাদেরকে কোনো জামানত দিতে প্রস্তুত নই। তোমাদের যা অপরাধ, তাতে তোমাদের সাথে কথা বলাও ইনসানিয়াতের অবমাননা। কিন্তু তুমি গিয়ে তোমার কমাণ্ডারকে বলতে পারো যে, তোমরা অনন্তপুর কেল্লা জয়ের

পর আমাদের সিপাহী ও নারীদের সাথে যে আচরণ করেছিলে, তোমাদের সাথে তেমন কোনো আচরণ করবো না আমরা। ফয়সালা করার জন্য আধঘন্টা সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে। এই সময়ের পর কেল্লার উপর আবার শুরু হবে গোলাবর্ষণ এখন তুমি চলে যেতে পারো।'

ইংরেজ অফিসার বললো ঃ আধ ঘন্টা পর যদি কেল্লার দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, আমরা আপনাদের ফয়সালা মেনে নিয়েছি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ না, তা যথেষ্ট হবে না। তোমাদের তামাম ফউজ কেল্লার বাইরে দাঁড় করিয়ে তাদের হাতিয়ার এক জায়গায় জমা করে দিতে হবে। তারপর আমরা কেল্লা দখল করে নিলে তোমাদেরকে কোনো উপযুক্ত স্থানে অপসারণ করা হবে।'

ইংরেজ অফিসার মোয়াযযম আলীকে ফউজী সালাম করে ঘোড়ার বাগ ঘুরিয়ে নিলো। প্রায় বিশ মিনিট পর কেল্লার দরজা খুলে গেলো এবং ইংরেজ ফউজ বাইরে বেরিয়ে তাদের হাতিয়ার জমা করলো পাঁচিল থেকে কয়েক গজ দূরে।'

মোয়াযযম আলী কেল্লা দখল করে নিয়ে ইংরেজ সিপাহীদের বন্ধ করলেন কয়েকটি কুঠরিতে। মহীশূর ফউজের যেসব কয়েদি ইংরেজদের হাতে কতল থেকে বেঁচে গিয়েছিলো, তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিলো বিডনোরের কঙ্কাল। তারা চিৎকার করে দাবি করছিলো সিদ্দীক আলী ও তার সাথীদের রক্তের প্রতিশোধ।

ঃ আমি সিদ্দীক ও মাসউদের বাপ। এই কথা বলে মোয়াযযম আলী তাদেরকে শান্ত করলেন। তিনি শহীদানের কবর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে এক কয়েদি বললো, তাদের সবাইকে কেল্লার বাইরে একটি গর্তে দাফন করা হয়েছে এবং তাদেরকে দিয়েই খোদাই করা হয়েছিলো সে গর্ত।

কিছুক্ষণ পর বিজয়ী লশকর কেল্লার বাইরে মাটির এক টিবির উপর উড়ানো হলো মহীশূরের ঝাণ্ডা। মোয়াযযম আলী কয়েদিদের মুখে শুনলেন সেই তরুণীর কথা, যিনি সিদ্দীক আলীর সাথে জামে শাহাদতের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। তার পুরো কাহিনী কেউ জানতো না। অশুগতি প্রশ্নের জওয়াবে তিনি শুধু জানলেন যে, তার পুত্র হয়েছিলেন এক উচু খান্দানের সহায়-সম্বলহীনা তরুণীর শেষ অবলম্বন এবং তিনি তাকে বিডনোর কেল্লা থেকে পাঠাতে চেয়েছিলেন আপন গৃহে।

মোয়াযযম আলী দোআর জন্য হাত তুললেন। সিদ্দীক ও মাসউদের শৈশব ও যৌবনের বেশুমার স্মৃতি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। তারপর তার পুত্রদের সাথে তিনি দেখতে লাগলেন এক অজানা তরুণীর অসংখ্য কাল্পনিক ছবি। তার দীল বলে উঠলো ঃ বেটি আমার! তুমি কে ছিলে, কোত্থেকে এসেছিলে, কোন খান্দানের মেয়ে তুমি, তা আমি জানি না। আমি তোমায় কখনো দেখতে পাবো না। কিন্তু যদি তোমার রুহ আমার আওয়াজ শুনতে পায়, তা হলো আমি বলে দিতে চাই যে, আমার বাচ্চাদের চাইতে তুমি কম প্রিয় ছিলে না আমার কাছে।' ঃ-৮

পরদিন মোয়াযযম আলী চারশ' সিপাহী কেল্লার হেফাজতের জন্য রেখে দিয়ে বাকি সেনাদল সাথে নিয়ে চললেন সুলতানের শিবির অভিমুখে। পথে তিনি খবর পেলেন যে, সুলতানের লশকর বিডনোরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। মোয়াযযম আলী তার পদাতিকদের পেছনে রেখে সওয়ার দলকে সাথে নিয়ে পৌছলেন বিডনোরে। ইতিমধ্যে সেখানে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

মোয়াযযম আলী শহরের পূর্বদিকের পাঁচিল থেকে প্রায় আধমাইল দূরে সিপাহীদের থেমে যাবার হুকুম দিয়ে নিজে ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে উঠলেন এক টিলার উপর। চোখে দূরবীন লাগিয়ে তিনি পরিস্থিতি যাচাই করে নিলেন। কিছুক্ষণ পর টিলা থেকে নেমে সাথীদের ঘোড়া থেকে নামবার হুকুম দিয়ে তিনি এক অফিসারকে বললেন ঃ তুমি তোমার সিপাহীদের বলে দাও, তারা যেনো ঘোড়াগুলো পিছনে নিয়ে যায়। আমি বাকি সেনাদল সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।'

কয়েক মিনিট পর তারা গিয়ে শামিল হলেন শহরের পূর্বপ্রান্তে গাজি খানের নেতৃত্বে যুদ্ধরত সিপাহীদের সারিতে। সুলতানের ফউজের ফরাসী তোপখানা পাঁচিলের পূর্ব দরজার উপর গোলাবর্ষণ করছে। তোপখানার ডানে বাঁয়ে গাজি খানের ফউজ চূড়ান্ত হামলার হুকুমের ইন্তেজার করছে। ফরাসী তোপখানার গোলাবর্ষণে পূর্বদিকের পাঁচিলের কোথাও কোথাও ছোট ছোট গর্ত হয়ে গেছে। তথাপি ইংরেজ পাঁচিলের উপরকার ঘাঁটিতে মজবুত হয়ে বসে রয়েছে এবং তাদের জওয়াবী গোলাবর্ষণও চলছে তেমনি তীব্রভাবে। শহরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে নাকাড়ার আওয়াজে বোঝা যাচ্ছিলো যে, সেদিকে সাধারণ হামলার হুকুম দিয়েছেন। সিপাহীরা নিজ নিজ ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো শহরের আশ্রয়স্থলের দিকে। তারপর কত নওজোয়ান বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে দেখতে দেখতে পাঁচিলের কাছে পৌছে গেলো, কিন্তু দুশমনের তীব্র প্রতিরোধের দরুন তারা পাঁচিলের কোনো হিসসার উপর দখল বসাতে পারলো না। পূর্ব দরজার আশেপাশে কতকগুলো লাশ ফেলে তাদেরকে হটে যেতে হলো পিছন দিকে।

মোয়াযযম আলী পাঁচিল থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ কদম দূরে এক জখমী সিপাহীকে ধরে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। আচানক তিনি দেখতে পেলেন, দুজন ফরাসী জোয়ান বেপরোয়া হয়ে ছুটে চলছে পাঁচিলের দিকে। তাদের একজনের

হাতে জ্বলন্ত মশাল, অপরের উভয় বাহুতে চেপে ধরা এক বারুদি গোলা। তাদের পিছনে ফরাসী সিপাহীদের একটি দল পাঁচিলের ঘাঁটির উপর গুলিবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। মোয়াযযম আলী বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন ঃ দুশমনের মনোযোগ নিজেদের দিকে নিবদ্ধ রাখো। তার সাথীরাও ফিরে পাঁচিলের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করলো। গাজি খান ও ফউজের অন্যান্য অফিসার বিস্মিত হয়ে দেখছেন ফরাসী জানবাজদের কার্যকলাপ। বারুদি গোলার ভারী বোঝা নিয়ে ফরাসী সিপাহী তার গন্তব্য পথের শেষ পর্যায় অতিক্রম করছে অতি কষ্টে। মশালধারী সাথী তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে কয়েক কদম আগে, আবার আচানক জমিনের উপর শুয়ে পড়ে ইন্তেজার করছে তার জন্য। পাঁচিল থেকে আট দশ কদম দূরে তারা দুজনেই জখমি হয়ে পড়ে গেলো একে একে। এক মুহূর্ত পর তাদের একজন আবার উঠলো এবং গোলা হাতে নিয়ে পড়ে গেলো পাঁচিলের পাশে। তারপর সে গোলাটি পাঁচিলের গর্তের ভিতর ঠেলে দিয়ে ফিরলো জমিনের উপর হামাগুড়ি দিয়ে। ভূপতিত সাথীর কাছে গিয়ে সে জ্বলন্ত মশালটি তুলে নিয়ে আবার হামাগুড়ি দিয়ে চললো পাঁচিলের দিকে। কিন্তু আচানক তার মাথায় গুলি লাগলে সে নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়লো জমিনের উপর।

মোয়াযযম আলী আচানক উঠে পূর্ণগতিতে ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন জমিনের উপর। আবার উঠে কয়েক কদম ছুটলেন, আবার শুয়ে পড়লেন। তৃতীয় বারের চেষ্টায় তিনি ফরাসী সিপাহীর হাত থেকে পড়ে যাওয়া মশাল তুলে নিলেন। একে একে তার রানে ও সিনায় এসে লাগলো দুটি গুলি। তথাপি তিনি পড়তে পড়তে এগিয়ে গেলেন বারুদি গোলার কাছে। পাঁচিলের গর্তের ভিতর ঢুকে যাবার পর উপর থেকে গুলি আসার ভয় আর নেই। তিনি জ্বলন্ত মশালটি রখলেন বারুদি গোলার পলতের সাথে যুক্ত করে। তারপর অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে কোনো মতে বেরিয়ে এলেন পাঁচিলের গর্তের ভিতর থেকে এবং ছুটে চললেন প্রাণপণে।

ইতিমধ্যে পাঁচিলের ঘাঁটিগুলোতে ছড়িয়ে পরেছে বিশৃঙ্খলা। পাঁচিল থেকে বিশ গজ দূরে মোয়াযযম আলী পড়ে গেছেন ভূমিশয্যায়। তার সাথে সাথেই শোনা গেলো এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। ধূম ও আশপাশের ধূলিমেঘ উড়ে গেলে মহীশূরের সিপাহীরা পূর্বদিকের পাঁচিলের গায়ে দেখতে পেলো একটি ক্ষুদ্র গর্তের পরিবর্তে মানুষ চলাচলের মতো বিরাট পথ।

৫

হুঁশ ফিরে এলে মোয়াযযম আলী যখন চোখ খুললেন, তখন তিনি এক খিমার মধ্যে শায়িত। আনোয়ার আলী ও মহীশূর ফউজের এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তার পাশে উপবিষ্ট। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্বলতার দরুন তিনি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। চিকিৎসক তাকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বললেন ঃ আপনি আরামে শুয়ে থাকুন।'

মোয়াযযম আলী কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে আনোয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি কোথায়? বিডনোর জয় করা হয়েছে তো?'

ঃ আব্বাজান, বিডনোর শহর জয় করা হয়েছে, এখন বাকি শুধু কেল্লা।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ বেটা, আমার জন্য তুমি তোমার কর্তব্য থেকে গাফেল হয়ো না।'

ঃ আব্বাজান, সুলতানে মোয়াযযম ও গাজী খান আমায় হুকুম দিয়েছেন আপনার কাছে থাকতে। তারা এখখুনি আপনাকে দেখে গেলেন। বুরহানুদ্দিনও আপনাকে দেখতে এসেছিলেন। এখনো কেল্লার উপর হামলা শুরু হয়নি। তার চারদিকে এখন তোপ পাতা হচ্ছে।'

মোয়াযযম আলী বেদনা-কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ঃ বেটা, শহরের লড়াইয়ে আমাদের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি-তো?

ঃ না আব্বাজান, শহরের পাঁচিল ভাঙবার পর চারদিক থেকে ইংরেজ ভেড়ার মতো দৌড়ে পালাতে লাগলো কেল্লার দিকে।'

চিকিৎসক ওষুধের পিয়ালা মোয়াযযম আলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ কথা বললে আপনার তকলিফ আরো বাড়বে। আপনার আরামের প্রয়োজন। ওষুধটা খেয়ে নিন।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ এ ওষুধ যদি আমায় বেহুঁশ করে রাখার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমি তা গিলবো না। জিন্দেগির বাকি কয়েক ঘণ্টা আমি বেহুঁশ থাকতে চাই না। আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমি কয়েক ঘণ্টার মেহমান মাত্র।

আনোয়ার আলী বললেন ঃ আব্বজান! গাজি খান বলছিলেন, আপনি পছন্দ করলে আম্মাজান ও মুরাদকে এখানে নিয়ে আসার ইন্তেজার হতে পারে।'

মোয়াযযম আলী জওয়াব দিলেন ঃ না, বেটা! তুমি গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে

এসো। আমি তাদের নামে এক চিঠি লিখবো।'

আনোয়ার আলী উঠে বেরিয়ে গেলেন। হাকিম সাহেব বললেন ঃ দেখুন, এ অবস্থায় আপনি চিঠি লিখতে পারবেন না।'

ঃ আমায় জিন্দেগির শেষকর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া আপনার উচিত হবে না। আমি নিজে না লিখে আনোয়ার আলীকে অথবা আপনাকে দিয়ে কয়েক পঙক্তি লিখিয়ে নেবো।'

হাকিম সাহেব বললেন ঃ কোনো কিছু আমি আপনাকে মানা করবো না। কিন্তু দীলকে একটুখানি বল দেবার জন্য এ ওষুধটা আপনি গিলে ফেলুন।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ আমার দীলকে বলিষ্ঠ করবার জন্য বিজয়ের খবরের চাইতে বড়ো আর কোনো ওষুধ নেই। যা-ই হোক, ওষুধটা আমি নিচ্ছি।'

হাকিম সাহেব এক বোতল থেকে খানিকটা ওষুধ ঢেলে মোয়াযযম আলীকে পান করালেন।

আনোয়ার আলী কলমদান ও কাগজ নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বাপের বিছানার পাশে বসলেন। হাকিম সাহেব মোয়াযযম আলীকে বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত মনে চিঠি লিখিয়ে নিন। আমি বাইরে ইন্তেজার করবো। তারপর তিনি আনোয়ার আলীকে বললেন ঃ দরকার হলে আমায় আওয়াজ দেবেন।'

চিকিৎসক বাইরে গেলে মোয়াযযম আলী ফরহাতের নামে চিঠি লিখিয়ে নিতে ব্যস্ত হলেন।

দীর্ঘ চিঠিখানা শেষ করে মোয়াযযম আলী পুত্রকে বললেন, বেটা, চিঠিখানা তোমার মাকে দেবে। আমার পর তোমার উপর তোমার মা ও ভাইয়ের এবং সর্বোপরি নিজের দেশ ও কওমের প্রতি কর্তব্য পালনের যে জিম্মাদারী ন্যস্ত হবে, সে সম্পর্কে তোমায় কিছু বলে দেবার প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্বাস, তুমি হবে এক কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্র ও স্নেহপরায়ণ ভাই। কিন্তু আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা তার চাইতেও অনেক বেশি। তোমায় ও তোমার ভাইদের আমি হামেশা দোআ করছি, যেনো তোমরা কওমের ইজ্জত ও আজাদির আমানতদার হতে পারো এবং তোমাদের ভাবী বংশধর হতে পারে তোমাদের পূর্বপুরুষের খুনসিঞ্চিত বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখার মতো। মহীশূর হচ্ছে হিন্দুস্তানের মুসলমানের শেষ রক্ষাদুর্গ। সুলতান টিপুর বিজয় হবে সেই কোটি কোটি মানুষের বিজয়, যারা চায় এ দেশে ইজ্জত ও আজাদির জিন্দেগি যাপন করতে। তোমার সম্পর্কে আমার শেষ খাহেশ ঃ মহীশূরের ইজ্জত ও আজাদির মুহাফিজ যেদিন বিজয় পতাকা উড্ডীন করবেন, সেদিন তুমি ফখর করে বলতে পারবে ঃ এই মহীশূরের মাটিতেই একদিন পড়েছিলো আমার

বাপ ও আমার ভাইদের তপ্ত খুন। কোনোদিন যেনো তুমি আমার কবরের কাছে এসে মুজদা (খোশ খবর) শোনাতে পারো ঃ আব্বাজান, আপনি বিপুল মকসাদের জন্য যে কোরবানী দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছে। আজাদির যে সূর্যসন্ধানে আপনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তা পূর্ণ গৌরবে দীপ্তিমান হয়েছে মহীশূরের আসমানে।'

বেটা, তোমাদের মনজিল বহুত দূর, আর তোমাদের পথ খুবই কঠিন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন এক পথের দিশারী দান করেছেন, যিনি গৌরব, মহিমা, দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার নিয়ামতে সমৃদ্ধ। কাফেলার প্রথ প্রদর্শক যদি ভয়াবহ অন্ধকার, ঘূর্ণি ও তুফানের মাঝখানে তার মনজিল দেখতে পায়, তার চাইতে বড়ো খোস কিসমতি আর কি হতে পারে?'

আনোয়ার আলী বহু কষ্টে তার চোখের অবাধ্য অশ্রু সংযত করছিলেন। তিনি বললেন ঃ আব্বাজান, আমার বিশ্বাস, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। সুলতানের প্রয়োজন রয়েছে আপনার মতো সাথীর। মহীশূরে এখনো বাকি রয়েছে আপনার হিসসার বহু কাজ।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ বেটা, জিন্দেগির রাজপথে প্রত্যেক মুসাফিরেরই থাকে এক আখেরী মনজিল। আমার জিন্দেগির শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোনো স্থানের প্রত্যাশা আমি করতে পারি না। তোমার মতো বয়সে আমার সব চাইতে বড়ো খাহেশ ছিলো ঃ সত্যের জন্য আমি বেঁচে থাকবো, সত্যের জন্য লড়াই করবো ও সত্যের জন্য জান দেবো।'

চিকিৎসক খিমার ভিতরে ঢুকে মোয়াযযম আলীর কাছে বসে তার নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন ঃ আপনার কয়েকজন দোস্ত আসছেন আপনাকে দেখতে। কিন্তু আমি আপনাকে বেশি সময় কথা বলবার এজাযত দেবো না। আপনার জখমে বেশি দরদ অনুভব করছেন না তো?'

মোয়াযযম আলী হাসবার চেষ্টা করে বললেন ঃ না, আলাপ করার সময়ে কোনো দরদের অনুভূত থাকে না আমার।'

গাজি খান, বুরহানুদ্দীন ও ফউজের আরো তিনজন বড়ো অফিসার খিমায় প্রবেশ করলেন। গাজি খান এগিয়ে এসে মোয়াযযম আলীর পেশানীতে হাত রেখে বললেন ঃ আপনি কেমন আছেন?'

ঃ আমি বেশ ভালো আছি। কেল্লা ফতেহ হয়েছে?'

গাজি খান জওয়াব দিলেন ঃ না। কেল্লা ফতেহ হবার খবর শোনার জন্য আপনাকে হয়তো আরো কিছুদিন ইন্তেজার করতে হবে। এখন গুরুত্বপূর্ণ

স্থানগুলোতে তোপ বসানো হচ্ছে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যাবে। সুলতানে মোয়াযযম আপনার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন এবং তিনি বলেছেন, আপনি পছন্দ করলে আপনার বিবি বাচ্চাকে নিয়ে আসা হবে এখানে।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ না, এ অবস্থায় আমি তাদেরকে পেরেশান করতে চাই না।'

মোয়াযযম আলীর সাথে কয়েক মিনিট কথা বলার পর গাজি খান ও তার সাথীরা খিমার বাইরে গেলেন। বুরহানুদ্দিন খিমা থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে ফিরে দেখলেন এবং চিকিৎসককে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। চিকিৎসক জলদি করে খিমার দরজার দিকে গেলেন। বুরহানুদ্দিন তার হাত ধরে বাইরে নিয়ে বললেন ঃ সুলতানে মোয়াযযমের হুকুম, আপনি ওর প্রাণ বাঁচাবার সব রকম সম্ভাব্য চেষ্টা করবেন। ওর অবস্থা এখন বিপদমুক্ত নয় কি?'

চিকিৎসক মাথা হেলিয়ে বললেন ঃ না, এখনো যে উনি নিশ্চিন্তে আলাপ করছেন, এ এক মোজেজা। যখন খুবই গুরুতর এবং আমার ভয়, আচানক ওর হিম্মৎ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।'

বুরহানুদ্দিন বললেন ঃ ওর জান বড়োই মূল্যবান।'

চিকিৎসক বললেন ঃ নিশ্চিন্ত থাকবেন, আমার তরফ থেকে কোন ত্রুটি হবে না।'

৪

পরের রাত্রে মোয়াযযম আলীর অবস্থা খুব নাজুক হয়ে পড়লো। কখনো কখনো হুঁশ ফিরে এলে তিনি আনোয়ার আলীর সাথে কথা বললেন, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই। তার তাকৎ নিঃশেষ হয়ে যায়। আধা-বেহুঁশ অবস্থায় তিনি চোখ বন্ধ করে থাকেন। মধ্যরাত্রের কাছাকাছি সময়ে তিনি আনোয়ার আলীকে বললেন ঃ বেটা, আমার ধারণা ছিলো, শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে সুলতানে মোয়াযযমের সাথে আমি কয়েকটি কথা বলবো, কিন্তু তিনি বড়োই ব্যস্ত।'

আনোয়ার আলী বললেন ঃ আব্বাজান, আপনি ইচ্ছা করলে আমি গাজি খানের মাধ্যমে তার পয়গাম পৌঁছাতে পারি। এশার নামাজের পর সুলতানে মোয়াযযম আপনাকে দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু তখন আপনি ছিলেন বেহুঁশ।'

মোয়াযযম আলী চোখ বন্ধ করে জওয়াব দিলেন ঃ তাকে এ সময়ে তকলিফ দিয়ে কাজ নেই। আর বেটা, তুমিও শুয়ে পড়ো।'

আনোয়ার আলী বললেন ঃ আব্বাজান! হাকিম সাহেব কোনো জখমিকে দেখতে গেছেন। তিনি ফিরলেই আমি ঘুমাবো। আপনি আমার জন্য ভাববেন না।'

রাতের শেষ প্রহরে চিকিৎসক তাকে ওষুধ দিচ্ছিলেন এবং আনোয়ার আলী পাশে বসে ঢুলছিলেন তন্দ্রার আবেশে। খিমার বাইরে শোনা গেলো পায়ের আওয়াজ তারপর কে যেনো বললেন ঃ তুমি দাঁড়াও এখানে। মুহূর্তের পরে মানবীয় মহিমা ও গৌরবের এক মূর্ত প্রতীক এসে প্রবেশ করলেন খিমার মধ্যে। মোয়াযযম আলী চোখ খুললেন এবং তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হলো সুলতান টিপুর মুখের উপর। হাকিম আদব সহকারে সালাম করে এক দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আনোয়ার আলী চমকে উঠে চোখ খুলেই সরে গেলেন একদিকে। মোয়াযযম আলী বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার হিম্মত নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সুলতান দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে হাত ধরে বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকুন। তারপর তিনি কোনো দ্বিধা-সংকোচ না রেখে বসে পড়লেন তার পাশে।

মোয়াযযম আলী নিরুদ্ধ আওয়াজে বললেন ঃ আলীজাহ্, আমার বিশ্বাস ছিলো যে, আপনি অবশ্যি তশরিফ আনবেন, যদিও এ ধরনের খাহেশ আপনার এক খাদেমের পক্ষে অশোভন।'

সুলতান বললেন ঃ আপনি আমার দোস্ত এবং আপনার দোস্তির জন্য আমি ফখর অনুভব করি।'

মোয়াযযম আলী বললেন ঃ যে সব লোক দেশের ইজ্জত ও আজাদিদের মনে করে তেজারতের মাল, তাদের সম্পর্কে আপনি হুঁশিয়ার থাকবেন। একটি মাত্র

গাদ্দার হাজারো শহীদের কোরবানী ব্যর্থ করে দিতে পারে। এ দেশে কতো আয়াজ রয়েছে, তা খোদাই মালুম। বিডনোর ও মালাবারের বাকি এলাকাগুলো থেকে দুশমনদের তাড়ানোর পর কোনো গাদ্দারকে আপনি জিন্দাহ ছেড়ে দেবেন না।'

সুলতান জওয়াব দিলেন ঃ গাদ্দার আক্রমণ চালাবার আগে আমাদের সামনে আসে না। তাদেরকে খতম করবার জন্য শাসকের দৃষ্টির চাইতে বেশি প্রয়োজন পুরো কওমের সামগ্রিক চেতনা জাগ্রত করে তোলা। যে দেহে বিশুদ্ধ রক্তের স্থান দখল করেছে বিষাক্ত উপাদান, সেখানেই দেখা যায় বিপজ্জনক ক্ষত। যে কওমের বিচারক্ষমতা কমজোর হয়ে গেছে, তারই কোলে জন্ম নেয় গাদ্দার। আমার পুঁজি সেই সর্বহারা কওম-যাদের আত্মসম্ভ্রম ও লজ্জা শরমের ঐশ্বর্য লয় হয়ে গেছে। এ কওমের ভিতরে নয়া জিন্দেগির প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলাই আমার সময়ের প্রয়োজন। আল্লাহ এ যুদ্ধ থেকে যদি আমায় অবকাশ দেন, তাহলে হয়তো সে কাজ আমি করতে পারবো। কিন্তু আমার যুদ্ধ কেবল ইংরেজের বিরুদ্ধেই নয়, বরং নিজামও আমায় মনে করেন তার নিকৃষ্টতম দুশমন।'

মোয়াযযম আলী দুর্বলতার দরুন চক্ষু মুদে বললেন ঃ আমার বিশ্বাস, তিনি আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যে মকসাদের জন্য আল্লাহতাআলা আপনাকে মনোনীত করেছেন, তা অবশ্যি পূর্ণ হবে।'

সুলতান হাকিমের দিকে তাকালেন। হাকিম দ্রুত এগিয়ে মোয়াযযম আলীর নাড়ি দেখলেন। সুলতান তার পেশানীর উপর হাত রেখে ডাকলেন ঃ মোয়াযযম আলী!'

মোয়াযযম আলী চোখ খুললেন এবং সুলতানের হাত ধরে ঠোঁটের উপর লাগালেন। তারপর বললেন ঃ আলীজাহ! মৃত্যুর জন্য আমি এই মুহূর্তটির ইন্তেজার করছিলাম। খোদা আপনাকে বিজয় গৌরব দান করুন। তারপর তার মুহাব্বত, আনুগত্য ও নির্ভরতা ভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সুলতান টিপুর মুখের উপর।

কয়েক মুহূর্ত পর মোয়াযযম আলী এক দীর্ঘ গভীর শ্বাস গ্রহণ করলেন এবং সুলতানের হাতের উপর তার হাতের চাপ ঢিলা হয়ে এলো। মুর্শিদাবাদের আঁধার রাতের মুসাফির মহীশূরের দীপ্তমান প্রভাতসূর্যের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সুলতানের ইশারায় হাকিম তার পাশে এসে নাড়ির উপর হাত রেখে মাথা হেলিয়ে দিলেন।

'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলে সুলতান আসন ত্যাগ করে উঠলেন। আনোয়ার আলী নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সস্থানে। তার চোখের কোণে চকচক করে উঠলো অশ্রুবিন্দু। সুলতান স্বস্নেহে তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন বেটা, ওর জিন্দেগি ছিলো মানুষের অনুকরণের যোগ্য আর ওর মৃত্যুও তাদের ঈর্ষার বস্তু।'

৫

কয়েকদিন পর। অপরাহ্নে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ফরহাত ও মুরাদ আলী বারান্দায় বসে রয়েছেন। আচানক মুরাদ আলী চিৎকার করে উঠলেন ঃ আম্মাজান! আম্মাজান!! ভাইজান এসেছেন। তারপর ছুটে আঙিনায় নেমে সে আনোয়ার আলীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। আনোয়ার আলীর লেবাস পানি-কাদায় ভরা। তিনি মুরাদ আলীকে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলেন। ফরহাত হাজারো দোয়াভরা দৃষ্টি নিয়ে উঠে বারান্দার সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু আনোয়ার আলীর মুখের উপর দুঃখবেদনার ছাপ দেখে তার দীল বসে গেলো। আনোয়ার আলী বারান্দার সিঁড়ির উপর পা রেখেই অস্পষ্ট আওয়াজে সালাম করে মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঃ কি খবর বেটা?' মা আশঙ্কার স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। তোমায় খুব পেরেশান মনে হচ্ছে যে?'

কয়েক মুহূর্ত ধরে আনোয়ার আলীর বাকশক্তি লোপ পেয়ে গেলো। তারপর আচানক ঝুঁকে পড়ে তিনি মুরাদ আলীকে বুকে চেপে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন ঃ আম্মাজান! আব্বাজান শহীদ হয়েছেন।'

ফরহাত কিছুক্ষণ নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কম্পিত পদে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে চারপায়ার উপর বসে পড়লেন। তার মৌনতা চিৎকারের চাইতে মর্মভেদী, তার বিস্ফারিত দৃষ্টি অশ্রুপাতের চাইতেও পীড়াদায়ক। আনোয়ার এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে বসলেন। তিনি কোমরের থলে থেকে মোয়াযযম আলীর চিঠি বের করে মা'র হাতে দিয়ে বললেন ঃ আম্মাজান! জখমি হবার পর আপনার কাছে আব্বাজান এ চিঠিখানা লিখিয়েছিলেন।'

ফরহাত কম্পিত হাতে চিঠিখানা ধরলেন, কিন্তু খুলে পড়বার পরিবর্তে তেমনি নির্বাক নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। মুরাদ আলী এগিয়ে এসে বললো ঃ আম্মাজান! আপনি আব্বাজানের চিঠি পড়লেন না?'

ফরহাতের ঠোঁট কাঁপছে। তার পাথরের মতো চোখ দুটিতে উথলে উঠছে অশ্রুধারা। তারপর আচানক মুরাদ আলীকে টেনে তিনি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। তার চোখে নেমে এলো অশ্রুর সয়লাব।

সাবের আনোয়ার আলীকে ডাকতে ডাকতে আঙিনায় প্রবেশ করলো, কিন্তু বারান্দার কাছে এসে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়ালো।

ঃ কি হয়েছে বিবিজী?' আশঙ্কার আওয়াজে সে প্রশ্ন করলো।

ফরহাত কোনো জওয়াব না দিয়ে উঠে গেলেন কামরার মধ্যে। মুরাদ আলী এগিয়ে গিয়ে সাবেরকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আনোয়ার আলী বললেন ঃ চাচা সাবের! আব্বাজান শহীদ হয়েছেন।'

সাবের কিছুক্ষণ নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদতে লাগলো অঝোর ধারায়।

ফরহাত কামরার মধ্যে একটি মোড়ার উপর বসলেন। কম্পিত হস্তে তিনি স্বামীর চিঠি খুলে পড়তে শুরু করলেন। মোয়াযযম আলী লিখেছেন-

'জীবনসঙ্গিনী! আমি জখমে কাতর অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে তোমায় লিখেছি এই চিঠি। সম্ভব হতে পারে যে, আমার যিন্দাহ থাকাই হবে আল্লাহর মর্জি এবং আমি তোমায় আবার দেখতে পাবো। কিন্তু এখন আমার জিন্দাহ থাকার খাহেশকেও মনে হয় এক আত্মপ্রতারণা। আমার যখম খুবই গুরুতর এবং খুব সম্ভব, তোমার নামে এই চিঠিই হবে আমার আখেরী পয়গাম।

আমার জিন্দেগির শ্রেষ্ঠ দিনগুলি আমি অতিবাহিত করেছি তোমার সাহচর্যে এবং তোমার সাহচর্যের আগে তোমার স্মরণে ও কল্পনায় তোমার সম্পর্কে যে স্বপ্ন আমি দেখতাম, তা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো আমার আশা-আকাঙ্খা, উৎসাহ-উদ্দীপনা। তোমার সাহচর্য আমায় দিয়েছে জিন্দেগির উত্তম মকসাদ। তোমার বাচ্চাদের জন্য আমি সন্ধান করে ফিরেছি এমন এক ওয়াতন, যেখানে তারা যাপন করতে পারবে ইজ্জত ও আজাদির জিন্দেগি এবং মহীশূর হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের জান্নাত। একটি বড়ো আকাঙ্খা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল কোরবানীর। মহীশূরের ইযযত ও খ্যাতির জন্য যে অগুণতি মুজাহিদ জান কোরবান করেছেন, তাদের রক্তের চাইতে আমার ও তোমার পুত্রদের রক্ত বেশি মূল্যবান নয়। অনন্তপুরে আমি দেখে এসেছি সেই মাটির স্তূপ, যার তলায় সিদ্দীক ও মাসউদের সাথে দাফন করা হয়েছে আরো অসংখ্য শহীদের লাশ। কতো বাপ-মা, কতো বোন, কতো ভাই, কতো সন্তান ও বিধবা স্ত্রী অনন্তপুর থেকে বহু বহু বহু দূরে থেকে আজো করছে তাদের ইন্তেজার। কে জানে, অনাগত ভবিষ্যতে অনন্তপুরের এ কাহিনী মহীশূরের আরো কতো কেল্লায়, শহরে ও বস্তিতে অভিনীত হবে?'

সুলতান টিপু হচ্ছেন সেই মুজাহিদ দলের নেতা- আল্লাহ যাদেরকে মনোনীত করেছেন এক পতনমুখী কওমের অতীত গুনাহর কাফফারা আদায়ের জন্য। আমি তোমায় বলতে পারবো না, কি হবে সুলতানের সে সংগ্রামের আখেরী আনজাম অগ্নি আর রক্তের কতো তুফান উঠবে তার মনজিলের পথে বাইরের হামলাদার ছাড়া এই দেশের ভিতরেই রয়েছে কতো সুযোগসন্ধানী, বিবেকবর্জিত মুনাফিক ও গাদ্দার, যারা এই মহিমান্বিত মানুষটিকেই মনে করবে তাদের পথের কন্টক। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, দক্ষিণ হিন্দুস্তানের মুসলমানরা যদি আত্মহত্যার ইরাদা না করে থাকে, তাহলে মহীশূরই হবে তাদের আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্রভূমি। তাহলে তারা সুলতান টিপুকে তাদের নাজাতদাতা মনে করে তাঁর ইশারায় জান কোরবান করাকেই মনে করবে সৌভাগ্য। কিন্তু যদি যিল্লৎ ও অবমাননা তাদের জন্য নির্ধারিত ভাগ্যলিপি হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে ইজ্জতের সাথে মাথা উঁচু

রেখে জিন্দেগি যাপনের পথ দেখানোর সাধ্য কেনো মানুষেরই থাকবে না। আমাদের রুহ এতটুকু আশ্বাস নিয়ে যেতে পারবে যে, আমরা আল্লাহর জমিনে আমাদের শেষ কর্তব্য সম্পাদন করে গেছি এবং পুরস্কার ও শাস্তি দানের মালিকের দরবারে দাঁড়িয়ে একদিন আমরা বলতে পারবো যে, কওম যেদিন গোমরাহীর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলো, সেদিন আমরা তাদেরকে রোশনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। হক ও বাতিলের সংঘাত যেদিন চলছিলো, সেদিন আমরা বাতিলের বিরুদ্ধে হকের পক্ষে সমর্থন করেছিলাম। আল্লাহতাআলা যেদিন এক পতনমুখী কওমের গতি নির্দেশের জন্য পাঠিয়েছিলেন এক মহিমান্বিত মানুষকে, সেদিন আমরা কওমের যিল্লৎ ও অবমাননার দাগ মুছে দেবার জন্য পেশ করেছিলাম দেহের তপ্ত খুন।'

'জীবনসঙ্গিনী! আমি দোআ করছি, সিদ্দীক ও মাসউদদের মতো যেনো আনোয়ার ও মুরাদও সুলতান টিপুর জানবাজদের প্রথম সারিতে থাকতে পারে। এক জামানা এমন ছিলো, যখন আমি চিন্তা করতাম যুদ্ধের তার ফলাফলের কথা এবং মনে করতাম যে, যুদ্ধে কোনো ফউজের পরাজয় ঘটলে তার সিপাহীদের রক্তক্ষয় হয় ব্যর্থ, কিন্তু আজ এ বাস্তব সত্য আমার ঈমানের অংশ হয়ে গেছে যে, জয়-পরাজয়ের পরোয়া না করে যে মুজাহিদ কোনো মহৎ ও উচ্চ আদর্শের জন্য জান কোরবান করে দেন, তার সে কোরবানী কখনো ব্যর্থ হয় না এবং যে আদর্শের জন্য তিনি নির্লোভ কোরবানী দিয়ে যান, তা মানবতার মূল্যবান উত্তরাধিকার হিসাবে হামেশা জিন্দাহ থাকবে। যখস সত্য-ন্যায়ের আলমবরদারদের এক কাফেলার পতন ঘটে তখনই আল্লাহতাআলা আর এক কাফেলাকে পাঠান তাদের হাতের ঝান্ডা উঁচু করে ধরবার জন্য। আমি যখন আমার কওমের অতীতের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমি অনুভব করতে থাকি, ইনসানিয়াতের যে ঝাণ্ডা সুলতান টিপু আজ তুলে ধরেছেন, অতীত কয়েক শতাব্দীতে আরো কোনো কোনো মহিমান্বিত মানুষ তা উঁচু করে ধরেছিলেন। তাদের মধ্যে কতক ছিলেন এমন, যাদের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য মওজুদ ছিলো যিন্দাহ ও চেতনাসম্পন্ন কওমসমূহ এবং তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিলো সাফল্য ও সৌভাগ্য। কতক আবার এমন ছিলেন, যাদের বিপুল মহিমা এবং অসাধারণ সাহস ও হিম্মত থাকা সত্ত্বেও অভিশপ্ত কওমকে তারা আনতে পারেননি সরল-সহজ পথে এবং যে মুষ্টিমেয় আত্মত্যাগী মানুষ তাদের আওয়াজে সাড়া দিয়েছিলেন, তাদের পবিত্র খুন দিয়ে কওমী ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় লিখিত হয়নি।'

'ভবিষ্যতের কথা যখন চিন্তা করি, তখন আমার আত্মা এই কথারই নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের পতাকা কখনো ভূলুণ্ঠিত হবে না। এ দেশের কোনো না কোনো কোণ থেকে কোনো-না-কোনা মহিমান্বিত মানুষ বেরিয়ে এসে তুলে ধরবে তাকে। তারপর আসবে এমন একদিন, যেদিন পুরো কওম সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত হবে সেই ঝাণ্ডাতলে এবং তার প্রতি কদম চালিত হবে

সাফল্যের দিকে-সৌভাগ্যের অভিমুখে। কিন্তু সে সাফল্য ও সৌভাগ্যে তাদেরকে সমান হিসসাদার মনে করা হবে, যাঁরা অতীতের ঘূর্ণাবর্ত উপেক্ষা করে উঁচু করে ধরেছিলেন হক ও ইনসানিয়াতের পতাকা।

'বিভিন্ন যুগে হক ও ইনসানিয়াতের জন্য কোরবানী দেনেওয়ালা মানুষ কিয়ামতের দিন এসে দাঁড়াবেন একই সারিতে। আমার আখেরী দোআ, ইউসুফ, আসফ, আফযল, আমার আব্বাজান, সিদ্দীক ও মাসউদের মতো আনোয়ার ও মুরাদও যেনো দাঁড়াতে পারে সেদিন হকপরস্ত মানুষের কাতারে।

তোমার স্বামী।

ফরহাত যখন চিঠির ভিতরে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, তখন আনোয়ার ও মুরাদ কামরায় প্রবশ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তার সামনে, কিন্তু আশপাশের কোনো কিছুর অনুভূতিই নেই তার। কখনো কখনো চিঠির কথা ও তার চোখের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় অশ্রুর পরদা। তিনি অশ্রু মুছে ফেলে আবার ব্যস্ত হন চিঠি পড়তে। চিঠি খতম করার পরও দীর্ঘ সময় তিনি বসে থাকলেন নত মস্তকে। তারপর তিনি গর্দান তুললেন এবং পুত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমাদের আব্বাজান মরে যাননি, তিনি যিন্দাহ রয়েছেন। যতোদিন এ দুনিয়ার বুকে ইজ্জত ও আজাদির ধারণা জিন্দাহ থাকবে, তিনিও জিন্দাহ থাকবেন ততোদিন। এ চিঠিখানা তোমাদের উত্তরাধিকার। কোনো বাপ তার সন্তানের জন্য এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোনো উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেন না।'

এক হফতা পর আনোয়ার আলী রওয়ানা হয়ে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। তারপর প্রতিদিন মুরাদ আলী মকতব থেকে ফিরে এসে মাকে শোনায় সুলতানের বিজয়ের নতুন নতুন খবর : 'আম্মাজান, বিডনোর ফতেহ হয়ে গেছে। জেনারেল ম্যাথুজ ও তার ফউজকে শিকল পরা পায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চাতল দুর্গের কয়েদখানায়। 'আম্মাজান, আজ খবর এসেছে যে, সুলতানের বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে বাংগালোরের দিকে। আজ খবর এলো; বাঙ্গালোর শহর ফতেহ্ হয়ে গেছে, আর কেল্লা অবরোধ করে রাখা হয়েছে।'

আর একদিন এসে মুরাদ বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললো : আম্মাজান, বাঙ্গালোরের কেল্লা ফতেহ হয়ে গেলো।'

সমাপ্ত